যা দেখেছি
যা বুঝেছি
যা করেছি

রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম বীর উত্তম

যা দেখেছি,
যা বুঝেছি,
যা করেছি

রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম বীরউত্তম

নবজাগরন প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
নবজাগরন প্রকাশনী ঢাকা
৪৩৫/এ বড় মগবাজার; ঢাকা-১২১৭

প্রকাশ কাল
১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১

মূল্যঃ ২৫০.০০ টাকা

প্রচ্ছদঃ আলী আহম্মদ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পাকিস্তানঃ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল

- আইয়ূব শাহীর বিরুদ্ধে গণরোষ।
- শেষ অধ্যায়।
- জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল।
- কেন্দ্রিয় শাসকগোষ্ঠির অপশাসন-শোষণ, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিটি অঞ্চলে স্বাধিকার এবং স্বায়ত্ব শাসনের আন্দোলন।
- ৬ দফা আন্দোলন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।
- পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ঐক্যের ১১ দফা আন্দোলন।
- পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূট্টোর উত্থান।
- সারা দেশে ওয়ান ইউনিট বাতিল এবং নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের জোয়ার।
- দেশব্যাপী আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকায় ছিল জাগ্রত ছাত্র সমাজ।
- '৭০ এর নির্বাচনের প্রেক্ষাপট।
- প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়।

আইয়ূব খানের ক্ষমতা দখল পাকিস্তানের জন্য অবিসংবাদিত বিপর্যয় ডেকে আনল। মার্শাল'ল জারি করার ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের অবক্ষয় ঘটল। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ভারতে গণতন্ত্র যখন সুপ্রতিষ্ঠিত তখন পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারি হওয়ায় বিশ্ব পরিসরে উপমহাদেশের মুসলমানদের ইমেজ বিনষ্ট হয়। সরকার রাজনীতিকদেরকে অর্ডিন্যান্স বলে অপরাধী ঘোষণা ঘোষণা করে জাতীয় রাজনীতিকে কলঙ্কিত করেছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার হরণ করে তিনি দেশের মানুষের উপর একনায়কত্ব চাপিয়ে দেন। আইয়ূবের বুনিয়াদি গণতন্ত্র দেশে দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়েছিল। পাকিস্তানের ফেডারেল কাঠামো ভেঙ্গে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনার উপর আঘাত হানা হয়। আইয়ূব পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে একটা বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিলেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের হিন্দু ভাবাপন্ন চির পরাধীন, সন্দেহপ্রবন বলে আখ্যায়িত করে তিনি দুই অংশের মধ্যকার সংহতি বিনষ্ট করেছিলেন। করাচী থেকে ফেডারেল ক্যাপিটাল পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত করে করাচীর জনগণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনেও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। বুনিয়াদি গণতন্ত্র প্রথা প্রবর্তন করে তিনি আজীবন শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন বলে মনে করেছিলেন। এ প্রথা প্রবর্তনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের ৯জন নেতা আইয়ূব খানের এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ বুদ্ধিজীবি মহলে সমাদৃত হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপ সময়োপযোগী হওয়া অপরিহার্য। এই সময়ের হেরফের একটি আন্দোলনকে বহু বছর পিছনে ঠেলে দিতে পারে। সে সময় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল আইয়ূব সরকারের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতির ঐক্য গড়ে তোলা। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। এ সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই জেনারেল আইয়ূব জাতির মাথায় বুনিয়াদি গণতন্ত্রের ভূত চাপিয়ে দিতে সক্ষম হন।

কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সত্য হল এই যে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। সে এক নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলে এবং সে গতি তার অমোঘ। বার বার করে ক্ষমতালোভী নেতৃত্ব এই সত্যটাকেই অস্বীকার করে থাকেন। মোনেম খানকে আইয়ূব খান বাংলাদেশে তার সবচেয়ে অনুগত এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হিসাবে বেছে নিয়ে তাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ করেন। তার দ্বারা বাংলা সংস্কৃতি এবং বাঙ্গালীর ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালানো হয়। তার আমলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে দুর্নীতি প্রবেশ করে। কিছু সংখ্যক ছাত্রনেতাকে তিনি ঠিকই বশীভূত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর পরিণতি মোনায়েমের জন্য সুখকর হয়নি। তার এই কূটকৌশলের বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে দলমত নির্বিশেষে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল।

মোনেম খাঁর ছেলে খসরু আইয়ূব বিরোধীদের খতম করার জন্য গুন্ডা বাহিনী গড়ে তুলেছিল। রাজনীতিতে ছেলে-ভাগ্নেদের প্রভাব কখনো কল্যাণকর হয়নি। অচিরেই মোনেম খাঁর অন্যায় গণবিরোধী কার্যকলাপের জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের ক্ষোভ আইয়ূব প্রশাসনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হয়ে উঠে।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এ সময় কতগুলো অপ্রত্যাশিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। পরবর্তী পর্যায়ে ঘটনাগুলো পাকিস্তানের রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যুদ্ধ শেষে আইয়ূব খান ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রির মধ্যে ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দানের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা করে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন এবং নাটকীয়ভাবে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন। একই কারণে তিনি তার মন্ত্রীত্বের পদেও ইস্তফা দেন। এরপর তিনি সরাসরিভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। তিনি পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি (পি পি পি) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জনাব ভুট্টো ও তার দল পিপিপি অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়। জনাব ভুট্টো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেন তরুণ ও ছাত্র সমাজের কাছে। তার ডাকে বিশেষভাবে সাড়া দেয় পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ। নবগঠিত পিপিপি-কে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনকে গতিশীল করে তুলতে তরুণ ছাত্র সমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৮ সালের শেষাশেষি আইয়ূব বিরোধী আন্দোলন পিপিপি-র নেতৃত্বে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে গণআন্দোলনের রূপ নেয়।

যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেশরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজনীয় ইউনিট এবং অস্ত্র সম্ভারের অভাবে ভারতীয় আক্রমণের মুখে ৩ দিন টিকে থাকার মত ব্যবস্থাও সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরতার জন্য মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য অচল হয়ে যায়। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ৬ দফা দাবি পেশ করলেন। তখন তিনি অবশ্য এ কথাও বলেছিলেন যে, ৬ দফার প্রশ্নে আলোচনা করা যেতে পারে।

ছয় দফা :

(১) ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

সংশোধিত: সরকারের চরিত্র হবে ফেডারেল এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক। জাতীয় এবং ফেডারেটিং ইউনিটসমূহতে প্রতক্ষ্য গণভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে ফেডারেল সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা হবে।

(২) কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে মাত্র দুইটি বিষয় থাকিবে। প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট বিষয়সমূহ স্টেট বা প্রদেশসমূহের হাতে থাকিবে।

(৩) পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দুইটি পৃথক অথচ বিনিময় যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকিবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচাঁর না হইতে পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

সংশোধিত: ফেডারেল সরকার শুধুমাত্র পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা সম্পর্কিত বিষয়াদির জন্য দায়ী থাকিবেন। বিষয়গুলো হল:-

ক) দুই উইং এর জন্য দুইটি ভিন্ন কিন্তু পরিবর্তনশীল মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে হবে অথবা-

১। সারা দেশের জন্য একটি মুদ্রা ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক আইন প্রবর্তন করতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ ও অর্থ পাচাঁর হতে না পারে।

খ) আলাদা ব্যাংকিং রিজার্ভ সৃষ্টি করতে হবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য; আলাদাভাবে আর্থিক এবং আয়-ব্যয় এবং হিসাব-নিকাশের ক্ষমতা থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের।

১। দুইটি ভিন্ন কিন্তু পরিবর্তশীল মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করা প্রতিটি অংশে কিংবা অঞ্চলের জন্য অথবা একটি মুদ্রা ব্যবস্থাই চালু থাকবে তবে কেন্দ্রিয় রিজার্ভ ব্যাংকিং সিষ্টেমের ভিতর আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক সৃষ্টি করতে হবে এবং এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে যাতে এক অঞ্চলের সম্পদ কিংবা অর্থ অন্য অঞ্চলে পাচাঁর করা সম্ভব না হয়।

(৪) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রেভিনিউর একটি অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের মূলধন হইবে।

সংশোধিত: আর্থিক লেনদেন, আয়-ব্যয় এবং পরিকল্পনা হবে ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর। ফেডারেটিং ইউনিটগুলো কেন্দ্রিয় সরকারকে বরাদ্দকৃত অর্থের যোগান দেবে প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকান্ডের জন্য। দেশের সংবিধানে নির্ধারিত বরাদ্দ আয় কেন্দ্র পাবে যথাযথভাবে নির্ধারিত অনুপাতে। সংবিধানে এমন বিধান নির্ধারন করা হবে যাতে কেন্দ্রিয় সরকার ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ পায় যাতে করে ফেডারেল ইউনিটগুলোর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতিগুলোর উপর ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

(৫) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আদায়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে। এইসব অর্থ আঞ্চলিক সরকারের এখতিয়ারে থাকিবে। কেন্দ্রিয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল সমানভাবে দিবে অথবা সংবিধানের নির্ধারিত হারে আদায় হইবে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানি-রপ্তানীর অধিকার আঞ্চলিক সরকারের থাকিবে।

সংশোধিত: বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সব হিসাব প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিটের নিয়ন্ত্রণে পৃথক পৃথক ভাবে রাখার বিধান সংবিধানে রাখা হবে। কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিট কি অনুপাতে প্রদান করে সেটা সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত থাকবে। দেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারনের দায়িত্ব হবে কেন্দ্রিয় সরকারের। কিন্তু সেই নীতির আওতায় আঞ্চলিক সরকারগুলো বর্হিবাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সর্ম্পকে সরাসরি আলোচনা এবং চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে সেই বিধানও সংবিধানে থাকিতে হইবে।

(৬) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠন করা হইবে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে।

সংশোধিত: জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ফেডারেটিং ইউনিটগুলো নিজস্ব মিলিশিয়া অথবা প্যারামিলিটারী ফোর্স গঠন করতে পারবে।

৬ দফা দাবি প্রণয়নের পরই মুজিবের প্রতি পাকিস্তানী সামরিক জান্তার আক্রোশ বেড়ে যায়। ৬ দফার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয় পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার কথা। ঐ দাবির মধ্যে পাঞ্জাবী চক্র দেশদ্রোহিতার গন্ধ পান। তারা ৬ দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী অপপ্রয়াস বলে চিত্রিত করেন। মূলতঃ ৬ দফা ছিল পাকিস্তান ভিত্তিক বাঙ্গালীদের মুক্তি সনদ মাত্র। এই ৬ দফা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য মুজিব ও আওয়ামী লীগের উপর বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা চাপিয়ে দেয়া হয় একটার পর একটা। কোন মামলায় জামিন নিয়ে জেল থেকে বেরুনোর মুহূর্তে জেল গেট থেকে আবার মুজিব ও তার সহকর্মীদের গ্রেফতার করা হত। অন্যায়ভাবে মুজিবকে এভাবে পুনঃ পুনঃ গ্রেফতার করার ফলে দেশবাসী বিশেষভাবে মুজিবের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে। ৬ দফার প্রতিও জনসমর্থন বাড়তে থাকে। ক্রমান্বয়ে ৬ দফা হয়ে উঠে বাঙ্গালী জনগণের মনের দাবি, সোচ্চার হয়ে উঠে তারা।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। ষড়যন্ত্র চলল বাংলার সোচ্চার কণ্ঠ দাবিয়ে রাখার। হঠাৎ করে ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী ২জন বাঙ্গালী সিএসপি অফিসার সহ মোট ২৮ জন সামরিক/বেসামরিক বাঙ্গালী অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় '৬৭ এর ডিসেম্বরে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সশস্ত্র পন্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার চক্রান্ত করছিল। ১৭ই জানুয়ারী রাতে হঠাৎ করে মুজিবকে মুক্তি দেয়া হল। জেল গেট থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগুতেই সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিরা তাকে পুনরায় গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যায়। ১৮ই জানুয়ারী এক প্রেসনোটে বলা হয়, "মুজিব একটি ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী"। এই মামলার নাম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। আসামীর সংখ্যা ৩৫জন। এর মধ্যে বঙ্গবীর এমএজি ওসমানীও রয়েছেন। রাজসাক্ষী ১১ জন। ২১শে এপ্রিল গঠিত হল বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। বিচার শুরু হয় কুর্মিটোলা সেনানিবাসে ১৯শে জুন। ঐ মামলার ঘটনার সঙ্গে শেখ মুজিব কোনভাবেই জড়িত ছিলেন না। তবু তাকে ঐ মামলায় জড়ানো হয়েছিল তার দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাকুরীরত বাঙ্গালী সদস্যদের প্রায় সবাই পাঞ্জাবী শাসককুলের বিরুদ্ধে

বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। তাদের বিজাতীয় শাসন-শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী ছিলেন তারা।

নৌ বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালীদের প্রতি অবিচার ও ক্রমাগত অবহেলায় পাঞ্জাবী শাসক চক্রের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর কতিপয় দুঃসাহসী তরুণ সদস্য এবং কয়েকজন প্রভাবশালী বাঙ্গালী আমলার সহায়তায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তা করেছিলেন মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও। কিন্তু শেখ মুজিব কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কথা চিন্তা করেননি। তিনি স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবি জানিয়েছিলেন মাত্র।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ধারা বিবরণী খবরের কাগজে প্রকাশিত করতে থাকে আইয়ূব-মোনেম চক্র। তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানদের ভারত বিরোধী মনোভাবকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন, মানুষ যখন জানতে পারবে শেখ মুজিব ভারতের দালাল হয়ে পাকিস্তানের অখন্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। কিন্তু পরিণাম হল সম্পূর্ণ উল্টোটাই। প্রকাশিত ধারা বিবরণীর মধ্যেই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠল আইয়ূব-মোনেম চক্রের ঘৃণ্য চক্রান্ত। এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলাকে তখন বাঙ্গালীরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলেই ধরে নেয়। ফলে সারা বাংলার মানুষ আইয়ূব শাহীর বিরুদ্ধে রুদ্র আক্রোশে ফেটে পড়ল। এখানে আবারও উল্লেখ করতে হয় যে, আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানেও মুখ্য এবং অগ্রণী ভূমিকা ছিল ছাত্র সমাজের। তারা ইতিমধ্যেই সংগ্রামকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামে রূপ দেবার লক্ষ্যে ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ১১ দফার ভেতরেই বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠে। ১১ দফার ভিত্তিতেই বাংলার মাটিতে ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের জোয়ার এক প্রচন্ড রূপ ধারণ করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবিঃ

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘ দিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শাসন-শোষনের নিপীড়নে অতিষ্ট ছাত্র-জনতা আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন। আমরা ছাত্র সমাজ ও

দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফা দাবিতে ব্যাপক ছাত্র গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি :-

১। (ক) স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজসমূহকে সত্ত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আইএ, আইএসসি, আইকম ও বিএ, বিএসসি, বিকম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এমএ ও এমকম ক্লাশ চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার ৫০ ভাগ সরকারি সাবসিডি হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেলের সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে

পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাশ লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের কন্ডেন্স কোর্সের সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিষ্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আইইআর ছাত্রদের ১০ দফা, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এমবিএ ছাত্রদের, ও আইন ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা ফ্যাকাল্টি করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কন্ডেন্স কোর্সের দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, স্টীমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখাইয়া শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেসনে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকেটেও এইরূপ সুবিধা দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলেও বাস যাতায়াতে ৫০% কন্সেসন দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুলে ও কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের ৫০% কন্সেসন দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্ব শাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসক গোষ্ঠির শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামান্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হবে।

(২) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন দিতে হইবে।

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ। এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতির প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সংগে সংগে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বর্হিবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বর্হিবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মান ও নৌ বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রদানকরতঃ সাব ফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাংক, বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ ভারী শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকদের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋন মওকুফ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মনপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারন ও আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কায়দা-কানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জন সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার. নিরাপত্তা ও আন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(১০) সিয়াটো. সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বর্হিভূত স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে ।

(১১) দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে ।

সংগ্রামী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব দেন আব্দুর রউফ (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ), খালেদ মোহাম্মদ আলি (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ), সাইফুদ্দিন আহমদ (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন), সামসুদ্দোহা (সাধারণ সম্পাদক,

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন), মোস্তফা জামাল হায়দার (সহ-সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন), দীপা দত্ত (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন), তোফায়েল আহমদ (সহ-সভাপতি, ডাকসু), নাজিম কামরান চৌধুরি (সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু)। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিন্তু সেদিন ছাত্র আন্দোলনের সাথে তাল রেখে চলতে পারেননি। সমগ্র বাংলার জনগণের কাছে সেদিন ৬ দফা আন্দোলনকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তরুণ আট নেতার জনপ্রিয়তার কাছে সেদিন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাবমুর্তি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তিকালে আগরতলা মামলা থেকে শেখ মুজিবর রহমান ছাড়া পেয়ে রেসকোর্স ময়দানে প্রথম বক্তৃতায় বলতে বাধ্য হন, "জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমি দেখি আওয়ামী লীগের ৬ দফা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফায় বিলীন হয়ে গেছে।" যাই হোক আন্দোলন তখন দুর্বার হয়ে উঠেছে। প্রমাদ গুনলেন আইয়ূব খান। এমন সময়ই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দী অবস্থায় নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয় কুর্মিটোলায়। এর প্রতিবাদে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী গর্জে উঠলেন আইয়ূব শাহীর বিরুদ্ধে। অতীতে তিনি প্রতিটি গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে আন্দোলনের বীজ। তিনি কিভাবে চুপ থাকতে পারেন। ভাসানী ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করবেন বলে হুমকি দিলেন। তার নেতৃত্বে ঢাকার বুকে আন্দোলন উদ্দাম হয়ে উঠল। বাধঁভাঙ্গা ঢেউয়ের মত বাংলার দামাল ছেলেরা মার্শাল'ল ভঙ্গ করল। এখানেও অগ্রণীর ভূমিকায় জাগ্রত ছাত্র সমাজ। কারফিউ চলছে দিন-রাত। তার মধ্যে বর্জ্রকণ্ঠে গর্জন উঠল মধ্যরাতে 'জয় বাংলা'। হল থেকে হলে, তার পর বাইরে। কারফিউ আগ্রায্য করে ঢাকার রাজপথে জনতার ঢল নামল। সে রাতেই গুলি চলল। অগনিত দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী শাহাদাত বরণ করলেন সামরিক বাহিনীর গুলিতে। এতটুকু বিচলিত হলনা বাংলার দুর্জয় মানুষ। বর্জ্র কঠিন শপথ নিয়ে এগিয়ে চলল তারা। তাদের প্রিয় নেতাদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছিনিয়ে আনবেই। বুকের রক্তের বিনিময়ে অধিকার আদায়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের মুখে ধ্বসে পড়ল আইয়ূব প্রশাসন। এতে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠে সার্বিক পরিস্থিতি।

জাতীয় রাজনীতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমি তখন কোয়েটায় ১৬ ডিভিশনের ৬২ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্টে পোস্টেড। আমার আবাস কিংস রোডের আর্টিলারী অফিসার্স মেসে। আমি ছাড়াও তখন কোয়েটাতে বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার বিভিন্ন রেজিমেন্ট ও ব্যাটালিয়নে পোস্টেড ছিলেন। কর্নেল দস্তগীর জিওয়ান ডিভ হেডকোয়ার্টার্স, মেজর হাফিজ ৬২ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন শহীদ ৩৩ ক্যেভারলী, ক্যাপ্টেন শরফুল ৩৩ ক্যেভারলী, ক্যাপ্টেন মহ্সীন বেলুচ রেজিমেন্ট, মেজর মালেক বি এম, মেজর কাদের ইঞ্জিনিয়ার্স, ক্যাপ্টেন মাওলা ইএমই ব্যাটালিয়ন, ক্যাপ্টেন

আমছা আমিন ইনফ্যানট্রি স্কুল, ক্যাপ্টেন জাকের, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন শাফায়াত, লেফটেন্যান্ট হারুণ ২৬ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন ইফতেখার, ক্যাপ্টেন মাজহার উদ্দিন মোল্লা, লেফটেন্যান্ট কে বি ৬৩ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন জামাল এএমসি, ক্যাপ্টেন কাসেম এএসসি প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক জেসিও, এনসিও ও জোয়ান ভাইরা স্কুল অফ ইনফ্যানট্রি এন্ড ট্যাকটিকস, ইএমই ব্যাটালিয়ন, সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, ডিভ হেডকোয়ার্টার্স, ষ্টাফ কলেজ এবং ৩৩ ক্যেভারলী রেজিমেন্টে।

কোয়েটায় বাঙ্গালীদের ছোট পরিবার ছিল একটি সুখী পরিবার। আমরা সবাই মিলেমিশে হাসি আনন্দে কাটাতাম দিনগুলো। প্রায়ই আমরা সমবেত হতাম কোথাও না কোথাও। চলতো আলাপ-আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, গল্প-গুজব। জাতীয় সংকট আমাদের মাঝের ব্যবধানকে কমিয়ে আনল আরো। সবাই দেশ সম্পর্কে সচেতন, সবাই শংকিত। ভাবনায় আকুল, কি হচ্ছে? ঘটনা প্রবাহের পরিণাম কি? প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের ক্ষমতা লিপ্সা কোথায় নিয়ে যাবে দেশটাকে? পাকিস্তান টিকে থাকবে কি করে? অন্যায়, অবিচার, শাসন-শোষণ শেষ হবে কবে? আইয়ূব খানের প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে সম্পূর্ণরূপে। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে তিনি কি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেবেন আলোচনার মাধ্যমে? নাকি ক্ষমতার মোহে দেশকে আরো রসাতলে টেনে নিয়ে যাবেন? গোপনে আমরা মিলিত হই বিভিন্ন জায়গায়। আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে পেতে চাই এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব। খবরা-খবরের আদান-প্রদান হয় নিজেদের মধ্যে। প্রতিটি নতুন খবর পর্যালোচনা করি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। খবর পাই দেশ থেকে আসা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। মনযোগ দিয়ে শুনি বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, ভয়েস অফ অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি। জাতীয় রেডিও এবং টিভি মাধ্যমের প্রচারিত খবর একপেশে হওয়ায় বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়না। মাঝে মধ্যে সিগন্যালস্ সেন্টারের বাঙ্গালী ভাইরা নিয়ে আসে জিএইচকিউ থেকে প্রেরিত গোপন বার্তাসমূহের সারবস্তু। এ থেকে শাসকচক্রের মন মানসিকতা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সেটাই বা কতটুকু? পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলনের প্রতি মুহুর্তের ঘটনাবলী জানার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে থাকে তীর্থের কাকের মত। দেড় হাজার মাইল দূরত্বে বসে সীমিত মাধ্যমে ঘটনা প্রবাহের যতটুকু খবরা-খবরই পাচ্ছিলাম, তার চুলচেরা বিশ্লেষন করে অবস্থার সাথে নিজেদের যতটুকু সম্ভব সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করছিলাম আমরা। কিন্তু সবকিছুই করতে হচ্ছিল বিশেষ সতর্কতার সাথে। মনের দাহ ও আক্রোশ অতি কষ্টে চেপে রেখে স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম সবাই। নিজেদের সংযত রেখে ধৈর্য্য সহকারে অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে সবাইকে এ সিদ্ধান্তই

গৃহিত হয় গোপন বৈঠকগুলোতে। আশা-নিরাশার এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তায় কাটছিল আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত।

১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী হঠাৎ করে এক সরকারি ঘোষণায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। ঐ দিন দুপুরে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে কুর্মিটোলা সেনানিবাস থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ঝড় উঠেছে। এবারের আন্দোলন এক ইউনিট বাতিল করার আন্দোলন। সারা পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশের আন্দোলনে সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন করলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান ডাকের প্রধান নির্বাচিত হলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গোটা দেশব্যাপী আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়েই মার্শাল আইয়ুব খান উভয় অংশের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দেশের সার্বিক সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করলেন। শেখ মুজিব, মাওলানা ভাসানী, জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ বহু নেতা আমন্ত্রিত হলেন গোলটেবিল বৈঠকে।

প্রেসিডেন্টের গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন প্রবাসে আমাদের মনে আশার আলো জ্বালাল। ক্ষীন আশা জাগল মনে। বৃহত্তর স্বার্থে হয়তো বা বর্তমান সংকট থেকে দেশকে বাচাঁবার জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করবার আন্তরিক প্রচেষ্টা করবেন সংশ্লিষ্ট সবাই। তবু রয়ে যায় সংশয়।

এদিকে প্রচন্ড গণআন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসে শেখ মুজিব নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করলেন, দেখলেন ইতিমধ্যেই তিনি সারা পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে গেছেন। অথচ পূর্ব বাংলার একক নেতৃত্বের সবটুকুই কিন্তু তার একার অর্জিত সম্পদ ছিল না। বাংলাদেশের জনতা চিরদিনই চলেছে আগে আগে আর নেতারা চলেছেন পেছনে। পূর্ব পাকিস্তানের জনতার মন তখন স্বাধীনতা পাগল। তারা চঞ্চল, চরম বিস্ফোরন ঘটানোর জন্য আকুল। কিন্তু সামনে নেই কোন উপযুক্ত নেতৃত্ব। রাজনৈতিক অঙ্গনে যার রয়েছে ভাবমূর্তি, আন্দোলন গড়ে তোলার মত অবদান সেই ভাসানী তখন বৃদ্ধ। অবদান প্রচুর, রাজনৈতিক প্রজ্ঞারও অভাব ছিল না তার। কিন্তু দেশব্যাপী সংগঠনের অভাব

ছিল তার। তাই ইমেজ থাকলেও তার পক্ষে তখন আন্দোলনকে গড়ে তুলে তাকে ধরে রেখে ধাপে ধাপে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া সম্ভব ছিলনা। এদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেখ মুজিবর রহমানকে রাতারাতি পরিনত করেছে এক কিংবদন্তী নায়কে। তাই বিস্ফোরন্মুখ পূর্ব পাকিস্তান সেই মুহূর্তে জনগণ তাকে নেতৃত্বে বরণ করে নিতে দ্বিধাবোধ করেনি।

শেখ মুজিব আইয়ূব খানের গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রন গ্রহণ করলেন। অন্যান্য নেতাসহ প্রতিশ্রুতি দিলেন একমাত্র ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতেই গোলটেবিল বৈঠকে তিনি আলোচনা করবেন।

মাওলানা ভাসানী পক্ষান্তরে এই বৈঠক বর্জন করে তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া অবস্থা বিশ্লেষনে তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ব বাংলাকে একটি পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করা ছাড়া এ পর্যায়ে রাজনৈতিক জটিলতার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। তাই পল্টনের এক বিশাল জনসভায় তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, "পশ্চিম পাকিস্তান আস্‌সালামু আলাইকুম।" ঐ জনসভায় তিনি শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করারও পরামর্শ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোও সে বৈঠক বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মাওলানা ভাসানী ও ভুট্টোর গোলটেবিল বৈঠক বর্জন জনগণকে বৈঠকের সফলতা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। আমরাও হতাশ হয়ে পড়ি। আশার ক্ষীন আলো যা দেখতে পেয়েছিলাম হঠাৎ করেই যেন তা মিলিয়ে গেল। উৎকণ্ঠায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকলাম। পাকিস্তানের দুই অংশের দুই প্রভাবশালী নেতার অনুপস্থিতিতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক বসে। প্রথম বৈঠকের পর অধিবেশন মুলতবী হয়ে যায় ১০ই মার্চ পর্যন্ত। ১০ই মার্চের অধিবেশনে শেখ মুজিব তার ওয়াদার বরখেলাপ করলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার পরিবর্তে শেখ মুজিব তার ৬ দফার দাবি উত্থাপন করলেন। কথা ছিল ১১ দফাই হবে বৈঠকে ডাক এর আলোচনার ভিত্তি। কোন বিশেষ পার্টি প্রোগ্রাম বা দাবি সেখানে উত্থাপিত হবে না। কিন্তু মুজিব সমঝোতার বরখেলাপ করে ৬ দফার দাবি উত্থাপন করায় নেতাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হল। ডাক ভেঙ্গে গেল। বৈঠকে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হল না। ১৩ই মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ূব সভাপতির ভাষণে দুইটি প্রস্তাব মেনে নেন -

১) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং

২) পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তন।

১৪ই মার্চ শেখ মুজিব ও তার ৯ সদস্য ঢাকায় ফিরে আসেন। ততক্ষণে নতুন ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়েছে।

সারা দেশব্যাপী আইয়ূব বিরোধী বিক্ষোভ তখন তুঙ্গে। আইয়ূবের ব্যক্তিগত ভাবমুর্তি ও জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ কমে আসছে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারীতে পুমনারী এমবোলিজমে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। এতে করে তার কর্মক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। তিনি আর আগের মত সবখানে যেতে পারছেন না। গণসংযোগ রক্ষা করতে পারছেন না প্রয়োজন মত। সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ও ইউনিটগুলো থেকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন দিনকে দিন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন গুটিকতক জ্বী-হুজুর টাইপ আমলার উপর। প্রতিদিনের রুটিন কাজগুলো সংক্ষিপ্ত করে সম্পাদন করতে হচ্ছিল তাকে।

এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন চক্রান্তকারী ক্ষমতা লিপ্সু জেনারেলগণ। তাদের সাথে হাত মিলান জনাব ভুট্টো এবং আইয়ূব বিরোধী বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সদস্যবৃন্দ। আইয়ূব বিরোধী এই চক্রান্তের নেতৃত্ব দেন তারই নিযুক্ত সেনা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ূব খান যখন সেনা প্রধান হিসাবে জনাব ইস্কান্দর মির্জাকে সরিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত আটছিলেন তখন তরুণ সেনা অফিসার ইয়াহিয়া খান ছিলেন তার বিশেষ অনুগত একজন ষ্টাফ অফিসার। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আইয়ূবের ক্ষমতা দখলের নীল নকশা প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপতির বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে উঠেন তিনি। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৬ সালে জেনারেল মুসা খান সামরিক বাহিনী প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি নেবার পর অনেককে সুপারসিড করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সেনা প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়। আইয়ূব খানের ধারণায় ইয়াহিয়া ছিলেন সহজ হালকা মেজাজের আরামপ্রিয় একজন সামরিক অফিসার। যার কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস নেই। ভেবেছিলেন, স্বীয় শাসন টিকিয়ে রাখতে জেনারেল ইয়াহিয়ার মাধ্যমে সেনা বাহিনীর উপর তিনি তার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন অতি সহজে। কিন্তু তার সে ভাবনা মিথ্যে প্রমাণিত হয়। সার্বিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে একদিকে জেনারেলদের নিয়ে ইয়াহিয়া খান তার ক্ষমতা দখলের নীল নকশা নতুন করে তৈরি করতে গোপন বৈঠকে মিলিত হতে থাকেন; অপরদিকে জেনারেল পীরজাদার মাধ্যমে ভুট্টোকে উৎসাহিত করেন আইয়ূব বিরোধী গণআন্দোলন জোরদার করে তোলার জন্য। জেনারেলদের পরোক্ষ আর্শীবাদপুষ্ট হয়েই জনাব ভুট্টো সরাসরিভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন ও আইয়ূব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে অতি উৎসাহী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রভাবশালী বেসরকারি আমলা জনাব আজিজ আহমেদ ও তার অনুসারীরা আইয়ূব

বিরোধী প্রচারণা অতি চতুরতার সাথে ছড়িয়ে দিলেন সরকারি আমলাদের মধ্যে। প্রশাসনের একটি অংশকে আইয়ূব শাহীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে সক্ষম হয় সে প্রচারণা। উপরন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে মেজর জেনারেল আকবরের নির্দেশে এমন সব তথ্য প্রেসিডেন্টকে জানানো হচ্ছিল যাতে ক্রমশঃই আইয়ূব খান হয়ে পড়ছিলেন আশাহীন ও দুর্বল। হারিয়ে ফেলছিলেন আত্মবিশ্বাস।

এহেন পরিস্থিতিতে, ১৯শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান থেকে ডেকে পাঠালেন জেনারেল মোজাফফর উদ্দিনকে। একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হল জেনারেলদের। বৈঠকে চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ জেনারেল গুল হাসান সবার তরফ থেকে সেনা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে প্রস্তাব রাখলেন, "আমরা দেশের অবস্থার অবনতি আর সহ্য করব না। দেশের অখন্ডতা আজ হুমকির সম্মুখীন। আইয়ূব প্রশাসন আজ সম্পূর্ণরূপে অকেজো। এ পরিস্থিতিতে আপনার নেতৃত্বে মার্শাল'ল জারি করা ছাড়া দেশকে বাচাঁনোর আর কোন পথ নেই। আপনি যত সত্ত্বর সম্ভব দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করুন।" বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ২৫শে মার্চ দেশে সামরিক শাসন জারি করা হবে। গোপন এই বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান জেনারেল আইয়ূবকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, "আমরা পরিস্থিতির অবনতি আর দেখতে চাই না। ২৫শে মার্চের মধ্যে আপনার যা করণীয় করে ফেলুন।" আইয়ূব খান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য শেষ চেষ্টা স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর বদল করেন। কিন্তু তাতেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না।

২৪শে মার্চ জেনারেল রাও ফরমান আলী জেনারেল মোজাফ্ফর উদ্দীনের সাথে রাওয়ালপিন্ডি গমন করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে জেনারেলদের মিটিং হল। অনেক ফর্মেশন কমান্ডাররা উপস্থিত ছিলেন সেই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ। মার্শাল'ল প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনার পর তারা সবাই মিলে প্রেসিডেন্ট হাউজে গেলেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব, আলতাফ গওহর এবং ফিদা হাসান অপেক্ষা করছিলেন। আলোচনার প্রথমেই প্রেসিডেন্ট দৃঢ়তার সাথে বললেন,

–এখন দেখছি মার্শাল'ল ছাড়া কোন উপায় নেই।

–আলবত। ইয়াহিয়া খান বললেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ূব ভেবেছিলেন তার নেতৃত্বে মার্শাল'ল জারি হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান দৃঢ়তার সাথে বললেন,

–মার্শাল'ল সামরিক বাহিনীর লোকদের নেতৃত্বে হবে। এ কথা শুনে আইয়ূব খান বললেন,

—আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, আমি পদত্যাগ করছি। আইয়ূব খানের বক্তৃতা রেকর্ড করা হল। ২৪শে মার্চই ইয়াহিয়া ভুট্টোর সাথে দেখা করে বললেন,

—আইয়ূব খান ব্যর্থ হয়েছেন, আমি ক্ষমতা গ্রহণ করেছি। এখন তোমার মতামত কি? অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে ভুট্টো শর্ত সাপেক্ষে সমর্থন জানালেন।

২৫শে মার্চ রাতে আইয়ূবের রেকর্ডকৃত বক্তৃতা জাতির উদ্দেশ্যে প্রচার করা হল। আইয়ূব পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন। সামরিক শাসন জারি হল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। শাসনতন্ত্র স্থগিত করার সামরিক ফরমান জারি হল। সামরিক শাসন জারি করার যৌক্তিকতা বয়ান করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব তার বক্তৃতায় বললেন, "প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সার্বিক বিশৃঙ্খলার জন্যই সামরিক শাসন বাধ্য হয়ে জারি করা হল।"

১১ বছর আইয়ূব শাহীর শোষণ-শাসনের ফলে দেশের অবকাঠামো যখন সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে তখন প্রভাবশালী ফিল্ড মার্শাল অত্যন্ত অসহায়ের মতো বললেন, "রাষ্ট্রপতি হিসাবে দেশের ধ্বংসযজ্ঞ স্বচক্ষে দেখতে চাই না বলেই আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে স্বৈরাচারের কি করুণ পরিণতি!

দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে বিশেষ করে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক শাসন জারি ও সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্ব গ্রহণে দেশবাসী খুব একটা বিস্মিত হয়নি। এ যেন ছিল অনেকটা অবধারিত পরিণতি। আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবার প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যায় তখন স্বৈরাচারী একনায়কত্ব অস্ত্র শক্তির জোরে জাতির উপর একপেশে সমাধান চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পর আইয়ূব খানের কাছেও সামরিক শাসন জারি করা ছাড়া আর অন্য কোন পথ ছিল না। আইয়ূব বিরোধী প্রচন্ড গণবিক্ষোভের মুখে আইয়ূব শাহীকে টিকিয়ে রেখে কিংবা আইয়ূব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি করে অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনাও ছিল অসম্ভব। তাই আইয়ূব খানকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে মার্শাল'ল জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন জেনারেলরা। অনেককেই সে সময় বলতে শুনেছি নেহায়েত অপারগ হয়েই নাকি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে ঘটনাবলী এটাই প্রমাণ করে যে আইয়ূব খানের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান সার্বিক পরিস্থিতির অবনতির সাথে তাল মিলিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও ক্ষমতালিপ্সু জেনারেলরা ঠান্ডা মাথায় ক্ষমতা দখলের নীল নকশা তৈরি করে চলেছিলেন পর্দার অন্তরালে অতি গোপনে।

ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখলের উপাখ্যান কিছুটা আকস্মিক হলেও সাধারণভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেমন এতে বিস্মিতও হলেন না ঠিক তেমনি অখুশিও হলেন না। সদ্য প্রচারিত সামরিক আইনকে অভিনন্দন না জানালেও নীরবে এ পরিবর্তনকে তারা যেন মেনেই নিলেন। ক্ষমতা দখলের ২৪ ঘন্টার মধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির প্রতি প্রদত্ত ভাষণে বললেন, "আমি আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই আমার কোন রাজনৈতিক অভিলাষ নেই। আমার একমাত্র প্রচেষ্টা হবে অতিসত্ত্বর একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠন করে ব্যারাকে ফিরে যাওয়া। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি গঠনমূলক রাজনৈতিক তৎপরতা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সুষ্ঠ, সৎ এবং পরিচ্ছন্ন কার্যকর প্রশাসন একটি পূর্ব শর্ত। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণই জাতিকে প্রদান করবেন একটি উপযুক্ত শাসনতন্ত্র এবং তাদের দায়িত্ব হবে সার্বিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সব সমস্যার সমাধান করা। যে সমস্ত সমস্যাবলী আজ জনমনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে সেগুলোর সমাধানও তাদেরই বের করতে হবে।"

ইয়াহিয়া খানের এ ভাষণের পর হঠাৎ করেই আন্দোলন, স্ট্রাইক সব বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্র ও শিক্ষকগণ সব আন্দোলন পরিহার করে আপন আপন কাজে যোগদান করলেন। এভাবেই অখন্ড পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটে শেষ অধ্যায়ের সূচনা হল। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক সরকার প্রধানদের বক্তব্যের মত ইয়াহিয়া খানের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ নেতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকেই দেখলেন। ইয়াহিয়ার শাসন প্রক্রিয়াকে 'আইয়ুব ছাড়া আইয়ূবী শাসন' বলেও অভিহিত করলেন অনেকেই। প্রথমে ক্ষমতা দখলকারী জেনারেলরা আইয়ূবী কায়দায় দেশ শাসন করার চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার যথেষ্ট অভাব ছিল। তাই তারা সার্বিক পরিস্থিতির জটিলতা এবং দীর্ঘ দিন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে গড়ে ওঠা জনগণের চাহিদার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হন। তারা ভেবেছিলেন প্রশাসনিক কাঠামোতে রদবদল করে প্রশাসন যন্ত্রকে কার্যক্ষম করে তোলাটাই মূল সমস্যা। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীকারের প্রশ্নসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দাবিগুলো নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অতি সহজেই সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলে তারা মনে করেন।

আইয়ূব আমলে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল মুষ্টিমেয় সামরিক ও বেসামরিক আমলার হাতে। আইয়ূবী শাসনের শেষার্ধে প্রেসিডেন্ট জেনারেলদের চেয়ে বেসামরিক আমলাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠেন। তার পতনের জন্য এই

নির্ভরশীলতাও অনেকটা দায়ী। তাই ক্ষমতায় এসেই জেনারেলরা বেসামরিক আমলাদের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। জেনারেল এসজিএম পীরজাদা নিয়োজিত হলেন ইয়াহিয়া খানের মুখ্য স্টাফ অফিসার হিসাবে। তার অধিনে নিয়োগ করা হল বিগ্রেডিয়ার রহীম (পাঞ্জাবী) মার্শাল'ল এফেয়ার্স ইনচার্জ এবং ব্রিগেডিয়ার করিম (বাঙ্গালী) বেসামরিক বিষয়াদির ইনচার্জ। পরবর্তী পর্যায়ে দু'জনই মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তারা দু'জনই 'সুপার সচিব' হিসাবে সমস্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। প্রশাসনিক কোন ব্যাপারই এই তিনজনের মাধ্যম ছাড়া রাষ্ট্রপতির গোচরে আনা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এভাবেই জেনারেল পীরজাদা সমগ্র আমলাতন্ত্রকে প্রেসিডেন্টের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হন। আইয়ূব আমলে উচ্চ পর্যায়ে নিয়োজিত অভিজ্ঞ আমলাদের অনেককেই সরিয়ে দেয়া হয়। অবসর গ্রহণেও বাধ্য করা হয় অনেককে। যেমন: আলতাফ গওহর, এনএ ফারুকী, ফিদা হাসান প্রমুখ। এতে সর্বোপরিসরে বেসামরিক আমলাতন্ত্র সামরিক জান্তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে ক্ষমতা দখলের প্রথম লগ্ন থেকেই। জেনারেল পীরজাদা ক্রমশঃ হয়ে উঠেন ইয়াহিয়ার মুখ্য পরামর্শদাতা এবং রাজনৈতিক গুরু। সানডে টাইমস তাকে 'রাজপুটিন' হিসাবে আখ্যায়িত করে। ৩১শে মার্চ ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট বনে গেলেন। যুক্তি হিসাবে বলা হল, নতুন সরকারকে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি দানে কূটনৈতিক জটিলতা দূরীভূত করার জন্যই জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে প্রেসিডেন্ট হতে হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হয়েও তিনি সামরিক বাহিনীর প্রধানরূপে বলবত থাকেন। জেনারেল আইয়ূব খান ক্ষমতা দখলের পর একটি বেসামরিক মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে অসম্মত হন। ফলে ৭ই আগষ্ট তিনি যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন তাদের সবাই ছিলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য। জেনারেল ইয়াহিয়া, জেনারেল পীরজাদা, এয়ার মার্শাল নূর খান ও এডমিরাল আহ্সানকে নিয়ে গঠিত হয় ক্ষমতার কেন্দ্র কাউন্সিল অফ এডমিনিস্ট্রেশন। প্রয়োজন মত মন্ত্রণালয় থেকে সচিবদের ডেকে পাঠানো হত পরামর্শের জন্য। ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলরা সবাই মনে করতেন যে সুশৃঙ্খল সেনা বাহিনী তার সাংগঠনিক শক্তি, কার্যকরী জ্ঞান, প্রাযুক্তিক বিদ্যা এবং সমসাময়িক আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের সচেতনতা দেশ ও জাতির আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

ইতিমধ্যে এয়ার মার্শাল নূর খান শ্রমিক ও ছাত্রদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে কতগুলো সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শ্রমিকদের বেশ কিছু দাবি তিনি যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নেন। তিনি তাদের স্ট্রাইক বা ধর্মঘট করার অধিকারকে বৈধতা প্রদান করেন। আইয়ূব শাহীর শিক্ষা নীতি বাতিল করে তিনি একটি নতুন শিক্ষা নীতি প্রণয়নের পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটিতে

ছাত্রদের প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করেন। নূর খানের এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ইয়াহিয়া খান ও তার কাউন্সিল অফ এডমিনিস্ট্রেশন কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। শংকিত হয়ে উঠেন ক্ষমতাশালী কায়েমী স্বার্থবাদীর দল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, বেসরকারি আমলা গোষ্ঠি বিশেষ করে জেনারেল পীরজাদা ও জেনারেল হামিদ। জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে বোঝানো হল এয়ার মার্শাল নূর খান তার ব্যক্তিগত ভাবমুর্তিও জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে এ সমস্ত অযৌক্তিক দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছেন এবং অবাস্তব প্রস্তাবাদি কাউন্সিল অফ এডমিনিস্ট্রেশন এর বৈঠকে উত্থাপন করছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। তিনি ভাবলেন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্যই নূর খান এ সমস্ত কার্যকলাপে ব্রতী হয়েছেন। এ সন্দেহ থেকে সূত্রপাত হয় ইয়াহিয়া-নূর খান দ্বন্দ্বের। তারই ফলশ্রুতিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভেঙ্গে দেন কাউন্সিল অফ এডমিনিস্ট্রেশন। এয়ার মার্শাল নূর খান ও এডমিরাল এহসানকে চীফ অফ এয়ার ষ্টাফ এবং চীফ অফ নেভাল ষ্টাফ পদ থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাদেরকে অবশ্য পরে যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন কেন্দ্রে কাউন্সিল অফ এডমিনিস্ট্রেশনের পরিবর্তে বেসামরিক একটি মন্ত্রীসভা তিনি গঠন করবেন। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৫জন করে মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠন করা হবে নতুন মন্ত্রীসভা।

আইয়ূব খানের ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারাকে এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে পুনর্বহাল করে প্রাদেশিক গভর্ণরদের সেই একই ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া হল। এতে করে প্রাদেশিক শাসন কাঠামোতে দ্বৈততার সূত্রপাত ঘটল। কারণ, গভর্ণর নিয়োগের পরও প্রাদেশিক ও জোনাল সামরিক শাসনকর্তারা সরাসরি মুখ্য সামরিক শাসনকর্তা তথা প্রেসিডেন্টের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন। এ সমস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর রদবদল জনমনে সন্দেহের উদ্রেক করল। তাহলে কি ইয়াহিয়া খান তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্তভাবে দীর্ঘস্থায়ী করার পরিকল্পনা করছেন? গণপ্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যারাকে ফিরে যাবার প্রতিজ্ঞা কি তিনি আর রক্ষা করবেন না? জনাব প্রেসিডেন্ট কিন্তু সবসময় বলতে থাকলেন, ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাওয়াই তার লক্ষ্য।

ইয়াহিয়ার শাসনকাল বেসামরিক আমলা বিশেষ করে সিএসপি অফিসারদের জন্য ছিল এক কালো অধ্যায়। জেনারেল পীরজাদা এবং তার নেতৃত্বাধীন সিএমএলএ অফিসের দু'জন সুপার সেক্রেটারী জেনারেল রহিম ও জেনারেল করিমের প্ররোচণায় ৩০৩ জন সিএসপি অফিসারকে দুর্নীতির অভিযোগে চাকুরীচ্যুত করা হয়। এদের মধ্যে অনেক প্রবীণ ও বিচক্ষণ কর্মকর্তা ছিলেন। দুর্নীতির অভিযোগ আনলেও কোন সুষ্ঠু তদন্ত

ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেয়া হয়। এমনকি চাকুরীচ্যুত অফিসাররা তাদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা বা অসত্যতা প্রমানের সুযোগ হতেও বঞ্চিত হন। চাকুরীচ্যুত অফিসারদের কয়েকজন পরবর্তিকালে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আবার চাকুরীতে পুনর্বহাল হতে সক্ষম হন।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের প্রতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির হীন মনোভাব, বিদ্বেষ, অসম আচরণ, বঞ্চনা জনমনে সৃষ্টি করে প্রচন্ড বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের আগুনকে প্রশমিত করতে এবং বাঙ্গালীদের কিছুটা খুশি করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ৬ জন বাঙ্গালী সিএসপি অফিসারকে কেন্দ্রিয় প্রশাসনে সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ করেন। তিনি প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে নির্দেশ দেন, যখনই কোন সিনিয়র পোষ্ট খালি হবে সেখানে বাঙ্গালীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। তার নির্দেশে বাঙ্গালীদের জন্য সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের কোটা দ্বিগুন করা হয়। বাঙ্গালীদের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য প্রেসিডেন্টের আন্তরিকতা ও সৎ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা প্রবাহ তখন অনেক এগিয়ে গেছে। পুরো বাঙ্গালী জাতি ১৯৬৯ সালে ভাবছে মাত্র একটি দাবির কথা - স্বাধীকার অথবা স্বাধীনতা। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্টের পদক্ষেপগুলোকে বাঙ্গালীরা গ্রহণ করে যৎসামান্য অনুদান হিসেবে। আজ যেখানে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি চাইছে স্বাধীকার অথবা স্বাধীনতা সেখানে এ ধরণের সামান্য অনুদানে বাঙ্গালী তাদের সংগ্রাম থেকে সরে আসবেই বা কেন?

আগষ্ট মাসের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট তার মন্ত্রীসভা গঠন করেন। সদস্যদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন বয়সে প্রবীণ। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেয়া হয় একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল, একজন প্রাক্তন চীফ জাস্টিস, তথাকথিত ২২পরিবারের একজন, জমিদারদের মধ্যে থেকে একজন এবং শিল্পপতিদের মধ্যে থেকে একজন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নেয়া হয় দু'জন প্রাক্তন সিএসপি অফিসার, একজন রাজনীতিবিদ, একজন বেসরকারি খাতের ব্যবসাদার এবং একজন শিক্ষাবিদ। ইয়াহিয়া খানের নতুন মন্ত্রীসভা জনগণের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। যে কোন সামরিক শাসনাধীন মন্ত্রীসভার মত ইয়াহিয়ার মন্ত্রীসভার ক্ষমতাও ছিল অতি সীমিত। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা কোন মন্ত্রীর ছিল না। সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত প্রেসিডেন্ট ও তার 'কিচেন কেবিনেট' এর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। মন্ত্রীগণ আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সভা-সমিতি, ফিতা কাটার অনুষ্ঠান, নিমন্ত্রণ রক্ষা করেই খুশি ছিলেন মন্ত্রী মহোদয়গণ। তাদের মন্ত্রীত্ব বজিয়ে রাখার জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্টের অনুগ্রহের উপর। তাই প্রেসিডেন্টকে খুশি রাখাই ছিল তাদের প্রধান কর্তব্য।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতা দখল করে তখন দেশ জটিল রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত। আর্থসামাজিক অবস্থারও চরম অবনতি ঘটেছে। দেশের অখন্ডতাই শুধু নয় জাতীয় অর্থনীতিও বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সার্বিক এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা এবং সামর্থ্য কোনটাই ইয়াহিয়া সরকারের ছিল না। যে কোন সামরিক সরকারের সফলতার জন্য যেটা বিশেষ প্রয়োজন সেটা হল জনপ্রিয়তা। তাছাড়া শহরভিত্তিক বুদ্ধিজীবি, আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়িক সম্প্রদায় এবং অন্যান্য শক্তিশালী চাপ প্রয়োগকারী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা লাভ করাও বিশেষ প্রয়োজন। ইয়াহিয়া সরকারের উল্লেখিত জনসমর্থন এবং শহরভিত্তিক শক্তিশালী সম্প্রদায়গুলোর সহযোগিতা এ দু'টোর একটিও ছিল না। তদপুরি জান্তার মধ্যেও ছিল ক্ষমতার কোন্দল। সর্বোপরি আইয়ূব খানের মত জেনারেল ইয়াহিয়া সমগ্র সেনা বাহিনীর একচ্ছত্র অধিপতিও ছিলেন না। এসব কিছু মিলিয়ে ইয়াহিয়া সরকার ছিল মূলতঃ একটি দুর্বল অস্থায়ী সরকার।

ইতিমধ্যে জাতীয় পরিসরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম বন্টনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন প্রচলিত ধনতান্ত্রিক অবকাঠামোতে অর্থনৈতিক উন্নতি আর সম্ভব নয়। তারা দাবি তোলেন মানুষের বেঁচে থাকার নূন্যতম প্রয়োজনগুলো সরকারের নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য তারা সোচ্চার হয়ে উঠেন আর্থসামাজিক অবকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের পক্ষে। কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষে সময়ের এ চাহিদা পূরণ করা ছিল অসম্ভব এক প্রত্যাশা।

তবুও সীমিত ক্ষমতাধারী ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন, "আমাদের এ অবস্থায় সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। সামাজিক ব্যবধান অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে। গরীব ও বড়লোক শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সামাজিক অস্থিরতা, প্রতিহিংসা ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যাবে না। ফলে কোন প্রকার অর্থনৈতিক অগ্রগতিই সম্ভব হবে না। সুপরিকল্পিত অর্থনীতির মানে হচ্ছে সর্বোপরিসরে সাধারণ জনগণের জীবিকার মান উন্নত করা এবং শুধুমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থের পরিবর্তে সাধারণ জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।"

বাস্তবে এ নীতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে অবকাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সামান্য কিছু cosmetic পরিবর্তনের মাধ্যমে ফলপ্রসু করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। ইয়াহিয়া সরকার ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ এর বাজেটে শ্রমিকদের

নূন্যতম পারিশ্রমিক ধার্য্য করে দেয় এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ক্ষেত্রেও বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়। ইতিমধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও কমে আসে, কমে আসে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার। ফলে প্ল্যানিং কমিশনকে বাজেট বরাদ্দে রদবদল করতে হয়।

১৯৬৯ এর গণআন্দোলন ও বাঙ্গালীদের পশ্চিমা বিরোধী ক্ষোভের একটি প্রধান কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য। দীর্ঘ দিনের শোষণ ও বঞ্চনার ফলে এ বৈষম্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেন, পাহাড় সমান এ বৈষম্য দূর করতে না পারলে পাকিস্তানকে এক রাখা যাবে না। কিন্তু পাকিস্তানকে এক রাখার জন্য অসামান্য রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে পশ্চিম পাকিস্তানকে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি কি তার জন্য প্রস্তুত? শাসকগোষ্ঠির এ সদিচ্ছা থাকলেও রাতারাতি এ বৈষম্য দূরীভূত করা অবাস্তব। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের এ সদিচ্ছা কতটুকুই বা বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য? এ অবস্থার মধ্যেই ইয়াহিয়ার সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয় ৪র্থ পাঁচশলা পরিকল্পনা প্রণয়নের। শেখ মুজিব প্রথমত: এর প্রতিবাদ করেন। তার যুক্তি ছিল অস্থায়ী সরকার হিসাবে ইয়াহিয়া সরকারের সুদূরপ্রসারী পাঁচশর্লা পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন অধিকার নেই। কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য এবং বিদেশী সাহায্যের ধারা প্রবাহমান রাখার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। ফলে ১৯৭০ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের অধিবেশন শুরু হয় রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে। অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মনোনীত মন্ত্রীদের মধ্যে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বিতর্কের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি বাধ্য হয়ে দু'টি নীতি নির্ধারক ফরমান জারি করেন। তিনি কমিটির সদস্যবৃন্দকে নির্দেশ দেন,

(১) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) আঞ্চলিক বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে হবে।

প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা অনুযায়ী পাঁচশলা পরিকল্পনার একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। সেটা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের নিয়ে গঠিত আলাদা প্যানেলের কাছে পেশ করা হয় তাদের মতামত জানার জন্য। অর্থনীতিবিদদের মতামতসহ দু'টো প্যানেল থেকে রিপোর্ট পেশ করা হয় ন্যাশনাল ইকনোমিক কাউন্সিলে। রিপোর্ট দুইটি ছিল বিপরীতধর্মী। ১৯৭০ সালে ২রা জুন কমিশনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় পাঁচশলা পরিকল্পনা চুড়ান্ত করার জন্য। অধিবেশনে রিপোর্ট দুইটির উপর প্রচন্ড তর্ক-বিতর্ক হয়। ফলশ্রুতিতে দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ আরো বেশি তীব্র হয়ে উঠে।

অনেক বাক-বিতন্ডার পর ১৯৭০ সালের জুনের শেষাশেষি চূড়ান্ত ৪র্থ পাঁচশলা পরিকল্পনা প্রণীত হয় এবং জাতীয় ইকনোমিক কাউন্সিলে সেটা গৃহিত হয়। গৃহিত পরিকল্পনায় আর্থিক বরাদ্দ ছিল নিম্নরূপঃ- (কোটি রুপিতে)

	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
সরকারি খাত	২৯৪০ (৬০%)	১৯৬০ (৪০%)	৪৯০০
বেসরকারি খাত	১০০০ (৩৯%)	১৬০০ (৬১%)	২৬০০
মোট	৩৯৪০ (৫২.৫%)	৩৫৬০ (৪৭.৫%)	৭৫০০

৪র্থ পাঁচশলা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ক্রমান্বয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তনের মধ্যকার বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে তোলা। ন্যাশনাল ইকনোমিক কাউন্সিল কর্তৃক এই চূড়ান্ত বরাদ্দের বিরোধিতা করেন ডঃ এ মালেক এবং জনাব আহসানুল হক ছাড়া মন্ত্রী পরিষদের বাকী ৩জন বাঙ্গালী মন্ত্রী। পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রীরা অভিমত প্রকাশ করলেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে এ ধরণের আর্থিক বরাদ্দ নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। জাতীয় ইকনোমিক কাউন্সিল ২রা জুন ১৯৭০ যে বাৎসরিক প্ল্যান ১৯৭০-৭১ চূড়ান্ত করে। তার জোর বিরোধিতা করেন মন্ত্রী পরিষদের ৩জন বাঙ্গালী জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরী, জনাব হাফিজউদ্দিন এবং জনাব শামছুল হক। তারা অভিমত প্রকাশ করেন, বাৎসরিক প্ল্যানের লক্ষ্য ৪র্থ পাঁচশলা পরিকল্পনার লক্ষ্যের সম্পূরক নয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির আন্তরিকতা সেই বাৎসরিক প্ল্যানে প্রতিফলিত হয়নি বিধায় এ প্ল্যান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালী ৩জন মন্ত্রীর যুক্তিসম্পন্ন এ প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে প্ল্যানিং কমিশনকে বাৎসরিক প্ল্যানের প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের আদেশ দেন। ফলে জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরী, জনাব হাফিজ উদ্দিন এবং জনাব শামছুল হক সম্মিলিতভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লিখিতভাবে জানান, "অতি অন্যায়ভাবে বাৎসরিক বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৈষম্যমূলক আর্থিক বরাদ্দের প্রতিবাদে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি। এ ধরণের অন্যায় মেনে নিয়ে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

তারা জানতেন যে, ইয়াহিয়া খান অতি সহজেই তাদের অব্যাহতি দিতে পারেন। তবুও তারা ভেবেছিলেন তাদের সম্মিলিত পদত্যাগের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাকী ২জন বাঙ্গালী মন্ত্রীর পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। মন্ত্রী পরিষদ থেকে সব বাঙ্গালীদের একসাথে পদত্যাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে রাজনৈতিক আন্দোলনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। ইয়াহিয়া খান বাধ্য

হবে তার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিতে। পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি সোচ্চার হয়ে বলতে পারবে যে ইয়াহিয়া খানের দ্বারা নিযুক্ত মন্ত্রীরাও আজ তার সরকারের বাঙ্গালী বিরোধী মনোভাবে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। অন্যায় বৈষম্যমূলক আচরণের বিরোধিতায় তারা পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। এ অবস্থায় অত্যন্ত আকস্মিকভাবে প্রেসিডেন্ট আলোচনার জন্য ডেকে পাঠালেন জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরী, জনাব হাফিজউদ্দিন এবং জনাব শামছুল হক ৩জনকেই। বৈঠকে তিনি তাদের আশ্বস্ত করে বললেন অতিসত্ত্বর তিনি ন্যাশনাল ইকনোমিক কাউন্সিলের জরুরী বৈঠক তলব করবেন। জরুরী বৈঠকে প্ল্যানিং কমিশনকে তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন, "মন্ত্রীসভার বাঙ্গালী সহকর্মীরা আমায় বলেছেন- ১৯৭০-৭১ বাৎসরিক বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ অসম হয়েছে। এই বরাদ্দ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজিত আর্থিক বৈষম্য দূর করা ও আঞ্চলিক ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আমার পক্ষে এই বাজেট অনুমোদন করাও সম্ভব নয়।"

প্ল্যানিং কমিশনের কর্তা ব্যক্তিরা প্রেসিডেন্টের বক্তব্য ও মনোভাবে হঠাৎ পরিবর্তনে হচকিত হয়ে গেলেন। কিন্তু পরিণতিতে কোন বির্তক ছাড়াই আমলারা বাৎসরিক বাজেটের অর্থ বরাদ্দে পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। ১৯৭০-৭১ সালের বাৎসরিক বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৫০ কোটি টাকা প্রাথমিক ভাবে বরাদ্দ করা হয়। প্রয়োজনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে আরো অর্থ বরাদ্দ করা হবে বলে প্রেসিডেন্ট ও পরিকল্পনা কমিশন আশ্বাস প্রদান করেন। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ১৯৭০-৭১ সালের বাজেট প্রসঙ্গ থেকে দু'টো জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠে।

প্রথমত: ইয়াহিয়া খান ও শাসকগোষ্ঠির কয়েকজন বুঝতে পেরেছিলেন আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে না পারলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে। তাই তারা আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়ত: যদিও বা শাসকগোষ্ঠির মুষ্টিমেয় সদস্য এবং প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আঞ্চলিক বৈষম্য থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক জটিলতা দূর করে দেশের অখন্ডতা রক্ষা করার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়ে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তথাপি বৃহৎ পরিসরে ক্ষমতাসীন অনেকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের প্রতি হীনমন্যতা ও বিদ্বেষ তখনও বলবত থাকায় পাকিস্তানের ভাঙ্গা রোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠে।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ষাটের দশকের শেষার্ধে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি:-

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তান এশিয়া মহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে রাশিয়া পাকিস্তানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের চরম প্রকাশ ঘটে ১৯৬০ সালে। সে বছর পেশোয়ারে অবস্থিত মার্কিন বিমান ঘাঁটি থেকে U-2 বিমান উড্ডয়নের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রুশচেভ পাকিস্তানকে রকেট আক্রমণের হুমকি দেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনকালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিকতাকে প্রাধান্য দেবার ফলে আমেরিকার সাথে বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজিয়ে রাখার পরও গণচীন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। ফলে রাশিয়া ও চীন উভয় দেশ থেকেই পাকিস্তান প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখলের পর আভ্যন্তরীন সার্বিক অবস্থার অবনতি বিশ্বপরিসরে পাকিস্তানের ভাবমুর্তি খর্ব করে। ইয়াহিয়া সরকার ছিল মূলতঃ পররাষ্ট্র নীতিবিহীন সরকার। এ সরকারের কোন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিল না। জেনারেল পীরজাদা এবং জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সদস্য সচিব জেনারেল ওমর এই দু'জনেই ছিলেন পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারক। এই দুই জেনারেলের একজনেরও বৈদেশিক নীতি, আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক কার্যক্রম ও কূটনৈতিক কার্যপ্রনালী সম্পর্কে কোন জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতা কোনটাই ছিল না। তবুও গায়ের জোরে তারা এক একজন নিজেকে হেনরী কিসিঞ্জারের মত কূটনৈতিক বিশারদ ভাবতেন। তাদের দৌরাত্মে জনাব এসএম ইফসুফের মত যোগ্য ও জ্ঞানী পররাষ্ট্র সচিবকে অবসর নিতে হয়। স্বঘোষিত কূটনৈতিক বিশারদ জেনারেলদ্বয়ের সাথে মতের মিল না হওয়ার গোস্তাকীতে তিনি চাকুরিচ্যুত হন। তার স্থলে পরে জনাব সুলতান খানকে নিয়োগ করা হয়। যদিও আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পররাষ্ট্র নীতির প্রতি নজর দেবার সময় করে উঠতে পারছিলেন না তবুও সেই সময় পাকিস্তানের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ঘটনাগুলো পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতিকে গতিশীল করে তোলে।

১৯৬৯ সালের আগষ্ট মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনাব নিক্সন ২২ ঘন্টার রাষ্ট্রীয় সফরে পাকিস্তানে আসেন। সফরকালে তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে মার্কিন-চীন সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। পরিবর্তে জনাব নিক্সন পাকিস্তানকে বিশেষ বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে প্রয়োজনীয় সামরিক ও বেসামরিক সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইয়াহিয়া খান সানন্দে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও পরবর্তী পর্যায়ে মার্কিন-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এতে পাকিস্তান-আমেরিকার সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। চীনও ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রশংসা করে।

নিক্সনের পাকিস্তান সফরের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ইসলামিক সামিট কনফারেন্সে যোগদানের জন্য রাবাত যান। সেটাই ছিল তার প্রথম বিদেশ সফর। ভারতীয় সরকার ঐ অধিবেশনে যোগদানের জন্য একজন মুসলমান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরন করে। কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে রাবাত কনফারেন্সে যোগদান করতে না দেয়া হলে বাধ্য হয়ে প্রতিনিধি দলটিকে দেশে ফিরে আসতে হয়। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের ব্যর্থতায় পাকিস্তানের জনগণ খুশি হয়। ফলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার প্রথম বিদেশ সফর শেষে বীরের বেশে সদর্পে দেশে ফেরেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের ব্যর্থতার জন্য জনগণ ইয়াহিয়া খানকে অভিনন্দন জানায়। এরপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যান ইরান সফরে। প্রেসিডেন্ট নিজে ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। শুধু তাই নয় তার পূর্বসূরীরা এসেছিলেন ইরান থেকে। তাই ইরানের শাহ এর সাথে জনাব ইয়াহিয়া খান এক গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাদের ব্যক্তিগত নিবিড় সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে ইরান-পাকিস্তান সম্পর্কেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে ইয়াহিয়ার আমলে। জেনারেল ইয়াহিয়ার শাসন আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অস্বাভাবিক উন্নতির ফলে ১৯৬৯-৭০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার তরফ থেকে বিরূপ চাপের সৃষ্টি হয়। আইয়ূব খানের ক্ষমতাচ্যুতিকে রাশিয়া ভালভাবে দেখেনি। ক্ষমতার রদবদল সম্পর্কে প্রাভদা মন্তব্য করে, "প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান যখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন তখন বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ছিল অনৈক্য। কিন্তু ক্রমশঃ মার্কিন ও চীনপন্থীরা একত্রিত হয়ে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলন শুরু করল।" ইজভেজিয়া লিখলো, "সামরিক শাসন জারি করার মাধ্যমে পাকিস্তানের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।"

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে আইয়ূবের ক্ষমতাচ্যুতির ঠিক আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল এ এ গ্রেচ্‌কো পাকিস্তান সফরে আসেন। সফরকালে তিনি পাকিস্তানী জেনারেলদের জানিয়ে দেন আইয়ূব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পদক্ষেপ হবে ভুল সিদ্ধান্ত এবং তা হবে দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখলকে অপছন্দ করলেও সোভিয়েত নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোসেজিন এবং পোদগর্নি ১১ই এপ্রিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন। এরপর মে মাসে কোসেজিন পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় সফরে আসেন। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সরাসরি আলাপ করা। আলোচনাকালে কোসেজিন পরিষ্কারভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন,

–একই সময়ে রাশিয়া এবং চীনের সাথে পাকিস্তান সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না।

–সোভিয়েত ইউনিয়ন কি করে একই সাথে ভারত এবং পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়? জবাবে ইয়াহিয়া খান কোসেজিনকে প্রশ্ন করেন।

–একটি সুপার পাওয়ারের পক্ষে যা করা সম্ভব পাকিস্তানের মত একটি ছোট দেশের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। উত্তরে কোসেজিন পরিষ্কার ভাষায় বলেন।

তার এ বক্তব্য থেকে পাকিস্তানের প্রতি রাশিয়ার মনোভাব পরিষ্কার হয়ে যায়। কোসেজিনের বক্তব্য চীনা নেতৃবৃন্দের হুঁশিয়ারীকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করে। তারা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এবং পরে ইয়াহিয়া খানকে পূর্বেই রাশিয়ার বন্ধুত্বের আন্তরিকতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। কোসেজিনের সফরের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক মহা সংকটে পতিত হন। একদিকে রাশিয়া অন্যদিকে চীন ও আমেরিকা। কোন দিকে যাবেন তিনি? সঠিকভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে ১৯৭০ সালের জুন মাসে মস্কো, অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটন এবং নভেম্বর মাসে পিকিং সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি।

১৯৬৯-৭০ সালে পাক-ভারত সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। বিশেষ করে আগরতলা ষড়যন্ত্রের পর থেকে পাকিস্তান সামরিক এবং বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগগুলো পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সরাসরিভাবে ভারতীয় হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এর কাছে রিপোর্ট পেশ করতে থাকে। তারা প্রেসিডেন্টকে জানায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীকার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে ভারত। প্রেসিডেন্টকে একটি বন্ধুরাষ্ট্রও একই কথা বলে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু ইয়াহিয়া এ সমস্ত অভিযোগ তেমন গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেননি। যখন তিনি এর সত্যতা অনুধাবন করতে পারলেন তখন ঘটনা গড়িয়ে গেছে অনেক দূর, প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ইয়াহিয়ার মন্ত্রীসভার অনেকেও বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার ভারতীয় চক্রান্তের কথা বলেছিলেন প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে দেবার জন্য। কিন্তু তাদের সে সমস্ত বক্তব্যে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা মনে করেননি তিনি। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ ক্ষমতা গ্রহণের ২৫ ঘন্টার মধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছিলেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি ব্যারাকে ফিরে যাবেন। জেনারেল আইয়ূব ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণের সময় একই ধরণের অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু তাদের অঙ্গীকার ও বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা তফাৎ ছিল। আইয়ূব বলেছিলেন তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত গণতন্ত্র প্রবর্তন করবেন। ইয়াহিয়া পরিষ্কারভাবে প্রতিজ্ঞা করলেন ১০ই এপ্রিলের ভাষণে, "আমাদের লক্ষ্য দেশের গঠনমূলক একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা যাতে করে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হয়।" নির্বাচন সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন, "গণভোটের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার জন্য হবে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা তৈরী করবেন শাসনতন্ত্র।"

এপ্রিলের ১০ তারিখ এবং জুলাই এর ২৮ তারিখের মধ্যে ইয়াহিয়া খান বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত প্ল্যান জনগণের কাছে ব্যক্ত করলেন ২৮শে জুলাই। জনাব ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করেছিলেন শাসনতন্ত্র ও মন্ত্রীসভা এমনকি জাতীয় সংসদেরও অবলুপ্তি ঘোষণা করে। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করেননি। তার আমলে আইয়ূবী স্টাইলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারও করা হয়নি। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার আগে মুজিব, ভুট্টো, ভাসানী প্রমুখ নেতাদের সাথে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করেন তাই ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তেমন একটা বিস্মিত হননি। দীর্ঘ দিন আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যে গন্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি পাবার আশায় আপামর সাধারণ মানুষ মার্শাল'ল জারি হওয়ায় কিছুটা হাফ ছেড়েই বেঁচেছিল। আইয়ূব খানের মার্শাল'লকে যেভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল ইয়াহিয়া খান তেমন অভিনন্দন না পেলেও জনগণ তার ক্ষমতা দখলকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেয়।

ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য আইয়ূব খানের মত গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করেননি। তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত সফর করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা করতে লাগলেন। তার ব্যক্তিগত এই উদ্যোগ ও আলোচনার ধারায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইয়াহিয়া খানের আন্তরিকতা সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিন্ত হন। অতিসঙ্গত কারণেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবের সাথে তার আলাপকেই প্রাধান্য ও বিশেষ গুরুত্ব দেন।

শেখ মুজিব কিন্তু প্রথম দিকে ইয়াহিয়ার আন্তরিকতা সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ ১৯৫৭ সালে তার রাজনৈতিক গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সরিয়ে ইস্কান্দর মির্জার ক্ষমতা দখলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক প্রশাসক ইয়াহিয়া খানকে তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তবে পরবর্তী পর্যায়ে তার এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে বেশ একটি সৌহার্দপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের আস্থাভাজন হতে সমর্থ হন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত করেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতাকে অক্ষুন্ন রেখে রাজনৈতিক সমস্যাবলীর গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করা। দেশের অখন্ডতা বজায় রাখার প্রশ্নে যে কোন পদক্ষেপ নেবার ব্যাপারে জান্তার সব জেনারেলরাই একমত ছিলেন। প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিক আলোচনার সব বিষয়বস্তুই জেনারেলদের জানাতে হত এবং এ ব্যাপারে জেনারেলদের সাথে

আলোচনা না করে কোন সিদ্ধান্তই প্রেসিডেন্টের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না বিধায় তার সুচিন্তিত পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রে বানচাল হয়ে যেত। এর জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল মুজিব সম্পর্কে জান্তার অনেকের সন্দেহ। তারা কিছুতেই মুজিবের মনোভাব ও তার ৬ দফার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পারছিলেন না। সব আলোচনার ক্ষেত্রে দু'টো বিষয়ই মুখ্য হয়ে দাড়ায়। মুজিব কি ৬ দফার প্রশ্নে আপোষ করে পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায় রাখবেন? সামরিক জান্তা কি শেষঅব্দি মুজিবকে বিশ্বাস করে নির্বাচনে জয়ী হলে তার হাতে পাকিস্তানের সার্বিক ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন?

মাওলানা ভাসানীর সাথে প্রেসিডেন্টের আলোচনাকালে মাওলানা শাসনতান্ত্রিক সংকট থেকে উত্তরনের প্রসঙ্গে পরিষ্কার করে তেমন কিছু বলেননি। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন পাকিস্তানের সৃষ্টির পর থেকে কোন সরকার গরীব মেহনতী মানুষের জন্য কিছুই করেনি। নিপীড়িত জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নেবার জন্য প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানান। আলোচনার এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট মাওলানা ভাসানীকে বলেন,
–মাওলানা সাহেব আপনি আমার সাথে যোগদান করে নিজেই এই সমস্যাগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করেন না কেন?
–মজলুম জনতার দাবি সরকারের কাছে তুলে ধরাই আমার কর্তব্য এবং সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলাই আমার দায়িত্ব। কোন সরকারে যোগদান করার ইচ্ছা আমার নেই। জবাবে বলেছিলেন মাওলানা।

মাওলানার সাথে আলাপ করে প্রেসিডেন্ট তার নিঃস্বার্থপরতা এবং নিপীড়িত জনগণের প্রতি আন্তরিকতায় মুগ্ধ হন। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য মধ্যপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথেও প্রেসিডেন্ট আলাপ-আলোচনা করেন। তাদের সবাই প্রেসিডেন্টকে বলেন যে, একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান বের করার মাধ্যমেই পাকিস্তানের অখন্ডতাকে অটুট রাখা সম্ভব। তাদের অনেকেই মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

অভিজাত জমিদার গোষ্ঠির প্রতিভু জনাব ভুট্টো তখন পশ্চিম পাকিস্তানে তার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলতে ব্যস্ত। একই সাথে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ক্ষমতাশালী জেনারেলদের সাথেও তিনি সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য জনাব ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। যেমন পাঞ্জাবে তিনি বলে বেড়াচ্ছিলেন, "প্রয়োজনে আমরা হাজার বছর ধরে ভারতের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনবো।" সেই সময়ে ভুট্টোর এ ধরণের বক্তৃতা পাঞ্জাবীদের মাঝে আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কারণ তারা আইয়ূব

খানের অক্ষমতাকে পাকিস্তানের পরাজয় বলেই মনে করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলোতে তার বক্তব্য ছিল আঞ্চলিক শোষণ-বঞ্চনা দূরীকরণ এবং ইসলামিক সমাজতন্ত্র কায়েম করার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা। প্রেসিডেন্ট এর সাথে আলোচনাকালে তিনিও ভাসানীর মতই সাংবিধানিক সংকট মোকাবেলা করার জন্য কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন না। মুজিবের ৬ দফা সম্পর্কেও কোন বক্তব্য বা মন্তব্য করা থেকে তিনি বিরত থাকেন। যদিও মুজিবের ৬ দফা তখন জাতীয় রাজনীতিতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রেসিডেন্ট এর সাথে আলোচনাকালে জনাব ভুট্টো জাতীয় সমস্যাবলীর চেয়ে আর্ন্তজাতিক রাজনীতির উপর বেশি গুরুত্ব দেন। আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক সংকটের মুখে যখন পাকিস্তানের অখন্ডতা হুমকির সম্মুখীন তখন তার এ ধরণের মনোভাব অনেককেই অবাক করেছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দক্ষিনপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো যারা বিশেষভাবে ইসলামপ্রিয় দল বলে পরিচিত তাদের প্রতিনিধিরা রাজনৈতিকভাবে ইসলামিক আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলোচনায় প্রাধান্য দেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ, আঞ্চলিক বৈষম্যতার মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে তারা কোন বক্তব্যই রাখেননি। দূরদর্শিতার অভাবে তারা এই বিষয়গুলির সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হন। মস্কোপন্থী ওলি খান ও মোজাফ্ফর আহমেদের ন্যাপ ও অন্যান্য চরমপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে কোনরূপ আলোচনা করতে অসম্মতি জানায়। তারা প্রথম থেকেই সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে।

চার মাস আলাপ-আলোচনার পর ১৯৬৯ সালের ২৮শে জুলাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে তার নির্ধারিত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, "আলোচনাকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মূল সমস্যাগুলোর উপর ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে পুনর্বহাল করার প্রশ্নে শেখ মুজিব বিরোধিতা করেছিলেন অথচ অনেক রাজনীতিবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে আশু নির্বাচনের জন্য ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল করা অপরিহার্য। প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কেও বিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন সমাজভিত্তিক নির্বাচন হতে হবে যেমনটি হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে শেখ মুজিব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, নির্বাচন হতে হবে গণভোটের মাধ্যমে। পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মত প্রকাশ করেছেন যে কেন্দ্রিয় শাসন কাঠামো হতে হবে দুই হাউজ ভিত্তিক। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে ১৯৫৫ সালে ওয়ান ইউনিট প্রবর্তন করা হয়েছিল এর বিরুদ্ধে মতামত রেখেছেন অনেকেই। তারা চান ওয়ান ইউনিট লুপ্ত করে আগের মত চারটি প্রদেশ সৃষ্টি করে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন কায়েম করতে। সবচেয়ে জটিল সমস্যা হল মুজিব যদি তার ৬ দফার

প্রশ্নে আপোষ না করেন তবে কেন্দ্রিয় সরকার আদৌ কার্যকরী হবে কি? কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সম্পর্কই বা কি হবে?"

এসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বললেন, "অতএব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মূল সমস্যাগুলোর উপর বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। আমি আগেও অনেকবার বলেছি এখনও বলছি এ সমস্ত ব্যাপারে আমার চিন্তা-ভাবনা উদার এবং পরিষ্কার। সিদ্ধান্ত নিতে হবে জনগণকে। একটি ব্যাপারে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই জনগণ যে কোন ধরণের শাসনতন্ত্র এবং যে কোন ধরণের সরকার প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয় না কেন সেখানে পাকিস্তানের আদর্শ ও অখন্ডতাকে অবশ্যই বজিয়ে রাখতে হবে। আমাদের সর্বপ্রথম পাকিস্তানকে নিয়েই ভাবতে হবে। তার মানে এই নয় যে ন্যায়সঙ্গত আঞ্চলিক দাবিগুলো অবহেলিত হবে। পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রতি হুমকি নয় এমন সব দাবিগুলো পূরণের উপায় খুঁজে পেতেই হবে।"

এরপর বাঙ্গালীদের দাবি-দাওয়া ও আক্রোশ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বললেন, "জাতীয় পরিসরে বাঙ্গালীরা তাদের ন্যায়সঙ্গত দায়িত্ব পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ক্ষোভ অতি স্বাভাবিক। আমি প্রতিজ্ঞা করছি এ অন্যায়ের প্রতিকার আমি করব।"

পাকিস্তানের ইতিহাসে কোন রাষ্ট্রপ্রধান এর আগে এত খোলাখুলিভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে এত সঠিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের রাষ্ট্র পরিসরে নীতি নির্ধারনে কোন প্রকার অংশীদারিত্ব না দেয়ার ফলে বাঙ্গালীদের মনে ক্রমান্বয়ে যে আক্রোশ দানা বেঁধে উঠে তা থেকেই সৃষ্টি হয় অবিশ্বাস, বিক্ষোভ ও প্রচন্ড গণআন্দোলন। আন্দোলনের তীব্রতায় বিপন্ন হয়ে পড়ে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতা। পাকিস্তানের কন্সটিটিউশন কমিশন এর প্রধান জাষ্টিস শাহাবুদ্দিন বাঙ্গালীদের মনোভাব সম্পর্কে তার রিপোর্টে বলেন, "বাঙ্গালীদের প্রতি ঔপনিবেশিক ব্যবহার করা হয়।" পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মত কোন সরকারি ডকুমেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা করতে গিয়ে 'ঔপনিবেশিক' শব্দটা ব্যবহার করেন জাষ্টিস শাহাবুদ্দিন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের মনোভাব, আশা-আকাঙ্খার সঠিক মূল্যায়ন করার মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব ছিল পাকিস্তানের অখন্ডতা টিকিয়ে রাখা। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক সেটা চায়নি; তারা চেয়েছিল তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কায়েম করতে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারার ব্যর্থতাই পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ এর দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মতপ্রকাশ করেন, "জাতীয় পরিসরে সমঝোতার ভিত্তিতে জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

নিশ্চয়ই শাসনতান্ত্রিক এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে পাবেন। যদি এই দায়িত্ব পালনে তারা ব্যর্থ হন তখন বাধ্য হয়ে তাকেই জাতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে হবে।" আগষ্টের শেষঅব্দি প্রেসিডেন্ট পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষে মূল সমস্যাবলীর কোন সমাধান সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বের করা সম্ভব নয়। তাই তিনিই অতি সংগোপনে উদ্যোগ নেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা প্রণয়নের। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, জেনারেল হামিদ, জেনারেল পীরজাদা, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই মার্শাল'ল এডমিনিস্ট্রেটর এবং গভর্ণরদ্বয় অতি ঘন ঘন বৈঠকে মিলিত হতে লাগলেন। রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রতিটি ঘটনা, সে সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের মন্তব্য অতি সূক্ষভাবে বিশ্লেষন করতে লাগলেন তারা। সামরিক এবং বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগসমূহের রিপোর্ট এবং তাদের মতামত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হয়ে উঠে। তাদের এই গোপন বৈঠকগুলোতে বেসামরিক মন্ত্রীদের কোন অবস্থান ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রাজনৈতিক দাবিসমূহের মূল প্রবক্তা ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। তার সর্বপ্রথম দাবি ছিল সাধারণ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট দিন ধার্য করা। তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পুনর্বহালের বিরোধিতা করেন। তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের নীতি সমতাভিত্তিক ভোটাভুটির পরিবর্তে গণভোটের দাবি তোলেন। তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সম্পর্কেরও বিরোধিতা করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওয়ান ইউনিট ভাঙ্গার দাবিকে সমর্থন জানান। আওয়ামী লীগ বাদে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে কিছু রদবদল করে সেটাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তারা শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন এনে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন কায়েমের দাবি উত্থাপন করেন। তারা মুজিবের ৬ দফার বিরোধিতা করেন কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্যতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক পরিবর্তনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তারা সবাই গণভোটের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচনের পক্ষে রায় দেন। ইসলামপ্রিয় দক্ষিনপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো একটি শক্তিশালী কেন্দ্র এবং ইসলামিক শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবি তোলেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিরোধিতা তারা করেননি। কিন্তু আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের সম্পর্কে তাদের মতামতের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবির কোন মিলই ছিল না। জনাব ভুট্টোও ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার টাইপের গণতন্ত্র পাকিস্তানের মত একটি অনুন্নত দেশে প্রযোজ্য নয়। এ ধরণের রাজনৈতিক সরকার প্রবর্তনে দেশে বিশৃঙ্খলাই যাবে বেড়ে, পরিবেশ সৃষ্টি হবে রাজনৈতিক অস্থিরতার। ফলে জাতি বা দেশের কোন উন্নতিই সম্ভব হবে না। এ ছিল তার বদ্ধমূল ধারণা। আইয়ূব খানও ঠিক একই চিন্তা

করতেন। কেন্দ্র-প্রাদেশিক সম্পর্ক, শাসনতন্ত্র, ইসলামিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন, ওয়ান ইউনিট ভাঙ্গা প্রভৃতি সমস্যাগুলো সমাধানের দায়িত্ব ইয়াহিয়া খানের সরকারের বলেই জনাব ভুট্টো মনে করতেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকেই এ সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সরাসরিভাবে ওয়ান ইউনিট ভেঙ্গে ফেলার দাবি তোলেন। পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দ এ দাবি মেনে নিতে না চাইলেও প্রকাশ্যে তেমন জোর প্রতিবাদ তোলা বিপদজনক হবে ভেবে এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকতে বাধ্য হন।

বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং সমাজতন্ত্র কায়েম করে জনগণের মুক্তির দাবি তোলেন। উল্লেখিত রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে তিনটি মূল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়।

প্রথমত: বাঙ্গালীদের গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করার দাবি।

দ্বিতীয়ত: কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর সম্পর্ক। এটাই ছিল সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে।

তৃতীয়ত: পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ান ইউনিট ভেঙ্গে প্রদেশগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে তার ভাষণ শুরু করেন উল্লেখিত শাসনতান্ত্রিক মূল বিষয়গুলো নিয়ে। তিনি বলেন যে দুঃখজনক হলেও দেশের রাজনীতিবিদগণ ও নেতৃবৃন্দ বিষয়গুলোর উপর ঐক্যমত সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আইয়ুব খানের মত রাজনৈতিক নেতাদের তাদের ব্যর্থতার জন্য সরাসরি দোষারোপ না করে তিনি অতি বুদ্ধিমানের মত ব্যর্থতার কারণ হিসাবে সার্বিক জটিল অবস্থাকে দায়ী করেন। এরপর তিনি বলেন বর্তমান অবস্থায় চারটি উপায়ে নির্বাচনের সমস্যা হাল করা যেতে পারে :-

(১) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি কন্সস্টিটিউশনাল কনভেনশন গড়ে তোলা। যার দায়িত্ব হবে একটি সুষ্ঠ নতুন সংবিধান তৈরি করা।
(২) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে পুনরায় বহাল করা।
(৩) একটি শাসনতন্ত্র তৈরি করে সেটার উপর জাতীয় পর্যায়ে রেফারেন্ডাম গ্রহণ করা।
(৪) পুরনো শাসনতন্ত্রের ভাল-মন্দের বিশ্লেষন করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক গঠন করে তার আওতায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

উল্লেখিত চারটি পন্থার দোষ-গুন বর্ণনা করে প্রেসিডেন্ট চতুর্থ উপায়কে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেন। তিনটি মূল সমস্যা গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচন, ওয়ান ইউনিট ভেঙ্গে দেওয়া এবং কেন্দ্র-প্রাদেশিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা দেন গণভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হবে। ওয়ান ইউনিটের অবলুপ্তি করে প্রাদেশিক নির্বাচন গণভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি। প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে, ফেডারেল সরকারের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একটি জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবেন। ইয়াহিয়ার এ ঘোষণার বিরোধিতা করেছিলেন জান্তার মূল ক্ষমতাবলয়ের এয়ার মার্শাল নূর খান ও জেনারেল হামিদ। তারা মত প্রকাশ করেন যে, দুই হাউজ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিষদ না থাকলে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙ্গালীরা পাকিস্তান ফেডারেশনের অন্যান্য প্রদেশগুলোর উপর তাদের প্রণীত শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তাই তারা দাবি করেন শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত সংসদ সদস্যদের ৬০% দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। ২৫শে নভেম্বর অতি কষ্টে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার ইনার-ক্যাবিনেটের সদস্যদের ৬০% এর দাবি উঠিয়ে নেবার জন্য রাজি করাতে সক্ষম হন। ২৪শে নভেম্বর তার বক্তৃতায় ৬০% সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের অনেকেই সেদিন অবাক হয়েছিল। কেন্দ্র-প্রাদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে শেখ মুজিবের অভিপ্রায় ছিল নির্বাচিত সরকার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের এ দাবিও মেনে নেন। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতাই প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করেন। তারা চেয়েছিলেন গণভোট এবং ওয়ান ইউনিট ভেঙ্গে দেওয়ার মত এ ব্যাপারেও প্রেসিডেন্টের নিজেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। প্রেসিডেন্ট প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবি ও মেনে নেন। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সর্ম্পকের বিষয়ে তিনি বলেন, "আমার জুলাই মাসের ভাষণে আমি কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে বলেছি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে সর্বদা বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। এ ধরণের বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অসন্তুষ্টি এবং বিক্ষোভ অতি যুক্তিসঙ্গত। এ ধরণের বঞ্চনার প্রতিকার আমাদের করতে হবে। পাকিস্তানের একাত্মতা এবং অখন্ডতা বজিয়ে রেখে পাকিস্তানের দুই অংশকে স্বায়ত্ব শাসনের পূর্ণ অধিকার দেবার মাধ্যমেই এই ক্ষোভের নিরসন করা সম্ভব। স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার শুধুমাত্র প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলেই চলবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে প্রদেশগুলোকে। পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক সম্পদ পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে অংশ বিশেষের জনগণ দ্বারা। কেন্দ্রিয় স্বার্থের পরিপন্থী নয় এমন সব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তারা স্বাধীনভাবে করতে পারবেন।" প্রেসিডেন্টের ২৮শে নভেম্বরের ভাষণ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হল পাকিস্তানের সমস্যার হয়তো

বা একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে চলেছে। নিউইয়র্কস টাইমস-এ শিরোনাম খবর ছাপা হয় "পাকিস্তান দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে। প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বিশ্বের অন্যান্য সব সামরিক শাসকদের জন্য এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছেন। তিনি গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মাধ্যমে বেসামরিক সরকার কায়েম করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা এবার কেন্দ্রিয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হবে। জনসংখ্যা অনুপাতে এটাই তাদের ন্যায্য অধিকার।"

ক্রিশ্চিয়া সায়েন্স মনিটর লেখে, "জেনারেল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গণভোটের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সংসদে গৃহিত আগামী শাসনতন্ত্র বাঙ্গালীদের স্বায়ত্ব শাসনের পূর্ণ অধিকার প্রদান করবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে প্রথমবারের মত বাঙ্গলীরা তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে জনাব সিকেস বলেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উদাহরণ অন্যান্য দেশগুলোর জন্য শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপই নয় প্রশংসারও যোগ্য। তার পদক্ষেপ পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।" জনাব নিক্সন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ওয়াশিংটনে গ্রীক রাষ্ট্রদূতকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, "গ্রীস পাকিস্তানের উদাহরণ অনুসরন করতে পারে।" দেশে-বিদেশে সবার কাছেই প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য এক সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ বলে মনে হয়েছিল। সামরিক শাসকগণ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না বলে যে কথিত প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে তাও খন্ডিত হয়ে যাবে ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

কিন্তু তার বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনে কতগুলো প্রশ্ন দেখা দিল। সামরিক বাহিনী তথা জান্তার সবাই কি তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে একমত পোষণ করেন? শেখ মুজিব কি তাহলে পাকিস্তানের অখন্ডতা বজিয়ে রেখে তার ৬ দফা দাবির পরিবর্তন করতে রাজি হয়েছেন? নাকি তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে শুধুমাত্র নিজেকে বাঙ্গালী জনগণের একমাত্র নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় আছেন? বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর তিনি কি স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে চাইবেন? পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিশেষ করে জনাব ভুট্টোর মনোভাব কি? প্রেসিডেন্টের বক্তব্যকে কার্যকরী করার জন্য তাদের যে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তার জন্য কি তারা সত্যিই আন্তরিকভাবে প্রস্তুত? তিনটি বিষয়ের উপর ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা নির্ভরশীল:

প্রথমত: শেখ মুজিবর রহমান তার ৬ দফা দাবির প্রয়োজনীয় রদবদল করে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার পর বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে এসে পাকিস্তানের ঐক্য বাজায় রাখবেন।

দ্বিতীয়ত: পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী মহলকে প্রয়োজনীয় ত্যাগের মাধ্যমে বহুদিন ধরে বঞ্চিত বাঙ্গালীদের আশা-আকাঙ্খা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণের ফলে সৃষ্ট অবিশ্বাস এবং আক্রোশ নিরসনের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। তাহলেই শুধু সম্ভব হবে পাকিস্তানের ঐক্য বজিয়ে রাখা।

তৃতীয়ত: সামরিক বাহিনীর জেনারেলদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিতে হবে নির্বাচিত সরকারের হাতে।

দীর্ঘ দিনের শাসন-শোষণ, বঞ্চনা, বাঙ্গালীদের প্রতি হীন মনোভাব এবং অবজ্ঞার ফলে যে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে, তার ক্ষত ১৯৬৯-৭০ সালে ক্যান্সারে পরিণত হয়। তার বিস্তৃতি ছিল বাঙ্গালীদের মনের গভীরে। ক্যান্সার আক্রান্ত দেশকে বাচাঁনোর লক্ষ্যে ইয়াহিয়ার প্রণীত পরিকল্পনা দেশবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার করলেও অনেকেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠে। সামরিক জান্তার কিছু জেনারেল এবং জনাব ভুট্টোসহ কিছু রাজনৈতিক নেতা মনে করছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালীদের খুশি করতে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করছেন। কিন্তু পক্ষান্তরে জনাব আহ্‌সান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর, জেনারেল ইয়াকুব জোনাল মার্শাল'ল এডমিনিষ্ট্রেটর পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ জনগণের কাছে প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগীয় চীফ জেনারেল আকবর এবং বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগীয় চীফ জনাব রিজভী প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করেন যে, জাতীয় পরিসরে জনগণ প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে। কিছু সংখ্যক সংকীর্নমনা রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং আমলাতন্ত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ বাদে সেনা বাহিনীর তরুণ অফিসারদের বৃহৎ অংশ এবং প্রজ্ঞাশীল জেনারেলরা যে কোন ত্যাগের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে সৃষ্ট অবিশ্বাস ও ঘৃনা দূর করে পাকিস্তানের আদর্শ ও অখন্ডতা রক্ষা করার স্বপক্ষেই মত পোষণ করেন। তবুও ২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯ এবং ৩০শে মার্চ ১৯৭০ সালের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ভূট্টো ও কিছু সংখ্যক সংকীর্ণমনা জেনারেল এবং আমলাদের একটি অংশ থেকে ভীষণ চাপের সম্মুখীন হতে হয়। তারা দাবি তোলেন লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডার-এ স্বায়ত্ব শাসনের পরিধি পরিষ্কার করে দিতে হবে প্রেসিডেন্টকে। এতে করে

শেখ মুজিব রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধুঁয়া তুলে স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি উত্থাপন করতে পারবে না। কিন্তু এর মধ্যেই শেখ মুজিবর রহমান গভর্ণর আহ্‌সানের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, স্বায়ত্ব শাসনের পূর্ণ অধিকার এবং গণভোটের অধিকারে কোন ব্যতিক্রম হলে আলোচনার সব পথই বন্ধ হয়ে যাবে এবং শুরু হবে দেশব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। সামরিক জান্তার অনেকই মত প্রকাশ করেন, নির্বাচনের আগেই বল প্রয়োগ করে মুজিবের ৬ দফা ভিত্তিক দেশ বিভক্তির চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়া উচিত। নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দূরহ্ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু গভর্ণর আহ্‌সান প্রেসিডেন্টকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, মুজিবের সাথে সংঘর্ষে গেলে পাকিস্তানের ঐক্য থাকবে না। প্রেসিডেন্ট জনাব আহ্‌সানের সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন মুজিবের মাধ্যমে ৬ দফার পরিবর্তন করেই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। ৬ দফার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে দেয়া শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুতিই ছিল তার বিশ্বাসের ভিত্তি। শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের অখন্ডতা বজিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ৬ দফার দাবিতে তিনি করবেন।

ইতিমধ্যে একটি বিশেষ আশাপ্রদ ঘটনা ঘটে। জনাব শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারীতে জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরির সাথে আলোচনা করার সময় মত প্রকাশ করেন যে, এলএফও এর আওতায় প্রাদেশিক নির্বাচনও হয়ে যাওয়া উচিত। যুক্তি হিসাবে তিনি বলেন, ৬ দফার দাবিতে আপোষ করে প্রাদেশিক নির্বাচনে যাওয়া তার জন্য কঠিন হবে। জনাব ভুট্টো মুজিবের অভিমত সমর্থন করেন এবং একই সাথে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের পক্ষে মত দেন। এ থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায় শেখ মুজিব একান্তভাবে পাকিস্তানকে হয়তোবা দ্বি-খন্ডিত করতে চাননি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরির কাছ থেকে মুজিব ও ভুট্টোর মত জানার পর কেন্দ্রিয় এবং প্রাদেশিক নির্বাচন একই সাথে করার সিদ্ধান্ত নেন। গণভোটের পরিবর্তে অন্য কোন ধরণের ভোটাধিকার ভিত্তিক নির্বাচন এবং স্বায়ত্ব শাসনের অবকাঠামো, এলএফও-তে নির্ধারিত নীতি সমূহের উপর ভিত্তি না করে নির্বাচন করার ব্যাপারে তিনি তার জান্তাকে বলেন যে এ ধরণের যে কোন পদক্ষেপ বাঙ্গালী জাতির মনে সন্দেহের উদ্রেক করবে ফলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব, এ ধরণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। তার এ যুক্তি জান্তার জেনারেলরা মেনে নিতে বাধ্য হলেও জেনারেল হামিদ, জেনারেল টিক্কা, জেনারেল ওমর প্রমুখরা মনে করেন প্রেসিডেন্ট বাঙ্গালীদের প্রতি অযৌক্তিক নমনীয়তা প্রদর্শন করছেন। বিশেষ করে শেখ মুজিবের প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন তারা। এদিকে জেনারেল পীরজাদা জনাব ভুট্টোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। ৩১শে মার্চ ১৯৭০ প্রেসিডেন্ট

ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে যে এলএফও-এর কথা ব্যক্ত করেন তাতে পাচঁটি নীতি নির্ধারন করা হয়:-

১। ইসলামিক আদর্শই হবে পাকিস্তানের ভিত্তি।

মুজিব এর বিরোধিতা করেননি। বরং তার নির্বাচনী ইশ্তেহারে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা ছিল, "আওয়ামী লীগ নির্বাচিত সংসদ দ্বারা এমন কোন সংবিধান তৈরি করতে দেবে না যার মাধ্যমে কোরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী কোন আইন পাশ করা যায়। জাতির কাছে আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অঙ্গীকার করেই শেখ মুজিব নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন; কারণ তিনি ভাল করেই জানতেন ধর্মের ব্যাপারে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণই অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

২। দেশে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন করার সাপেক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।

কেউই এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি।

৩। শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের অখন্ডতাকে নিশ্চিত করতে হবে।

শেখ মুজিবর রহমানের মনে যাই থাক খোলাখুলিভাবে তিনি এর বিরোধিতা করেননি।

৪। পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় বিধিসমূহ শাসনতন্ত্রের অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে।

এ ব্যাপারেও পূর্ব কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক নেতাই কোন উচ্চবাচ্য করতে সক্ষম হননি। জনাব শেখ মুজিব এবং জনাব ভুট্টোও এর বিরোধিতা করেননি।

৫। কেন্দ্র-প্রাদেশিক সম্পর্ক এমন হবে যে প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লাভ করবে। দেশের একতা এবং সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কেন্দ্রের অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও কেন্দ্রের হাতে থাকবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর তার ড্রাফট প্রেসিডেন্টকে দেখাতে হবে। ড্রাফটের কোন বিষয়ে প্রেসিডেন্ট এর ব্যাখ্যা কিংবা মন্তব্য চুড়ান্তভাবে শাসনতন্ত্রে গৃহিত হবে।

এলএফও-এর ভূমিকায় ২৭টি আর্টিক্যাল ও ২টি সিডিউল থাকায় এটাকে প্রায় একটা অস্থায়ী শাসনতন্ত্রের মতই মনে হয়। আর্টিক্যাল ২০ এর আওতায় পাঁচটি মূলনীতি বর্ণিত হয়। সংসদ কর্তৃক একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশগুলো অন্যান্য আর্টিক্যালগুলোতে বর্ণনা করা হয়।

এলএফও-তে সংযোজিত ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল এই দীর্ঘ ৯ বৎসর সময়ে দু'টি নির্বাচিত সরকার গঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য একটি নির্ধারিত সময় ধার্য করে দেয়া হয়। এতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছাও কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে এলএফও-এর ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অনেকেই অভিমত প্রকাশ করে যে এলএফও প্রেসিডেন্টের ২৮শে নভেম্বর বক্তব্যের পরিপন্থী। কিন্তু পর্দার আড়ালে বোঝাপড়া করতে কতটুকু বেগ পেতে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সে সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান ব্যক্তিগতভাবে অবহিত ছিলেন বলে তিনি এলএফও-কে মেনে নেন। এলএফও-তে বর্ণিত রাজনীতিকে অনেকে মনেপ্রানে মেনে নিতে না পারলেও যেহেতু এলএফও কোন রাজনৈতিক দলের নীতির পরিপন্থী ছিল না তাই এর বিরোধিতা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। যদিও অনেকেই মনে করেন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্রের অনুমোদন প্রয়োজন হবে বলে বর্ণিতধারা সংসদের অধিকার এবং সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করেছে। ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭০ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় যান। এয়ারপোর্টে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "জনগণের অধিকার এলএফও দ্বারা খর্ব করা হয়েছে বলে যে দাবি সেটা আমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করিনা। আমার একমাত্র ইচ্ছা হচ্ছে দেশে গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা। আমার সব পদক্ষেপই আজঅব্দি আমি আমার বক্তব্যের বাস্তবায়নের জন্যই গ্রহণ করেছি।"

১৪ই এপ্রিল ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আবার দৃঢ়তার সাথে বলেন, "ঢাকায় অবস্থানকালে সব পার্টির নেতাদের সাথে প্রণীত শাসনতন্ত্র প্রেসিডেন্ট এর অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহিত হবে সে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দ এলএফও-কে স্বাগতম জানিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। শাসনতন্ত্র যদি এলএফও-তে বর্ণিত নীতি অনুযায়ী প্রণীত হয় তবে শুধু প্রত্যাখান করার জন্যই আমি সেটাকে গ্রহণ করব না এটা ভাবার কোন যুক্তি নেই। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্রের সত্যায়ন একটি প্রক্রিয়াগত লৌকিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

প্রেসিডেন্ট কি সত্যিই তার কথা রাখবেন? এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরিকে বলেছিলেন, "দেয়ালের লিখন পড়তে না পারার মত বোকা আমি নই। ১৯৬৮-৬৯ এ আইয়ূব বিরোধী গণআন্দোলন ছিল নিঃসন্দেহে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম। জনগণের গণতন্ত্রের এ দাবি কোন জেনারেলের পক্ষেই আগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তবে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সেনা বাহিনী প্রধান হিসাবে দেশেকে দ্বি-

খন্ডিত করার কোন ষড়যন্ত্রই আমি সহ্য করব না। অবশ্য সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী যদি পরোক্ষভাবে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় না নিয়ে (মুজিবের ৬ দফার প্রতি ইঙ্গিত) সোজাসুজি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা চাইত তবে সেটা ছিল একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। তারা পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের চেয়ে অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার ও সহযোগিতা করেছিলেন কায়েদে আযমের সাথে জাতীয় সংগ্রামে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অন্যায় না করলে আজ পাকিস্তানের অখন্ডতা হুমকির সম্মুখীন হত না। এবার গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা শুধু প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার শুধু লাভ করবে না, তারা জাতীয় পরিসরে দেশকে শাসন করার ন্যায্য অধিকারও লাভ করবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের মতামত প্রাধান্য পাবে। আইয়ূব খানকে দেখ! আমরা দু'জনেই ব্যক্তিগত ভাবে তাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আজ তার কি করুন অবস্থা! নিজের দেশে তিনি আজ প্রায় নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। এ পরিস্থিতির জন্য তিনি নিজেই দায়ী। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আজ যে সংকট দানা বেঁধে উঠেছে তা থেকে দেশকে বাচাঁতে না পারলে আমার পরিণতিও ঠিক আইয়ূব খানের মতই শোচনীয় হবে, তুমি কি সেটাই চাও?"

ইয়াহিয়ার এ ধরণের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় তিনি আন্তরিকভাবেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংকটের মোকাবেলা করে পাকিস্তানের অখন্ডতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তা না হলে তিনি সুষ্ঠ নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন? তার মনে কোন কূটবুদ্ধি থাকলে অবশ্যই তিনি তৃতীয় বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্র প্রধানের মত ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন। সামরিক জান্তার একজন একদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলেন, "ঘটনা প্রবাহ থেকে মনে হয় মুজিব ও তার পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো আসন থেকেই জয়লাভ করবে। তাই যদি হয় তাহলে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।"

জবাবে প্রেসিডেন্ট পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, "যদি সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্ত ানবাসী মুজিবকে পছন্দ করে এবং তার দলকে ভোট দেয় এবং মুজিব যদি রাষ্ট্র বিরোধী কোন পদক্ষেপ না নেয় তাবে তার বিরোধিতা করার আমিই বা কে আর তুমিই বা কে? তাছাড়া আমার দায়িত্ব নির্বাচিত গণপ্রতির্নিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা, দেশকে ভাঙ্গা নয়। আমাদের সবাইকে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। হতে হবে ধৈর্য্যশীল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করার মাধ্যমেই পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব। শঠতা কিংবা অসৎ নির্বাচনের চিন্তা-ভাবনা করলে দেশ বাচাঁনো যাবে না।"

ইতিমধ্যেই সব রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ জোর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে দেন। এক নির্বাচনী জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে টিকে থাকার জন্যই। কোন শক্তিই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না।"

এক পাকিস্তানের পক্ষে সব মহলের এ ধরণের মনোভাব ও বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেউই সে সময় ভাবতে পারেনি যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে এমন ভয়াবহ লোমহর্ষক ঘটনা ঘটতে পারে যার পরিণতিতে ভারতীয় সেনা বাহিনী বিজয়ীর বেশে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকার মাটিতে পদার্পন করার সুযোগ পাবে। পরিণামে পাকিস্তানের নব্বই হাজার সদস্যের সেনা বাহিনীকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করা হবে এবং দ্বি-খন্ডিত হবে পাকিস্তান।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রমের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয় এবং ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। শুরু হয় নির্বাচনী প্রচারণা। নির্বাচনী প্রচারণার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা ঘোলাটে হয়ে উঠে। শেখ মুজিবর রহমান বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ৬ দফা এবং 'জয় বাংলা' শ্লোগান এর উপর ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তানের সব জায়গায় নির্বাচনী অভিযান চালান। ১৯৭০ সালের ১৪ই আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের একটি পতাকা তৈরি করে আকাশে উড়িয়ে দেয়। ঐ মিটিংএ সভাপতিত্ব করেছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর জনাব আবু সাঈদ চৌধুরি। তাকে জোনাল মার্শাল'ল এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল ইয়াকুব খান ডেকে পাঠান এবং ঘটনা সম্পর্কে কৈফিয়ত দাবি করেন। জনাব চৌধুরিকে বলা হয় ছাত্রদের এ ধরণের কাজ দেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ বিধায় আইনত দন্ডনীয়। গভর্ণর আহ্সানের মধ্যস্থতায় জনাব চৌধুরী সে যাত্রায় রক্ষা পান। ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া খানের কাছে গোয়েন্দা রিপোর্টি পেশ করা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, শেখ মুজিব তার সহকর্মীদের সাথে সভাকালে বলেছেন নির্বাচনের পর তিনি এলএফও-এর তোয়াক্কা করবেন না। তিনি তার ইচ্ছা মতই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন এবং সেটাকে স্বীকৃতি দিতে প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করবেন। এ খবর পাবার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভীষণভাবে চটে যান। এদিকে অল ইন্ডিয়া রেডিও কোলকাতা থেকে খোলাখুলিভাবে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' নামক একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে দেয়। গোয়েন্দা বিভাগীয় রির্পোটে বলা হয়, ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ ও অস্ত্র দু'টোই পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে জেতানোর জন্য এবং প্রয়োজনে সেনা বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য। পাকিস্তানের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগগুলোই শুধু নয় কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্রের তরফ থেকেও একই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক নেতাই তখন

প্রেসিডেন্টকে আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় আতাঁতের কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট গভর্ণর আহ্সানের কথার উপর বিশ্বাস করে ঐসমস্ত রিপোর্টকে অহেতুক সন্দেহ বলে উড়িয়ে দেন। গভর্ণর আহ্সান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন শেখ মুজিব কখনও পাকিস্তানের ঐক্যের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। গভর্ণর আহ্সান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মনেও একই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ তখন বেশ কিছুটা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। জনমনে আবার নতুন করে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। পরিস্থিতি যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কি সম্ভব হবে? এ অবস্থায় দু'টো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৭০ সালের আগষ্ট মাসে হল এক ভীষণ বন্যা, নভেম্বরে হল এক প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়। বাংলাদেশের উপর দিয়ে যখন ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় তখন প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় সফরে গণচীনে। সেখান থেকে সফর সংক্ষিপ্ত করে তিনি ঢাকায় চলে এলেন। সেখানকার প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা তাকে বোঝালেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব ঠিক ততটুকু না যা খবরের কাগজগুলোতে ফলাও করে বের করা হয়েছে। অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। এ আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ঢাকায় দু'দিন থেকে ইসলামাবাদ ফিরে যান। এতে করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা ভাবলেন ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালীদের দূরাবস্থার জন্য বিশেষ চিন্তিত নন। দুর্যোগের ফলে যে বিশাল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় বাঙ্গালীদের তার প্রতি প্রেসিডেন্টের এরূপ হেয়ালী মনোভাবের ফলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তারা তাদের এ দুর্দিনে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আরও বেশি আন্তরিকতা ও সহানুভূতি আশা করেছিল। তাদের এ মনোভাবকে রাজনৈতিক স্বার্থে শেখ মুজিবর রহমান ব্যবহার করতে ছাড়েননি তার প্রচারণায়। তিনি এ সুযোগে বলতে লাগলেন যে, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠির কাছে বাঙ্গালীরা অবহেলার পাত্র মাত্র। বাঙ্গালীদের দুঃখ-কষ্টে তারা মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দুর্যোগের মোকাবেলা করাটাই এখন জাতির প্রধান কর্তব্য। প্রশাসনকেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ অবস্থার মোকাবেলায় সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাই সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেয়াটাই হবে যুক্তিসঙ্গত। জনাব ভুট্টো এবং মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী ঘোষণা দিলেন, "ভোটের আগে ভাত চাই"। ভাসানী প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানালেন নির্বাচন পিছিয়ে দিতে। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান হুমকি দিয়ে পরিষ্কারভাবে নির্বাচন পিছানোর বিরোধিতা করে বলেন, "নির্বাচন পিছানোর যে কোন ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রয়োজনে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেয়া হবে।" তার এ হুঁশিয়ারীর পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সবার মতামত উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট যথাসময়ে নিরপেক্ষ সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল

থাকলেন। প্রেসিডেন্ট আশা করেছিলেন তার এ সিদ্ধান্তে শেখ মুজিব খুশি হবেন। হয়েছিলও ঠিক তাই। মুজিব খুশি হলেন ইয়াহিয়ার এ সিদ্ধান্তে এবং প্রেসিডেন্টকে গোপন সূত্রে তার আগের ওয়াদার পুনরাবৃত্তি করে খবর পাঠান যে, পাকিস্তানের ঐক্য তিনি বজিয়ে রাখবেন অবশ্যই। প্রেসিডেন্ট মুজিবের ওয়াদায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা ও পরিণতি

- ভোটের আগে ভাতের দাবিতে মাওলানা ভাসানী নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেন।
- দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন এবং প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।
- পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস্ পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা।
- সামরিক জান্তার ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনার উদ্যোগ।
- আলোচনাকালে বিভিন্ন গোষ্ঠি এবং ব্যক্তির চক্রান্তমূলক কার্যক্রম।
- জাতীয় সংকটের একটা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাবার পথে বাঁধা হয়ে উঠে দুই অঞ্চলের দুই নেতা শেখ মুজিব এবং জেডএ ভূট্টোর উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতার মোহ ও অনমনীয়তা।
- স্বায়ত্ব শাসনের দাবি যুক্তিগত কারণেই স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হয়।
- অবিশ্বাস ও অনাস্থার পরিবেশে দেশের অখন্ডতা বজিয়ে রাখার শেষ প্রচেষ্টা।
- সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিব এবং রাজনীতিবিদদেরকেই এর জন্য দায়ী করেন।
- পাকিস্তানের ভাঙ্গন অনিবার্য ছিল না।
- অস্ত্রের জোরে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করার সিদ্ধান্ত পাকিস্তান বিভক্তি অবধারিত করে তোলে।

১৯৭০ এর নভেম্বর/ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে শেখ মুজিবর রহমানের ৩টি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় অত্যন্ত প্রীতিকর পরিবেশের মধ্যে। বৈঠকে মুজিব প্রতিজ্ঞা করেন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার পর সংসদে উথাপনের আগে তিনি সেটা প্রেসিডেন্টকে দেখাবেন তার সম্মতির জন্য। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেন ৬ দফা পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার জন্য প্রণীত হয়নি। তিনি আরো বলেছিলেন, তার ৬ দফা এবং প্রেসিডেন্টের এলএফও-তে বর্ণিত ৫ নীতির উপর ভিত্তি করেই তিনি তৈরি করবেন দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র। শেখ মুজিবর রহমানের সাথে বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট সন্তুষ্টচিত্তে রাওয়ালপিন্ডি ফিরে যান। শেখ মুজিবের সাথে তিন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করার পর তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায় যে, সাধারণ নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত সঠিক এবং একমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার মাধ্যমেই পাকিস্তানের ঐক্য বজিয়ে রাখা সম্ভব।

নির্বাচনী প্রচারণার গতিধারা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এটাই পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, মুজিবের মত একচ্ছত্র আধিপত্য পশ্চিম পাকিস্তানের কোন নেতাই অর্জন করতে পারবেন না। তুলনামূলকভাবে জনাব ভুট্টোর জনপ্রিয়তা বেশি হলেও জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য ইসলামপ্রিয় দলগুলোও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী। তাছাড়া ওয়ালী খানের ন্যাপ (মস্কোপন্থী) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানে জনপ্রিয় দল হিসাবে প্রমাণিত হয়। জনাব ভুট্টোর ইন্ডিয়া বিরোধী প্রচারণা পাঞ্জাবে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তাছাড়া জনাব ভুট্টো জেনারেল পীরজাদার মাধ্যমে জান্তার জেনারেল ওমর, জেনারেল গুল হাসান, জেনারেল হামিদ প্রমূখের সাথে নিয়মিত গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। জেনারেল শের আলী জামায়াতে ইসলামী দলের একজন পরোক্ষ সমর্থক ছিলেন। নির্বাচনী প্রচারণা যতই এগিয়ে চলে পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব ভুট্টোর জনপ্রিয়তা ততই বাড়তে থাকে। বিশেষ করে পাঞ্জাবে ভারত বিরোধী বক্তব্য, তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ইসলামিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান জনগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলাপের মাধ্যমে জাতীয় সমস্যার সমাধানের উদ্যোগকে জান্তার অনেক জেনারেলই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছিলেন। তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন যে আলোচনার মাধ্যমে সামরিক শাসনের দুর্বলতাই প্রকাশ করা হচ্ছিল। তাদের মতে শক্ত হাতে সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় দেশদ্রোহী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে শায়েস্তা করে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনা খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়। তারা মনে করতেন মুজিবসহ কিছু নেতাদের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে সঠিকভাবে অবগত করালে তারা বুঝতে পারবে যে, মুজিব ও তার সহকর্মীরা দেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে ভারতীয় সাহায্য নিয়ে। এর ফলে নিশ্চয়ই মুজিব জনসমর্থন হারাবেন। সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে

কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণ করলেই পূর্ব পাকিস্তানের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাদের এ ধরণের চিন্তা-ভাবনায় জেনারেলদের পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন অবস্থার জটিলতা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অভাবই প্রকাশ পায়। গণতান্ত্রিক গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে গণভোটের মাধ্যমে অবাধ সাধারণ নির্বাচন করা তখন ছিল একান্তভাবে প্রয়োজন। পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বশীল সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রের প্রচলন করার অঙ্গীকার নিয়ে। কায়েদে আযম জিন্নাহ্ পরিষ্কারভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, "পাকিস্তান একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবেই গড়ে উঠবে।"

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানে গণভোটের মাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্বাচন করে কোন সরকার গঠিত হয়নি। সর্বপ্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন করা হয় বৃটিশ আমলে ১৯৪৬ সালে সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। এরপর ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ সালে গণভোটের মাধ্যমে প্রাদেশিক নির্বাচন করা হলেও কেন্দ্রিয় সরকার গঠন করা হয় প্রাদেশিক সংসদ সদস্যদের পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে। ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষভাবে সংগঠিত হয়নি। নির্বাচন দু'টি ছিল প্রহ্সন মাত্র। সরকারি দলের কারচুপি, প্রশাসন যন্ত্রের পক্ষপাতিত্ব, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভূয়া ভোট প্রদান, বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের অযথা হয়রানি এবং কিডন্যাপিং এমনকি প্রশাসন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে নির্বাচনের প্রাক্কালে কারাবন্দী করে সরকারি দলের প্রার্থীকে বিজয়ী করার জঘণ্য প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন দু'টো গ্রহণযোগ্যতা হারায়। এ ধরণের অবস্থার মধ্যেও ১৯৫৪ সালে রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর এবং সচেতন বাঙ্গালীরা সরকারি দল মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টকে নির্বাচনে জয়ী করতে সক্ষম হয়। কিন্তু অচিরেই নির্বাচিত এ সরকারকে চক্রান্তের মাধ্যমে উৎখাত করে গণতন্ত্রের কবর দিয়ে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ক্ষমতায় আসীন হয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বুনিয়াদি গণতন্ত্র নামে এক নতুন পন্থার উদ্ভাবন করে বেসিক ডেমোক্র্যাটদের পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় সরকার গঠন করেন। পরোক্ষ ভোটের যে নির্বাচন হয় তাতে জনগণের ইচ্ছার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে না। ফলে আইয়ুব খানের বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক সরকারকেও প্রতিনিধিত্বকারী সরকার বলে অভিহিত করা যায় না। আইয়ুব খানের বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারনের জন্য জনাব জাষ্টিস ছাত্তারের অধিনে দুইজন হাইকোর্ট জজ নিয়ে একটি কমিটি বানানো হয়। দু'জন সদস্যের একজন ছিলেন পূর্ব এবং আর একজন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। ইলেকশান কমিশন কর্তৃক নতুন ভোটার লিষ্ট তৈরি করা এবং নির্বাচনী এলাকা নির্ধারন কমিটি কর্তৃক

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারন করার পদক্ষেপ জাতীয় পরিসরে অভিনন্দিত হয়। নির্বাচনের জন্য প্রেসিডেন্ট এর প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলোতে জনগণ আনন্দিত হয়। সামরিক শাসন জারি করার পর সব দেশেই অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে সামরিক আইনের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার অধিকার রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়েছিলেন। অবশ্য মার্শাল'ল রেগুলেশন ৬০অনুযায়ী বর্ণিত নীতিগুলো মেনে নিয়েই রাজনৈতিক কর্মকান্ড করার অধিকার লাভ করে রাজনৈতিক দলগুলো। রেগুলেশন ৬০-এ বলা হয় যে কোন ব্যক্তি কিংবা দল হিংসাত্মক কোন কর্মকান্ড, আঞ্চলিক বিদ্বেষ কিংবা পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখতে পারবে না। ধর্মের ব্যাপারেও কোন মন্তব্য রাখা যাবে না। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রেগুলেশন ৬০-এর খেলাপ করেন। তারা সভা-সমাবেশে পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বক্তব্য রেখে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। তরুণ ছাত্র সমাজ এবং শ্রমিকরা জঙ্গীভাব ধারণ করে প্রতিপক্ষের সভা-সমাবেশ ভন্ডুল করে দিতে থাকে। তারা ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের মাধ্যমে লুট-পাট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সাধারণ জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করে। এ সুযোগ গ্রহণ করে সামরিক জান্তার অনেকেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে দুর্বল বলে অভিযুক্ত করেন। তাদের এই অভিযোগকে খন্ডাতে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে বলতে হয় তার ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনৈতিক সরকার কায়েমের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সৎ ইচ্ছাকে তার দুর্বলতা বলে কেউ মনে করলে সেটা ভুল হবে। তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শেখ মুজিব এবং ভুট্টোকে অনুরোধ করেন যাতে তারা সহনশীলতার সাথে এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে এটাই প্রমাণ করেন যে জাতি হিসেবে পাকিস্তানবাসীরা সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রমনা এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত। কিন্ত তার এ আন্তরিক অনুরোধ তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোন নেতার উপরই তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। বিভিন্ন পার্টির কার্যকলাপই এর পক্ষে যুক্তি দেয়।

১৯৭০ এর নির্বাচনে সর্বমোট ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে অনেকগুলো দলই ছিল অতি ক্ষুদ্র এবং রাজনৈতিক তৎপরতা কিংবা সাংগঠনিক শক্তির দিক দিয়ে প্রায় অনুল্লেখযোগ্য। প্রতিটি পার্টিকে একটি করে নির্বাচন প্রতীক বরাদ্দ করা হয় ইলেকশান কমিশন থেকে।

অনুন্নত দেশগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম বিধায় লোকজন তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলের নাম পড়তে পারেন না বলে প্রতিটি দলের জন্য

নির্বাচন প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। ভোটাররা প্রতীক দেখেই নিজ পছন্দের দলকে ভোট দান করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের জন্য মোট ৮৪০ জন দলীয় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিযোগিতা করেন। পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনে দলীয় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মোট ৭৮১ জন প্রতিযোগিতা করেন।

পুরনো এবং ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ তখন তিন খন্ডে বিভক্ত। জামায়াতে ইসলামী এবং জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম দু'টি মুখ্য দক্ষিনপন্থী দলের জন্ম ইতিহাস শুরু হয় স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকেই। স্বাধীনতার পর সৃষ্ট আওয়ামী লীগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে পুরনো এবং সর্ববৃহৎ সংগঠন। অতি অল্প সময়ে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ভুট্টোর পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তান যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিশেষ বন্ধুরাষ্ট্র রূপে সম্পর্ক স্থাপন করে তখন থেকেই পাকিস্তানে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ দ্বি-খন্ডিত হয়ে যায়। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। পরে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় মস্কোপন্থী এবং পিকিংপন্থী হিসাবে। ১৯৪৭ সালের পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অংশ বিশেষের নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস রাখা হয়। '৭০ দশকের পাকিস্তানের রাজনীতির দু'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য:-

প্রথমত: জাতীয় পরিসরে পাকিস্তানের দুই অংশের কোন রাজনৈতিক দলেরই তেমন কোন প্রভাব ছিল না।

দ্বিতীয়ত: ব্যক্তি হিসাবে কোন রাজনৈতিক নেতারই জাতীয় পরিসরে পাকিস্তানের দুই অংশে কোন জনপ্রিয়তা ছিল না।

শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা এবং দল হিসাবে গড়ে উঠে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব ভুট্টো ও তার পার্টি পিপিপি অন্যান্য দক্ষিনপন্থী দলগুলোকে পেছনে ফেলে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা এবং দল হিসেবে আর্বিভূত হয় ফলে নির্বাচনী প্রচারণার সাথে সাথে পাকিস্তানের দুই অংশে আঞ্চলিক মেরুকরণ প্রক্রিয়াও বাড়তে থাকে। পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি হুমকি স্বরূপ এ ধরণের প্রক্রিয়ায় অনেকেই বিশেষভাবে শংকিত হয়ে পরে। পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে যে দুইটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্টতা লাভ করে জয়লাভ করে তারা প্রকৃত অর্থে আঞ্চলিক দল হিসাবেই বিজয়ী হয়: জাতীয় দল হিসাবে নয়। এখানে পাকিস্তানের শেষ অঙ্কের দুই নায়ক ও তাদের রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি:-

শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী প্রচারণা ছিল সম্পূর্ণভাবে ৬ দফা ভিত্তিক। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মুসলমান জনগণের ধর্মীয় চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "ইসলাম আমাদের ধর্ম। কোরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী কোন আইন দেশের শাসনতন্ত্রে সংযোজিত হতে দেবে না বলে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে ওয়াদাবদ্ধ।"

পরে অবশ্য এ বক্তব্যের মাধ্যমে দেয়া ওয়াদার তিনি বরখেলাফ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশ হবার পর মুজিব রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ভূত চাপিয়ে দেন গোটা দেশবাসীর উপর। নির্বাচনী প্রচারণাকালে শেখ মুজিব পরিষ্কার করে জনসভায় বক্তৃতা করেন, "৬ দফা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য তৈরি হয়নি। পাকিস্তানের ফেডারেল গভার্নমেন্টকে কার্যকরী করার জন্যই ৬ দফা প্রণীত হয়েছে। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে টিকে থাকার জন্য। কোন শক্তিই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না।"

কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর একই শেখ মুজিব বলেন, ১৯৬৮ সাল থেকেই নাকি তিনি বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি আরো বলেন, "১৯৪৮ সালেই সূত্রপাত ঘটে স্বাধীনতা আন্দোলনের। ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ এর গণআন্দোলনে পরিপক্কতা লাভ করে স্বাধীনতার চেতনা। ফলে ১৯৭১ এ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ।"

মুজিব চরিত্রের দ্বৈততা পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে উল্লেখিত বক্তব্যগুলো থেকে। নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ান আমার পবিত্র কর্তব্য।"

কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা দিয়ে স্বয়ং তিনিই সরকার প্রধান হিসাবে জাতীয় নীতি হিসাবে সমাজতন্ত্রের জোয়াল তুলে দিলেন জাতির ঘাড়ে। যার কুফল আজও বয়ে চলেছে বাংলাদেশী জনগণ। শেখ মুজিবের নির্বাচনী প্রচারণা মূল বিষয়বস্তু ছিল পাকিস্তান বিরোধী বক্তব্য। দীর্ঘ দিনের পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির কুশাসন, বঞ্চনা ও শোষণের জাল থেকে বাঙ্গালী জাতিকে মুক্ত করে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি জনগণের কাছে ভোট দাবি করেন। এ সময়ে ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রী পরিষদের তথ্যমন্ত্রী জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা বোঝার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী এক সফরসূচী গ্রহণ

করেন। সব জায়গায় সফরকালে তিনি স্থানীয় প্রশাসক, জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে বুঝতে পারেন শেখ মুজিবের সোনার বাংলা কায়েমের আবেদন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে আওয়ামী লীগ সার্বিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে এ আবেদন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তারা শ্লোগান দিচ্ছে 'জয়বাংলা'। এ ধরণের প্রচারণা পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে ভেবে জনাব চৌধুরি প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন মুজিবকে ডেকে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসা করতে মুজিব তার ৬ দফার পরিবর্তন করে পাকিস্তানের অখন্ডতা বজিয়ে রাখবেন কিনা? শেখ মুজিব যদি ৬ দফায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে অসম্মত হন তবে প্রেসিডেন্টের পক্ষে উচিত হবে পূর্ব পাকিস্তানে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমানদের অভিমত নেয়া। তারা কি পাকিস্তানের ঐক্য বজায়ে রেখে স্বায়ত্বশাসন চায়, নাকি স্বাধীনতা চায়? এ প্রসঙ্গে জনাব চৌধুরি প্রেসিডেন্টকে আলজেরীয় সংকটের মোকাবেলায় প্রেসিডেন্ট ডিগ্যলের সাহসী পদক্ষেপের কথাও স্মরন করিয়ে দেন। ইতিমধ্যে মাওলানা ভাসানী ঘুর্নিঝড়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'ভোটের আগে ভাত চাই' শ্লোগান তুলে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাড়িয়েছেন। মস্কোপন্থী ন্যাপের স্বঘোষিত 'প্রফেসর' মোজাফ্ফর আহমদের তেমন কোন জনসমর্থন তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো তখন শতভাগে বিভক্ত। তদপুরি জনাব আহ্সানের আমলে প্রশাসন বামপন্থীদের সমূলে উৎপাটন করার জন্য তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জনাব আহ্সানের বাম বিদ্বেষের কারণ ছিল SEATO এর সাথে তার ব্যক্তিগত দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। সামরিক জান্তার সদস্যদের রাজনৈতিক এবং আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবেই জনাব আহ্সান কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে এমন এক সময় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন যখন গণচীন পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্র রূপে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে আহ্সানের মাওলানা ভাসানী বিদ্বেষ কিংবা কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষ নীতি পাকিস্তান-চীন সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে। গভর্ণর আহ্সানের অধিনে কম্যুনিষ্ট নিধনযজ্ঞে অনেক চীনপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে আত্মাহুতি দিতে হয়। ফলে ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে জনাব ভুট্টো যখন পিকিং যান ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনের সমর্থন লাভ করার আশায় তখন চীনা নেতৃবৃন্দ তাকে জানান পূর্ব পাকিস্তানে অসংখ্য চীনপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। তারা ৬০জন নেতার নামের একটি লিষ্টও জনাব ভুট্টোর কাছে পেশ করেন। এদিকে মস্কোপন্থী দলগুলো তখন পড়েছে এক মহাবিপাকে। তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলনা কাকে সমর্থন করলে তাদের সুবিধা হবে। এতদিন মস্কো পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপকেই সমর্থন যুগিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই মস্কো বেতার থেকে ১৬ই আগষ্ট ১৯৭০-এ এক ঘোষণায় বলা হল, "আওয়ামী লীগে লুকায়িত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির মুখোশ আজ খুলে গেছে। তারা আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে দেশকে দ্বি-খন্ডিত করার চক্রান্ত করছে। শেখ মুজিব

এবং তার দল আজ পূর্ব পাকিস্তানে বাম এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।" ১৯৬৭ সালে মস্কোর মনোভাব আওয়ামী লীগের প্রতি ছিল বৈরীভাবাপন্ন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতীয় প্রীতির ফলে মস্কো তার মনোভাবও পরিবর্তন করে। শেখ মুজিব সর্বদাই চীনের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। পাকিস্তান-চীন বন্ধুত্বকে তিনি উস্কানিমূলক বলেই মনে করতেন। রাজনৈতিক দলগুলো তখন মুজিবের মোকাবেলা করতে অসমর্থ। আর্থিক এবং সাংগঠনিক দুর্বলতাই ছিল এর মূল কারণ। পূর্ব পাকিস্তানের শহুরে বুদ্ধিজীবি, ছাত্র সমাজ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আমলাদের বৃহৎ অংশ তখন শেখ মুজিবের পক্ষে। গণমাধ্যমগুলোও তখন ঝুঁকে পড়েছে শেখ মুজিবের প্রতি। সর্বোপরি গভর্ণর আহ্‌সান স্বয়ং তখন মুজিবের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল। মুজিবের প্রতি তার মনোভাব অনুকূল বুঝতে পেরে পুরো প্রশাসন তখন মুজিব ও তার দলের সাথে সহযোগিতা করে চলেছে। এভাবেই ক্রমান্বয়ে মুজিব হয়ে উঠেন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নেতা আর তার দল হয়ে উঠে সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠন।

এবার আলোচনায় আসা যাক ভুট্টো ও তার নির্বাচনী ঘোষণাপত্রের বিষয়ে:-
পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে সমগ্র জনগণকে মুজিব যেভাবে নিজের দলের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন ভুট্টোর পক্ষে তেমন একটি মাত্র শ্লোগানের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র জনগণকে তার দলের প্রতি আকৃষ্ট করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের রাজনৈতিক চাহিদা ছিল ভিন্ন। তাই ভুট্টোকে চার প্রদেশের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখেই ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন প্রকার প্রচারণার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই তাকে ভারত বিরোধী বক্তৃতা করতে হয়। বলতে হয় 'ওয়ান ইউনিটের' বিরুদ্ধে। একদিকে তাকে খুশি রাখতে হয় জমিদার শ্রেণীকে অপর দিকে তাকে বলতে হয় ভূমি সংস্কারের পক্ষে, ইসলামপন্থীদের খুশি করতে গিয়ে তাকে বলতে হয় ইসলামিক সমাজতন্ত্রের কথা। উপরন্তু জেনারেলদের মন যুগিয়ে চলতে গিয়েও তাকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তার মুখ্য শ্লোগান ছিল, "ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের নীতি, সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি।" তিনি আর্থসামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে ইসলামিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ভুট্টো কিন্তু মুজিবের ৬ দফা সম্পর্কে কোন বক্তব্যই তার প্রচারণায় বলেননি। এ ব্যাপারে তিনি আগা-গোড়াই কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনী প্রচারণা চালাবার ব্যাপারেও তার কোন গরজ পরিলক্ষিত হয়নি। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে তার ক্ষমতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তোলাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের ঐক্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। যদিও পাকিস্তানের অখন্ডতা বজিয়ে রাখার প্রশ্নটিই ছিল তখনকার মূল রাজনৈতিক সমস্যা। দক্ষিনপন্থী

এবং মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে ভাল হলেও ভুট্টোর প্রগতিশীল চিন্তাধারার মোকাবেলায় তারা তাদের পুরোনো ধ্যান-ধারণা যেমন: ইসলামী আদর্শ, শক্তিশালী কেন্দ্রিয় সরকার প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে জনগণকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হন। দীর্ঘ আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান বেড়ে গিয়েছিল। পুরনো কথায় কিংবা শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের মন যোগানো পুরনো নেতাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন জনাব ভুট্টো। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলে গিয়ে সেই অঞ্চলের জনগণের দাবি-দাওয়ার উপর ভিত্তি করে তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। বক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন শেখ মুজিবের সমতুল্য। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে বিমোহিত করতে সক্ষম হয়। তার আবেদনে বিশেষ করে সাড়া দেয় ছাত্র ও তরুণ সমাজ।

ইতিমধ্যেই পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলি শেখ মুজিবের বিজয় সুনিশ্চিত বলে প্রচারণা করতে শুরু করে। শেখ মুজিব নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জয়লাভ করবেন এ বিষয়ে সবাই তখন প্রায় একমত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রেসিডেন্ট জনসনের আমলে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে পাকিস্তান-চীন বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে নিক্সন প্রেসিডেন্ট হবার পরপরই সম্পর্ক আবার উষ্ণ হয়ে উঠে। তখন জনাব এ ব্লাড ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তার সন্দেহজনক কার্যকলাপ পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে পরিগনিত হয়। তিনি শেখ মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেন। তিনি ও তার প্ররোচণায় ফোর্ড ফাউন্ডেশন এর আর্থিক মদদপুষ্ট কয়েকজন মার্কিন ইকনোমিষ্ট শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন যোগাতে থাকেন।

তারা গোপনে মুজিবের সাথে নিয়মিত সাক্ষাত করতে থাকেন। তাদের এই সাক্ষাৎকারের খবর সরকার জানতে পারে। মিঃ এ ব্লাডকে এ ধরণের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা থেকে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জনাব ফারল্যান্ড মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, বিচ্ছিন্নবাদী কোন প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র কোনরূপ সাহায্য কিংবা সহযোগিতা করবে না; কোনরূপ সহানুভূতিও প্রদর্শন করা হবে না। ইতিমধ্যে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭০ এক ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের জন্য ৭ই ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক নির্বাচনের দিন ১৭ই ডিসেম্বর ধার্য করে। সরকার এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিজেদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র ও নীতিমালা জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো যথা- রেডিও, এবং টিভি-র মাধ্যমে প্রচারণার সুযোগ দেয়া হবে। প্রথমবারের মত পাকিস্তানের ইতিহাসে রাজনৈতিক নেতারা এ ধরণের সুযোগ পায়। আইয়ূব আমলে কিংবা এর

আগে বিরোধী দলীয় নেতারা এ ধরণের সুযোগ থেকে সবসময়েই বঞ্চিত থেকেছে। ২৮শে অক্টোবর থেকে ১৯শে নভেম্বর ১৯৭০ সময়কালের মধ্যে ১৪টি রাজনৈতিক দলের নেতারা এই সুযোগ গ্রহণ করে। প্রচারণা শুরু করেন শেখ মুজিবর রহমন এবং প্রচারণা শেষ হয় সিন্ধু ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা জনাব জিএম সাঈদের বক্তৃতার মাধ্যমে। সভা-সমাবেশে প্রদত্ত রাজনৈতিক বক্তৃতার উপর ভিত্তি করেই নেতারা তাদের বক্তব্য রাখেন। এই সময়ে আমি এবোটাবাদে পিটি কোর্সে ডিটেলড হয়ে এসেছি। পিটি স্কুল কাকুলে এসে পরিচয় হল ক্যাপ্টেন রফিক (স্কুলের সিআই), PMA-তে প্লাটুন কমান্ডার মেজর সালাম এর সাথে। কোর্সে সাথী হিসেবে পেলাম লেফটেন্যান্ট রফিককে। আমার চাচাতো ভাই মুনিরুল ইসলাম চৌধুরী (মুন্না) তখন PMA-তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। অনেকের সাথে পরিচয় হলেও ক্যাপ্টেন রফিক এবং মেজর সালামের সাথেই বিশেষ ঘনিষ্টতা গড়ে উঠে। লেফটেন্যান্ট রফিকের সাথেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। অবসর সময়ে ক্যাপ্টেন রফিকের মেসে কিংবা মেজর সালামের বাসায় জমিয়ে আড্ডা দেয়া হয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যত নির্বাচন নিয়ে সবাই সমভাবে উদগ্রীব। কি হবে, কি হতে যাচ্ছে এ নিয়ে তুমুল আলোচনার ঝড় বয়ে যায় আমাদের আড্ডায়। ক্যাপ্টেন রফিকের ঘরে নিয়মিত শুনতাম টিভিতে প্রচারিত নেতাদের নির্বাচনী বক্তৃতা সবাই একত্রিত হয়ে। যদিও তখন মাওলানা ভাসানী নির্বাচনের বিপক্ষে তবুও তার বক্তব্য দেশের দুই অংশের জনগণ এবং আমরা বিশেষ মনযোগের সাথে শুনেছিলাম। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি বাংলা এবং উর্দূতে তার বক্তব্য রেখেছিলেন। দেশের দুই অংশেই তার বক্তৃতা প্রশংসিত হয়েছিল। শেখ মুজিব এবং জনাব ভুট্টোর বক্তৃতাও আমরা গভীর উৎসাহের সাথে শুনেছিলাম। টিভিতে জনাব ভুট্টোর উপস্থাপনা শেখ মুজিবের চেয়ে বেশি চটকদার হয়েছিল। বক্তৃতায় সব নেতারাই দেশের সব সমস্যা নিয়েই কথা রাখলেন।

গণতন্ত্র, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম, ভূমি সংস্কার নীতি, শিক্ষা নীতি, পররাষ্ট্র নীতি, শাসনতন্ত্র কোন কিছুই বাদ পড়েনি তাদের বক্তব্যে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা বললেও শেখ মুজিবের বক্তব্যের প্রধান বিষয় ছিল বাঙ্গালী-জাতীয়তাবাদ এবং আঞ্চলিক বৈষম্য কেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে ভুট্টোর মূল বক্তব্য ছিল ইসলামিক সমাজতন্ত্র, পাক-ভারত সমস্যা এবং কাশ্মীর নিয়ে। দক্ষিনপন্থী দলগুলোর প্রধান বক্তব্য ছিল ইসলামিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বিদেশী মতবাদের হাত থেকে ইসলামকে বাচাঁনোর আহ্বান। জনাব ওয়ালী খান আঞ্চলিক অধিকার এবং বঞ্চনার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন তার বক্তৃতায়। মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী রাজনৈতিক কিংবা শাসনতান্ত্রিক এ দু'টোর কোনটার বিষয়েই তেমন কিছু বলেননি। তার বক্তব্যের সারবস্তু ছিল মেহনতী মানুষের দাবি। সমাজের নিচুস্তরের গণ-মানুষের কথাই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে তার কথায়। বেতার

ও টেলিভিশনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণার ফলে দেশব্যাপী নির্বাচনী জোয়ারের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে শহুরে লোকজন সার্বিক নির্বাচনী অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে। ৩রা ডিসেম্বর ইলেকশনের ৪দিন আগে প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আবেদন জানান তারা যেন সংযম এবং সহনশীলতার সাথে দেয়া-নেয়ার ভিত্তিতে সরকারের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করতে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। তিনি আবারও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, "সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু সরকার তার সিদ্ধান্তে অটল আছেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সব সন্দেহের অবসান ঘটবে।" ইতিমধ্যে ২৭শে নভেম্বর ১৯৭০ ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্ব শাসনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হবে। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের ভাগ্য নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পান সেটা ব্যক্তিগতভাবে তিনিও সমর্থন করেন।" তিনি আরও বলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্বের বাস্তবতায় এভাবেই পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাখা সম্ভব।"

৭ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিব এবং আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র বিজয়ে জনগণ খুব একটা বিস্মিত হয়নি। আওয়ামী লীগের জয় ছিল সুনিশ্চিত। পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২টা আসনের ১৬০টাতেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করে। বাকি দু'জন ছিলেন জনাব নূরুল আমিন এবং চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একটি আসনও লাভ করতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলাম ও মধ্যপন্থী দলগুলোর পরাজয় ঘটে। আশ্চর্যজনকভাবে অপাঞ্জাবী জনাব ভুট্টো এবং তার দল অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসনেই পিপিপি প্রার্থীরা জয়ী হয়। বাকি ৫৭টি আসন ৭টি রাজনৈতিক দল এবং ১৫জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়। আওয়ামী লীগের মত একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন দলও পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন লাভ করতে পারেনি। ফলে মুজিব ও ভুট্টো যথাক্রমে হয়ে উঠেন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মূল নেতা। অনেকেই মনে করেছিল নির্বাচনের ফলাফল প্রেসিডেন্টকে চমকে দিয়েছিল; কিন্তু তা নয়। প্রেসিডেন্ট এবং জান্তার সবাই নিশ্চিত ছিলেন নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগই জয়ী হবে। সেক্ষেত্রে শেখ মুজিবই হবেন মুখ্য নেতা সেটা বুঝেই নির্বাচন দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন শেখ মুজিব নির্বাচনের পর তার ওয়াদা অনুযায়ী ৬দফার পরিবর্তন করে পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায় রাখবেন। তার দেয়া কথার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনের সাথে সাথে প্রাদেশিক নির্বাচনও অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল।

ইলেকশন শেষ হওয়ার পরপরই আমার কোর্স শেষ হয়ে যায়। কোয়েটা থেকে ইতিমধ্যেই আমাকে জানানো হয়েছে OW & JTC কোর্সের জন্য আবার আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ফিরে গিয়েই (School Of Infantry & Tactics) স্কুল অফ ইনফ্যানট্রি এন্ড ট্যাক্‌টিকস্-এ যোগ দিতে হবে। এই খবর পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি কোর্সে যোগ দেবার আগেই ১৫ দিনের জন্য হলেও ছুটিতে ঢাকায় যাব সরেজমিনে সবকিছু দেখে আসার জন্য। সেভাবে ছুটির আবেদন করায় ছুটি মঞ্জুর হয়ে যায়। কোর্স শেষে কাকুল থেকেই ৩ সপ্তাহের ছুটিতে ঢাকায় যাই জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে। ঢাকার মাটিতে পা দিয়েই বুঝতে পারি রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত। সবাই ভাবছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাঙ্গালীদের হাতে দিতেই হবে সামরিক জান্তাকে। দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের পর দেশ শাসনের সুযোগ পাবে পূর্ব পাকিস্তানবাসী। বিভিন্ন মহলের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলোচনায় বুঝতে পারলাম সবাই ধরেই নিয়েছে শেখ মুজিবই হবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী: এর কোন গত্যান্তর নেই। শেখ মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে পাকিস্তানও টিকবে না বলেও অভিমত প্রকাশ করল অনেকেই। কিন্তু একান্তই যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয় তখন মোকাবেলায় রাজনৈতিকভাবে কি করবে আওয়ামী লীগ কিংবা অবস্থাই বা কোথায় গিয়ে কী ভয়াবহ রূপ নিতে পারে সে সম্পর্কে কারো কোন পরিষ্কার ধারণা আছে বলে মনে হল না। পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের কোন পরিকল্পনা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আদৌ আছে কিনা সেটাও বোঝা গেল না। সেই সময় হঠাৎ করেই বাপ্পিদের বাসায় একদিন শেখ কামালের সাথে দেখা হয়ে গেল। সাক্ষাৎ-এ আমি তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

–৬ দফার প্রশ্নে কোন মত বিরোধের ফলে সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর নাও করতে পারে সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কি স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাবে? সেই পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে প্রস্তুত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কি আওয়ামী লীগ? সামরিক অভিযান চালানো হলে অবস্থা যে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে তার মোকাবেলায় সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার জন্য যে মন-মানসিকতার প্রয়োজন সেটা আওয়ামী লীগের মত দলের আছে কি? জনাব শেখ মুজিবই বা কি ভাবছেন? আলাপ হচ্ছিল খোলামেলা ঘরোয়া পরিবেশে। একটু ভেবে নিয়ে শেখ কামাল জবাবে বলল,

–বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তানে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওয়াদাবদ্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলে তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে যেভাবে সহযোগিতা করেছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। নির্বাচিত

গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সদিচ্ছা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সামরিক জান্তার আছে বলেই আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। নির্বাচন হওয়ার পর ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব সামরিক সরকারের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়; তাছাড়া এই বিষয়ে আলাপের জন্য প্রেসিডেন্ট শীঘ্রই ঢাকায় আসছেন। জানাল কামাল।

তার কথা থেকে বুঝতে পারলাম ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ প্রায় নিশ্চিত এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বাইরে তারা তেমন কিছুই চিন্তা করছে না। প্রেসিডেন্টের সাথে শেখ মুজিবের আসন্ন বৈঠকের উপরও আওয়ামী লীগ বিশেষভাবে আশাবাদী। তার বক্তব্য থেকে বুঝতে পারলাম আপোষরফার মাধ্যমে যেভাবে নির্বাচন সম্ভব হয়েছে সেভাবেই ৬দফার বিষয়েও আপোষের মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তরও সম্ভব হবে সেই মনোভাবই পোষণ করছেন শেখ মুজিব এবং আওয়ামী নেতৃবৃন্দ। তার মানে প্রেসিডেন্টকে দেয়া কথা অনুযায়ী ৬দফাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে শেখ মুজিব শুধুমাত্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীই হবেন তাই নয়, পাকিস্তানের অখন্ডতাও বজায়ে রাখবেন তিনি সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেল শেখ কামালের কথায়। পরিশেষে কামালকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

–ধরো যে কোন কারণেই হোক না কেন, শেষঅব্দি বর্তমান সরকার শেখ সাহেবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে যদি সামরিকভাবে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে সেই অবস্থায় তাদের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য জনগণকে তৈরি করে সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য আওয়ামী লীগ কি প্রস্তুত? জবাবে শেখ কামাল বলল,

–শেখ সাহেব চক্রান্তকারী নন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে স্বায়ত্বশাসন কায়েম করার জন্যই ৬দফা; পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার জন্য ৬দফা নয়। কামাল আরো বলেছিল,

–আব্বাকে চক্রান্তকারী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রতিপন্য করার হীন চক্রান্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে সেভাবে ভবিষ্যতেও সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি জানতে চেয়েছিলাম,

–নির্বাচনের আগ থেকেই সরকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্বাভাবিক হারে সামরিক ইউনিট পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করছে এ ব্যাপারে তারা অবগত আছে কিনা এবং এই ধরণের সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যই বা কি? জবাবে কামাল বলেছিল,

–৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত বলে যে দাবি উঠে সে পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্যই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, এটাতো জনগণেরই বিজয়।

তার এই বক্তব্য থেকেও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাদের চিন্তা-ভাবনায় এ ধরণের অসচ্ছতার কারণেই ২৫-২৬শে মার্চ রাতের শ্বেতত্রাসের মুখে অসহায় হয়ে পড়েছিল সমগ্র জাতি। আওয়ামী লীগ ব্যর্থ হয়েছিল প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দিতে। 'আমি অস্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না' বক্তব্য রেখে বন্দী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেচেঁছিলেন শেখ মুজিব। কোন অনুরোধ কোন যুক্তিই মানতে রাজি হননি জনগণের 'নয়নের মণি' শেখ মুজিব!! সেই মুজিবই পরবর্তিকালে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং মূল নায়ক সাজাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি নির্লজ্জের মতো। আগরতলা ষড়যন্ত্রের আর্কিট্যাক্ট হিসাবে বাহ্‌বা কুড়াতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি। মুজিব চরিত্রের এহেন সুবিধাবাদী বৈশিষ্ট্য তার পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

খুব তাড়াতাড়িই আমার ছুটি শেষ হয়ে গেল। ছুটি বাড়াবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কোয়েটায় ফিরতে বাধ্য হলাম। ফিরে আসার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমার কোর্স শুরু হয়ে গেল। স্থানীয় অফিসার হিসাবে মেসে থেকেই কোর্স করব ঠিক করলাম। কোয়েটার সব বাঙ্গালীরাই আমার ফিরে আসার প্রতিক্ষায় উদগ্রীব হয়েছিলেন। ফেরার পর প্রায় সবার সাথেই দেশ থেকে যা বুঝে এসেছি সে বিষয়ে আলাপ হল। আওয়ামী লীগের অসচ্ছ চিন্তা-ভাবনা এবং সরকার সম্পর্কে অযৌক্তিক আশাবাদের কথা শুনে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। যেকোন সামরিক অভিযানের ফল কতটা ভয়ানক হতে পারে সেটা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ বুঝতে না পারলেও আমাদের সেটা বুঝতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না। অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কেউ কেউ আবার শেখ কামালের মতই আশাবাদ ব্যক্ত করেন, "সরকার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে নিশ্চয়ই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। শেখ মুজিবও তার কথামত ৬দফার পরিবর্তন করে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। ফলে দেশ বিভক্তির হাত থেকে বেচেঁ যাবে পাকিস্তান।" দেশ থেকে ফিরে আসার পর মানসিক অস্থিরতা বেড়ে গেল। অস্বস্তিকর পরিবেশে আশা-নিরাশা বুকে ধরে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম আগামী দিনের ঘটনা প্রবাহের দিকে।

নির্বাচনের পরপরই প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোকে অভিনন্দন জানান। তিনি সকল রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেন। তিনি চাচ্ছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে মুজিব ও ভূট্টোর সাথে আলোচনা শুরু করতে। পাকিস্তানের ২২ পরিবারের এক পরিবারের সদস্য মোহাম্মদ হারুনের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান মুজিবকে ইসলামাবাদ আসার নিমন্ত্রণ জানান। (হারুণ

পরিবারের সাথে শেখ মুজিবের অস্বাভাবিক এবং রহস্যজনক সম্পর্ক নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে।) হবু প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব ইসলামাবাদ আসতে রাজি হলেন না। তার এই সিদ্ধান্তে অনেকেই মনে করলেন ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী ইসলামাবাদের পরিবর্তে ঢাকাতেই সব আলোচনা হোক সেটাই চাচ্ছেন। যাই হোক, মুজিব ইসলামাবাদ আসতে রাজি না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকেই ঢাকায় যেতে হয়েছিল আলোচনার জন্য। তিনি ১৯৭১ সালের ১২ই জানুয়ারী ঢাকায় গমন করেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট তার মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ এবং শাসনতন্ত্র বিষয়ক প্রধান পরামর্শদাতা জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরীর দ্বারা শাসনতন্ত্রের একটা খসড়াও তৈরি করেন। এই খসড়ার উপর ভিত্তি করেই তিনি তার আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন। খসড়াটার রূপরেখা ছিল :-

(১) কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা সংবিধানে থাকবে। বাকি সব ক্ষমতাই থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশগুলোর জন্য কোন ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে রাখতে হলে তার জন্য আলাদা পরিসীমা নির্ধারন করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে নির্ধারিত ক্ষমতা ছাড়া সব ক্ষমতাই থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

(২) কেন্দ্রের হাতে থাকবে মাত্র কয়েকটি বিষয়। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষমতাই থাকবে প্রাদেশিক সরকারগুলোর হাতে। নূন্যতম ৫-৬টি বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে।

(৩) (ক) শাসনতন্ত্রে এমন কোন বিশেষ বিধি রাখা যাবে না যার দ্বারা জাতীয় সংহতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমন্বয় কিংবা সম্পূরকতার অযুহাতে কেন্দ্রিয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে। ১৯৬২ সালের সংবিধানে এ ধরণের বিধি জনগণের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

(খ) আজকের পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক বিষয়ই কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক সম্পর্কের মূল বিষয় বিধায় শাসনতন্ত্রে এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত নীতিগুলোর সংযোজন অপরিহার্য:-

(১) কেন্দ্রিয় সম্পদ (বৈদেশিক সাহায্য এবং মুদ্রাসহ) পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের মাঝে জনসংখ্যানুপাতে বরাদ্দ করার বিধান থাকতে হবে। বৈদেশিক ঋন ও সাহায্য কেন্দ্রিয় সরকারের মাধ্যমে গৃহিত হবে। এবং এ বিষয়ে সব চুক্তি করার অধিকার থাকবে কেন্দ্রের হাতে।

(২) কেন্দ্রিয় খরচ, রাজস্ব এবং উন্নয়ন খাতের সব খরচা জনসংখ্যানুপাতে কিংবা আধাআধিভাবে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের মাঝে ভাগ করার বিধি সংবিধানে থাকতে হবে।

(৩) রাজস্ব ব্যবস্থা হবে প্রদেশভিত্তিক। সব রকম কর কিংবা রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। কেন্দ্রিয় সরকারের জন্য রাজস্বের একটি অংশ বরাদ্দ করে দিতে হবে শাসনতন্ত্রে।

(৪) কেন্দ্রিয় সরকারের প্রশাসনিক বিভাগগুলো (সাংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং আইন বিভাগ) পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা এবং ইসলামাবাদে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে করে ভৌগলিক দূরত্বের ফলে দেশের দু'টি অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন মনে না করে। কেন্দ্রিয় বিষয় সক্রান্ত বিভাগীয় দফতর ঢাকাতেও রাখতে হবে।

(৫) কেন্দ্রিয় সরকারের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে লোক নিয়োগও পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ থেকে জনসংখ্যানুপাতে কিংবা আধাআধিভাবে করার বিধান সংবিধানে রাখতে হবে।

(৬) কেন্দ্রিয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে জয়েন সেক্রেটারী এবং তার উপর সর্বোপরিসরে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের আনুপাতিক বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ গ্রহণের সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে।

জনাব চৌধুরী খসড়া রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান তার ন্যায্য অধিকার থেকে সর্বদাই বঞ্চিত হয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক বরাদ্দ, রাজস্ব বন্টন, উন্নয়ন খাতে ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রা এবং সাহায্য প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই পূর্ব পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চাতভূমিতে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানের ঐক্যের স্বার্থে এ দুঃখজনক অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। ক্রমান্বয়ে এই বৈষম্য দূরীকরণের নীতি গ্রহণ করার কোন বিকল্প নেই। এই সত্যকে মেনে নিয়ে সার্বিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমেই পাকিস্তানের ঐক্য বজায়ে রেখে দেশকে শক্তিশালী করা সম্ভব। আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন করতে পারলেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। এ ব্যাপারে আন্তরিক এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে জাতীয় ঐক্য এবং একাত্মতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিগত দুই দশকের শোষণ-নিপীড়নের জ্বালা ভুলে তারা আবার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করে পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। শাসনতন্ত্রে অর্থনৈতিক এবং রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ রাখা সম্ভব নয় তাই শাসনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের উপর দায়িত্ব আরোপ করা হবে যাতে করে উক্ত সংগঠন এমনভাবে আইন এবং নীতি প্রণয়ন করবে যাতে অতীতের শোষণ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। জনাব চৌধুরী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া

খানের কাছে খসড়াটি ১৯৭০ সালের ১১ই ডিসেম্বর পেশ করেন। প্রেসিডেন্ট জনাব চৌধুরীর খসড়ার সাথে একমত প্রকাশ করে জনাব চৌধুরীর কাছে একটি পত্র লিখেছিলেন। ঢাকায় প্রেসিডেন্ট জনাব চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি ভেবেছিলেন আলোচনাকালে শেখ মুজিব তার ওয়াদা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ প্রণীত শাসনতন্ত্রের খসড়া নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে মত বিনিময় করবেন এবং সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের জনাব চৌধুরী এবং তাদের প্রণীত খসড়াটির প্রয়োজন হবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং জনাব শেখ মুজিবের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১২ই জানুয়ারী। তাদের ঐ একান্ত বৈঠক হয়েছিল ৩ঘন্টারও বেশি সময় নিয়ে। ঐ মিটিং-এ কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। মিটিং এর পরপরই প্রেসিডেন্ট তার সংবিধান বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা মন্ত্রী জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরীকে তলব করেন। তিনি তাকে বলেন, "শেখ মুজিব আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাকে বিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি। সে তার কথার বরখেলাপ করেছে। পরামর্শদাতাদের অনেকেই তাকে বিশ্বাস করতে মানা করেছিলেন; কিন্তু আমি তাদের উপদেশ উপেক্ষা করে তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। আমার আন্তরিকতাকে মুজিব দুর্বলতা মনে করে ভুল করেছে।" আলোচনার সারবস্তু অনুযায়ী শেখ মুজিব পূর্বকথামত প্রেসিডেন্টকে শাসরতন্ত্রের খসড়া দেখাতে অস্বীকার করেন। তিনি পরিষ্কারভাবে প্রেসিডেন্টকে বলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনিই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার কিছুই নেই। প্রেসিডেন্টের এখন একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে অতিসত্বর জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা। তিনি প্রেসিডেন্টকে সতর্কবাণী উচ্চারন করে বলেন, "অবিলম্বে সংসদ অধিবেশন শুরু করতে ব্যর্থ হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন তিনিই।"

শেখ মুজিবের এ ধরণের মনোভাবের ফলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভীষণভাবে মর্মাহত হন। এতে জান্তার ভিতরেও তার অবস্থান নাজুক হয়ে পড়ে। পূর্বে বর্ণিত অধ্যায় থেকে দেখা যাবে ইয়াহিয়া খান মুজিবের প্রায় সব দাবিই মেনে নিয়েছিলেন। কেন্দ্র-প্রাদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দু'টো বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য থাকলেও মূলতঃ বলা যায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। তার প্রণীত খসড়া অনুযায়ী বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা এবং মুদ্রা এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে রেখে বাকি সবকিছুই তিনি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ঐ মূল তিনটি বিষয়ের আনুসাঙ্গিক আরো কয়েকটি বিষয়কেও তিনি কেন্দ্রের অধীন রাখতে চেয়েছিলেন। যেমন:- পাসপোর্ট, ন্যাশনালিটি, ইমিগ্রেশন। কেন্দ্রের হাতে রাজস্ব আদায়ের কোন ক্ষমতা থাকবেনা

বিধায় সংবিধানে তিনি কেন্দ্রের আর্থিক সংকুলানের গ্যারান্টি দাবি করেন। তিনি চেয়েছিলেন সংবিধানে আইন প্রবর্তন করতে হবে যে প্রতিটি প্রদেশ নিজেস্ব আয় থেকে নির্ধারিত একটি অংশ কেন্দ্রকে দিতে বাধ্য থাকবে। কেন্দ্রের স্বতন্ত্রতা বজায়ে রেখে কেন্দ্র যাতে করে তার নিজস্ব দায়িত্বসমূহ পালন করতে পারে সে জন্যই প্রেসিডেন্ট ঐ দাবি জানিয়েছিলেন। বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিন্নমুখীতা ও স্বতন্ত্রতা মেনে নেননি। এ ব্যাপারে তার মতামত ছিল নিম্নরূপ :-

প্রাদেশিক সরকারগুলো তাদের স্বতন্ত্র বানিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিনিধি বিদেশের দূতাবাসে প্রেরণ করতে পারবেন। রাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্র নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বানিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক সবরকম তৎপরতাই প্রাদেশিক সরকার করতে পারবেন। কেন্দ্রের নীতির পরিপন্থী কোন কার্যক্রম প্রাদেশিক সরকার করতে পারবেন না তা সেটা যতই লাভজনক হোক না কেন। প্রথম বৈঠকের বিপর্যয়ের পরও প্রেসিডেন্টে ও শেখ মুজিবের মাঝে আরো কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৈঠকগুলোর গতিধারা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে সংঘাতের পথেই ধাবিত হচ্ছে। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, "মুজিবের সাথে তার প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেন সাংবাদিক সম্মেলনে। তিনি বলেন, "শেখ মুজিব যখন ক্ষমতা নেবেন তখন তিনি ক্ষমতায় থাকবেন না। খুব শীঘ্রই শেখ মুজিব তার সরকার কায়েম করবেন। কিন্তু ইয়াহিয়া এবং মুজিবের মাঝে যে সমঝোতা হয়েছিল সে অনুযায়ী সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হবেন সরকার প্রধান আর ইয়াহিয়া খান হবেন সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান। এই ধরণের সমঝোতা বর্তমান থাকা অবস্থায় প্রেসিডেন্টের ঐ ধরণের ইঙ্গিত শংকিত করে তুলেছিল জনগণকে। তাহলে কি দীর্ঘদিন ধরে প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবের মাঝে যে বিশ্বাস এবং আন্তরিক নির্ভরশীলতা জন্মেছিল তার ভিত ধ্বসে গেছে? তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মতভেদ! এর পরিণতি কি হবে? ঢাকা ত্যাগের আগে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে জনাব ভুট্টো এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদদের সাথে মত বিনিময় করবেন এবং তাদের অনুরোধ করবেন যাতে তারা ঢাকায় এসে শেখ মুজিবকে বোঝান যে, জাতীয় স্বার্থে তাকে আরো যুক্তিসঙ্গত আচরণ করতে হবে। তা না হলে যে বিপর্যয় দেখা দিবে তার জন্য দেশের সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেই জাতির কাছে জবাবদিহি হতে হবে। ১২ই জানুয়ারীর বৈঠকের বিপর্যয়ের পর জনাব চৌধুরী ছুটে গিয়েছিলেন মন্ত্রীসভার সদস্য জনাব হাফিজুদ্দিনের কাছে। সবকিছু বুঝিয়ে বলে তিনি জনাব হাফিজুদ্দিনকে অনুরোধ করেছিলেন শেখ মুজিবকে বোঝাতে। শেখ মুজিবের সাথে জনাব হাফিজুদ্দিনের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। জনাব হাফিজুদ্দিন শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেছিলেন।

সেই বৈঠকে জনাব তাজুদ্দিনও (পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল) উপস্থিত ছিলেন। জনাব হাফিজুদ্দিন শেখ সাহেবকে তার দেয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রেসিডেন্টকে তাদের প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্র দেখাবার অনুরোধ জানান। শেখ সাহেব জবাবে পরিষ্কারভাবে কিছুই বলেননি। তবে জনাব তাজুদ্দিন উত্তর দিয়েছিলেন। পরিষ্কার ভাষায় তিনি বলেন, "শেখ মুজিব এমন কোন কথা কাউকে দেননি। শাসনতন্ত্রের খসড়া কাউকে দেখাবার দায়ভারও আওয়ামী লীগের নেই। এ ধরণের দাবি নেহায়েতই যুক্তিহীন।"

ঢাকা থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সাথে দেখা করার জন্য গেলেন লারকানায়। আলোচনাকালে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট-মুজিব বৈঠকের ব্যর্থতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। জেনারেল হামিদ খান এবং জেনারেল পীরজাদাও প্রেসিডেন্টের সাথে লারকানায় যান। ইতিমধ্যে জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় পৌছান ২৭শে জানুয়ারী। ভুট্টো ও মুজিব তিন দফা বৈঠকে মিলিত হন। শেখ মুজিবের বাসভবনে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হলেও মূল বিষয়গুলোর উপর কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে তারা ব্যর্থ হন। শেখ মুজিব পরিষ্কারভাবে ভুট্টোকে জানান ৬ দফার ব্যাপারে তিনি কোন আপোষ করবেন না। জবাবে জনাব ভুট্টো বলেছিলেন, "৬ দফার আড়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদের আভাষ রয়েছে বিধায় ৬ দফা ভিত্তিক কোন শাসনতন্ত্রের পক্ষে তিনি বা তার দল কোনরূপ সমর্থন দিতে অপারগ। এভাবেই পাকিস্তানের দুই অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাদের মাঝে অতি প্রয়োজনীয় কোনরূপ রাজনৈতিক সমঝোতা গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। সেই সময় পর্দার অন্তরালে থেকে জনাব হারুণ এক বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছিলেন। তিনি অতিকৌশলে জনাব ভুট্টোকে শেখ মুজিবের কাছে সরকারের দালাল হিসেবে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে বরাবরই শেখ মুজিব জনাব ভুট্টোকে সন্দেহের চোখে দেখে আসছিলেন। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং সন্দেহের কারণেই সব আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে পরে জনাব ভুট্টো বলেন, "শেখ মুজিব জাতির উপর জোর করে ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেবার চক্রান্ত করছেন। তার চেষ্টা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তড়িঘড়ি করে জাতীয় সংসদ অধিবেশন বসিয়ে তার প্রণীত শাসনতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাশ করিয়ে তার জোঁয়ালে জাতিকে আবদ্ধ করা। তিনি জনগণকে ৬ দফার মূল উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে নারাজ।" জনাব ভুট্টোর ঢাকা থেকে ফেরার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লারকানা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই শেখ মুজিব লারকানা বৈঠক সর্ম্পকে সন্দিহান হয়ে উঠেন। লারকানা বৈঠক সম্পর্কে ভুট্টো বলেন, "আমরা ৬ দফার তাৎপর্য নিয়ে মত বিনিময় করেছি। ৬ দফার মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষন করে আমরা শংকিত হয়ে পড়েছি। তথাপি প্রেসিডেন্টকে কথা দিয়েছি

বর্তমান সমস্যার একটা আপোষভিত্তিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।"

লারকানা বৈঠকের পর ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি ইসলামাবাদে জান্তার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। জেনারেলরা সিদ্ধান্ত নিলেন, শেখ মুজিবের অনমনীয়তার মোকাবেলা করা হবে দৃঢ়তার সাথে। ভুট্টোর উস্কানিমূলক উক্তিগুলো উপেক্ষা করে চলেছিলেন জান্তার যুদ্ধবাজ জেনারেল হামিদ, ওমর, গুলহাসান এবং পীরজাদা প্রমুখ। তারা ভুট্টোকেই পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকারী একমাত্র রাজনীতিবিদ ও নেতা মনে করতে থাকায় অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠে। এই বৈঠকেই মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মুজিবের সাথে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং এডমিরাল আহ্সানকে তিরষ্কারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল জান্তার অন্যান্য জেনারেলদের ঐ বৈঠকে। এর ফলে এডমিরাল আহ্সান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার পদে নিয়োগ করা হয় কট্টরপন্থী জেনারেল টিক্কা খানকে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ক্যাবিনেট বিলুপ্ত করা হয়। ক্যাবিনেট বিলুপ্তির ৪৮ঘন্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্যদের তার পরামর্শমন্ডলীর সদস্য হওয়ার আহ্বান জানান। জনাব এহসানুল হক এবং জাষ্টিস কর্নওয়ালিস ব্যতিত অন্য সবাই তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। শেখ মুজিবের বারংবার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দেন, "৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্টের ঐ ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, "তার ও শেখ মুজিবের মধ্যে ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে কোন সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসতে পারে না। সংসদ কার্যক্রমের উপরও একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত।" তিনি হুমকি দেন, "আমার দাবি অবহেলিত হলে করাচী থেকে খাইবার পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে।" জনাব ভুট্টো ভাল করেই জানতেন জান্তার বেশিরভাগ জেনারেল তার পক্ষে রয়েছেন। তিনি আরো জানতেন, শেখ মুজিবের অনমনীয় ভাবের ফলে জান্তার মধ্যে প্রেসিডেন্টের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক ব্যর্থ হবার পরই জেনারেলরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংবিধানের বিষয়ে তারা আর নিরব দর্শকের ভূমিকায় থাকবেন না। এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে জেনারেল হামিদকে প্রেসিডেন্ট বানাবার কথাও চিন্তা করেছিলেন জান্তার জেনারেলরা। কিন্তু চীন-মার্কিন সম্পর্কের ব্যাপারে নিক্সন কর্তৃক ইয়াহিয়া খানকে প্রদত্ত দায়িত্বের কথা ভেবেই পরিশেষে জেনারেলরা ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা থেকে বিরত থাকেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট পদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ক্ষমতাহীন বিব্রত প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর একান্ত বিরোধিতার মুখে ১লা মার্চ এক

ঘোষণায় ৩রা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী করতে বাধ্য হন। জেনারেল পীরজাদা ও ভুট্টো মিলিতভাবে প্রেসিডেন্টের ১লা মার্চের ভাষণ তৈরি করেন বলে পরে জানা যায়। জাতীয় সংসদ অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা শোনার পরমুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে non co-operation movement কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রের সাথে সব সর্ম্পকই প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। এ অবস্থার মধ্যেও মুজিব-ইয়াহিয়া যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। ৭ই মার্চের জনসভার প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট টেলিফোনে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে দীর্ঘ আলাপ করেন। আলোচনার ধারা ছিল সৌহার্দপূর্ণ। দু'জনেই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্ট মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে অনুরোধ করেন যাতে মুজিব এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন যেখান থেকে ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়বে। উত্তরে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টকে ঢাকায় এসে বিষ্ফোরম্মুখ অবস্থা স্বচক্ষে দেখে যাবার আমন্ত্রন জানান।

৭ই মার্চ শেখ মুজিব ঐতিহাসিক জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। প্রেসিডেন্টের ২৫শে মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জনসভায় চার দফা দাবি পেশ করেন। তিনি ঘোষণা দেন তার চার দফা দাবি ভবিষ্যতে সংসদ অধিবেশনে যোগদানের পূর্ব শর্ত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

তার ঘোষিত চারটি শর্ত ছিল নিম্নরূপ:-

১। অবিলম্বে মার্শাল'ল উঠিয়ে নিতে হবে।

২। আর্মিকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৩। আর্মি এ্যাকশানের ফলে যে প্রাণহানি ঘটেছে তার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ দাবিসমূহ পূরণ না করা পর্যন্ত non co-operation movement চলবে। এভাবেই ৩রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ মধ্যরাত অব্দি মুজিবের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানে একটি প্যারালাল প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহ উম্মুখ পূর্ব পাকিস্তানের অশান্ত পরিবেশে শেখ মুজিবর রহমান হয়ে উঠেন ডিফেক্টো রাষ্ট্রপ্রধান। মুমুর্ষ রুগীকে বাচাঁবার শেষ চেষ্টার মত পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মার্চের ১৫ তারিখে ঢাকায় আসেন। সে দিনই শেখ মুজিব এক উস্কানিমূলক

বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, "জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের জনগণ, বেসামরিক আমলা, অফিস-আদালত এবং মিল-ফ্যাক্টরির শ্রমিকগণ, কৃষক এবং ছাত্র সমাজ ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে, আত্মসমর্পন করার চেয়ে তারা জীবনাহুতি দিতে প্রস্তুত। বাঙ্গালীর স্বাধীনতার চেতনাকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখা যাবে না। সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবেই চলবে।" বাংলাদেশকে পরিচালিত করার জন্য শেখ মুজিব ৩১টি আদেশ জারি করেন। সরকারি এবং আধা-সরকারি সমস্ত অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। দুই অংশের মধ্যে শুধুমাত্র টেলিফোন, টেলেক্স এবং ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে যোগাযোগ বহাল থাকবে। এভাবে স্বাধীনতার চেতনা ক্রমশঃ বাস্তবাকার ধারণ করতে শুরু করে। সেনা বাহিনী ছাড়া সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসন শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। বিদেশী খবর সংস্থাগুলিও একই অভিমত প্রকাশ করেন। যেমনঃ মার্চের ৯ তারিখে ডেইলী টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়, "অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শেখ মুজিবর রহমান প্রায় স্বাধীনতাই ঘোষণা করেছেন।" একইদিন এডিটোরিয়ালে লেখা হয়, "ইতিমধ্যেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের নামও শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ বলে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য স্বতন্ত্র একটি পতাকাও সৃষ্টি হয়েছে।" একই ধরণের খবর দি ইকনোমিষ্ট (১৩ই মার্চ সংখ্যা) এ প্রকাশিত হয়। ১৫ই মার্চ দি টাইমস অভিমত প্রকাশ করে, "পাকিস্তান আজ ধ্বংসের পথে।" ইতিমধ্যে একটি ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত সরকার ভারতের উপর দিয়ে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বিমান যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানের ক্রান্তিলগ্নে ভারত সরকারের এ ধরণের চরম সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য পাকিস্তান বন্ধুরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন এর মধ্যস্ততার জন্য আকুল আবেদন জানায়। সোভিয়েত ইউনিয়নকেও আবেদন জানানো হয় এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। জাতিসংঘের মহাসচিব মধ্যস্থতা করার জন্য সম্মতি জানান। কিন্তু ভারত সরকার এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ অথবা মধ্যস্থতার চরম বিরোধিতা করে এবং নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। পরবর্তিকালে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ফলে জানা যায় হাইজ্যাকাররা ছিল সবাই ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর থেকে গৃহিত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য। শেখ মুজিব ভারতীয় নিষেধাজ্ঞার সমর্থন করে বলেন, "হাইজ্যাক ঘটনা পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতা হস্থান্তর না করার একটি কূটকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।" প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যখন আন্তরিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন তখন শেখ মুজিবের এ ধরণের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বিমান যোগাযোগ নিষিদ্ধ করার ভারতীয় সিদ্ধান্তের পক্ষে শেখ মুজিবের সমর্থন জান্তার ভেতর জেনারেলদের শেখ মুজিব সম্পর্কে পুষিত সন্দেহকেই জোরদার করে। শেখ মুজিব ভারতের দালাল এ ধারণা জেনারেলদের অনেকের মনেই

বদ্ধমূল হয়ে উঠে। হাইজ্যাক প্রসঙ্গে ভুট্টোর বক্তব্যও ছিল নেহায়েত দায়িত্বহীন। তিনি হাইজ্যাকারদের 'পাকিস্তানী' ঘোষণা করে তাদের 'জাতীয় বীর' আখ্যায়িত করেন। জাতীয় স্বাধীনতা এবং সংহতির প্রতি হুমকি স্বরূপ ভারতীয় পদক্ষেপের প্রসঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাদ্বয়ের এ ধরণের প্রতিক্রিয়ায় তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাই প্রকাশিত হয়। জাতীয় সংসদ অধিবেশনের আগে কিংবা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে কোনরূপ বোঝাপড়ার আগে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের শেখ মুজিবের দাবির সমালোচনা করে জনাব ভুট্টো যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন সেটাও ছিল দুঃখজনক এবং হতাশাব্যাঞ্জক। ১৪ই মার্চ শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবার শেষ চেষ্টা করার জন্য প্রেসিডেন্ট যখন ঢাকার পথে ঠিক তখন জনাব ভুট্টো এক বিবৃতিতে বলেন, "শেখ মুজিবের দাবি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বিষয়ে সমঝোতার আগেই যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে একই সাথে পূর্ব ও পশ্চিম পকিস্তানের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির হাতে।" ১৫ই মার্চ তার বিবৃতিতে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, "পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্বের সত্যকে মেনে নিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কায়েমের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে দাড়ায়।"

১৫ই মার্চ এমন এক পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এসে পৌছান যখন পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব স্বাধীনতা প্রায় ঘোষণা করেছেন অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব ভুট্টো 'দুই সরকারের' পক্ষে বক্তব্য দিয়ে দেশের বিভক্তি প্রায় স্বীকার করে নিয়েছেন। পাকিস্তান সরকার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য ছোট ছোট দলগুলোর নেতৃবৃন্দ তখনও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন পাকিস্তানের ঐক্য এবং সংহতি বজিয়ে রাখার। ইয়াহিয়া খান জনাব ভুট্টোকে ঢাকায় আসবার জন্য অনুরোধ জানান। জবাবে জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্টকে বলেন শেখ মুজিব যখন প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বাধীনতাই ঘোষণা করে বসেছেন তখন ঢাকায় গিয়ে আলোচনা করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এতে কোন ফায়দাও হবে না। তার এ ধরণের মনোভাব থেকে এটাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জনাব ভুট্টোর কাছে তখন পাকিস্তানের অখন্ডতার চেয়ে ক্ষমতাই বড় হয়ে উঠেছে। ক্ষমতা লাভের জন্য দুই অংশের দুই নেতাই মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাদের উদ্দেশ্যমূলক কার্যক্রমের ফলে দেশ এবং জাতির কি অবস্থা হবে সে ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। ক্ষমতার অন্ধ মোহে তারা বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপকেও মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করছিলেন না।

প্রেসিডেন্ট যখন ঢাকায় তখন থেকেই সামরিক জান্তা contingency plan বানাতে শুরু করে। প্ল্যান অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আকাশ পথে কলম্বো হয়ে আর্মি রিইনফোর্সমেন্ট পাঠানো শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানে। ভারত সরকার শ্রীলংকা সরকারের

উপর চাপ প্রয়োগ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কলম্বো হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বিমান যোগাযোগ বন্ধ করার। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কলম্বো সরকার ভারতীয় চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঢাকার মাটিতে পা দিয়েই প্রেসিডেন্ট বুঝতে পারলেন অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। জনগণ বিক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরম্মুখ। তার কাছে মনে হল তিনি যেন ভিন্ন কোন দেশে এসেছেন। তার অতি চেনা পূর্ব পাকিস্তান যেন এটা নয়। যাই হোক, প্রতিকূল অবস্থার মাঝেই ১৬ই মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিবের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সকাল ১১টায় শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি ভবনে এলেন বৈঠকের জন্য। তার গাড়িতে উড়ছিল একটি কালো পতাকা। আগের সপ্তাহে পুলিশের গুলিতে শহীদদের স্মরনে ঐ কালো পতাকা গাড়িতে লাগানো হয়েছিল। বৈঠকে শেখ মুজিব অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং মার্শাল'ল উঠিয়ে নেবার দাবিসহ তার ৪ দফা প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য ১৯৬৯-৭০ সালে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্রের খসড়ার উপর ভিত্তি করে কোন আলোচনার অবকাশ আর তখন ছিল না। ফলে প্রেসিডেন্ট এর পক্ষে শুধু দু'টোই রাস্তা খোলা ছিল -

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া।

২। শেখ মুজিবের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কিন্তু যে কোন প্রকার সামরিক পদক্ষেপে প্রাণহানীই শুধু ঘটবে না পরিশেষে এ ধরণের পদক্ষেপের পরিণতিই বা কি হবে সে সম্পর্কেও কিছু বলা সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে এক কঠিন সমস্যার মুখাপেক্ষী হন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। জান্তার কট্টরপন্থী জেনারেলদের মধ্যে অনেকেই যেমনঃ জেনারেল হামিদ খান প্রমুখরা ভেবেছিলেন ৭২ ঘন্টার মধ্যেই সামরিক অভিযান চালিয়ে তারা বাঙ্গালীদের বিদ্রোহ দমন করতে পারবেন। ১৯৬৯ সালের মার্শাল'ল প্রয়োগের সফলতাই তাদের মাঝে এ ধরণের ধারণা সুদৃঢ় করেছিল। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিলেন যে ১৯৬৯ সালের মার্শাল'ল-কে বাঙ্গালী জনগণ মেনে নিয়েছিল তখনই যখন পর্দার অন্তরালে জান্তা প্রধান অতিসত্তর জাতীয় নির্বাচন সংগঠিত করে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ তখন তুঙ্গে। সারা পূর্ব পাকিস্তানে তখন স্বাধীনতার দাবি জনগণের মাঝে বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে সংঘাতের পথ বর্জন করার জন্য আকুল নিবেদন জানান। বৈঠকে মুজিবকে সিদ্ধান্তহীন মনে হয়। ঘটনা প্রবাহের চরম পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কে তিনিও ছিলেন শংকিত। মুখে বিপ্লবী বাণী উচ্চারণ করলেও চারিত্রিকভাবে শেখ মুজিব ছিলেন সুবিধাবাদী দুর্বল ও ভীরু চরিত্রের রাজনীতিবিদ। ফলে অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য ইয়াহিয়া-মুজিব

যখন আলোচনায় ব্যস্ত তখন যুদ্ধবাজ জেনারেলরা বাঙালী জাতিকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়নে ছিলেন ব্যস্ত। এ অবস্থায় ২০শে মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবের মধ্যে শাসনতন্ত্র বিষয়ে একটি আপোষ সমঝোতা হয়েছে; যার মধ্যে মুজিবের ৬ দফার প্রতিফলন ঘটেছে। মার্শল'ল অবিলম্বে উঠিয়ে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারেও একটি সমাধান প্রেসিডেন্ট ও জনাব মুজিবর রহমান মেনে নিয়েছেন বলেও সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়।

ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে একটি ঘোষণাপত্রের খসড়াও চুড়ান্ত করা হয়। তাতে বলা হয়, কেন্দ্রিয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকেই মনোনীত করা হবে। জাতীয় সংসদকে দুইটি কমিশনে ভাগ করা হবে। কমিশন দুইটি পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বিধি নির্ধারন করবেন; যা পরে শাসনতন্ত্রের অংশ হিসেবে পরিগনিত হবে। এর ভিত্তিতেই জাতীয় অধিবেশনে দেশের জন্য নতুন একটি শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। খসড়া ঘোষণাপত্রে জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরি প্রণীত ১৯৭১ জানুয়ারীর শাসনতন্ত্র বিষয়ে খসড়ার আলোকেই কেন্দ্র ও বাংলাদেশের সম্পর্ক নির্ধারিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়। খসড়ায় মুজিবের ৬ দফার প্রায় সবটাই গৃহিত হয় পাকিস্তানের ঐক্য বজিয়ে রেখে। কিন্তু খসড়া ঘোষণাপত্র সম্পর্কে জান্তার জেনারেলরা নেতিবাচক অভিমত পোষণ করে আসছিলেন গোড়া থেকেই। তাদের মতে চাপে পড়েই প্রেসিডেন্ট এ ধরণের ঘোষণাপত্র তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে তাদের কাছে প্রেসিডেন্টের ঘোষণাপত্রের তেমন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। পরবর্তিকালে তাদের এ ধরণের মানসিকতা এবং প্রজ্ঞার অভাবেই জাতীয় জীবনে নেমে এসেছিল চরম বিপর্যয়।

ঢাকার আলোচনায় আবার ফিরে যাওয়া যাক। ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে তখন প্রতিদিন বৈঠক হচ্ছিল সকাল-বিকাল। আলোচনা চলছিল দুই পর্যায়ে। প্রেসিডেন্ট এবং মুজিবর রহমানের মধ্যে এবং দুই পক্ষের বিশেষজ্ঞদের মাঝে। প্রেসিডেন্টের পক্ষে বিশেষজ্ঞ ছিলেন জাষ্টিস কর্নওয়ালিস, জেনারেল পীরজাদা, জনাব এম এম আহমদ। চতুর্থ সদস্য ছিলেন কর্নেল হাসান। জান্তার মূল সদস্যদের মাঝে জেনারেল হামিদ, জেনারেল গুল হাসান, জেনারেল ওমর, জেনারেল মিট্টা প্রমুখ সবাই তখন ঢাকায়। তারা তখন নিয়মিত নিজেদের মধ্যে এবং প্রেসিডেন্ট এর সাথে আলোচনা করছিলেন সার্বিক অবস্থার গতিপ্রবাহ নিয়ে। আলোচনায় কেন্দ্র ও প্রাদেশিক অর্থনীতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ভবিষ্যত সম্পর্কের বিষয়গুলিই মূলতঃ প্রাধান্য পাচ্ছিল।

কর্নেল হাসানের মতে প্রেসিডেন্ট যখন শেখ মুজিবের দাবিগুলো সমঝোতার ভিত্তিতে একের পর এক মেনে নিচ্ছিলেন তখন জেনারেলরা প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, জাতীয় সরকারকে দুর্বল করা হলে তার পরিণতির জন্য প্রেসিডেন্টকেই দায়ী থাকতে হবে।

পাকিস্তান আর্মির গর্বিত জেনারেলরা মনে করতেন জাতীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব শুধু তাদেরই। পঞ্চাশ দশকে আইয়ূব খানের ক্ষমতা দখলের পর থেকেই জাতীয় স্বার্থের একচ্ছত্র ধারক ও বাহক হয়ে উঠে পাকিস্তানের সেনা বাহিনী। সর্বোপরিসরে রাজনীতিবিদদের তারা করুণার চোখেই দেখতেন। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা আছে এটা তারা নির্দ্বিধায় অবিশ্বাস করতেন। অবশ্য এর ব্যাতিক্রমও ছিল। সেনা বাহিনীর অনেকেই চাইছিলেন বর্তমান সমস্যার একটি যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক সমাধানই হওয়া উচিত। সমাধান অবশ্যই পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তখনকার পরিবেশে সেনা বাহিনীর বৃহৎ অংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ সানন্দে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। তবে শর্ত ছিল একটাই শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের অখন্ডতা বজিয়ে রাখতে হবে। একইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণও পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার পক্ষে ছিল না। তাদের দাবি ছিল সত্যিকারের নির্ভেজাল স্বায়ত্ব শাসন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেই তারা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তারা চাইছিল অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে। কিন্তু সাধারণ জনগণের ইচ্ছার তখন কোন দাম ছিল না। পাকিস্তানের ভাগ্য তখন সুস্পষ্টভাবে নির্ভর করছিল দুই রাজনৈতিক নেতার উপর। পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব ভুট্টো আর পূর্ব পাকিস্তানে জনাব শেখ মুজিব। কিন্তু উচ্চাভিলাসী দুই নেতাই তখন ক্ষমতার লোভে অন্ধ। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে নিজেদের ক্ষমতাই তখন তাদের কাছে মুখ্য। ১৯৭০এর নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগের পক্ষে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারনী বড় সমাবেশ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী রমনা রেসকোর্সে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। ঐদিন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান স্বয়ং শেখ মুজিব। এই শপথের শেষ বাক্যটি ছিল ঃ "'জয় বাংলা', 'জয় পাকিস্তান'।" (দৈনিক পাকিস্তান ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১)। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের বিবরণী সম্পর্কে দৈনিক পাকিস্তানের ভাষ্য :

দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক বিজয়কে সুসংহত করার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী দালালদের বাড়াবাড়ি দমনের জন্য দেশবাসীকে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন,"ইউনিয়নে-ইউনিয়নে, মহল্লায়-মহল্লায়, আওয়ামী লীগ গঠন করুন এবং রাতের অন্ধকারে যাহারা ছোরা মারে তাদের খতম করার জন্য প্রস্তুত হন।" রাতের

অন্ধকারে যাহারা ছোরা মারে, মানুষ মারে সেই সব বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "চোরের মত রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লব চোরের কাজ নয়।" সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদের দালালদের খতম করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে বাশেঁর লাঠি এবং সুন্দরী কাঠের লাঠি বানাইবার পরামর্শ দেন। শেখ মুজিব বলেন, "প্রত্যেকের হাতে আমি হয় বাশেঁর; নয় সুন্দরী কাঠের লাঠি দেখিতে চাই।" উপরোক্ত দু'টো ঘটনার প্রথমটি অর্থাৎ শপথে 'জয় পাকিস্তান' যোগ করে দিয়ে স্পষ্টতঃ তিনি পাকিস্তানের প্রতি তার আনুগত্য অক্ষুন্ন রেখেছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটিও এই আনুগত্যেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা পাকিস্তানের অখন্ডতার মূলে আঘাত হেনে তথা 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' কায়েমের প্রস্তাব তুলে সশস্ত্র যুদ্ধের কর্মসূচী দিয়েছিলেন যে সমস্ত বিপ্লবীরা শেখ মুজিবের কাছে তারা হলেন সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদের দালাল। স্বাধীনতাকামী এই সন্ত্রাসবাদীদের খতম করার জন্য বাঁশ ও সুন্দরী কাঠের লাঠির ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন তিনি। একই ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শেখ মুজিব। এ সম্পর্কে ঐদিনের পাকিস্তান অবজারভারের প্রতিবেদন, "Sheikh Mujib thanked President Yahiya for fulfilling his commitment in holding the elections. However, he said that there was a section among his subordinates who are still conspiring to undo the election results." বক্তব্যটা পরিষ্কার। শেখ মুজিবের এ অভিনন্দন যে যথার্থই অভিনন্দন ছিল তার প্রমাণ জেনারেল ইয়াহিয়া খানও রেখেছিলেন ১৩ই ফেব্রুয়ারী তার নির্দেশের মাধ্যমে। তিনি নির্দেশ দেন ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে। ২২শে ফেব্রুয়ারী তিনি তার মন্ত্রী পরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ঘোষণা দিলেন, "৬ দফা কারও উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না।" (দি ডেইলী ডন, ১লা মার্চ ১৯৭১) এই ডন পত্রিকাটির মালিক হচ্ছে কুখ্যাত ২২ পরিবারের অন্যতম হারুণ পরিবার। এই হারুণ পরিবারেরই আর একটি প্রতিষ্ঠান আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে শেখ মুজিব বিনা কাজে কিন্তু মোটা বেতনে একটা চাকুরী করতেন! সে যাই হোক, ৬ দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবের এই নমনীয়তা কেবল যে এ সংক্রান্ত তার পূর্ববর্তী বক্তব্য কিংবা আন্দোলনকারীদের আশা-আকাঙ্খার পরিপন্থী ছিল তাই নয়; বরঞ্চ পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার সুস্পষ্ট প্রয়াসও ছিল। অর্থাৎ তার এ বক্তব্য হচ্ছে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতির প্রমাণ। প্রেসিডেন্টের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেন জনাব ভুট্টো। তিনি এই বলে হুমকি দেন, "যদি পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি ৩রা মার্চের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করার জন্য ঢাকায় যায় তবে তার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেয়া হবে।" জনাব ভুট্টোর কট্টোর বিরোধিতার মুখে প্রেসিডেন্ট ১লা মার্চ এক বিবৃতির মাধ্যমে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয়

পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন বাধ্য হয়েই। এর ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়েছিল তার মর্মবাণী ছিল একটাই -স্বাধীন বাংলাদেশ।

২রা মার্চ বাংলাদেশের ছাত্র ও যুব সমাজের পক্ষ থেকে ডাকসু ভিপি আসম আব্দুর রব বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। এই পতাকা উত্তোলনের জন্য শেখ মুজিব ছাত্র নেতৃবৃন্দকে যে ভর্ৎসনা করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ শ্রোতা ও দর্শক আজও অনেকেই বেঁচে আছেন। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশ্তেহার পাঠ করেন। এ জনসভায় ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, সভা শেষে শেখ মুজিব মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বক্তৃতার এক পর্যায়ে স্বয়ং শেখ মুজিবই মিছিলের কর্মসূচী বাতিল করেন। কারণ হিসেবে তিনি তৎকালীন আইজি পুলিশ জনাব তসলিমুদ্দিন সাহেবের বরাত দিয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বলেন, তার কাছে গোয়েন্দা বিভাগের খবর রয়েছে মিছিলে যোগদান করলে তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র এটেঁছে সামরিক শাসকগোষ্ঠি।

অত্যন্ত চতুর যুক্তি! সত্যিই কি জীবন নাশের হুমকির মুখে তিনি মিছিলের কর্মসূচী বাতিল ঘোষণা করেছিলেন নাকি স্বাধীনতার ইশ্তেহার পাঠই তার কারণ ছিল সেটা গবেষণার বিষয়।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা দেন। এই ভাষণেই তিনি সর্বপ্রথম স্বাধীনতার কথাটি উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

অবশ্য ভাষণের সমাপ্তিতে একই সাথে তিনি শ্লোগান দেন, "জয় বাংলা, জয় পাঞ্জাব, জয় সিন্ধু, জয় বেলুচিস্তান, জয় সীমান্ত প্রদেশ, জয় পাকিস্তান।"

একই ভাষণে এ ধরণের স্ববিরোধী বক্তব্যকে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের চুড়ান্ত ঘোষণা হিসেবে গ্রহণ করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত সেটা বিবেচনা করার ভার পাঠকগণের উপরই ছেড়ে দিলাম। আশ্চর্য্যজনক হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস 'দলিলপত্র' নামক প্রকাশিত গ্রন্থে ঐ কয়টি শ্লোগানের উল্লেখ নেই। এর রহস্য কি? তবে এ শ্লোগানগুলো দিয়ে যে শেখ মুজিব তার ভাষণ শেষ উচ্চারণ করেছিলেন তার সাক্ষী হিসেবে বর্তমান রয়েছে সে সময়কার পত্র-পত্রিকা ও সেই জনসমাবেশে যারা উপস্থিত ছিলেন সেই সব ব্যক্তিবর্গ।

১৪ই মার্চ শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত। এর পরই ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৬ই মার্চ ১১টায় জেনারেল ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিব দেড় ঘন্টা কোন সাহায্যকারী ছাড়া রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। ১৭ই মার্চ একইভাবে একান্ত বৈঠক হয়। এটাও ছিল সাহায্যকারী ছাড়া। মুজিব-ইয়াহিয়ার তৃতীয় দফার রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় ১৯শে মার্চ শুক্রবার। এ দিন রাতে দুই পক্ষের ৩ জন করে উপদেষ্টা আলাদা বৈঠকে মিলিত হন। ২০শে মার্চ শনিবার আওয়ামী লীগের ৬ জন শীর্ষস্থানীয় সহকর্মী নিয়ে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট আলোচনা করেন এবং পরে তার বাসভবনে সাংবাদিকদের শেখ মুজিব বলেন, "আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।" তিনি বলেন, "রাজনৈতিক সংকট সমাধানের পথে তিনি এগুচ্ছেন।" এই বৈঠকের পর পাকিস্তানের খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশ পায় যে, মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের মাঝে একটা বড় রকমের সমঝোতা হয়েছে। এ সম্পর্কে দি ডনে পরিবেশিত খবরটি ছিল, "Mr. Bhutto held a night long session on Monday with his party man examining the terms of the broad agreement and understanding reached between President Yahiya Khan and Sheikh Mujibur Rahman to end the present political crisis in the country." (The Dawn, 25 March 1971) এই ব্রড এগ্রিমেন্ট সম্পর্কে শেখ মুজিব কিংবা তার আওয়ামী লীগ আজ পর্যন্ত খোলামেলা কিছুই দেশবাসীকে জানায়নি। আজঅব্দি দেশবাসীকে এ ব্যাপারে অন্ধকারে রাখা হল কেন?

২৫শে মার্চ রাতে আত্মসমর্পন বা গ্রেফতারের আগে বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী দৈনিক লা' মন্ডের সাথে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব বলেন, "Is the Pakistan govt. not aware that I am the only one able to save East Pakistan from Communists?" অর্থাৎ কম্যুনিষ্টদের খপ্পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার তিনিই একমাত্র ভরসা। তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন বিকল্প নেই। সাক্ষাৎকারটি লা' মন্ডেতে ছাপা হয় ৩১শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে।

২৫শে মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে পাকবাহিনী শহরে প্রবেশ করে। এর আগেই শেখ মুজিব তার সহকর্মীদেরকে সরে পড়ার এবং জান বাচঁবার উপদেশ দিয়ে নিজের পরিবার-পরিজনদের এমনকি তার গাভীটিকেও অন্যত্র সরিয়ে দেন। এমনকি তার বহুল পরিচিত বডিগার্ডকেও রাত সাড়ে ১০টার পর ৩২নং ধানমন্ডিতে আর দেখা যায়নি। পাকিস্তান আর্মি রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা, ইপিআর সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় অভিযান চালিয়ে শেষ রাতের দিকে ৩২নং ধানমন্ডির বাসা থেকে শেখ সাহেবকে নিয়ে যায়। এদিকে চলতে থাকে একনাগাড়ে

নির্বিকার পাশবিক গণহত্যা। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস বেগম ফজিলাতুন নেসা (শেখ মুজিবর রহমানের স্ত্রী), শেখ রেহানা, শেখ হাসিনা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পাকিস্তান সরকারের ভাতায় ঢাকা শহরে নিরাপদ জীবন যাপন করেছেন। তাদের স্বাভাবিক জীবন ধারায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। পিজি হাসপাতালে শেখ মুজিবের বৃদ্ধা মা-বাবার চিকিৎসা হয়েছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। এবং শেখ হাসিনা এবং তার মা তাদের দেখতেও গেছেন হাসপাতালে ভিআইপি দর্শনার্থীর মত। কোন কোন দিন হাসপাতালে রাত্রিও কাটিয়েছেন র্নিবিঘ্নে।

উপরোল্লিখিত ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার পরোক্ষ ইংগিত প্রদান করা ছাড়া শেখ মুজিব একাত্তরের ৩রা জানুয়ারী থেকে ২৫শে মার্চ রাত পর্যন্ত পাকিস্তানের সংহতির পরিপন্থী কোন অবস্থান গ্রহণ করেননি। শুধু ২১শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে শেখ মুজিবের বিশেষ জরুরী বৈঠকেই ঘটেছিল এর ব্যাতিক্রম।

শেখ মুজিবের বিশেষজ্ঞদের মাঝে ছিলেন জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ, জনাব নজরুল ইসলাম, জনাব মোশতাক আহমদ, জনাব কামারুজ্জামান, জনাব মনসুর আলী প্রমুখ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ। শাসনতন্ত্র বিষয়ে প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন জনাব কামাল হোসেন। এছাড়া বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ তাদের সাহায্য করেছিলেন। যদিও এদের কেউই প্রত্যক্ষভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছিলেন না তবুও তারা কট্টর দাবিগুলোর ব্যাপারে ছিলেন সোচ্চার। তাদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করছিলেন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আর্থিক মদদপুষ্ট কয়েকজন বিদেশী অর্থনীতিবিদ। প্রেসিডেন্ট এবং শেখ মুজিবের মধ্যে বৈঠক চলে ২২শে মার্চ পর্যন্ত। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরাও ঢাকায় আগমন করেন। ২১শে মার্চ জনাব ভুট্টো তার দলীয় প্রতিনিধিদের সাথে ঢাকায় আসেন। প্রেসিডেন্টের সাথে শেখ মুজিবের বোঝাপড়া হয়ে যাচ্ছে মনে করেই ভুট্টো হঠাৎ তড়িঘড়ি করে ঢাকায় এসে হাজির হন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আলোচনাকালে তার উপস্থিতি ছিল নির্দ্বিধায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই তার ঢাকা আগমনে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঘটনা ঘটে হিতে বিপরীত। ঢাকায় পৌছেই তিনি প্রেসিডেন্টের প্রণীত খসড়া ঘোষণাপত্রের তীব্র সমালোচনা করেন। ঘোষণাপত্রের অনেক বিষয়ে তিনি আপত্তি জানান। তিনি দাবি করেন জাতীয় গণপরিষদ বসার আগে মার্শাল'ল উঠিয়ে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে সাংবিধানিক জটিলতার সৃষ্টি হবে। ফলে আইনগত শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণাপত্রও তার বৈধতা হারাবে। অতএব, জাতীয় সংসদের অনুমোদন নিয়েই সবকিছু করার দাবি জানান তিনি।

তার এ ধরণের নেতিবাচক মনোভাব ও কার্যক্রম সমঝোতার প্রক্রিয়ায় শুধু যে বাধার সৃষ্টি করছিল তাই নয় অবস্থাকে করে তুলেছিল স্থবির। যাই হোক, প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে ২২শে মার্চ ইয়াহিয়া, মুজিব এবং ভূট্টোর সম্মিলিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বৈঠকের ঠিক আগের দিন এক হতাশাব্যাঞ্জক ঘটনা ঘটে। শেখ মুজিব হঠাৎ করে প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকের এক প্রস্তাব পাঠান। প্রেসিডেন্টের সম্মতি পেয়ে শেখ মুজিব জনাব তাজুদ্দিনকে সঙ্গে করে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেসিডেন্ট এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বৈঠকে মিলিত হয়ে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টকে জানান আওয়ামী লীগ চায় আলাদাভাবে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রিয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন করতে তিনি অপারগ। তার মানে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা দেশকে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান এই দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের প্রস্তাবে ভীষণভাবে আশাহত হয়ে পড়েন। তার দাবি প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেন। তিনি তাকে এটিও স্মরন করিয়ে দেন যে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কারার জন্য তিনি জাতির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেশকে দ্বি-খন্ডিত করার কোন অধিকার তার নেই। তিনি শেখ মুজিবকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আরো বলেন, "তার বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ অবশ্যই শক্তভাবে মোকাবেলা করা হবে।" এভাবেই ২১শে মার্চের বৈঠকে অনেকদিনের প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠা বিশ্বাস, আস্থা এবং সমঝোতার ভিত ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। আলোচনা হয়ে উঠে অর্থহীন।

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল, হঠাৎ করে শেখ মুজিব এ ধরণের ডিগবাজি খেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করলেন কেন? তিনিতো সেই একই ব্যক্তি; যিনি সবসময়ই সামরিক জান্তাকে বলে এসেছেন পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করা তার রাজনীতি নয়। '৭০ এর নির্বাচনে তিনি ভোটারদের কাছ থেকে ভোট গ্রহণ করেছিলেন এই বলে, "পাকিস্তান টিকে থাকাবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। কোন শক্তিই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না।" (শেখ মুজিবের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ) শেখ মুজিব খুব ভালোভাবেই জানতেন পাকিস্তানের শাসকমন্ডলী পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রশ্নে কোন আপোষ করবেন না। সর্বশক্তি দিয়ে তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবেন আর তার পরিণতি হবে ভয়ংকর।

মন্ত্রীত্বের ইস্যু তুলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচিত হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্টকে ঠুটো জগন্নাথ বানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আস্থাভাজন হয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী-মুজিব। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও যুক্তফ্রন্ট এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির বিকাশ আমেরিকার জন্য দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠে ছিল। এই দুই নেতা সেখানে আওয়ামী

লীগ ও যুক্তফ্রন্ট দু'টোকে ভেঙ্গে আমেরিকার উদ্বেগের অবসান ঘটান। এভাবেই সূচিত হয় সোহরাওয়ার্দী-মুজিবের সাথে আমেরিকার ঘনিষ্ঠতা। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেই সম্পর্কের বন্ধন আরো পোক্ত হয় হারুণ পরিবারের সাথে সখ্যতার মাধ্যমে। ১৯৫৮ সালে আইয়ূব খান ক্ষমতায় এসে যে সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিকে দুর্নীতির দায়ে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করেছিলেন তার মধ্যে হারুণ পরিবারে একজন বহুল পরিচিত সদস্যও অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। শুধু কি তাই? পরিবারের প্রধান জনাব ইউসুফ হারুণকে দেশান্তরী হয়ে নির্বাসিনে থাকতে হয়েছিল অনেকদিন। জনাব ভুট্টো পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে তিনি CIA-এর দালাল। জেনারেল আইয়ূব খান অবশ্য নিজেও ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন আমেরিকার পরোক্ষ সহযোগিতা নিয়ে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে যুদ্ধ জোটের প্রধান শরিক আমেরিকার পাকিস্তানের প্রতি আচরণ আইয়ূব খানের মনঃপুত হয়নি। তার এই অসন্তোষ লিখিতভাবে আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়ে একই সাথে তৎকালীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জানি দুশমন কম্যুনিষ্ট গণচীনের সাথে দ্রুত সম্পর্ক উন্নয়নে যত্নবান হয়েছিলেন জেনারেল আইয়ূব। প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের এই উদ্যোগ আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তার এই 'বেয়াদবীর' সমুচিত সাজা দেবার জন্য আমেরিকা আইয়ূব বিরোধী চক্রান্তে মেতে উঠে। তাদের এই প্রচেষ্টায় যোগ দেয় আমেরিকার পুরনো এবং বিশ্বস্ত-আস্থাভাজন আলফা ইন্সুরেন্সের বেতনভূক নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং বিদগ্ধ হারুণ পরিবার। আর ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ঘোষিত ৬ দফা হচ্ছে তারই ফসল। ৬ দফা অতি উগ্র কর্মসূচী হলেও শেখ মুজিব ৬ দফাকে কখনোই পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির বিপরীতে দাঁড় করাননি। যে মুহূর্তে আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় পকিস্তানের জাতীয় সংহতি বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে সে মুহূর্তেই শেখ মুজিব সংহতির পক্ষে দাড়িয়েছেন। ৬ দফাকে মূলতঃ সাধারণ নির্বাচনের বৈতরণী হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন জনাব শেখ মুজিব। কারণ, আইয়ূব খানকে শায়েস্তা করার জন্যই ৬ দফার পেছনে আমেরিকান সমর্থন ছিল কিন্তু ৬ দফার দ্বারা পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার ইচেছ ছিল না আমেরিকার। এই ব্যাপারে শেখ মুজিবকে পরিষ্কারভাবে সর্তক করে দিয়েছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জনাব জে. ফারল্যান্ড। জনাব ফারল্যান্ড মার্চ মাসের উত্তাল অবস্থায় ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সাথে দুইবার গোপনে এবং একান্তভাবে সাক্ষাত করেন বুড়িগঙ্গায় নৌ বিহারের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে জনাব জি ডাবলিউ চৌধুরি তার 'লাষ্ট ডেইজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তানে' লিখেছেন, "মার্কিন রাষ্ট্রদূত জনাব জে ফারল্যান্ড মার্চ মাসে ঢাকায় এসে মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে পরিষ্কারভাবে বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান সংকটকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আভ্যন্তরীন সংকট বলেই মনে করে এবং এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে শেখ মুজিব কোন সাহায্যই আশা করতে পারেন না যা পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে। এতসমস্ত পরিষ্কার

জানার পরও শেখ মুজিব কোন সাহসে ২১শে মার্চ সবরকম বোঝাপড়ার উপর পানি ঢেলে দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে চতুরতার সাথে বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে কনফেডারেশনের আচ্ছাদনে পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার প্রস্তাব রেখেছিলেন? এই সাহসের মূল উৎস ও সমর্থন সম্পর্কে তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জনাব জে. ফারল্যান্ড পরবর্তিকালে লন্ডনে জনাব জি ডাব্লিউ চৌধুরিকে বলেছিলেন, "আমি যখন ঢাকায় একাত্তরের মার্চ মাসে শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমে তাকে যুক্তরাষ্ট্র কোন প্রকার সাহায্য করবেনা তখন মুজিব বেশ কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রতি সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের সমর্থন ও পূর্ণ সহযোগিতা ছিল সুনিশ্চিত। '৭০ এর নির্বাচনের পর মস্কোপন্থী পার্টিগুলো মস্কোর ইঙ্গিতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে সার্বিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে থাকে। তাদের মাধ্যমেই শেখ মুজিব মস্কোর সমর্থন পেয়েছিলেন। ভারতের সমর্থন আদায়ের যোগসূত্র ছিল জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ।" (পাকিস্তান সরকারের অপ্রকাশিত নথিপত্র)

'৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৫৭ সালে মাওলানা ভাসানীর 'আসসালামু আলাইকুম' ঘোষণা, '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, সিরাজ সিকদারের জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী ঘোষণা, কাজী জাফরের স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলার কর্মসূচী, '৭০ সালের মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা, '৭০ সালে পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী ঘোষণা, '৭১ এর নববর্ষে মুজাহিদ সংঘের স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা প্রকাশ, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের বিপ্লবী সরকার কায়েমের আহ্বান, বিভিন্ন বামপন্থী দল ও গ্রুপের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত গেরিলা যুদ্ধের সূচনা প্রভৃতি ঘটনার কথা বাদ দিলেও নিঃসংশয়ে বলা যায়- '৭১ এর ১লা মার্চ থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার মর্মবাণী ছিলঃ- কোন সমঝোতা নয়, আপোষ নয়, চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। আপোষহীন এই গণচেতনার প্রচন্ড চাপের মুখে যে কোন আপোষ ফর্মূলা বাস্তবায়িত করা শেখ মুজিবের পক্ষে হয়ে উঠেছিল প্রায় অসম্ভব। এ বিষয়ে তৎকালীন ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজের নিম্মে প্রদত্ত বক্তব্যটি প্রানিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "এটা সঠিক যে আওয়ামী লীগের বিরাট অংশ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ৬ দফার সঙ্গে আপোষ করে পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় ক্ষমতায় যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এক পর্যায়ে আমাদের অজ্ঞাতে শেখ মুজিবকেও তাদের প্রস্তাব মানতে বাধ্য করে। গোলটেবিলের আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ এবং পিপলস পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত গোপন থাকলেও যেদিন আমরা এই সিদ্ধান্ত জেনে ফেলি সেই দিনই রাত ১০টায় আমরা কয়েকজন ধানমন্ডির এক বাসায় বৈঠক করি এবং দীর্ঘ

আলোচনার পর রাত ১টার দিকে আমরা কোরআন স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করি এবং রাত দেড়টায় শেখ মুজিবের বাসভবনে যাই ও তার সাথে সাক্ষাৎ করে সরাসরি একথাই বলি, "আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ না করলে আপনার সাথে আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটবে।" শাহজাহান সিরাজ তখন ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। ('একাত্তরের গণহত্যা আসল নায়ক কে?' লেখকঃ আব্দুর রহিম আজাদ)

উল্লেখিত জনাব শাহজাহান সিরাজের বক্তব্য থেকে তখনকার সময়ে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উপর স্বাধীনতার দাবির চাপের প্রচন্ডতা ও গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। সার্বিক অবস্থা তখন সম্পূর্ণরূপে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই বাস্তবতা শেখ মুজিব ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। তাদের এই নাজুক ও অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে অতি চতুরতার সাথে সমর্থন ও সার্বিক সহযোগিতার মোক্ষম টোপটি ফেলেছিল ভারত ও রাশিয়া। তাদের দেশীয় দালালরা মুমুর্ষ রোগীর মত শেখ মুজিবকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচতে হলে এই টোপ গলধঃকরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বরাবরই স্ববিরোধী ও দোদুল্যমান সুবিধাবাদী চরিত্রের অধিকারী শেখ মুজিব স্বীয় ও দলীয় স্বার্থের খাতিরে ২১শে মার্চ বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তবু ও ২২শে মার্চ ত্রি-পাক্ষিয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের বিবরণ দিতে গিয়ে পরে জনাব ভুট্টো বলেন, "বৈঠকে শেখ মুজিব সরাসরি আমাকে প্রস্তাব দেন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব নেবেন তিনি। তার মতে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট এড়াবার জন্য অন্য কোন বিকল্প পথ খোলা নেই।" জনাব ভূট্টো আরো বলেন, "শেখ মুজিবের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রেসিডেন্টকে পরিষ্কার জানিয়ে দেই এ প্রস্তাব আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ এ প্রস্তাব পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার চক্রান্ত।"

২৩শে মার্চ। এ দিনটি পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। এটা শুধু প্রজাতন্ত্র দিবসই নয়, এ দিনেই পাকিস্তানের স্থপতি জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন ভারতের মুসলমানেরা তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এ ঘোষণার দিনটি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই মহাসমোরহে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ ছিল ব্যাতিক্রম। ক্যান্টনমেন্ট, রাষ্ট্রপতি ভবন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি অফিস-আদালত এবং অন্যান্য সরকারি ভবনগুলোতে মুজিবের নির্দেশে পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে উড়িয়ে দেয়া হয় বাংলাদেশের পতাকা। মুজিব তার বাসভবনে বাঙ্গালী ছাত্র জনতার

জঙ্গী মিছিল থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেন। ঘটনাপ্রবাহ থেকে মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ যেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাছাড়া শেখ মুজিবের ঐ দিনের বিজ্ঞপ্তি এবং বক্তৃতাগুলিও ছিল নেহায়েত উস্কানিমূলক। এতে করে জান্তার ভিতরের মুজিব বিরোধী চক্রের সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরো দৃঢ়তা লাভ করে। এভাবে ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের ইতিহাসে এক আশংকাজনক অবস্থার সৃষ্টি করে। একই দিনে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টের ঘোষণাপত্রের পরিপন্থী তার প্রণীত শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষজ্ঞদের কাছে পেশ করেন। শেখ মুজিব তার খসড়ায় পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কনফেডারেশনের প্রস্তাব দেন। এভাবেই প্রেসিডেন্টের কাছে তথা সমগ্র জাতির কাছে তার দেওয়া কথার বরখেলাপ করে তিনি পাকিস্তানকে অখন্ড রাখার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেন। প্রেসিডেন্ট মুজিবের প্রতারণায় হতাশ এবং কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়েন। তার এক সহকর্মীর সাথে আলাপকালে তিনি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে উক্তি করেন, "ওরা সৈনিক নয়। তারা চতুর রাজনীতিবিদ। তাদের কথার কোন দাম নেই। স্বার্থের জন্য তারা সবকিছুই করতে পারে।"

এভাবেই সব আলোচনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ ঢাকা ত্যাগ করে ইসলামাবাদ ফিরে আসেন। ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট এবং ভুট্টো ঢাকা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য শেখ মুজিবকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন। শেখ মুজিবকে তিনি বেঈমান বলেও আখ্যায়িত করেন। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, "মুজিবের প্রস্তাব ছিল দেশকে দ্বি-খন্ডিত করার এক সূক্ষ্ম পরিকল্পনা। তার একগুয়েমী, অনমনীয়তা এবং যুক্তিযোগ্য আলোচনায় অনীহা এটাই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিব এবং তার রাজনৈতিক দল জাতির চরম শত্রু। সে পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করতে চায়। তার অভিসন্ধি জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতির প্রতি হুমকিস্বরূপ। তার এ ধরণের পরিকল্পনা ও কার্যকলাপের সমুচিত জবাব দেয়া হবে।"

এ ভাষণের জবাবে জনাব তাজুদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ প্রমাণ করে তিনি ও তার জেনারেলরা কখনো আন্তরিকভাবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান চাননি। আলোচনার মাধ্যমে সামরিক প্রস্তুতির জন্য তারা শুধু সময় নিচ্ছিলেন। আলোচনার সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশি করে সৈন্য ও গোলাবারুদ মজুদ করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে। বাঙ্গালীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনকে গুলির আঘাতে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য চলেছে গভীর ষড়যন্ত্র। এটা নিঃসন্দেহে জাতির সাথে বেঈমানীর এক চরম নিদর্শন। সামরিক শ্বেতসন্ত্রাসের নীলনকশা চুড়ান্ত করার জন্যই প্রেসিডেন্ট আলোচনার বাহানায় ঢাকায় আগমন করেন।"

পাকিস্তানের মত একটি বহুজাতিক দেশের জন্য শুরু থেকেই প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার এলিট শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে একটি কার্যকরী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল এবং পরিকল্পনা নির্ধারনের জন্য যে সহযোগিতা অতি আবশ্যক ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল জাতীয় পরিসরে :-

১। সব জাতীয় এলিট শ্রেণীর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিত্বকারী সরকার কায়েম করা।

২। বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মধ্যে ঐক্যমত্য এবং একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩। সর্বক্ষেত্রে একতা ভিত্তিক সহজলভ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৪। জাতির লক্ষ্য এবং আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার এলিট শ্রেণীর জনগণকে অনুপ্রানিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

৫। যে কোন বিচ্ছিন্নবাদী প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া; বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয় এবং তা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই।

৬। অর্থনৈতিক সুবিধাদি যাতে জনগণ পর্যন্ত পৌছে তা নিশ্চিত করা। আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নের সুফল সমভাবে যাতে সব জাতিগোষ্ঠিই উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জাতীয় এলিট শ্রেণীগুলো কর্তৃক বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির জনগণের মাঝে জাতীয় সম্পদ ও সুবিধাদির সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।

এ ধরণের কৌশল এবং পরিকল্পনা সব সমস্যার সমাধান অবশ্যই ছিল না, কিন্তু এর ফলে আশা করা যেত জাতীয় রাজনৈতিক অবকাঠামোতে বর্জনের পরিবর্তে ঐক্যের মাধ্যমে বহুজাতিক দেশের অখন্ডতা বজিয়ে রাখা।

ধারণা করা চলে, ন্যায্য অধিকার পাবার জন্য বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার জনগোষ্ঠি কিছুকাল হয়তো বা প্রলম্বিত শিল্পায়নের পরিকল্পনা এবং স্তিমিত আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকেও মেনে নিত। যে কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজে দরিদ্র হয়ে থাকাটা সহনীয় হয় তখনই যখন তার পড়শীরা সমাজে অর্জিত ধন-সম্পদের বড়াই করার সুযোগ না পায়। একটি দেশ উন্নত হতে পারে শুধুমাত্র ঐক্যের ভিত্তিতে। বৈষম্য এবং বিভক্তি এক অথবা একাধিক জাতিগত রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠিরই হয় সমূহ ক্ষতি। এ জন্যই বহুজাতিক একটি দেশের এলিট শ্রেণীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা অপরিহার্য হয়ে দাড়ায় শ্রেণী স্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থ দু'টোই বজিয়ে রাখার জন্য। কোন এক বিশেষ পর্যায়ে তারা অবশ্যই নিজ নিজ জাতি স্বার্থে একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারেন। কিন্তু কোনক্রমেই তাদের একে অপরের

সহ্যশক্তি ও বোঝাপড়ার ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। তেমনটি হলে বিচ্ছিন্নবাদের বিপদসংকুল একতরফা রাস্তা অবশ্যই খুলে যাবে।

তথাকথিত ইসলাম ও ইসলামিক রাষ্ট্রের ধ্বজাধারী পাঞ্জাবী-মোহাজের নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রিয় সরকার শুরু থেকেই বাঙ্গালীদের নিঃস্ব, হীনমনা এবং পশ্চাদমূখী জনগোষ্ঠি হিসাবে গন্য করে আসছিলেন। তারা মনে করতেন বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি পশ্চিম পাকিস্তানের উপর একটি বোঝাস্বরূপ। তারা বিশ্বাস করতেন পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে বাঙ্গালীর জাতিগত চেতনা এবং তাদের হিন্দুয়ানী মনোভাব সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

যাই হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে আইয়ূব খানের প্রণীত অর্থনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প উদ্যোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ সমস্ত উদীয়মান শিল্প উদ্যোগীরা সরকারি মদদ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠা পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ যারা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তাদের সাথে হাত মেলান। সমস্ত বাঙ্গালী শিল্পপতিরা ইম্পোর্ট লাইসেন্স এবং বৈদেশিক মুদ্রার কোটা বাড়াবার জন্য ঐ আন্দোলনকে কেন্দ্রের উপর চাপ প্রয়োগকারী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন। শেষ পর্যায়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণীকে একক একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী এলিট শাসক শ্রেণী অসঙ্গতভাবে তাদের বাঙ্গালী দোসরদের হীনমন্য, পশ্চাদমূখী এবং হিন্দু মনোভাবাপন্ন বলে চিহ্নিত করেন। এই ধরণের মনোভাব বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তদপুরি শেখ মুজিবের বিচার দেশের নাজুক ঐক্যের উপর হানে চরম আঘাত। এখানে আবারও উল্লেখ করতে হয় মুজিবের ৬ দফায় কোন নতুন কিছু ছিল না। অতীতে বহুবার এ ধরণের দাবিসমূহ বাঙ্গালী সাংসদগন কেন্দ্রিয় সংসদে উত্থাপন করেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্রের ঘোষণার সময়টি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘোষণাটি করা হয় এমন এক সময় যখন সারা দেশ জুড়ে এক জটিল রাজনৈতিক সমস্যা বিরাজমান। দেশ জুড়ে জনগণ তখন আইয়ূব শাহীর নিষ্পেষন এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

আইয়ূব শাহী আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের কোন প্রচেষ্টাতো করেইনি বরং পাঞ্জাবী-মোহাজের এলিট শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থকে লালন করে তাদের আধিপত্যকে আরো সুসংহত করে তোলে। সামরিক শাসনকালে কেন্দ্রিয় প্রশাসনে বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিত্ব একরকম ছিল না বললেই চলে। যাটের দশকে যখন বাঙ্গালীদের ধৈর্য্যের বাধঁ প্রায়

ভেঙ্গে পড়ছিল ঠিক তখনই পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রুশক্তি ভারতের দালাল হিসাবে আখ্যায়িত করার ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। বাংলাভাষী জনগণ যারা দ্ব্যর্থহীনভাবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন তারা পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠির কাছ থেকে এ ধরণের ব্যবহার কখনোই প্রত্যাশা করেনি। পাকিস্তানের সৃষ্টিতে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সত্যটিই অতি সহজে ভুলে গিয়েছিলেন পশ্চিমা শাসকগণ। যদিও বাহ্যিকভাবে মুজিবের দাবিগুলো ছিল চরম প্রকৃতির। পাকিস্তান তখনও ছিল অতিপ্রিয় প্রতিটি বাঙ্গালীর কাছে। বাঙ্গালী জনগণ শুধু চেয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মত প্রকাশের ন্যায্য অধিকার। তারা চেয়েছিল সাম্য ও সংহতির উপর একটি রাজনৈতিক কাঠামো।

তারা চাইছিল স্বৈরাচারী একনায়কত্বের পরিবর্তে একটি গণতান্ত্রিক সরকার। স্বৈরাচারী একনায়কত্ব তাদের অতীতের হিন্দু আধিপত্য ও অত্যাচার এবং ঔপনিবেশিক শোষণকেই জোরালোভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিল। এ থেকে এটাই পরিষ্কারভাবে বলা চলে, বাঙ্গালীরা সুচিন্তিত কতগুলো লক্ষ্যের বাস্তবায়নের জন্যই মূলতঃ সংগ্রাম করছিল। কোন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করার জন্য নয়। এটা জোর দিয়েই বলা চলে যে, আইয়ূব শাহীর পতনকালে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা মোটেই অবধারিত পরিণতি ছিল না। জাতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বাঙ্গালীদের অংশদারিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে ক্ষমতাধর শাসকচক্র বাঙ্গালী এলিট শ্রেণীকে জনগণের আন্দোলনের প্রতিই ঠেলে দিয়েছিল এবং তাদের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈষম্যকে পূর্ণঃজীবিত করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে বাধ্য করেছিল জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে। এ থেকে পরিশেষে এটাই বলা চলে যে অসম উন্নয়নই বাধ্য করেছিল বাঙ্গালী এলিট শ্রেণীকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিবর্তে বাঙ্গালীত্বকে উস্কে দিতে। বাঙ্গালীত্বের চেতনাই তখন আঠারমত বাঙ্গালী এলিট শ্রেণীকে জনগণের সাথে এক অটুট বন্ধনে বেঁধেছিল। অসম উন্নয়ন, শোষণ, বঞ্চনা, এবং নৃতাত্ত্বিক চেতনা ঐ ধরণের লোভী জোঁক যা একে অপরকে শুষে বেঁচে থাকে সেই সময় অব্দি যখন সশস্ত্র সংঘাত অথবা গণঅভ্যুত্থানের বিকল্প কোন পথই খোলা থাকে না। দুঃখজনক হলেও সত্য পাকিস্তানও ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে পৌঁছে অপরিহার্য এক মহা বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছিল ষাটের দশকের শেষে। অন্তিম অবস্থায় সামরিক জান্তা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বন্দুকের জোরে করার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু হয় ২৫-২৬শে মার্চ ১৯৭১ এর আর্মি ক্র্যাকডাউন। পাকিস্তান সেনা বাহিনী বাঙ্গালীদের আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য বর্বরোচিত সশস্ত্র অভিযান শুরু করে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে। এভাবেই অনিবার্য হয়ে উঠে দেশ বিভক্তি।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রতিরোধ সংগ্রাম রূপ নেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রতিক্রিয়া

- ২৫-২৬শে মার্চ কালোরাত্রির বর্বরোচিত পাশবিক সামরিক অভিযান।
- একটি স্ফুলিঙ্গ লেলিহান শিখার জন্ম দেয়।
- মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম রূপ নেয় সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রামে।
- স্বাধীনতার ঘোষণার ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টায় আষাঢ়ে গল্প।
- নজীরবিহীন শ্বেত সন্ত্রাস সম্পর্কে বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলোতে ছাপিত কয়েকটি লোমহর্ষক প্রতিবেদন।
- পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালীদের উৎকণ্ঠা।
- হাজার মাইল দুরত্বে অবস্থান করলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ উদ্বেলিত করেছিল অনেককেই।
- মুক্তিপাগল হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম। অন্যদিকে অনেকেরই বাঙ্গালীত্বের ভন্ডামীর মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পরেছিল জাতির ক্রান্তিলগ্নে।

এরপর নেমে আসে ২৫-২৬শে মার্চের সেই কালোরাত্রি। পাকিস্তান সেনা বাহিনী নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙ্গালী জাতিকে শায়েস্তা করার জন্য। ২৫শে মার্চের বর্বরতা আধুনিককালের সব নজীরকেই ছাড়িয়ে যায়। হাজার হাজার নারী, পুরুষ, শিশুকে হত্যা করা হয় নির্বিচারে। সামরিক বাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বাঙ্গালী সদস্যগণও রেহাই পাননি শ্বেত সন্ত্রাসের হত্যাযজ্ঞ থেকে। ঢাকা, চিটাগাং এবং খুলনাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই অভিযান চালানো হয়। নিষ্ঠুর অভিযান। প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয় বাঙ্গালী জাতি। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে অনেক অনুরোধ ও আকুতি জানানো হয় শেখ মুজিবকে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য। কিন্তু সব অনুরোধ উপেক্ষা করে জাতিকে মৃত্যু ও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে কাপুরুষের মতই তিনি কারাবরণ করে চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। আত্মরক্ষার জন্য অনন্যোপায় হয়েই শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়। প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দানে অসম্মত শেখ মুজিব বলেছিলেন, "আমি গণতন্ত্রের রাজনীতি সারাজিবন করেছি, অস্ত্রের রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না।"

এ কি পরিহাস! সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যার কথায় বিশ্বাস করে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, তাকে মেনে নিয়েছে একমাত্র নেতা হিসাবে; দীর্ঘ সংগ্রামে চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে নির্দ্বিধায়; সে নেতাই ক্রান্তিলগ্নে জাতিকে পিছে ফেলে রেখে খোঁড়া যুক্তি তুলে বহাল তবিয়তে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমালেন। ক্ষনিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বাঙ্গালী জাতি। মুজিবের সুবিধাবাদী আচরনে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল মুক্তিকামী জনতা। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। আওয়ামী লীগের নেতারাও সব যার যার মত গা ঢাকা দিলেন প্রাণ বাচাঁবার প্রচেষ্টায়। মুজিব গ্রেফতার হওয়ার সাথে তারাও পালিয়ে হাফ্ ছেড়ে বাচঁলেন। এ অবস্থায় জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামের দায়িত্ব নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হয়ছিল। গড়ে উঠে বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম। গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাংলাদেশে। এ অবস্থায় ২৬শে মার্চ রাতে চিটাগাং এ অবস্থিত অষ্টম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের এক অখ্যাত তরুণ মেজর জিয়াউর রহমান তার তরুণ বাঙ্গালী সহকর্মীদের পরামর্শ ও সহচার্যে তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেতার মাধ্যমে জাতির প্রতি আহ্বান জানান স্বাধীনতা সংগ্রামের। তার আহ্বানে আশার আলো দেখতে পেয়েছিল জাতি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তিকালে স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হয় মহান রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম।

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসে মেজর জিয়াউর রহমানের ক্ষীন কণ্ঠ, "Under circumstances however, I hereby declare myself as the Provisional Head of the Swadhin Bangla Liberation

Government." অবশ্য পরবর্তী ঘোষণায় এর সাথে যোগ করা হয়, "Under guidance of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman." স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে সেই সময় চুলচেরা বিশ্লেষন করার ফুসরৎ কারও ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ কালুরঘাট থেকে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে সরকার ও আওয়ামী লীগের তরফ থেকে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি কাহিনী প্রচার করা হয়।

প্রথম গল্পটি ছিল: ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে গ্রেফতারের পূর্বক্ষণে চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরীকে টেলিফোনে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীটি পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু সামরিক অভিযানের প্রাক্কালে সকল প্রকার টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। অতএব ঐ গল্প ধোপে টিকেনি। পরে

দ্বিতীয় গল্পে বলা হয়: ওয়্যারলেসের মাধ্যমে (?) চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থানরত একটি অস্ট্রেলিয় জাহাজের ক্যাপ্টেনকে স্বাধীনতার ঘোষণা জানানো হয়। ঐ ক্যাপ্টেন নাকি জনাব জহুর আহমদকে শেখ মুজিবের সেই ঘোষণা বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন! চট্টগ্রামের কোন লঙ্গর করা জাহাজের সাথে ঢাকায় বসে ওয়্যারলেস সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা কোনভাবেই তখন সম্ভব ছিল না। কারণ ঐ সময় চট্টগ্রাম বন্দরে ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈনিকদের সাথে পাক বাহিনীর লড়াই চলছিল। তাছাড়া ঢাকার ওয়্যারলেস সেন্টারসহ সবগুলো যোগাযোগ কেন্দ্র তখন পুরো মাত্রায় খানসেনাদের অধিনে। সুতরাং এ গল্পও সারহীন প্রমাণিত হয়।

শেষ গল্পে বলা হয়: চট্টগ্রাম ইপিআর-কে জানানো হয়েছিল সারা দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা বা বাণী প্রচারের জন্য। 'স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস' নামক প্রকাশনায় এই কাহিনীটিই নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

কিন্তু একটুখানি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষন করলেই বুঝা যায় এ কাহিনীটিও আষাঢ়ে গল্প মাত্র।

প্রথমত: ঢাকার সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যথা:- টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ঢাকা বেতার, ওয়্যারলেস সমস্তই তখন সম্পূর্ণরূপে পাক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এবার দেখা যাক ঢাকা ইপিআর এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ইপিআর-কে নির্দেশ পাঠানোর প্রশ্নটি। ঢাকা ইপিআর যদি শেখ মুজিবের নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম পৌঁছাতে পারে তাহলে ঢাকা ইপিআর-কেইতো বলা যেত ঢাকা থেকেই সারা বাংলাদেশে ঐ ঘোষণা প্রচার করার জন্য। তাছাড়া সবারই জানা ছিল ঢাকা ইপিআর-এর হেডকোয়টার্স এবং পিলখানা সিগন্যাল সেন্টার ২৩শে মার্চেই আর্মি দখল করে নিয়েছিল। তারপরও কথা থাকে। চট্টগ্রামের ইপিআর-এর দায়িত্বে ছিলেন তখন বাঙ্গালী তরুণ অফিসার ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম। যে সমস্ত বাঙ্গালী

অফিসারদের সাথে একত্র হয়ে মেজর জিয়াউর রহমান ২৬শে মার্চ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রফিক ছিলেন অন্যতম। পরবর্তী পর্যায়ে ১নং সেক্টরে তিনি যুদ্ধ করেন। স্বাধীনতার পর তাকে হঠাৎ করে সেনা বাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের উপর ক্যাপ্টেন রফিক একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী ঢাকা থেকে পাবার ব্যাপারে কিছু লেখেননি। কেন? সর্বোপরি স্বাধীনতার ঘোষণা সত্যিই যদি ঢাকা থেকে পাঠানো হয়ে থাকত সেই ক্ষেত্রে মেজর জিয়া তার প্রথম ভাষণে নিজেকে অস্থায়ী সরকার প্রধান হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন কোন যুক্তিতে? তারপরও প্রশ্ন থাকে। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন আরেক নেতা আবদুল হান্নান যিনি ৩০ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে একাধিকবার বক্তব্য প্রচার করেছেন, তিনিই বা কেন তার প্রচারণায় একবারও উল্লেখ করলেন না স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী ঢাকা থেকে পাবার কথা? অতএব, ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াই যে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এই ধ্রুব সত্যকে শত চেষ্টা করেও কোন যুক্তি দিয়েই খন্ডানো সম্ভব নয়।

২৫শে মার্চের কালোরাত্রির শ্বেত সন্ত্রাস এবং নৃশংস হত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনী ও চাক্ষুস বিবরণ আজঅব্দি অনেক ছাপা হয়েছে। ভুট্টোর আমলের সেনা প্রধান '১৯৭১ সালের জল্লাদ' জেনারেল টিক্কা খান প্রখ্যাত মিশরীয় সাংবাদিক জনাব হাইকেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তার আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমি যখন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানে যাই তখন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি ছিল অতি দুর্বল। সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে অপারগ ছিল। তাদের সাথে জনগণ কোনরূপই সহাযোগিতা করছিল না। গোয়েন্দা বিভাগসমূহের বাঙ্গালী কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিকায়ও যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করি। এর আগে এমন পরিস্থিতি কখনও হয়নি। সেনা বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরাই ছিল আমাদের খবরা-খবরের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র। বেঈমান মুজিবের কারসাজিতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা সেনা বাহিনীকে রীতিমত বয়কট করেছে।" জনাব হাইকেলের মতে জেনারেল টিক্কা বুঝতে পারেননি তিনি একটি জাতীয় বিপ্লবের মোকাবেলা করছিলেন। তিনি জানতেন না এ বিপ্লবের শিকড় প্রথিত ছিল তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনায়। বাঙ্গালীর স্বাধীকারের দাবির পেছনে যুক্তিও ছিল প্রচুর। এরপর ঢাকা আলোচনা কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল সে কথা বলতে গিয়ে জেনারেল টিক্কা খান জনাব হাইকেলকে বলেন, "ঢাকা আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রপতি আমাকে আদেশ দেন, ২৫শে মার্চ রাতে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বাঙ্গালী বিদ্রোহ দমন করে পূর্ব পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য।" জনাব হাইকেল এর বর্ণনায়,

"২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রি প্রায় ১১টা ৩০ মিনিটে পাক বাহিনী ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুলির আওয়াজে ভীত-সন্ত্রস্ত বাঙ্গালীরা জেগে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, পুলিশের হেডকোয়ার্টার্স মতিঝিল এবং ইপিআর এর সদর দফতর পিলখানায় মূল আঘাত হানা হয়। অবিশ্রান্তভাবে গোলাগুলি চলতে থাকে। মেশিনগান, রকেট, এমনকি ট্যাঙ্ক ফায়ারিং এর আওয়াজও শোনা যায়। সাথে মুমূর্ষ ব্যক্তিদের মরন চিৎকার। রাতের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠে ফ্লেয়ার ফায়ারিং এ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল এবং জগন্নাথ হলকে রেকয়েলেস রাইফেল এবং মর্টার ফায়ারে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়। মারা যায় অসংখ্য ছাত্র। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ হারায় অগনিত লোক।" তার প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাক বাহিনীর আক্রমণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লেখেন, "মাঝরাতের পরপরই পাকিস্তান আর্মির সাঁজোয়া বাহিনীর একটি কলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ক্ষিপ্ত গতিতে ছুটে যায়। সেনা বাহিনী বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী দখল করে সেটাকে ফায়ার বেস করে ছাত্রাবাসগুলির উপর আক্রমণ চালায়। ঘুমন্ত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ইকবাল হলের দুইশতেরও বেশি ছাত্র প্রাণ হারায়। বিদ্রোহী ছাত্রদের একটি কেন্দ্র ছিল ইকবাল হল। দু'দিন যাবত অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে ছিল মাঠে, পথে, হলগুলির চত্বরে এবং কক্ষগুলিতে। দু'দিন পরই সৈনিকরা হলগুলির প্রাঙ্গনে গর্ত খুড়ে মৃতদেহগুলিকে মাটি চাপা দেয়। গণ কবরগুলি খুড়তে বড় বড় বুলডোজার ব্যবহার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় বস্তিগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।"

জনাব হেনড্রিক ভানডার হেইজডেন, আন্তর্জাতিক ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা সে সময় ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দি নিউইয়র্ক টাইমস-এ এক প্রতিবেদন ছাপান। সেটা ১৪ই জুলাই লন্ডনের দি টাইমস এ প্রকাশিত হয়। তার উপর ভিত্তি করে একই দিনে দি টাইমস-এ একটি সম্পাদকীয়ও ছাপা হয়। পাক বাহিনীর পাশবিক আচরনের বিবরণ তাতে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়। সেই প্রতিবেদন পড়ে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে যান। বিশ্ব পরিসরে বাঙ্গালীদের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে জনাব হেনড্রিকের প্রতিবেদন ও দি টাইমস এর সম্পাদকীয় বিশেষ অবদান রাখে। ২৭শে মার্চ সকাল ৯টার সময় কারফিউ উঠিয়ে নেয়া হয় দুপুর পর্যন্ত। হাজার হাজার ভীত-সন্ত্রস্ত নর-নারী প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে যাত্রা করে। পথে পাক বাহিনীর সৈন্যরা তাদের উপরও গুলিবর্ষন করে। অনেক নিরীহ ব্যক্তি এতে প্রাণ হারায়। উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকেও পলায়মান নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলি চালানো হয়। এভাবে জনগণের মনে ভীতি সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা চালানো হয়। সেনা ছাউনিতে আচমকা আক্রমণের ফলে শত শত নিরস্ত্র পুলিশ এবং ইপিআরের সৈনিকরা প্রাণ হারান। যারা বেঁচে যান তারা অস্ত্রাগার লুট করে শহরের জায়গায় জায়গায় সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু বিপুল আক্রমণের মুখে তাদের অসংগঠিত প্রতিরোধ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে

পড়ে। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ছড়িয়ে পরেন গ্রামে-গঞ্জে। পাক বাহিনী নৃশংস হিংস্রতায় তাদের ধাওয়া করতে থাকে।

সেনা বাহিনীর জেনারেল ফজলে মুকিম খান পাকিস্তান সেনা বাহিনীর ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতের নিষ্ঠুর আগ্রাসনের তারিফ করে বলেন, "প্রয়োজনের খাতিরে পাকিস্তান সেনা বাহিনীকে বিদ্রোহ দমন করার জন্য মর্টার, রেকয়েলেস রাইফেল, মেশিনগান, এমনকি ট্যাঙ্কও ব্যবহার করতে হয়েছিল। সে রাতে মারণাস্ত্রসমূহের শব্দ থেকে মনে হচ্ছিল সমস্ত ঢাকা শহরই একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।"

ঢাকায় অবস্থানরত সব বিদেশী সাংবাদিকদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সেনা নিবাসে। সেখান থেকে তাদের সোজা এয়ারপোর্ট নিয়ে গিয়ে বিশেষ প্লেনে তুলে দিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। সে রাতে বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে সেনা বহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। সেনা বাহিনীর হাত থেকে মাত্র তিনজন বিদেশী সাংবাদিক রেহাই পান। এরা গোপনে ঢাকায় লুকিয়ে থেকে সেনা বাহিনীর চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা ছিলেন জনাব আরণল্ড জেইথলিন, জনাব মিসেল লরেন্ট এবং সাইমন ড্রিংগ। তাদের মাধ্যমেই পরে বিশ্ববাসী ২৫-২৬শে মার্চ রাত্রের ঘটনাবলী এবং সেনা বাহিনীর নৃশংস হত্যাকান্ড সম্পর্কে জানতে পারে। জনাব সাইমন ড্রিংগ ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ এক বিবরণীতে লেখেন, "পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য ঢাকাকে চরম খেসারত দিতে হয়েছিল।"

মার্চের ৩০ তারিখে আমরা বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, রেডিও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ষ্টেশনগুলো থেকে প্রচারিত নিবন্ধ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ২৫-২৬শে মার্চ রাতের ঘটা ঘটনা ও পরবর্তী দিনগুলোর ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি। বাংলাদেশে ফেলে আসা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনদের অবস্থা ভেবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে মন। পাকিস্তান সরকার ও সেনা বাহিনীর ন্যাক্কারজনক আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। সেই সেনা বাহিনীতেই চাকুরী করছি বলে নিজের প্রতি আত্মধিক্কার জাগে মনে। ভাবি, এ অবস্থায় প্রবাসে বসে আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? বাঙ্গালীদের ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের কি কোন দায়িত্বই নেই? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখার জন্য আকুল হয়ে উঠে মন। অস্বস্তিকর পরিবেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সময় কাটতে থাকে আমাদের।

ইতিমধ্যে আমাদের কোর্সও প্রায় শেষ হচ্ছে। কোর্সে আগত বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে ক্যাপ্টেন তাহের, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নূর চৌধুরী এবং লেফটেন্যান্ট মতির

সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। চিন্তা-ভাবনার মিলই ছিল আমাদের এই ঘনিষ্ঠতার প্রধান কারণ। আমি লোকাল অফিসার। এরা প্রায়ই আমার মেসে আসত। দল বেধে আনন্দ-ফূর্তি করে আমরা অবসর কাটাতাম। একসাথে খাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা দেখা, ক্লাবে আড্ডা মারা ছিল আমাদের বিনোদনের উপায়। লেফটেন্যান্ট সুমিও প্রায়ই আমাদের সাথে যোগ দিত। আমরা একত্রিত হয়ে আনন্দ-ফূর্তি করতাম ঠিকই কিন্তু তার ফাঁকে আলোচনা চলত বাংলাদেশ নিয়ে। সবারই একই চিন্তা। আমাদের কিছু একটা করা উচিত। মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করে নির্বিকার হয়ে বসে থাকলে চলবে না। জাতীয় সংগ্রামে আমাদের সাধ্যমত অবদান রাখতে হবে। কিন্তু কি করা সম্ভব! ইতিমধ্যে জানতে পারলাম আমাদের ১৬ ডিভিশনকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হবে। অত্যন্ত সুখবর! ডিভিশন গেলে আমিও ইউনিটের সাথে পূর্ব পকিস্তানে যেতে পারব। খবরটা পেয়ে তাহের, নূর, মতি এবং সুমি সবাই খুশি। কোর্স শেষ হল। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ আদেশ জারি করলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত কোন অফিসারকে তাদের ইউনিটে ফেরত পাঠানো হবে না। তাদের সবাইকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ইউনিটে পোষ্টিং দেয়া হবে। এ কি ব্যাপার! এমনটি তো হবার কথা নয়। আমরা সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পরলাম। কোর্স শেষে ইউনিটে ফিরে যাওয়াইতো নিয়ম তাহলে এ ধরণের আদেশের উদ্দেশ্য কি? তাহের, নূর, মতি সবার ইউনিটই পূর্ব পাকিস্তানে। তারা সবাই আটকা পড়ে গেল। আর আমি ফিরে এলাম ইউনিটে। কিন্তু ইউনিটে যোগদান করেই বুঝতে পারলাম অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবেশও অনেক বদলে গেছে। ইতিমধ্যে দেশে ইমারজেন্সী ঘোষিত হল। একদিন আমার কমান্ডিং অফিসার কর্নেল মিয়া হাফিজ আমাকে তলব করে পাঠালেন। তার অফিসে যাওয়ার পর তিনি কিছুটা বিব্রতভাবেই বললেন, "শরীফ ব্যাটারি কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমি তোমাকে এ্যাডজুটেন্ট পদে বহাল করতে চাই। দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমার ষ্টাফ অফিসার হিসাবে তোমাকেই আমি মনোনীত করেছি।"

তার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার সাথে কর্নেল হাফিজের সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। ব্যাচেলার হ্যাপিগোলাকি টাইপ কমান্ডো কর্নেল হাফিজ আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। আমি তাই সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্যার আমি ইউনিটে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে একজন। সে ক্ষেত্রে আমাকে ব্যাটারি কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিয়ে জুনিয়র পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? বেচারা কর্নেল হাফিজ মুখ কাচুমাচু করে বললেন, "দেখ, জিএইচকিউ থেকে অর্ডার এসেছে কোন বাঙ্গালী অফিসারকে দায়িত্বপূর্ণ কোন পদে রাখা যাবে না। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় সব বাঙ্গালীদের উপর নজর রাখার নির্দেশও জারি করা হয়েছে। তোমার শুভাকাঙ্খী হিসাবে এই গোপনীয় নির্দেশের কথা তোমাকে বিশ্বাস করে বললাম। আমার অনুরোধ

সব বুঝে তুমি চোখ-কান খোলা রেখে সতর্কতার সাথে চলবে। তোমার কোন কিছু হলে ব্যক্তিগতভাবে আমি কষ্ট পাব। বোঝার চেষ্টা কর, নেহায়েত অপারগ হয়েই আমি এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।

তার সিদ্ধান্তে কষ্ট পেলেও তার আন্তরিক স্বীকারোক্তি শুনে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। তার সতর্কবাণী সবাইকে জানাবার জন্য ছুটে গেলাম ক্যাপ্টেন তাহেরের মেসে। সেখানে ডেকে পাঠালাম নূর এবং মতিকে। সব শুনে সবাই ঠিক করলাম আমাদের সবকিছুই করতে হবে অতি সাবধানে। পশ্চিমারা আমাদের সব বাঙ্গালীকেই অবিশ্বাসের চোখে দেখছে। তাই এতটুকু অসতর্ক হলে আর রক্ষা নাই। মহাবিপদে পড়তে হতে পারে। সিদ্ধান্ত নিলাম স্বাভাবিকতা বজিয়ে চলতে হবে আমাদেরকে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপনে মিলিত হব আমরা। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বস্ত লোক ছাড়া অন্য কারো সাথে আলোচনা করা ঠিক হবে না। কর্নেল মিয়া হাফিজের সাথে আলাপের পর ঠিক বুঝতে পারলাম ইউনিটের সাথে আমার আর বাংলাদেশে যাওয়া হবে না। ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে চলল অতি দ্রুতগতিতে। হঠাৎ করে ডিভিশন হেডকোয়ার্টার্সের জিওয়ান বাঙ্গালী অফিসার কর্নেল দস্তগীরকে বদলি করে দেয়া হল জিওয়ান মুজাহিদ কোর হেডকোয়টার্স লাহোর। তার এ বদলিতে আশ্চর্য হয়ে গেল কোয়েটাতে অবস্থিত সব বাঙ্গালী। আমাদের কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু অন্যান্য বাঙ্গালীরা অবাক হয়ে গেল তার এ অস্বাভাবিক পোস্টিং এ। ডিভিশনের বাঙ্গালীরা যারা বাংলাদেশে যাবার আশায় উম্মুখ হয়ে ছিলেন তাদের গুড়ে পড়ল বালি। আমি ও নূর একদিন গেলাম কর্নেল দস্তগীরের বাসায়। তার পরিবার তখন বাংলাদেশে। তাকে বললাম,

–স্যার এরপরও কি আমাদের চুপচাপ বসে থাকা যুক্তিসঙ্গত?

–কি করতে চাও? পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি। আমি বললাম,

–দেশের সংগ্রামে অবদান রাখার চেষ্টা করতে হবে যেভাবেই হোক।

–পাগল হয়েছ? দেড় হাজার মাইল দূরে বসে কি করতে পার তোমরা?

–পালিয়ে গিয়ে যোগদান করতে পারি স্বাধীনতা সংগ্রামে। নয়ত বেলেলির এ্যামুনিশন ডিপো উড়িয়ে দিতে পারি। এতে করে সমস্ত সামরিক বাহিনীর সেকেন্ড লাইন এ্যামুনিশন ধ্বংস হয়ে যাবে। অপূরনীয় ক্ষতি হবে সামরিক জান্তার। যুদ্ধ করার ক্ষমতাও কমে যাবে অনেকাংশে।

–পাগল নাকি? কি সব অদ্ভুত কথা ভাবছ? ইমোশনাল হয়ে এ ধরণের পদক্ষেপ নিলে তোমরা তোমাদের জন্যই শুধু বিপদ ডেকে আনবে না, বিপদ ডেকে আনবে পশ্চিম

পাকিস্তানের সব বাঙ্গালীর জন্য। আবাস্তব চিন্তাধারা। তিনি আমাদের স্মরন করিয়ে দিলেন,

-পাসিং আউট করার দিন শপথ নিয়েছিলে, "To remain loal to the constitution. So be faithful and Prove your integrity." পরিশেষে তিনি বললেন, তার উপর কড়া নজর আছে; তাই সার্বিক মঙ্গলের জন্য এভাবে যখন তখন তার সাথে যেন দেখা না করি। কি আশ্চর্য্য! এই দস্তগীর সাহেবকে জানতাম ভীষণভাবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক হিসাবে। তাকে শ্রদ্ধাও করতাম সে কারণে। কিন্তু একি! আজ তার মুখ থেকে একি শুনছি! মুহুর্তে মনটা বিষিয়ে উঠল, নূরকে বললাম,

-চলো যাওয়া যাক। বেরিয়ে আসছিলাম। তিনি বললেন,

-Don't be so sentimental. Even if Bangladesh becomes a reality. Preserve yourself, Bangladesh can't go without you and me. তার সুবিধাবাদী উক্তি শুনে গাটা ঘিন্ ঘিন করে উঠল। এ সংসারে সত্যিই মানুষ চেনা দায়! বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে আমি ও নূর ফিরে এলাম। এরপর যেদিন তিনি লাহোরের পথে যাত্রা করছিলেন সেদিনও তাকে আকুল মিনতি জানিয়েছিলাম, "স্যার এখনও সময় আছে। আপনার মত বিচক্ষণ সিনিয়র অফিসারের প্রয়োজন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। আপনি রাজি থাকলে আমরা বুকের রক্ত বাজি রেখে আপনাকে সাথে করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।" তিনি রাজি হলেন না। রওনা হয়ে গেলেন লাহোরের পথে। ফিরে এলাম হতাশ হয়ে।

দুঃসাহসিক পলায়ন এবং দিল্লীর অভিজ্ঞতা

- দুঃসাহসিক পলায়ন।
- হোটেল নটরাজে দু'দিন দু'রাত।
- Ministry Of External Affairs-এ পরিকল্পনা অনুযায়ী আত্মসমর্পণ।
- ভারতীয় সরকারের সিদ্ধান্তে আমরা জেনারেল ওবান সিং এর হাতে।
- ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ হলেন আমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী।
- শ্রী একে রায়ের মাধ্যমে পরিচয় হল তরুণ বাঙ্গালী কূটনীতিক জনাব শাহাবুদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেনের সাথে।
- ইন্টারোগেশনের পালা শেষ, বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি দলের আগমন প্রতিক্ষায়।
- হাতে কোন কাজ নেই ঠিক হল বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো ঘুরে দেখানো হবে।
- দিল্লী আগত প্রতিনিধি দল প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ এবং মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর কাছে আমাদের সোপর্দ করা হল।
- প্রবাসী সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে ব্রিফিং এর জন্য থাকতে হয় দিল্লীতে।
- ব্রিফিং শুরু হল, পরিচিত হলাম মেজর সুরজ সিং এর সাথে পালাম বিমান বন্দর সংলগ্ন সেনা নিবাসের ট্রেনিং ক্যাম্পে।
- ব্রিফিং, ট্রেনিং এবং ভারতীয় নীল নকশা।
- সবশেষে মুজিবনগর সরকারে যোগদানের জন্য কোলকাতার পথে।
- পথে শংকিত মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তা।

এবার একাই সিদ্ধান্ত নিলাম বেলেলি ডিপো উড়িয়ে দেবার। কমান্ডো ট্রেনিং ছিল আমার। Sympathetic Detonation এর মাধ্যমে Explosive দিয়ে Sabotage করে উড়িয়ে দেব ডিপো। তখন আমার বিশেষ এক বন্ধু ছিল ডিপোর চার্জে। তার ওখানে যাওয়া-আসার মাধ্যমে সব প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম অতি গোপনে। পাঠান বন্ধুটি বাঙ্গালীদের প্রতি ছিল বেশ সহানুভূতিশীল। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটা Trace তৈরি করে ফেললাম। Trace টা নিয়ে একদিন গেলাম ইঞ্জিনিয়ার্স এর মেজর কাদেরের বাসায়। উদ্দেশ্য তাকে দিয়ে পরখ করিয়ে নেব আমার Trace টা ঠিক হয়েছে কিনা। তাকে গিয়ে সব কথা খুলে বলে তার সাহায্য প্রার্থনা করলাম। আমার প্ল্যান শুনে তিনি ভীষণভাবে আতঁকে উঠলেন। বললেন, "কি সাংঘাতিক! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ডালিম? তুমি কি বুঝতে পারছ না কি করতে যাচ্ছ তুমি? তোমার প্ল্যান কার্যকরী করলে প্রায় কোয়েটা শহরটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাতে আমরাও ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। তাছাড়া তোমার এ কাজ অত্যন্ত ঝুকিঁপূর্ণ। আমি এ ব্যাপারে তোমাকে Encourage করতে পারি না। আমার অনুরোধ তুমি আমাকে ভুল বুঝ না।" এখানেও হতাশা। ফিরে আসার আগে তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমার প্ল্যান সম্পর্কে তিনি যেন অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির সাথে আলাপ না করেন। তিনি রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিদানে আমাকেও কথা দিতে হয়েছিল আমি এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকব। আমি কিন্তু আমার প্ল্যান কার্যকরী করার চেষ্টা করে চলেছিলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ করেই আমার বন্ধু একদিন বদলি হয়ে পিন্ডি চলে গেল। আমার মাথায় বাজ পড়ল। তার অবর্তমানে ডিপোতে আসা-যাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে আমার পরিকল্পনাও বাদ দিতে হল। দুঃখ পেয়েছিলাম অনেক। কিন্তু অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিতে হল। নতুন করে আবার ভাবতে শুরু করলাম কি করা যায়? ঠিক করলাম পালিয়ে গিয়ে যোগ দিব স্বাধীনতা সংগ্রামে। এমন অবস্থায় একদিন নূর এল আমার মেসে। লনে বসে আলাপ করছিলাম দু'জনে। হঠাৎ করেই নূর বলল,

–স্যার ক্যাপ্টেন তাহের আপনাকে ডেকেছেন। জরুরী আলাপ আছে। বললাম,

–ঠিক আছে। আজ রাতে আমরা একসাথে তার মেসে ডিনার করব। নূর চলে গেল। কি এমন জরুরী আলাপের জন্য ক্যাপ্টেন তাহের ডেকে পাঠিয়েছেন ভেবে কোন কুল কিনারাই পেলাম না। সন্ধ্যার পর গিয়ে হাজির হলাম তার মেসে। নূর ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ডিনারের আগে তার রুমে বসে গান শুনছিলাম। গানের আওয়াজের আড়ালে নিচু গলায় আমরা আলাপ শুরু করলাম। কোন ভণিতা ছাড়াই ক্যাপ্টেন তাহের বলল,

–ডালিম, আমি ও নূর পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি চমন বর্ডার দিয়ে আফগানিস্তানে। সেখান থেকে বাংলাদেশ। আকবর বখ্‌তির ছেলেদের সাথে তোমার

বন্ধুত্ব আছে তাছাড়া তুমি স্থানীয় অফিসার। এ ব্যাপারে আমরা তোমার সাহায্য চাই। স্বল্পভাষী ক্যাপ্টেন তাহেরের অনুরোধের জবাবে বললাম,

—স্যার আমিও পালাবার চেষ্টা করছি। ক্যাপ্টেন তাহের আমার জবাব শুনে খুব খুশি হলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

—তাহলে তুমি সময় নষ্ট না করে যেভাবেই হোক বর্ডারটা একবার রেকি (Recce) করে আস। আমি সম্মতি জানিয়ে ফিরে এলাম মেসে। আমরা তিনজনে কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমাদের এ পরিকল্পনা সম্পর্কে কাউকেই কিছু বলা চলবে না। সুযোগমত একদিন Regimental Exercise Area Recce করার উছিলায় ইউনিটের গাড়ি নিয়ে প্রফুল্লচিত্তে Recce করে ফিরে এলাম। বন্ধুরা আমাদের পালাতে সাহায্য করবে জানতে পেরে নূর ও তাহের দু'জনেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল। এভাবে সব যখন প্রায় ঠিকঠাক হঠাৎ করে একদিন সিগন্যাল কোরের হাবিলদার নাজির রাতের অন্ধকারে আমার সাথে দেখা করতে এল। লোকাল বাঙ্গালী অফিসার হিসাবে সবার সাথেই আমার যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে জুনিয়রদের মধ্যে আমার একটা বিশেষ প্রভাব ছিল। নাজিরের মত সিনিয়র, জুনিয়র অনেকেই তাদের সমস্যাদি নিয়ে আমার কাছে আসতো সুখ-দুঃখের কথা কইতে এবং আমার পরামর্শ নিতে। ভাবলাম, নাজিরও নিশ্চয়ই তেমন কোন ব্যাপারেই আলাপ করতে এসেছে। কিন্তু তাকে দেখেই আতঁকে উঠলাম। তার মুখ ভীষণভাবে থমথম করছিল। চোখ দু'টোও টলটল করছিল। তাকে দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম ভীষণ কিছু ঘটেছে। আমি তাকে নিয়ে সোজা আমার ঘরে চলে গেলাম। "কি হয়েছে নাজির? এত গম্ভীর কেন?" জবাবে নাজির অতি নিচুস্বরে বলল, "স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ডিভ-কমান্ডার GHQ-তে Cypher Message এর মাধ্যমে জানিয়েছেন ২৯ EME Batalion এর ৩জন Junior Commission Officer (JCO) এবং ২জন Non-Commission Officer(NCO) চমন হয়ে আফগানিস্তানে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে।" খবর শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। নাজিরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিয়ে ছুটে গেলাম ক্যাপ্টেন তাহেরের মেসে। ডেকে পাঠানো হল লেফটেন্যান্ট নূরকে। গভীর রাত অব্দি আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল চমন বর্ডার দিয়ে পালানোর প্রচেষ্টা হবে অত্যন্ত বিপদজনক। তাই এই পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। অন্য পথ হিসাবে আমাদের সামনে খোলা থাকলো কাশ্মীর, লাহোর, শিয়ালকোট কিংবা ভাওয়ালপুর সেক্টর। ভাওয়ালপুর সেক্টর দিয়ে রাজস্থানের মরুভূমি পাড়ি দিতে সময় লাগবে দুই থেকে তিন দিন। অন্যান্য যে কোন সেক্টর দিয়ে বর্ডার পেরোতে লাগবে ৫ থেকে ৬ দিন। এত সময় পাওয়া যাবে কিভাবে? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ভাওয়ালপুর-ভাওয়ালনগর সেক্টরকেই বেছে নিলাম আমরা। এ সেক্টর দিয়ে পালাতে শুধু সময়ই কম লাগবে তা নয় আমাদের ডিভিশনের

অপারেশনাল এরিয়া ছিল এই সেক্টর। ফলে প্রয়োজনীয় ইনটেলিজেন্স ইনফর্মেশন সংগ্রহ করাও সহজ হবে। পালাবার পরিকল্পনা করার দায়িত্ব যুক্তিগত কারণেই আবার আমাকেই নিতে হল। শুরু হল আবার এক নতুন পরিকল্পনা। এভাবেই সময় বয়ে যাচ্ছিল।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের এক ছুটির দিনে, দুপুরের খাওয়া শেষ করে মেস থেকে ফিরে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম, হঠাৎ করে দরজায় কড়া নড়ে উঠল। কে জিজ্ঞেস করতেই লেফটেন্যান্ট মতির গলা শুনতে পেলাম। ভেতরে এল মতি। শুকনো মুখ, মলিন চেহারা। চিন্তিত লাগছিল ওকে। জিজ্ঞেস করলাম,

-কি ব্যাপার! হঠাৎ কি মনে করে এলে?

-স্যার কিছুদিন যাবত মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছি ভীষণভাবে। অবশেষে আজ মনস্থির করে এসেছি আপনার পরামর্শ নিতে।

-খুব সিরিয়াস ব্যাপার কিছু কি?

-হ্যাঁ স্যার। মনস্থির করে ফেলেছি। পালাবো। যে করেই হোক পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হব। চেষ্টা ব্যর্থ হলে যা হবার তা হবে। যে কোন ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত। আপনি কি বলেন? ভালো করে তার মুখের দিকে চেয়ে তার মনের ছবি পড়বার চেষ্টা করলাম। না, তাকে ভীষণ সিরিয়াস মনে হল। কিন্তু আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি আমাদের তিনজনের সিদ্ধান্তের কথা কাউকে বলা যাবে না। তাই সে মুহূর্তে আমাদের চিন্তা-ভাবনার কথা না বলে শুধু বললাম,

-মতি তোমার আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি?

মতি চুপ করে ভাবছিল কিছু। আমি বেয়ারাকে ডেকে নাস্তার ফরমায়েস দিলাম। নাস্তা এল। মতি তৃপ্তির সাথে খেলো নাস্তা। ওর খাওয়া দেখে বুঝতে পারছিলাম দুপুরের খাওয়া হয়নি তার। হঠাৎ করেই মতি প্রশ্ন করল,

-স্যার সবকিছু সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। এ অবস্থায় আমরা চোখ-কান বন্ধ করে হাত গুটিয়ে শুধু বসে থাকব? আমাদের কি কোন দায়িত্বই নেই? আপনি কি কিছুই ভাবছেন না? আমি মতির প্রশ্নের তাৎক্ষনিক জবাব না দিয়ে বললাম,

-কাল বিকেলে চায়না ক্যাফেতে ৬টায় এসো; আলাপ হবে বিস্তারিত।

মতি চলে গেল। ও চলে যাবার পর আমি কাপড় পড়ে বেরিয়ে গেলাম গাড়ি নিয়ে সোজা নূরের কাছে। গিয়ে দেখি নূর দিবা নিদ্রা দিচ্ছে। ওকে উঠালাম ঘুম থেকে। প্রথমে নূর কিছুটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

-কি ব্যাপার স্যার হঠাৎ আপনি! এ সময়ে?

-বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি নূর। তাকে মতির ব্যাপারে সব খুলে বললাম। সব শুনে নূর বলল,

-মতির ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন। আমি বললাম,

-ওকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়? নূর কিছুক্ষন চিন্তা করে বলল,

-আমার আপত্তি নেই তবে ক্যাপ্টেন তাহেরের মতামতটা জানা দরকার।

-বেশ তবে চল তার ওখানেই যাওয়া যাক।

-তাই চলুন।

আমার গাড়িতে করেই গেলাম ক্যাপ্টেন তাহেরের ওখানে। তাকে সব কথা খুলে বলে জানালাম তাকে সঙ্গে নিতে আমার এবং নূরের কোন আপত্তি নেই। ক্যাপ্টেন তাহের আমাদের সাথে একমত হয়ে বললেন, "ঠিক আছে ও যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে তাকে সঙ্গে নেয়া হোক।" ফিরে এলাম; পথে নূরকে নামিয়ে দিয়ে। পরদিন নির্ধারিত সময়ে আমি ও নূর চায়না ক্যাফেতে গেলাম মতির সাথে আলোচনা করতে। গিয়ে দেখি মতি আমাদের পৌঁছার আগেই আমাদের প্রিয় ডিশগুলোর অর্ডার প্লেস করে অপেক্ষা করছে। চায়না ক্যাফে তখন কোয়েটা শহরের একমাত্র চাইনিজ রেস্তোরা। আমাদের বিশেষ পছন্দের আড্ডা মারার জায়গা। একটি চাইনিজ পরিবার বাবা, মা ও মেয়ে মিলে রেস্তোরাটা চালায়। আমরা তাদের পুরনো রেগুলার কাষ্টমার। তাই গেলে বিশেষ খাতির-যত্ন করে। আমরা যোগ দেবার পরপরই খাওয়া শুরু হল। সাথে আলোচনা। আমি প্রথমেই বললাম,

-মতি তোমার গতকালের প্রশ্নের জবাব আজ দিচ্ছি। কোন কারণবশতঃ সেটা কাল দেয়া সম্ভব হয়নি। আমি, নূর এবং ক্যাপ্টেন তাহের পালাবার চেষ্টা করছি বেশ কিছুদিন যাবত। চমন বর্ডার দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু EME Batalion এর ঘটনার পর সে পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে। এখনও চেষ্টা করছি ভাওয়ালপুর-ভাওয়ালনগর হয়ে রাজস্থান বর্ডার ক্রস্ করব। তুমি আমাদের সঙ্গে ইচ্ছে হলে আসতে পার। মতির চোখে মুখে খুশি উপছে পড়ল।

-স্যার, আমি জানতাম আপনি এ সময়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।

-I am so happy that I can't tell you. I am proud of you Sir.

আমি পকেট থেকে ছোট্ট একটা কোরআন শরীফ বের করে তার উপর হাত রেখে ওকে শপথ নিতে বললাম। ও কোরআন শরীফের উপর হাত রাখলো। আমি বললাম,

–বল আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তিকে কিছু বলা চলবে না, কোন পরিস্থিতিতেই ; প্রয়োজন মত তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হবে সেটা বিনা প্রশ্নে তুমি পালন করবে। অযাচিতভাবে পরিকল্পনা সম্পর্কে কৌতুহলবশতঃ কোন প্রশ্ন তুমি করতে পারবে না। একে অপরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।

আমার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল মতি। কোন জড়তা নেই। কোন দ্বিধা নেই। এভাবেই শেষ হল আমাদের বৈঠক।

আমার উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সবচেয়ে শর্টকাট এবং গ্রহণযোগ্য পথ খুঁজে বের করা এবং সে পথের Operational map sheet যোগাড় করে তার উপর Own troops এবং Enemy troops position এবং Deployment Trace যোগাড় করা। তাছাড়া কম্পাস, বাইনোকুলার এবং Personal weapons যোগাড়ের দায়িত্বও আমাকেই নিতে হয়েছিল লোকাল অফিসার হিসাবে। এর সবগুলোই আমার রেজিমেন্টে বিস্তর রয়েছে কিন্তু Classified items হিসাবে Operational purpose ছাড়া এগুলো ষ্টোর থেকে বের করার হুকুম নেই। তাই অন্যপথ খুঁজে বের করতে হল। ম্যাপ যোগাড় করার জন্য ঠিক করলাম ইনফ্যানট্রি স্কুলের ইনন্টেলিজেন্স এর বাঙ্গালী হাবিলদার শফিকের সাহায্য নেব। ছেলেটার সাথে কোর্স করার সময় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। কোর্সে বাঙ্গালী হয়েও ভালো রেজাল্ট করায় ও আমাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করত। ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই ওর সাথে দেশ নিয়ে আলাপ হত। ও অনেক কথাই বলত আমাকে আপনজন ভেবে, বিশ্বাস করে। কোর্স করার সময় ও সবসময় আমাকে নানাভাবে সাধ্যমত সহযোগিতা করত অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি ঠিক করেছিলাম, দেখা যাক না চেষ্টা করে ও আমাকে ম্যাপের ব্যাপারে কোন সাহায্য করে কিনা। একদিন ওকে খবর পাঠালাম আমার সাথে দেখা করতে। ও ঠিক এল আমার মেসে। নানা ধরণের আলাপ-আলোচনা হল দেশ সম্পর্কে । এক সময় আমি ওকে বললাম,

–শফিক তোমার কাছে আমি একটি ব্যাপারে সাহায্য চাই। যদি ভরসা দাও তবে বলি। ও যেন কিছুটা লজ্জা পেল। বলল,

–স্যার আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আমি আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনি নির্দ্বিধায় বলুন কি প্রয়োজন আপনার?

–আমি যা চাইবো সেটা সাধারণ কোন জিনিস নয় শফিক। বুদ্ধিমান তরুণ শফিক জবাব দিল,

–আপনি আমার কাছে কোন সাধারণ জিনিস চাইবেন না সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। তবুও আপনি বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? ম্যাপ শীটের নম্বরগুলো তাকে লিখে দিয়ে বললাম,

–এগুলো আমার চাই। ম্যাপ শীট নম্বরগুলো দেখেই বুদ্ধিমান শফিক হয়তোবা আঁচ করতে পেরেছিল আমার উদ্দেশ্য কি? আমার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে চুপ করে বসে থাকলো শফিক। কি যেন পরখ করে খুঁজে দেখছিল আমার মাঝে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি বললাম,

–হ্যা আমি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, তাই এ ম্যাপ শীটগুলো আমার প্রয়োজন। আমার কথা শুনে ও বলল,

–কিন্তু স্যার ...?

–জানি শফিক তাতে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে তোমার শাস্তিও হতে পারে। তাই যা কিছুই করার সিদ্ধান্ত তুমি নেবে সেটা ভেবে চিন্তে স্থিরভাবেই তোমাকে নিতে হবে। এ ঝুঁকি নেবার ব্যাপারে আমার তরফ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে আমার অনুরোধ এ ঝুঁকি তোমার পক্ষে যদি নেয়া সম্ভব না হয় তবে তুমি অন্য কাউকে আজকের আলোচনা সম্পর্কে কিছু বলবে না। আশা করি তুমি এ অনুরোধ রক্ষা করবে। হাবিলদার শফিক আমার মুখের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। কথা শেষ হতেই সে আমাকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বলল,

–স্যার আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি এ বিশ্বাসের অবমাননা জান থাকতে হতে দেব না। কাল বিকেল ৫টায় খোকা বাজারে আমার সাথে আপনি দেখা করবেন। দেখি আমি আপনার জন্য কি করতে পারি।

পরদিন বিকেল ৫টায় আমি খোকা বাজারে নির্দিষ্ট স্থানে হাবিলদার শফিকের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। প্রতিটি মুহুর্ত কাটছিল চরম উত্তেজনায়। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট হয়ে গেল ৫টা বেজে শফিকের দেখা নেই। শফিক কি তবে আসবেনা? কোন অঘটন ঘটলো না তো? নাকি মুখের উপর না বলে আমাকে বিব্রত না করে আজ না এসে বুঝিয়ে দিল এ কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। চুপচাপ দাড়িয়ে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখছিলাম আর নানা ধরণের কথা ভাবছিলাম। ৫টা ২০ হয়ে গেল ভাবলাম শফিক আর আসবে না। চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি হঠাৎ দেখি ত্রস্ত পায়ে শফিক হাপাতে হাপাতে ছুটে আসছে আমার দিকে। বাম হাতে একটি ঝোলা। ডান হাত উঁচু করে আমাকে ইশারায় তার আগমন বার্তা জানাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই লোকের ভীড় ঠেলে ও আমার কাছে এল। ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠল মন।

–স্যার স্যরি, একটু দেরী হয়ে গেল। ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শফিক। বললাম,

–চলো কোথাও বসা যাক। মার্কেটের মধ্যেই সাজ্জি কাবাবের দোকানে গিয়ে বসলাম দু'জনে। ইন্টার ইউনিট ম্যাচ (Inter Unit Match) ছিল আজ। দারুন খেলা হয়েছে। তারপর ১ ঘন্টা হেভী এক্সারসাইজ করায় বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল। আস্ত দু'টো মুরগির সাজ্জি সাথে কড়াই কাবাব এবং নান অর্ডার দিয়ে বসলাম দু'জনে। বেয়ারা কাওয়ার পট এবং কাপ রেখে গেল। কোনার দিকে একটি নিরিবিলি জায়গাতে বসেছিলাম আমরা। রেকর্ড প্লেয়ারে জনপ্রিয় ফিল্মিগান বাজছিল। ফলে আমাদের আলাপ করার সুবিধা হল। পাশের টেবিলের লোকরাও আমাদের কথা কিছু শুনতে পাবে না।

–আমিতো প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিছুটা চিন্তিত হয়েও পড়েছিলাম।

–কি কষ্ট করে যে আপনার জিনিস হাসিল করেছি, সে একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন। এতে ঝুঁকি আছে প্রচুর। কিন্তু আপনি দেশের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু হলেও শান্তনা পাব এই ভেবে যে দেশের স্বাধীনতায় আমিও কিছু অবদান রাখার সুযোগ পেলাম। বলেই আস্তে টেবিলের নীচ দিয়ে সে ঝোলাটি আমার হাতে তুলে দিল।

–আমি তোমার অবদানের কথা সর্বদা স্মরন রাখব শফিক। ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে ছোট করব না। তবে একটি কথা জেনে রাখ। ২৫শে মার্চ ন্যাক্কারজনক পাশবিক ঘটনাবলীর পর থেকে দেশ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখার জন্য অনেক কিছুই ভেবেছি এবং অনেক বাঙ্গালীর সাথে আলাপ করেছি। কেউই তোমার মত নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা দেখায়নি। কেউ আমার চিন্তা-ভাবনায় আতঁকে উঠেছেন। কেউ বা রেগে গিয়ে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন। কোয়েটার অনেক বাঙ্গালীর কাছেই আমি ইতিমধ্যে বিপদজনক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছি। অনেকে আমার সাথে সব যোগাযোগ ছিন্ন করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। সে ক্ষেত্রে তোমার এ সাহায্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার এ অবদান সামান্য নয়। যদি সংগ্রামে যোগ দেবার তৌফিক আল্লাহ আমাকে নছীব করেন; দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি বেঁচে থাকি তবে তোমার নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে থাকবে ভাই, এ ওয়াদা আমি তোমাকে দিলাম।

শফিকের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝড়ছিল। রুমালে চোখ মুছে নিয়ে ধরা গলায় বলল,

–স্যার আমার এ অতি সামান্য অবদান। ইচ্ছে হয় আপনার সাথে আমিও পাড়ি জমাই। কিন্তু আমি ফ্যামিলিম্যান। পরিবার ফেলে কি করে পালিয়ে যাই! আমার এ

অক্ষমতা আমাকে পীড়া দেবে সারাজীবন। নিজেকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারব না স্যার।

–কেন মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছ ভাই। বাংলাদেশের সবার পক্ষে কি যুদ্ধে সরাসরিভাবে যোগ দেয়া সম্ভব হবে? অনেকেই নানাভাবে সংগ্রামে অবদান রাখবেন। তারাও মুক্তিযোদ্ধা। যেমন আজকে তুমি রাখলে এক অমূল্য অবদান। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করবে তাদের অবদানের চেয়ে তোমার এ অবদানের মূল্য কোনক্রমেই কম নয়: সেভাবে তুমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমার কথায় শফিক নিজেকে সামলে নিল। বেয়ারা ইতিমধ্যেই খাবার পরিবেশন করে গেছে।

–এসো খাওয়া যাক। দু'জনে তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খাওয়া শেষে শফিক বলল,

–আজ আমাদের নাইট ট্রেনিং আছে তাই চলে যেতে হবে। সময় প্রায় হয়ে এল।

–চলো তোমাকে নামিয়ে দেই। গাড়িতে বসে শফিক বলল,

–স্যার একটি কথা যদি আমার কিছু হয় তবে আমার পরিবারকে একটু দেখবেন।

–যদি বেঁচে থাকি তাহলে এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। কথা দিলাম। শফিককে নামিয়ে দিয়ে মেসে ফিরে এসে লনের মাঝখানে ছাতির মত দাড়িয়ে থাকা প্রিয় আখরোট গাছটার নীচে গিয়ে বসলাম। বসন্তের ফুরফুরে বাতাস নানা ধরণের ফুলের সুবাস ছড়াচ্ছিল। গার্ডেন লাইটগুলোর স্বল্প আলোকে ম্লান করে দিয়ে বেশ বড় একটি চাঁদ সামনের মুরদার পাহাড়ের গা ছুঁয়ে উকি দিয়ে হাসছে। মনোরম এক শান্ত পরিবেশ। কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম হাবিলদার শফিক সম্পর্কে।

আজ তিন দশকের বেশি পার হয়ে গেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু হাবিলদার নাজির এবং হাবিলদার শফিক কি স্বীকৃত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে? না। তারা এবং তাদের মত অনেকেই আজ বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়েছে। কেউ তাদের খবর রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। শুধু কি তাই? স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের আত্মত্যাগের সাথে। ন্যাক্কারজনকভাবে মিথ্যের উপর তাদের ক্ষমতার ভীত গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সত্যকে দাবিয়ে রাখার এক জঘণ্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে তারা। স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে সব শাসকের আমলেই। স্বাধীনতার পর প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের সহায়তায় বাংলাদেশের ক্ষমতা গায়ের জোরে কুক্ষিগত করে আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিবের রহমান উড়ে এসে জুড়ে বসে একাই দাবি করেন ৯ মাস দীর্ঘ সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামের সব কৃতিত্ব।

"১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল দেশের সাধারণ মানুষ। এটা কোন দলের বা গোষ্ঠির একক কৃতিত্ব ছিল না।" এ সত্যি স্বীকার করেছেন ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির সভাপতি ও ইন্দিরা গান্ধীর সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক শান্তিময় রায়। (দৈনিক ইনকিলাব ২৩.০৩.১৯৯৪)

বাংলাদেশকে করদ রাজ্যে পরিণত করার বিদেশী চক্রের সুদূরপ্রসারী নীল নকশা বাস্তবায়িত করার দাসখত লিখে দিয়ে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি ক্ষমতালিপ্সু শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগ। সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করেন গণতন্ত্রের তথাকথিত চ্যাম্পিয়ন শেখ মুজিব স্বয়ং। মানবিক এবং নাগরিক সব অধিকার হরণ করে স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন শেখ মুজিবর রহমান ও তার সরকার। বাংলাদেশে এভাবে সূচিত হয় এক কালো অধ্যায়। স্বীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য এবং পর্যায়ক্রমে পারিবারিক Dynasty কায়েমের লক্ষ্যে স্বাধীনতার চেতনাকে বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের খতম করতে মরিয়া হয়ে উঠেন তিনি। তিনি ও তার প্রভুরা ভাল করেই জানতেন, সাচ্চা মুক্তিযোদ্ধাদের কেনা যাবেনা কোন দামেই। জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যে কোন চক্রান্তের মোকাবেলায় পরিক্ষীত মুক্তিযোদ্ধারাই এগিয়ে আসবেন অগ্রণী হয়ে। জনগণের সামনে মুজিব ও তার বিদেশী দোসরদের সব চক্রান্তের মুখোশ উম্মোচিত করার জন্য তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠও সোচ্চার হয়ে উঠবে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কবল থেকে স্বাধীনতার সূর্য যদি তারা ছিনিয়ে আনতে পারেন তবে দেশ ও জাতিকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার যে কোন চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দেবার শক্তিও রয়েছে শুধু তাদেরই। তাই সচেতন, সাচ্চা মুক্তিযোদ্ধারাই হয়ে উঠেন শেখ মুজিব, তার সরকার এবং সম্প্রসারনবাদী ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির মূল প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের এ শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সরকার একদিকে চালাতে থাকে মিথ্যা প্রচারণা মুক্তিযোদ্ধাদের ইমেজ নষ্ট করার জন্য; অন্যদিকে রাজনৈতিক বিরোধিতা দমনের নামে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় হাজার হাজার দেশপ্রেমিক তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে।

সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানাবার প্রয়াসে শেখ মুজিব লজ্জাহীনভাবে ঘোষণা করেন তারই নির্দেশে শহীদ জিয়া স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন বেতার মাধ্যমে। এভাবেই শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শহীদ জিয়ার নিজ উদ্যোগে দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণার কৃতিত্ব অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিন পরই ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে ত্রিপাক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৯ই এপ্রিল ১৯৭৪ সালে। চুক্তিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ অপরাধীদের বিনা বিচারে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন মুজিব। আপোষকামী এবং সুবিধাবাদী চরিত্রের শেখ মুজিবর রহমান সর্বোপরিসরে স্বাধীন বাংলার মাটিতে স্বাধীনতার শত্রুদের পুনর্বাসিত করে স্বাধীনতার চেতনার সাথে বেঈমানীর এক অবিশ্বাস্য নজীর স্থাপন করেছিলেন। সে সময় অধুনাকালের তথাকথিত স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির চ্যাম্পিয়নরা সব কোথায় ছিলেন? কেন সেদিন শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠলেন না? শেখের আমলে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণআদালত গঠন করা হল না কেন? গোলাম আযম বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন তার রাজনৈতিক আদর্শের কারণে। তিনি যদি অপরাধী হন তবে তার চেয়েও বড় অপরাধী শেখ মুজিব, তার দল ও আওয়ামী-বাকশালীরা। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এককভাবে কুক্ষিগত করে নিয়ে স্বাধীনতার চেতনাকে সমূলে উৎপাটন করার চক্রান্ত করে জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তিনি ও তার দল। নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। তাই যুক্তিসঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের মাটিতে গণআদালতে গোলাম আযম ও তার দোসরদের বিচারের আগে বিচার করতে হবে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী-বাকশালীদের। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমীর মা জাহানারা ইমাম। পুত্র হারাবার শোকে তার স্বামীও মারা যান। বিশ বছর পর তথাকথিত গণআদালত গঠন করে আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে গোলাম আযমের বিচারের প্রহসন করে তিনি তার ছেলে শহীদ রুমীর বুকের রক্তের সাথেই বেঈমানী করার অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা নিধনকারী আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তার সম্মান হারিয়েছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার এ ধরণের উদ্যোগে ব্যক্তিগতভাবে আমিও দুঃখ পেয়েছি। জনাব রব, মেনন এন্ড গং এবং তথাকথিত প্রগতিশীল বিপ্লবী দলগুলোর নেতারা যারা বর্তমানে আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন তারাও আজ একই অপরাধে অপরাধী। তাদের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসনের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও দলীয় কর্মী। হালে আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদেরকে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার তাদের অপচেষ্টা জনগণকে বিস্মিত করেছে। নিজেদের স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে আওয়ামী লীগে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা নিজেদের আওয়ামী-বাকশালীদের বি-টিম বলে জনগণের মনে যে সন্দেহ বিরাজমান ছিল তাকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। হারিয়েছেন বিশ্বাসযোগ্যতা। লাখো শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানীর শাস্তিস্বরূপ তারা নিক্ষিপ্ত হবেন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। ইতিহাসের বিধান অমোঘ। সত্যকে খুঁজে বের

করার দায়িত্ব ঐতিহাসিকদের। সত্যের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে গতিশীল মানব সভ্যতার ইতিহাস। বাংলাদেশের ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

স্বাধীনতা উত্তরকালে শত চেষ্টা করেও বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছি। এমনকি শহীদ হাবিলদার নাজির এবং হাবিলদার শফিকের পরিবারের জন্য তাদের ন্যায্য অধিকার রেশনের বন্দোবস্ত করাটাও সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। নাজির এবং শফিক দু'জনেই মারা যায় সম্মুখ যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের রনাঙ্গনে। আমার মতে তারা শহীদ হলেও শেখ মুজিবের সরকারের চোখে তারা ছিলেন দেশ বিরোধী। ফলে তাদের পরিবারদের রেশন থেকে বঞ্চিত করা হয়। যে জাতি শহীদের রক্তের মর্যাদা দিতে পারে না সে জাতির ভাগ্যে দুর্গতি থাকবে সেটাইতো স্বাভাবিক। হয়তো তাই আজ এখনও আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাড়াতে পারছি না আমরা। অযোগ্য নেতৃত্বের দেউলিয়াপনার অভিশাপে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়েছে সমগ্র জাতি। এ বাঁধনের নিষ্পেষনে তিলেতিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে জাতির প্রাণসত্ত্বা। অন্তঃসাড় শূণ্য খোলসের মতই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বাংলাদেশ। পক্ষাঘাতের মুমুর্ষ রুগীর মত নিজের স্থবির অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে পরের কৃপা ও দয়া ভিক্ষা করে। খয়রাতি মিছকিনে পরিণত করা হয়েছে সমগ্র জাতিকে; স্বাধীনতা হয়ে উঠেছে অর্থহীন। কোয়েটার আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক।

বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর মালেক তখন পর্যন্ত ব্রিগেড মেজরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার ব্রিগেডের অপারেশনাল এরিয়ার আওতায় পরেছে ভাওয়ালনগর ফোর্ট আব্বাস সেক্টর। ভাওয়ালপুর হয়ে ভাওয়ালনগর। সেখান থেকে ফোর্ট আব্বাসের পথে ছোট ষ্টেশন হারুণাবাদ। হারুণাবাদ থেকেই শুরু করতে হবে আমাদের পদযাত্রা। পাক বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর ডিফেন্স ভেদ করে ২৫ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করে আমাদের পৌছতে হবে শ্রীকরণপুর। মেজর মালেকের কাছ থেকেই পেতে হবে পাক বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর Deployment trace. এতে বিশদভাবে আঁকা থাকে Top secret uptodate intelligence informations. যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। ম্যাপ পাবার পরদিনই টেলিফোন করে মেজর মালেককে বললাম জরুরী প্রয়োজনে অবিলম্বে দেখা করতে চাই। অনুমতি নিয়ে তার অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম মতিকে সঙ্গে নিয়ে। অফিসে একাই ছিলেন মেজর মালেক। দ্বারে উপস্থিত হতেই ভারী গলায় প্রশ্ন রাখলেন,

–কি ব্যাপার ডালিম?

–আপনার নতুন গাড়ি দেখতে এলাম। কেমন চলছে? অল্প কিছুদিন আগে তিনি একটি Skoda Sedan Car কিনেছেন।

-তোমার Volks Wagon এর মত শানদার না হলেও I have no complain.

-স্যার বাসায় চলেন । লাঞ্চ খাব একসাথে।

-লাঞ্চ খাবে তা বেশতো; তোমার ভাবীকে ফোন করে বলে দাও। But what is your problem? Have you picked up again on some one? তা তোমার সাথের ছেলেটিকে তো চিনলাম না?

আমি ইতিমধ্যেই টেলিফোন তুলে নিয়ে রিং করছিলাম,

-হ্যালো ভাবী, ডালিম Here. আমরা বাসায় আসছি, Three of us over lunch অসুবিধে হবেনা তো?

-কোন দিকে সূর্য উঠল আজ! এতদিন পর হঠাৎ ভাবীকে মনে করে যেচে লাঞ্চ খেতে চাচ্ছ?

ভাবীর জবাবে একটু লজ্জা পেলাম।

-বিশ্বাস করেন ভাবী, কোর্সের ঝামেলায় এত ব্যস্ত ছিলাম; তাই আসা হয়ে উঠেনি। আমার সময় কি করে কেটেছে সে শুধু আমিই জানি।

-চলে এসো; ভাবী বললেন। কথোপকথন শেষ করে Reciver নামিয়ে রেখে বললাম,

-All clear Sir at the home front. ও হ্যাঁ, Let me introduce Lieutenant Moti from 3rd East Bengal and Moti this is Maj. Malek from senior Tiger.

মতি মেজর মালেকের সাথে হাত মিলিয়ে বলল,

-স্যার আপনার সাথে আগে দেখা হয়নি কিন্তু আপনার কথা অনেক শুনেছি। প্রাণখোলা উচ্ছল প্রকৃতির মেজর মালেক স্মিত হাসলেন।

-Moti is here for OW-JTC. He has done pretty well in the course. বললাম আমি।

-That's very good. শুনলাম তুমিও নাকি খুবই ভালো করেছো? জানতে চাইলেন মেজর মালেক। নিজের কথায় কিছুটা অস্বস্তি লাগছিল: জবাবে কিছুই বললাম না। তাগিদ দিয়ে বললাম,

-চলেন উঠা যাক।

-You mean rightaway! কিছুটা আশ্চর্য হলেন মেজর মালেক।

-That's correct. এতো চাকুরি করে কি আর হবে স্যার! বললাম আমি।

-চলো তবে. মেজর মালেক Buzzer টিপলেন। পিওন এসে সেল্যুট করে দাড়াল। তাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে মেজর মালেক তাকে বললেন তিনি অফিসে আজ আর ফিরছেন না। এরপর আমরা বেরিয়ে এলাম অফিস থেকে। বাসায় ফিরে ড্রইং রুমে বসে আলাপ শুরু হল।

-Well now tell me what's up? প্রশ্ন করলেন মেজর মালেক।

-Sir, the matter is very serious and urgent at the same time confidential. আমরা পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জবাব দিলাম আমি।

অপ্রত্যাশিত জবাবে কিছুটা চমকে উঠলেন মেজর মালেক। চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। কিচেনে ভাবী রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

-Just a minuite, বলে উঠে গেলেন মেজর মালেক। অল্পক্ষণ পর সিগারেট হাতে ফিরে এসে বললেন,

-কি জানো, my batman is not that reliable. তাই বেটাকে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম ক্যান্টিন থেকে সিগারেট আনতে। বুঝলাম আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে Precaution নেবার জন্যই তিনি এমনটি করেছেন।

-Now then are you sure? একরাশ প্রশ্ন তার চোখে।

-জি স্যার। এভাবে আর চাকুরি করার কোন মানে হয় না। নিজের প্রতি ঘৃণা বাড়ছে। আজ আমাদের মত লোকের প্রয়োজন স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য। What do you think Sir? প্রশ্ন রাখলাম আমি।

-Well you may be right. কিন্তু সংগ্রাম সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্যইতো আমরা জানতে পারছি না। সে অবস্থায় এ ধরণের পদক্ষেপ নেয়াটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? Wouldn't it be too risky? পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন মেজর মালেক।

-আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু যেভাবে এখান থেকে জরুরী ভিত্তিতে Re-inforcement পাঠানো হচ্ছে আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে লাশ আসছে তাতে করে এতটুকু নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, সেখানে কিছু একটা ঘটছে। তদপুরি International media কি সবটাই মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে বলে মনে করেন আপনি? জোরালো যুক্তি তুলে ধরলাম আমি।

-Well then. what can I do for you in this venture of yours? জানতে চাইলেন মেজর মালেক।

-আমরা হারুণাবাদ থেকে শ্রীকরণপুর পৌছার চেষ্টা করব। সবদিক বিবেচনা করে এ পথই সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করছি আমরা।

-Your decision is right. চমন বর্ডার ছারা এটাই সবচেয়ে ভালো পথ নিঃসন্দেহে। এপথে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে।

-স্যার, আপনাকে Operational Trace করে দিতে হবে। অনুরোধ জানালাম আমি।

-Food has been served. এ্যাপ্রন পরা ভাবী ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে টেবিলে যাবার অনুরোধ জানালেন। ভাবীর আগমনে পরিবেশটাকে হালকা করে দেবার জন্য হঠাৎ করেই মেজর মালেক কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

-এসো আগে পেট-পুঁজো করা যাক। খালি পেটে ঠিকমত চিন্তাও করা যায় না। সবাই গিয়ে টেবিলে বসলাম। বাচ্চারা সবাই স্কুলে। খাবার দেখে জিভে পানি এসে গেল। টাটকা মাছের বিভিন্ন ব্যঞ্জন। জিজ্ঞেস করলাম,

-ভাবী The Great! এ জিনিষগুলো কোথা থেকে আমদানি করলেন? জবাবে ভাবি বললেন,

-ওরোখ্ থেকে আজ সকালেই আনিয়েছি।

কোয়েটা শহর থেকে ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট একটি সবুজ উপত্যকা ওরোখ্। একটি পাহাড়ী ঝরনা বয়ে যাচ্ছে উপত্যকার ঠিক মাঝ দিয়ে। বিভিন্ন ফলের গাছ-গাছলায় ছেয়ে আছে উপত্যকাটা। চারিদিকে ঘিরে আছে পাহাড়ের গায়ে চির-সবুজ বন। আকর্ষণীয় পিক্‌নিক্ স্পট। সেই ঝরনাতেই ট্রাউট এবং অন্যান্য জাতের মাছ পাওয়া যায়। বাঙ্গালীরা সুযোগ পেলেই মাছ আনান ওরোখ্ থেকে। আমরা Bachelor Boys প্রায়ই গাড়ি ভর্তি করে মাছ নিয়ে এসে ইচ্ছেমত যেকোন ভাবীর শরনাপন্ন হই টাটকা মাছ-ভাতের স্বাদ মেটাতে। হৈ চৈ করে তৃপ্তি মিটিয়ে খাওয়া শেষ করে আমরা আবার ড্রইং রুমে এসে বসলাম। খাবার সুযোগে সবকিছু ভেবে নিয়ে আমার অনুরোধের জবাবটা ঠিক করে নিয়েছিলেন মেজর মালেক। সোফায় বসে সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে মেজর মালেক বললেন,

-well I admire your courrage. আমি নিশ্চয়ই তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করব। শুধু অনুরোধ এ ব্যাপারটা আমার এবং তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

–Definitely Sir, we give you our words. আমি জবাব দিলাম।

–But what about map-sheets? কোথায় পাবে Operational map-sheets? যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন।

–আমরা যোগাড় করেছি। মেজর মালেক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাতেই তাড়াতাড়ি বললাম,

–Not from my Regiment. From elsewhere. স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাঁফ ছেড়ে যেন বাচঁলেন মেজর মালেক।

–Then bring them to me tomorrow. বললেন মেজর মালেক।

–Not tomorrow.এখনি Map-Sheetsগুলো দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, কাল এসে নিয়ে যাব। মতিকে পাঠালাম গাড়ি থেকে Map-Sheetsগুলো নিয়ে আসার জন্য। সেগুলো নিয়ে মতি ফিরে এল। Map-Sheetsগুলো পরখ করে মেজর মালেক সগোক্তি করলেন,

-Incredable! জিনিষগুলো উঠিয়ে নিয়ে কোন গোপন জায়গায় রেখে ফিরে এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে।

–আমরা তবে আজ উঠি স্যার, Still a lot to be done.

–বুঝেছি। কি জানো ডালিম, তোমাদের মত দেশপ্রেমিকদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বাধীন হবে নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ্। ইচ্ছে হচ্ছে আমিও তোমাদের সাথে পালিয়ে যাই, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। পরিবারের দায়িত্ব বাধা হয়ে আছে। How can I leave them and go? ভারী গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলছিলেন মেজর মালেক।

–আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু আমাদের সাহায্য করে আপনিতো কম অবদান রাখলেন না স্যার? সেভাবে বিচার করলে আপনিওতো একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা বেঁচে থাকলে আপনার এই অবদানের কথা দেশবাসী জানবে। বিশ্বাস করেন স্যার, আপনিই একমাত্র সিনিয়র অফিসার যার কাছ থেকে আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেলাম। বাকি সবাইকে চেনা হয়ে গেছে। All are paper tigers. তারা ভিতু, স্বার্থপর। মুখে মুখেই সব বাঙ্গালী এর বেশি কিছু নয়।

আমার কথায় মেজর মালেকের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। হৈ হুল্লরবাজ বলে পরিচিত মেজর মালেকের মাঝে সাচ্চা বাঙ্গালী দেশপ্রেমিক মেজর মালেককে খুঁজে পেয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সালাম জানিয়ে উঠে পড়লাম। গাড়ি

অব্দি এগিয়ে দিতে এলেন তিনি। গাড়িতে বসতে যাচ্ছি ঠিক তখন আবেগে আমাকে এবং মতিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন,

-I wish you all well boys, take care. ফিরে এলাম মেসে।

–সত্যি অদ্ভুত লোক মেজর মালেক। বলল মতি।

–আমিও কিন্তু ভাবিনি তার কাছ থেকে ঠিক এতটা সহযোগিতা পাবো। সত্যি পৃথিবীতে মানুষ চেনা দায়। জবাব দিয়েছিলাম। আরো কয়েকটি বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর মতি চলে গেল।

লেফটেন্যান্ট সুমি ফিরে যাচ্ছে লাহোর। ভাবলাম ওর কাছ থেকেই চেয়ে নেব Compass এবং Binocular.

যাবার আগের দিন বিদায় নিতে এসেছে সুমি। টকটকে ফরসা Well Builed সুদর্শন যুবক সুমি। সব সময় মিষ্টি হাসি মুখে লেগেই আছে। সেদিন তাকে খুব মলিন দেখাচ্ছিল।

–সুমি খারাপ লাগছে লাহোর ফিরে যেতে তাই না? জিজ্ঞেস করলাম।

–ঠিক বলেছেন স্যার। আপনাদের সাথে বেশ কেটে যাচ্ছিল সময়গুলো হেসে খেলে। আপনাদের ছেড়ে যেতে মন কিছুতেই চাচ্ছে না। কিন্তু এর বিকল্পওতো কিছু নেই! যেতে তো হবেই। আপনার কথা কখনও ভুলতে পারবনা স্যার। আপনি না থাকলে Life out here would have been hell and most boring.

–সুমি আজ তোমাকে একটা অনুরোধ করব, রক্ষা না করতে পারলে কথা দাও এ ব্যাপারে তুমি কাউকে কিছুই বলবে না।

–কি এমন কথা স্যার, যার জন্য এমনিভাবে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন? সুমির কথায় আন্তরিকতা ফুটে উঠল। ওকে বিশ্বাস করা চলে।

–আমি পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেব ঠিক করেছি। রাজস্থান বর্ডার দিয়ে ক্রস করব। তোমার Compass এবং Binocularটা পেলে সুবিধে হয়।

–Fantastic, great idea. আমি নিশ্চয়ই দেব Compass and Bino. কিন্তু আমাকে কি সঙ্গে নিতে পারেন না স্যার? আকুতি ঝড়ে পড়ল ওর অনুরোধে। I beg of you Sir, please take me along. আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

–Well Shumi thanks a lot. I shall remain ever greatful for your help. কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নেয়ার ব্যাপারে ঠিক এই মুহূর্তে কোন জবাব দেয়া আমার

পক্ষে সম্ভব নয়। I hope you wouldn't mind. আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে।

–That's fine Sir. Do take your time. But be sure, even if you decide not to take me along for some reason you will get the things which you have asked for. আমিও কিছুই মনে করব না। উঠি আজ তাহলে?

–না না সে কি করে সম্ভব! লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, লাঞ্চ করে যাবে তুমি। বলেই খাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলাম বেয়ারাকে ডেকে। খাওয়ার পর সুমি যাবার জন্য বিদায় চাইল আমি বললাম,

–সন্ধ্যায় মেসে থেকো, আমি আসব। সম্মতি জানিয়ে চলে গেল সুমি।

সুমি চলে যাবার পর আমিও বেরিয়ে পরলাম। মতি ও নূরকে সঙ্গে করে সোজা ক্যাপ্টেন তাহরের ওখানে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল সুমিকেও সঙ্গে নেয়া হবে। সন্ধ্যার একটু আগেই সুমির ওখানে গিয়ে হাজির হলাম আমি একাই। প্ল্যানিং এই স্টেজে গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যই Strict compartmentation মেনে চলা হচ্ছিল। Need to know basis-এ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলাম আমরা অতি সতর্কতার সাথে। সুমি আমার অপেক্ষা করছিল। ঘরে ঢুকে দেখি ওর ব্যাটম্যান সবকিছু গোজগাছ করছে। যাত্রার প্রস্তুতি।

-Let's have Chinese. বলেই গাড়িতে সুমিকে তুলে নিয়ে সোজা চলে গেলাম China Café তে। খাবার ফাঁকে ফাঁকে আলাপ হচ্ছিল।

–Sir, you said Rjasthan is the sector, is that correct? সুমি জানতে চাইলো।

–That's right. জবাব দিলাম।

–তাহলে আপনার সাথেতো আমার যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। আপনিতো জানেন, I am alegic to sand. বালির স্পর্শে আমার সমস্ত গায়ে চুলকানি শুরু হয়ে যায়। এর জন্য আপনার কোন অসুবিধা হোক সেটা আমি চাইনা, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি I shall stay back. সত্যিইতো এ কথাটা গতকাল আমাদের খেয়ালেই আসেনি।

–I don't want to be a liability. এতে আপনার বিপদও হতে পারে। আমার জন্য আপনার পথে কোন বাধার সৃষ্টি হউক সেটা আমি চাইনা। ছল ছল চোখে কথাগুলো বলছিলো সুমি। আমি ওর হাত ধরে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,

–Don't feel so bad. আমার সাথে মরুপথে যেতে পারছ না তাতে কি হয়েছে? That's not the end of the world. এখান থেকে যাবার পর লাহোরের কসুর কিংবা

ওয়াগা বর্ডার দিয়েতো তুমি পালাবার চেষ্টা করতে পারবে। আমার কথায় সুমির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

–তাইতো লাহোর থেকেই ক্রস্ করাটা সহজ হবে আমার জন্য। I promise you Sir. লাহোর পৌঁছেই পালাবার চেষ্টা করব যে করেই হোক না কেন।

–নিশ্চয়ই করবে। আমি পরম করুণাময়ের কাছে দোয়া করব যাতে তুমি তোমার প্রচেষ্টায় সফল হও। দু'জনে ফিরে এলাম সুমির মেসে। সমস্ত মেসটাই ঘুমিয়ে পড়েছে। একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম।

–সুমি Thanks a lot once again for all that you have done for me. আমার জন্য দোয়া কর। বেঁচে থাকলে স্বাধীন বাংলাদেশে দেখা হবে ইনশাল্লাহ্ Otherwise good luck and good bye my friend. আবেগ এবং বিচ্ছেদের অনুভূতি সব মিলিয়ে চোখে পানি এসে গিয়েছিল নিজের অজান্তেই। সুমি ধরা গলায় বিদায় জানাল,

–খোদা হাফেজ, Take care Sir may Allah be with you.

সুমির দিকে আর চাইতে পারলাম না। দ্রুতপায়ে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বসলাম। ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়ে ঝড়ের বেগে গেইট দিয়ে বেরিয়ে এলাম। Rear-view mirror এ দেখলাম সুমি তখনও পোর্চে দাড়িয়ে হাত নাড়ছে।

এ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকমতই এগুচ্ছিল। হঠাৎ করে ঘটলো প্রথম বিপর্যয়। আকস্মিকভাবে ক্যাপ্টেন তাহেরের বদলির অর্ডার এসে গেল। এবোটাবাদে বেলুচ সেন্টারে তার পোষ্টিং হয়েছে। অবিলম্বে তাকে যোগদান করতে হবে। খবরটা পেয়েই মতি, নূর এবং আমি ছুটে গেলাম তার কাছে। মেসে গিয়ে পৌঁছাতেই তিনি জানালেন কালই তাকে By air চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একি বিভ্রাট! কি করব এখন আমরা? জবাবে ক্যাপ্টেন তাহের বললেন, "It's ok. এ অবস্থায় তোমাদের সাথে আমার যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। But so what? আমি এবোটাবাদ থেকে পালাবার চেষ্টা করব। তোমরা তোমাদের প্ল্যান অনুযায়ী এগিয়ে যাও। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব Plan execute করতে হবে।" বুঝতে পারলাম পোষ্টিং অর্ডার একবার যখন আসা শুরু হয়েছে তখন যেকোন সময় মতি ও নূরের কিংবা আমার পোষ্টিং অর্ডারও এসে পরতে পারে। একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরার আগেই আমাদের কেটে পরতে হবে। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন তাহেরকে এয়ারপোর্টে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম। আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ক্যাপ্টেন তাহের! তরুণ চৌকশ কমান্ডো অফিসার। সবেমাত্র রেঞ্জারস্ কোর্স শেষে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। ফেরার পরপরই detailed হয়ে কোয়েটাতে এসেছিলেন Senior Tactical Course করতে।

স্বল্পভাষী, অসীম সাহসী, তেজদীপ্ত চেহারা, অস্বাভাবিক মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী যুবক ক্যাপ্টেন তাহের দেশপ্রেমের এক দুর্লভ নিদর্শন। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের মন জয় করে ফেলেছিলেন তিনি। অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিলাম আমরা। পাকিস্তান থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মতি, নূর এবং আমিই সর্বপ্রথম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে সক্ষম হয়েছিলাম। দ্বিতীয় ব্যাচে এসেছিলেন মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন তাহের। তারা এসেছিলেন শিয়ালকোট সেক্টর দিয়ে। আমরা একসাথে যুদ্ধ করেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। স্বাধীনতার সংগ্রামকালে এবং পরবর্তিকালে বাংলাদেশের গণমানুষের মুক্তি সংগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরের নিঃস্বার্থ অবদান এবং আত্মত্যাগের ইতিহাস সর্বজন বিধিত। কিংবদন্তির নায়ক কর্নেল তাহেরের আত্মগাঁথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করবে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের দেশপ্রেমিকরা। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তার নাম। কোন অপচেষ্টাই শহীদ তাহেরের স্মৃতিকে ম্লান করে দিতে পারবে না বাংলার মাটিতে। কর্নেল তাহের মরেও অমর হয়ে আছেন; আর থাকবেনও চিরদিন।

ক্যাপ্টেন তাহেরের হঠাৎ বদলিতে ভেঙ্গে পড়লেও আমরা নিজেদের সামলে নিলাম। তার চলে যাবার পর পুরোদমে আমরা আমাদের পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে নিয়ে চললাম। সুমির পিস্তলটা পাওয়ায় আমাদের সুবিধা হল। আমার ব্যক্তিগত হাতিয়ারের মধ্যে রয়েছে একটা পিস্তল আর একটা রিভলবার। সুমির পিস্তলটা আমাদের হাতিয়ারের সমস্যার সমাধান করে দিল। ক্রমান্বয়ে আমাদের সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষা।

ইতিমধ্যে আমাদের ১৬ ডিভিশনের ইউনিটগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। যে সমস্ত ইউনিটগুলো পাঠানো হচ্ছে সেগুলো থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে বাঙ্গালী সদস্যদের। এ থেকে ধরে নিলাম খুব শীঘ্রই আমার পোষ্টিং অর্ডার এসে যাবে। আমার ইউনিটে আমরা মাত্র দু'জন বাঙ্গালী। হলও তাই। প্রায় একই সময়ে নূর এবং আমার পোষ্টিং অর্ডার এসে গেল। আমাকে যেতে হবে খারিয়ায় আর নূরকে যেতে হবে কোহাট। একই সময়ে পোষ্টিং অর্ডার পাওয়ায় দু'জনেই খুশী হলাম। এতে আমাদের Movement co-ordinate করতে সুবিধে হবে। আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে পোষ্টিং অর্ডার পেয়ে নতুন জায়গায় যাবার পথেই কেটে পড়বো আমরা। এতে করে খুব সহজেই সপ্তাহখানেকের জয়েনিং টাইম কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল মতিকে নিয়ে। যেকোন কারণেই হোক না কেন ওর পোষ্টিং অর্ডার আসতে দেরী হচ্ছিল। ঠিক হল কিছু একটা করা দরকার। স্কুলে আটকে পরা সব বাঙ্গালীরাই প্রায় চলে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিটে। হঠাৎ মতির মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ও সরাসরি পিন্ডিতে MS Branch এর সাথে যোগাযোগ করে জানতে চাইলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের পোষ্টিং ইনচার্য

কে? ভাগ্যক্রমে জানা গেল ঐ বিভাগের দায়িত্বে যে কর্নেল সাহেব রয়েছেন তিনি মতির পূর্ব পরিচিত। কর্নেল সাহেব মতির এক স্কুল-মেটের বাবা। পরিচয় জানার পর মতি আবদার করে বসলো, " আংকেল, স্কুলের আটকে পরা সবারই পোষ্টিং হয়ে গেছে শুধু আমিই পরে রয়েছি। আমার একটা গতি করুন। একাকিত্বের যন্ত্রণা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। Please Uncle, you got to do something for me as soon as possible." জবাবে কর্নেল বললেন, " তুমি চিন্তা কর না আজই আমি তোমার পোষ্টিং অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি। 6 East Bengal Regiment পেশাওয়ার এ যাবার জন্য তুমি প্রস্তুত হও।" মতি কর্নেল সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল, সম্ভব হলে পেশাওয়ার যাবার পথে মুলতান হয়ে যাবার চেষ্টা করবে ও। উদ্দেশ্য কর্নেল সাহেবের পরিবারের সবার সাথে দেখা করে যাওয়া। পুরো পরিবারের সাথেই মতি পূর্ব পরিচিত। কথা শেষে মতি আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল, " It is all done Sir." "Well done indeed. it's really great." উঠলাম আমরা। কর্নেল Uncle এর কথা মত পরদিনই মতি তার পোষ্টিং অর্ডার হাতে পেলো। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

গেইমস্ থেকে ফিরে exercise করছিলাম মেসে। মতি ও নূর এল। দু'জনেই খুব relaxed. Exercise শেষ করে ফ্রেস হয়ে তিনজনেই গিয়ে বসলাম লনে। ঠিক করা হল, নূর রওনা হবে ট্রেনে করে কোহাটের পথে। কিন্তু পথিমধ্যে ভাওয়ালপুরে নেমে যাবে নূর। সেখানে সার্কিট হাউজে অবস্থান নেবে নূর। মতি ও আমি ওর যাত্রার পরদিন ভাওয়ালপুরে তার সাথে মিলিত হব। মতি এবং আমি কিভাবে যাব সে ব্যাপারে কিছুই আলাপ হল না। আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী কেউ এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করল না। আলাপ শেষে ক্লাবে চলে গেলাম 'তাম্বোলা-নাইট' attend করার জন্য।

আমাকে কমান্ডিং অফিসার নির্দেশ দিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোছগাছ করে খারিয়া চলে যেতে। স্বাভাবিকভাবে আমি ব্যস্ত হয়ে পরলাম গোছগাছ নিয়ে। সমস্ত মালপত্র ব্যাটম্যানকে দিয়ে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে ট্রেনে করে পাঠিয়ে দিলাম খারিয়ায়। CO-কে বললাম ট্রেনে না গিয়ে By air লাহোর হয়ে যাব আমি। Transit period টা লাহোরে আমোদ-ফুর্তি করে কাটিয়ে দিয়ে খারিয়াতে চলে যাব আমি। সমস্যা দেখা দিল সদ্য কেনা গাড়িটা নিয়ে। নতুন গাড়ি শখ করে কেনা তাই বেচে দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এতে লোকজনের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। তাই ঠিক করলাম আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধুকে দিয়ে যাব গাড়িটা। এজাজ লাহোরের ছেলে। ওর পরিবারের সাথেও আমার ঘনিষ্টতা রয়েছে। আমাকেও তারা পরিবারের একজন হিসাবেই মনে করে। এজাজকে একদিন বললাম, "এজাজ আমি By air লাহোর হয়ে যাচ্ছি। তুই আমার গাড়িটা রেখে দে। সুবিধামত লাহোর পাঠিয়ে দিস। আমি পরে এক ফাঁকে খারিয়া থেকে লাহোর গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসব। এজাজ আমার প্রস্তাবে খুশী হয়েই রাজি হল এবং বলল, "Don't you

ever think about it. I shall manage everything. You just go and have fun at Lahore. By the way when are you planing to leave?"
"Tentitively arround mid April." জবাব দিয়েছিলাম আমি। এভাবেই গাড়ির ঝামেলারও সুরাহা হল।

এরই মধ্যে ঘটলো চরম অঘটন। একদিন games এর পর স্কুলের মেসে এ্যান্টিরুমে বসেছিল নূর। কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারও বসেছিল সেখানে। কথায় কথায় এক সময় বাঙ্গালী জাতি এবং শেখ মুজিব সম্পর্কে কটুক্তি করে নূরকে চটাবার চেষ্টা করছিল। ওদের একজন নূরকে উদ্দেশ্য করে বলল, "নূর তেরাতো কিসমত খুল গিয়ারে। শেখ মুজিব আভি তুঝে একদমসে জেনারেল বানা দেগা, কিঁউ? Bastard Mujib is a traitor don't you think so? সারে বাঙ্গালী কওম হিন্দু হ্যায়।" উষ্কানিমূলক এধরণের বক্তব্যে নূর ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওদের কথার জবাবে গর্জে উঠে, "If Mujib is a gaddar then Yahia is a rogue. He is killing thousands of Bengalees. he has let loose the forces to rape and dishonour our mothers and sisters. Therefore, he is a bigger bastard." এ ধরণের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি নূর। রাগের চোটে সামনের ষ্ট্যান্ডে রাখা প্রেসিডেন্টে ইয়াহিয়া খানের ছবি তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দিয়ে তার উপর দিয়ে গটগট করে হেটে বেড়িয়ে যায় নূর। প্রেসিডেন্টের ছবি পা দিয়ে মারিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার গুরু অপরাধে তক্ষুণি তার বিরুদ্ধে Open arrest এর আদেশ জারি করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। শুরু হয়ে যায় কোর্ট মার্শাল প্রসিডিংস। ঘটনার আকস্মিকতায় আমার ও মতির মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ে। হতভম্ব হয়ে যাই আমরা। খবর পেয়েই ছুটে গেলাম ওর কাছে।

–একি করলে নূর? ক্ষণিকের উত্তেজনার বসে সবকিছু ভন্ডুল করে দিলে কি করে? তোমার এ ধরণের হঠকারি কার্যকলাপের পরিণামে আমরাও বিপদে পড়তে পারি। তোমার সাথে আমাদের হৃদ্যতার কথা সবাই জানে। How could you be so stupid to do a thing like that. Shame on you. এ ধরণের কাজ তোমার কাছ থেকে আশা করিনি। হঠাৎ করেই ওর উপর ভীষণ রাগ হল।

–I am sorry Sir. I was totally out of my head. যা ঘটেছে তার জন্য আমি লজ্জিত এবং অনুতপ্ত, এখন আমাকে নিয়ে বৃথা চিন্তা না করে প্ল্যানমত আপনারা চলে যাবার ব্যবস্থা করেন যত শীঘ্র সম্ভব। Summery Of Evidence শুরু হলে আপনাদের ডাক পরা অসম্ভব কিছু নয়, কেসে জড়িয়ে পরার আগেই পালিয়ে যেতে হবে আপনাদের। আমার যা হবার তা হবে। কিন্তু আপনারা ফেঁসে পড়লে আর যাওয়ার সুযোগ হবে না। তাই আমার আন্তরিক অনুরোধ Please leave me alone to my fate and just think to escape as quickly as possible. আপনাদের কিছু হলে আমি নিজেকে কখনো

ক্ষমা করতে পারব না। ছেলে-মানুষের মতই ডুকরে কেঁদে উঠল নূর। ওকে শান্তনা দেবার ভাষা খুজে না পেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিঁরে এলাম। হঠাৎ করে কি থেকে কি হয়ে গেল এখন আমাদের কি করা উচিত: ভেবে কোন কূলকিনারাই পাচ্ছিলাম না। নূরের ভবিষ্যত ভেবে শংকিত হয়ে পড়লাম। বেচারা নূর! অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক করলাম মতি এবং আমি ১৬ই এপ্রিল আমাদের যাত্রা শুরু করব। তখনকার দিনে করাচি থেকে একটি ফ্লাইট কোয়েটা, মুলতান হয়ে লাহোর যেত প্রতিদিন। ১৬ তারিখের ঐ ফ্লাইটেই রওনা হব আমি লাহোরের পথে। মতি স্কুল এ্যাডজুটেন্টকে জানিয়ে দিয়েছে ট্রেনে না গিয়ে ও By Air Travel করবে। পথিমধ্যে মুলতানে কয়েকদিন কর্নেল সাহেবের পরিবারের সাথে কাটিয়ে চলে যাবে পেশাওয়ার। MS Branch এর কর্নেল সাহেবের নাম শুনে অতি স্বাভাবিকভাবেই তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল স্কুলের Adjutant. একই ফ্লাইটে আমাদের সিট বুক করলাম। Open Arrest এ থাকার ফলে আমরা নূরের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারছিলাম। Closed Arrest হলে ওর সাথে কোন যোগাযোগ রাখা সম্ভব হত না। নূর বন্দী হওয়ার পর থেকেই মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলাম। ওকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যেতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। ঘুরে-ফিরে শুধু একটি কথাই মনে হচ্ছিল, কোন মতেই কি নূরকে উদ্ধার করে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া যায় না? অনেক চিন্তা-ভাবনার পর একটা উপায় আমার মাথায় এল। ১৫ তারিখ সকালে গিয়ে উপস্থিত হলাম মতির মেসে। গিয়ে দেখি মতির ঘর একদম খালি। বুঝলাম মতি তার মালপত্র ব্যাটম্যানের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। বাথরুমে গোসল করছিল মতি। অল্পক্ষণ পরই মতি বেরিয়ে এল,

–কি ব্যাপার স্যার, এতো সকালে আপনি?

–একটা বিশেষ ব্যাপারে আলাপ করতে এলাম। মতি তুমি ভালো করেই জানো নূরের বন্দী হওয়ার পর থেকেই আমি ভীষণভাবে মানসিক অশান্তিতে ভুগছি। সর্বক্ষণ ওকে নিয়েই ভাবছি। বললাম আমি।

–নূরের বিষয়েই কিছু কি? আমার মানসিক অবস্থা আচঁ করেই বোধহয় প্রশ্নটা করল মতি।

–হ্যা তাই, নূরকে সঙ্গে নেবার একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়---। আমাকে শেষ করতে না দিয়েই মতি বলে উঠল,

–Are you mad Sir? বন্দী অবস্থা থেকে তাকে নিয়ে যাবার কথা কি করে ভাবলেন? ওকে সঙ্গে নিলে আমরা ধরা পরতে বাধ্য।

–আহা আগে শোনই না আমার আইডিয়াটা। মতিকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

–বেশ বলেন কি বলতে চান।

-দেখ মতি, নূরই প্রথম আমার কাছে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মানছি হঠাৎ করে ও একটা ভুল করে ফেলেছে। মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। তাছাড়া ওর ভবিষ্যতটা একটু ভেবে দেখ। এ অবস্থায় ওকে অসহায় একা ফেলে রেখে যেতে বিবেকে বাধছে, ওকে ফেলে রেখে যাওয়াটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনা মতি।

-But then how? প্রশ্ন মতির।

-শোন মন দিয়ে। আমি ওর জন্য ৩দিনের Attend 'C' (Sick in quarters) যোগাড় করে আজই ওকে রওয়ানা করিয়ে দিতে চাই ভাওয়ালপুরের উদ্দেশ্যে। ওখানে পৌঁছে সে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ওকে কিছুই বলা হবে না। শুধু এতটুকুই বলা হবে আগামীকাল ভাওয়ালপুর ষ্টেশনে ওর সাথে নির্ধারিত সময়ে আমাদের দেখা হবে। সময় দুপুর ২-৩টার মধ্যে। That's all. এব্যাপারে কোন প্রশ্ন না করে ও যদি যেতে রাজি হয় তবে Let's take him. If at-all something goes wrong with him on his way even then we would be safe, as he wouldn't be in a position to reveal anything about our rout or the next step and thus our secret will not be compromised. What do you say?

-ঠিক আছে, বুঝলাম আপনার প্লানে যুক্তি আছে। কিন্তু Attend 'C' কি করে যোগাড় করবেন? প্রশ্ন মতির।

-First of all tell me do you agree or not to take him with us on principle?

-Well it is still risky but I shall buy it. জবাবে বলল মতি। আনন্দে মতিকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

-Thanks, you are really great Moti. Now come-along and see what I do. গাড়ি করে ছুটে গেলাম CMH এ ষ্টাফ সার্জেন ক্যাপ্টেন জামালের কাছে। আমি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়তেন জামাল। ছাত্র রাজনীতি করার সুবাদে পরিচয় হয় আমাদের সেই পরিচয় আর্মিতে যোগদানের পর আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠে। বয়সে ক্যাপ্টেন জামাল আমার চেয়ে কিছুটা বড় হলেও আমরা একে অপরকে তুমি বলে সম্ভোধন করতাম। CMH এর 'Out Patient' এ গিয়ে দেখি জামাল রুগী দেখায় খুবই ব্যস্ত। এক ফাঁকে এগিয়ে এসে বলল,

-কি বন্ধু হাসপাতালে কেন? বস কিছুক্ষণ একটু হালকা হইয়া লই। জবাবে বললাম,

-না দোস্ত বসনের সময় নাই খুব একটা জরুরী কামে আইছি।

-কও তইলে। মতিকে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম,

-কাইল যাইতাছি, দেখা না কইরা গেলেতো আমারে কাইট্টা ফেলাইতা তাই খোদা হাফেজ কইতে আইলাম। কিন্তু দোস্ত যাওনের আগে একটা শেষ আবদার লইয়া আইছি। নূরের লাইগা ৩দিনের attend 'C' লেইখা দাও। বেচারার মন-মেজাজ খুবই খারাপ। নূরের ঘটনা কোয়েটার সব বাঙ্গালীর মনেই সমবেদনার উদ্রেক করেছিল। অনেকেই ওর প্রতি ছিল sympathetic ক্যাপ্টেন জামাল ছিল তাদেরই একজন। মুহূর্তে র্নিদ্বিধায় এর একটা চিট প্যাডে লিখে সেটা আমার হাতে দিয়ে জামাল বলল,

-এরই মধ্যে একদিন সময় কইরা যামুনে দেখতে কইও তারে। পোলাডা খামাখা নিজেরে কি বিপদেই না ফেলাইছে আল্লাহই জানেন, young blood খুনকা গরমি বুঝলা বন্ধু। অনেকটা আফসোস করেই কথাগুলো বলেছিল জামাল।

-ঠিক কইছো দোস্ত। এখন তাইলে যাই, ভাবীরে বুঝাইয়া কইও সময়ের অভাবে দেখা করতে পারলাম না। বুঝতেই পারো কি তাড়াহুড়ার মইধ্যে আছি। আল্লাহ্ হাফেজ। বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। বিকেল ৩:৩০ মিনিটে 'বোলান এক্সপ্রেস্' এ তুলে দিতে হবে নূরকে। লাঞ্চ সেরে মতি ও আমি সোজা চলে গেলাম নূরের মেসে। গিয়ে দেখি নূর লুঙ্গি পরে খালি গায়ে শুয়ে আছে।

-Get up you lazzy bum! আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলে লুঙ্গি বাধতে বাধতে উঠে বসলো নূর।

-বিনা প্রশ্নে আমার কথা মেনে নিতে রাজি থাকলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে পারি। বলো রাজি। আমার কথা বলার ধরণে প্রথমে কিছুটা ভড়কে গিয়েছিল নূর। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,

-কিন্তু-----।

-কোন কিন্তু নয়। সময় নষ্ট না করে বলো রাজি। দৃঢ়তার সাথে জিজ্ঞেস করলাম আবার।

-রাজি। জবাব দিল নূর।

-বেশ এবার শোন মনযোগ দিয়ে- You have 3days Attend 'C', meanse complete bed rest ok? Send this chit to the adjutant through your batman then give him chutti for 3 days. Call him now and do as I said.

নূর তক্ষুণি তার ব্যাটম্যানকে ডেকে তাকে নির্দেশ দিল chitটা adjutant এর কাছে পৌঁছে দিয়ে ছুটিতে বাড়ি চলে যাবার জন্য। অপ্রত্যাশিতভাবে একসাথে ৩দিনের ছুটি পেয়ে ব্যাটার বত্রিশ দাঁত আর বন্ধই হচ্ছিল না। খুশীর ঠেলায় গদগদ হয়ে লম্বা একটা সেল্যুট মেরে ছুটে চলে গেল হুকুম তামিল করতে।

–এবার কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। একটা হ্যান্ডব্যাগে দুই প্রস্থ extra change ভরে নাও জলদি। তোমাকে বোলান এক্সপ্রেস ধরতে হবে। লাহোর পর্যন্ত টিকিট থাকবে কিন্তু ভাওয়ালপুরে নেমে যাবে তুমি। সেখানে সার্কিট হাউজে অবস্থান নেবে। আগামীকাল দুপুর ২ থেকে ৩টার মধ্যে ভাওয়ালপুর ষ্টেশনে আমরা মিলিত হব ইনশাল্লাহ্। ভাওয়ালপুর পৌঁছে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। সেখান থেকে ভাওয়ালনগর যাবার উপায় কি কি এবং কোন উপায়ে কতটুকু সময় লাগবে সেটা জেনে রাখতে হবে তোমাকে। All the way you will behave like an army officer travelling to your place of posting at Bhawal Nagar. Am I clear?

–Yes Sir. বলেই ছোট একটা হ্যান্ডব্যাগে অতি প্রয়োজনীয় সর্বকিছু গুছিয়ে নিয়ে নূর তৈরি হয়ে নিল। ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমরা ছুটলাম Railway Station. বোলান এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে ছিল। একটা ফার্ষ্টক্লাশ ক্যুপেতে নূরের জন্য একটা সিট রির্জাভ করা হল। নির্দিষ্ট কামরায় উঠে বসলাম আমরা। পকেট থেকে ৫হাজার টাকা, একটা পিস্তল এবং ২৫টা গুলি নূরের হাতে তুলে দিলাম। কোন কথা না বলে সেগুলো ব্যাগে ভরে রাখলো নূর। কিছুক্ষণ পর গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা এবং হুইসেল দু'টোই বেজে উঠল। নূরকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

–Take care. see you tomorrow. খোদা হাফেজ। গাড়ি নড়ে উঠল। আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম। তীব্র হুইসেল বাজাতে বাজাতে বোলান এক্সপ্রেস ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমরাও ফিরে এলাম।

আজ রাতে Div Arty এর তরফ থেকে আমার Farewell dinner তাই মতিকে মেসে নামিয়ে দিয়ে ফেরার সময় বললাম, "কাল এয়ারপোর্টে দেখা হবে।"

মেসে সে রাতে Div Arty-র ব্যান্ড এর সাথে অনেক রাতঅব্দি পানাহার চললো। ব্যান্ডের তালে তালে নাচগানও হল রেওয়াজ অনুযায়ী। বেশ কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করছিলাম সারাদিনের ব্যস্ততায়। তার উপর মাথায় রয়েছে নূরের ব্যাপারে টেনশন। কিন্তু কিছুই করার নেই। সব চিন্তা মনে চেপে রেখে স্বাভাবিকভাবেই সব Formalities শেষ করে অনেক রাতে ফিরে এলাম নিজের কামরায়। সেদিন হঠাৎ করে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় বেশ একটু ঠান্ডা পরেছে। তাই বেয়ারা ঘরের ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সঙ্গে নেবার জিনিষপত্র আগেই গোছগাছ করে রাখা হয়েছে। টেবিলের উপর রাখা আমার সবচেয়ে প্রিয়

ফটো এলবাম দু'টো। সাথেই আখরোটের সুক্ষকাজ করা লেটার বক্সে রাখা আছে নিম্মীর লেখা চিঠিগুলো। বেড-সাইড টেবিলের উপর ফটো ষ্ট্যান্ডে রাখা নিম্মীর ছবিটাকে ভীষণ জীবন্ত লাগছে। মনে হচ্ছে ও যেন গভীর দৃষ্টিতে আমাকে পরখ করে দেখছে। এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কোন সূত্র রাখা চলবে না। এতে করে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ফায়ার-প্লেসের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পোড়াবার আগে শেষবারের মত এলবামের ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। প্রতিটি ছবির সাথে জড়িয়ে আছে একেকটা স্মৃতি। ফটো দেখা শেষ হলে এলবাম দু'টো ছুঁড়ে দিলাম ফায়ার-প্লেসে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। চিঠিগুলোও ফেলে দিলাম সেই আগুনে। মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিল সব। কষ্টে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। সযত্নে তুলে রাখা এতদিনের অমূল্য সম্পদগুলোকে এভাবে বিসর্জন দিতে হবে সেটা কখনো ভাবিনি। আগুনের দিকে চেয়েছিলাম। দু'চোখ বেয়ে নিজের অজান্তেই পানি গড়িয়ে পড়ছিল। অতীতের স্মৃতিতে তলিয়ে গেলাম আমি। মনে পরে গেল নিম্মীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা।

রিয়াজুল ইসলাম চৌধুরী (বাপ্পি)-র বোন নিম্মী। বাপ্পি আমার ঘনিষ্টতম বন্ধুদের একজন। আমি, স্বপন, টুটু, হায়দার, বাপ্পি একে অপরের হরিহর আত্মা। ছুটিতে ঢাকায় এলে ২৪ ঘন্টা একসাথে থাকা, খাওয়া, হৈ হুল্লর করে সময় কাটে আমাদের। কখনো সিনেমা, কখনো পিকনিক নয়তো শিকার এভাবেই আনন্দে কেটে যায় আমাদের সময় ঝড়ের বেগে। এসব কিছু ভালো না লাগলে চলে যাই সিলেটের চা বাগানে, কাপ্তাই-রাঙ্গামাটি কিংবা কক্সবাজার-টেকনাফ। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ছুটিতে ঢাকায় এসেছি। হৈচৈ করে কেটে যাচ্ছিল সময়। একদিন হায়দার খবর নিয়ে এল যমুনার চরে মৌসুমী পাখির আগমন ঘটেছে প্রচুর তাই শিকারে যেতে হবে। শিকারের প্রতি একটা অদ্ভুত নেশা ছিল হায়দারের। সেদিন রাতেই দল বেধে শিকারে বেরিয়ে পরলাম। আরিচা ঘাট পর্যন্ত গাড়িতে তারপর নৌকা যাত্রা। মধ্যরাতের পর খাওয়া-দাওয়ার সেরে নৌকায় উঠলাম। পরদিন দুপুর পর্যন্ত শিকার করে শেষ বিকেলে ফিরে এলাম। শিকার ভালোই পাওয়া গেছে। ১টা রাজহাস, ৪টা চখা এবং ২০টা বালিহাস। শীতকালে মৌসুমী পাখি সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসে বাংলাদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে। গরমের শুরুতেই আবার উড়ে ফিরে যায় তুন্দ্রা অঞ্চলে। পাসপোর্ট কিংবা ইমিগ্রেশনের ঝামেলা নেই তাদের। যখন যেখনে খুশি উড়ে চলে যায় ওরা। শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকেই বৈষয়িক স্বার্থে এই স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। বাসায় ফিরতেই মহুয়া ও কেয়া আমার ছোট দুই বোন বায়না ধরে বসলো, বৃটিশ কাউন্সিলে একটা ফাংশন হচ্ছে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। সারা রাত-দিন শিকারের ধকলে সবাই ক্লান্ত। কেউই ওদের নিয়ে যেতে রাজি হল না। ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও আমি ওদের মানা করতে পারলাম না। অনেক কষ্টে বাপ্পিকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য রাজি করালাম। যখন বৃটিশ কাউন্সিলে পৌঁছলাম তখন রাত ৯টার উপর। বারান্দায় কয়েকটি মেয়ে দাড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। ফাংশন অথচ লোকজনের ভীড় নেই একদম। গাড়ি পোর্চের নিচে দাড় করাতেই মহুয়া কাচ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল,

-এই নিম্মী এদিকে এসো।

নিম্মীটি আবার কে! দেখলাম একটি মেয়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে এল।

-কি এত ফাঁকা কেন? প্রশ্ন করল মহুয়া।

-ফাংশন শেষ। জানাল মেয়েটা। বাপ্পি ওকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল,

-তুমি এখনও এখানে কি করছ?

-রিক্সা পাচ্ছি না। জবাব দিল মেয়েটা। মহুয়াই পরিচয় করিয়ে দিল,

-ভাইয়া, নিম্মী বাপ্পি ভাইয়ার বোন আমাদের হলিক্রসে পড়ে। বাপ্পিদের বাসায় যাওয়া-আসা থাকলেও নিম্মীর সাথে আগে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি।

-চলো না ভাইয়া নিম্মীকে নামিয়ে দিয়ে আসি ফাংশন যখন আর দেখাই হল না। মহুয়া অনুরোধ জানাল।

-বেশ চল। নিম্মীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাপ্পিদের বাসার দিকে রওনা হলাম। উজ্জ্বল শ্যামবর্নের একহারা গড়নের নিম্মী কেয়া-মহুয়ার সাথে পেছনের সিটে বসেছে। বাপ্পি আমার পাশের সিটে। Rear view mirror-এ নিম্মীকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম, সুন্দর ফিগারের অধিকারিণী নিম্মী দেখতে আকর্ষণীয় এবং মিষ্টি। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার চুল। ঘনকালো চুলের একটা অসাধারণ মোটা বেনী হাটু ছাড়িয়ে প্রায় গোড়ালির কাছ অব্দি ঝুলছে। হালফ্যাশানে বাঙ্গালী মেয়েদের মাঝে এ ধরণের ঘনকালো লম্বা চুল খুব একটা দেখা যায় না। গাড়ো নীল রং এর বুটিদার কামিজ ও চুরিদার পায়জামা পরেছিল নিম্মী। কথা বলার ধরণটিও ভীষণভাবে আন্তরিক। সবকিছু মিলিয়ে প্রাণবন্ত উচ্ছল প্রকৃতির নিম্মীকে প্রথম দেখাতেই ভালো লাগল। সেই ভালোলাগা থেকেই ভালোবাসা। আশ্চর্য হয়েছিলাম নিজেই। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি জীবনে শুধুমাত্র লেখাপড়ার জন্যই নয় বিভিন্ন কারণে বেশ নাম ডাক ছিল বরাবরই। একনামে পরিচিত ছিলাম বিভিন্ন মহলে। মেয়েদের সাথে মেলামেশার অবাধ সুযোগও হয়েছে ছোটকাল থেকেই। কিন্তু প্রেম-ট্রেমের ধার ধারিনি কখনো। দু'একটা প্রেমপত্র গল্পের বই আদান-প্রদানের মাধ্যমে হাতে এসে পৌঁছায়নি তাও নয়। কিন্তু সেগুলো মনে তেমন একটা দাগ কাটতে সক্ষম হয়নি। ঘটনাগুলো নেহায়েত নেকামী বলেই মনে হয়েছে সবসময়। অবশ্য পছন্দ না হলেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অনেক বন্ধু-বান্ধবকেই নানাভাবে সাহায্য করতে হয়েছে এ পর্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে। ছাত্র রাজনীতি, খেলা-ধুলা, গান-বাজনা, নাটক, সমাজসেবা ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকাটাই ছিল আমার নেশা। তাই মেয়েদের ব্যাপারে ধ্যান দেবার সময় ছিল না মোটেও। কাউকে দেখে তেমনভাবে আকর্ষণও বোধ করিনি কখনো। সেই আমিই কিনা প্রথম দেখার ভলোলাগা থেকে একেবারে ভালোবেসেই ফেল্লাম নিম্মীকে! এমনটিই বোধহয় হয়। যাকে ভালোলাগে তাকে প্রথম দেখাতেই ভালোলাগে। প্রথমে নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

হয়তোবা ক্ষণিকের মোহ– কিন্তু না এতো মোহ নয়। এরপর যতই দিন গেছে নিম্মীর প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে আমার। গভীর হয়েছে আমার ভালোবাসা। এক অদ্ভুত অনুভূতি! প্রতিদানে নিম্মীও সবটুকু মন উজাড় করে ভালোবেসেছে আমাকে। তার পবিত্র-আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার গহীন অতলে তলিয়ে গেছি আমি। নিম্মী তার প্রথম যৌবনের কুমারী মনের সবটুকু মাধুর্য্য বিলিয়ে দিয়ে একান্ত বিশ্বাসে আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল তার ভালোবাসার জন হিসাবে। আমি স্থান পেয়েছিলাম তার মনের মণিকোঠায়। আমি ধন্য হয়েছি তার ভালোবাসা পেয়ে। আমাদের ভালোবাসাকে সানন্দেই গ্রহণ করে নিয়েছেন দুই পরিবারের সবাই বিশেষ করে গুরুজনরা। খুশী হয়েছে বন্ধু-বান্ধবরা। এবার ছুটি থেকে ফেরার আগে আমাদের বিয়ের ব্যাপারেও সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ বছরের শেষাশেষি কিংবা আগামী বছরের প্রথম দিকে আমাদের বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করেই দৈবচক্রে সবকিছুই ওলোট-পালোট হয়ে গেল। ভবিষ্যত হয়ে উঠল অনিশ্চিত। ঢাকা থেকে ফিরে আসার পর কোন চিঠিপত্র পাইনি ওর কাছ থেকে। জানিনা ঠিক এই মুহূর্তে ও কোথায়, কি অবস্থায় আছে! নিম্মীর বাবা জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৬৯ সাল থেকে কোলকাতায় পাকিস্তান দূতাবাসে কূটনৈতিক হিসেবে পোস্টেড আছেন। তিনি নিম্মীর ছোটবোন মানুকে নিয়ে কোলকাতাতেই থাকেন। খালাম্মা মানে নিম্মীর আম্মা বাপ্পি, নিম্মী এবং নিজের পড়াশুনার জন্য ঢাকাতেই থাকেন অনেকটা বাধ্য হয়েই। ছুটিছাটায় কোলকাতায় যান মানুদের দেখে আসতে। আব্বা, মহুয়া, কেয়া, স্বপন, হায়দার, টুটু, বদি ওদেরও কোন খবরা-খবর নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ওরা কিছুতেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। ওরা নিশ্চয়ই জনগণের সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। আমি যে ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পাড়ি জমাচ্ছি তার জন্য একজন পদস্থ সরকারি অফিসার হিসেবে আব্বার এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর অভিসম্পাত নেমে আসতে পারে। পাক-বাহিনীর অত্যাচারের শিকারেও পরিণত হতে পারেন তারা। কথাটা ভেবে মনটা হঠাৎ করে দুর্বল হয়ে পড়ল। ব্যথায় বুকটা ভারী হয়ে উঠল। কিন্তু না, এ পর্যায়ে এমনভাবে দুর্বল হওয়া চলবে না। সবকিছুর বিনিময়ে এমনকি জীবনের পরোয়া না করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্তে অটল থাকতেই হবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠি, পারিবারিক সব স্বার্থ থেকে দেশ এবং জাতীয় স্বার্থ অনেক বড়। সে প্রশ্নে কোন আপোষ করা চলবে না কিছুতেই। আমার এই সিদ্ধান্তের ফলে কারো কিছু হলে দুঃখ পাবো কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনে কোন অবদান রাখতে না পারলে নিজের কাছে নিজেই হেয় হয়ে যাব। কাপুরুষতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে সারাজীবন। ইতিমধ্যে অনেক দিনের জমানো স্মৃতির নিদর্শনগুলো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সারাদিনের ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত শরীরে। আগামীকাল ভোর ৭টায় এয়ারপোর্টে যেতে হবে তাই শ্লথগতিতে উঠে পরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম।

পরদিন ভোর ৬টায় অভ্যাসমত ঘুম ভেঙ্গে গেল। Mess waiter bed tea দিয়ে গেল। Bed tea শেষে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে শেষ বারের মত ডাইনিং হলে গেলাম নাস্তার

জন্য। Head Waiter ফিদা খান নিজেই সমাদর করে নিজের তদারকিতে নাস্তা করালো। নাস্তা শেষে বয়, বাবুর্চী, ওয়েটার এবং হেড ওয়েটার সবাইকে বকশিশ দিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মেসের সামনের কারপার্ক গাড়িতে ভরে গেছে। Div Arty-র প্রায় সব অফিসারই জমায়েত হয়েছে আমাকে এয়ারপোর্টে See Off করতে যাবার জন্য। ওদের আন্তরিকতা আমাকে বিহ্বল করে তুলেছিল। সামরিক জান্তার পাশবিকতা আর এদের বন্ধুসুলভ আন্তরিকতায় কত তফাৎ! ভাবছিলাম আজ ইয়াহিয়া খান ও তার দোসররা রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারের যে ষ্টিমরোলার চালিয়ে দিয়েছে তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কতটুকু সমর্থন রয়েছে? সময় হয়ে এল। আমার CO মিয়া হাফিজ এসে বললেন,

-Sharif it's time, let's go.

-Yes Sir. বলে যারা এয়ারপোর্টে যাবে না তাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্নেল হাফিজের পাশে গাড়িতে উঠে বসলাম। তিনি গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার সাথে সাথে যারা যাবার তারা সবাই যার যার নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠে বসলো। কাফেলা চললো এয়ারপোর্টের দিকে। মিনিট বিশেকের মধ্যেই এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম। মতি আমার আগেই পৌঁছে Check-in করে অপেক্ষা করছিল।

-আরে মতি তুমি এখানে? ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা করলাম।

-মুলতান যাচ্ছি পেশাওয়ারের পথে। জবাবে বলল মতি।

-I see that's good. প্লেনে তাহলে গল্প করে সময়টা ভালোই কাটবে। বললাম আমি। Check-in পর্ব শেষ করে সবার সাথে কথাবার্তা বলছিলাম, হঠাৎ দেখি Div Arty Commander ব্রিগেডিয়ার বাদশা এয়ারপোর্টে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির। ব্রিগেডিয়ার বাদশা আমাকে A young good gunner officer হিসেবে খুবই স্নেহ করতেন। ব্রিগেডিয়ার বাদশা জাতিতে পাঠান। তিনি এগিয়ে আসতেই আমরা সবাই সেল্যুট করে দাড়ালাম।

-আলাকা শরিফ তু হামকো ছোরকে যা রাহা হ্যায় ইস্‌লিয়ে হামে দুখ্ হ্যায়, লেকিন এহি জিন্দেগী হ্যায় বেটা। নয়া ইউনিটমে আচ্ছা রেহ্‌না অওর খোশ রেহ্‌না এহি মেরা দোয়ায়ে হ্যায়। পিতৃসুলভ ব্রিগেড কমান্ডারের কথাগুলো মনে দাগ কেটেছিল। বোর্ডিং এর ঘোষণা হল। সবার সাথে কোলাকুলি করে বিদায় নিলাম। ব্রিগেডিয়ার বাদশার ইশারায় কয়েকজন Young officers কাঁধে তুলে নিয়ে 'He was a jolly good fellow' বলতে বলতে প্লেনের সিড়ি অব্দি বয়ে নিয়ে গেল। পুরনো বন্ধুদের ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছিল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে প্লেনে উঠে বসলাম। মতিও উঠে বসেছে। জানালা দিয়ে দেখলাম সবাই লাইন করে দাড়িয়ে হাত নাড়ছে। অল্পক্ষণ পরেই প্লেন ষ্টার্ট

নিয়ে Take-off করল। সবাই তখনও দাড়িয়ে। কেউ কেউ রুমাল নাড়িয়ে শেষ বিদায় জানাচ্ছিল। প্লেন এয়ারপোর্টের উপর দু'টো চক্কর দিয়ে মেঘের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে গেল। সবাইকে পিছনে ফেলে প্লেন উড়ে চললো মুলতানের উদ্দেশ্যে। এভাবেই শুরু হল আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই আমাদের বহনকারী ফোকার-ফ্রেন্ডশিপ বিমানটি মুলতান এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। প্লেন থেকে বেরুতেই মুখে লাগল গরম বাতাসের ঝাপটা। কোয়েটার তুলনায় মুলতানের আবহাওয়া অনেক উষ্ণ। ভাওয়ালপুর ভাওয়ালনগরের দিকে উষ্ণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। ছোট এয়ারপোর্ট ক্যান্টনমেন্টে এরিয়ার মধ্যেই অবস্থিত।ং প্লেন থেকে অবতরণ করে ট্রানজিট লাউঞ্জে না গিয়ে মতির সাথে সোজা চলে গেলাম Arrival এ। ওখানে PIA কাউন্টারে গিয়ে আমার লাহোর যাওয়া Cancel করে দিয়ে বেরিয়ে এলাম এয়ারপোর্ট থেকে। মুলতান শহর এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় ৫মাইল দূরে অবস্থিত। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা চলে এলাম শহরে। কিছু কেনাকাটা করার ছিল। Survival Kit, FirstAid Box, Anti Snake Bite Kit এগুলো সব সঙ্গে করে আনা হয়েছে। তিনজনের জন্য Desert Shoes, এক বোতল ব্রান্ডি, সুইটস-চুইঙ্গাম, বিস্কিটস, কিছু ড্রাই ফ্রুটস প্রভৃতি কেনা হল। তারপর গেলাম সোনার দোকানে। ওখানে দু'টো আংটি বানালাম একেকটা দেড় ভরি ওজনের। একটাতে খোদাই করলাম 'S' এবং অন্যটাতে 'M'। আমি ও মতি আংটি দু'টো পরে নিলাম। কেনাকাটার পাঠ চুকিয়ে গেলাম Railway Station-এ। ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম ১২টার ট্রেন ধরলে দু'টো-সোয়া দু'টোর মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে ভাওয়ালপুর। ঠিক করলাম দুই বাঙ্গালীর একসঙ্গে সফর করাটা ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়া হল মতি যাবে ট্রেনে আর আমি যাব বাসে। বাসে করে আমি মতির আগেই পৌঁছে যাব ভাওয়ালপুর। ওখানে ষ্টেশনে মিলিত হব আমরা। মতিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ট্যাক্সি করে গিয়ে পৌঁছালাম বাস ষ্ট্যান্ডে। প্রতি ১৫মিনিট অন্তর বাস ছাড়ছে ভাওয়ালপুরের উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষমান বাসে উঠে বসলাম। মালপত্রের বেশিরভাগই মতি নিয়ে গেছে সাথে। আমার কাছে রয়েছে হালকা ছোট্ট একটা ব্যাগ। দু'টো বাজার আগেই পৌঁছে গেলাম ভাওয়ালপুর। বাস ষ্ট্যান্ডে নেমে টাঙ্গা করে পৌঁছলাম ষ্টেশনে। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূর প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে একটা খবরের কাগজ হাতে দাড়িয়ে আছে। সোয়া দু'টোর দিকেই মতির ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে এসে দাড়াল। মতি নাএল ট্রেন থেকে। একে অপরের সাথে চোখাচোখি হল কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বললাম না। তিনজনেই আলাদাভাবে সার্কিট হাউজে পৌঁছলাম। নূরের ঘরে ঢুকেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম উল্লাসে। নূর আগেই আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ঘরেই লাঞ্চ করলাম। লাঞ্চের সময় নূর জানাল পথে ওর কোন অসুবিধেই হয়নি। আরো জানাল ভাওয়ালপুর থেকে ভাওয়ালনগর দু'ভাবে যাওয়া সম্ভব। ট্রেনে করে গেলে লাগবে ঘন্টা তিনেক। ট্রেনের সময় বিকেল ৪টা। আর ট্যাক্সিতে গেলে সময় লাগবে বড়জোর ঘন্টা দু'য়েক। ঠিক হল ট্যাক্সিতেই যাব। কারণ ভাওয়ালনগর থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ট্রেন ধরতে হবে আমাদের। প্রতিদিন দু'টোই ট্রেন যায় ভাওয়ালনগর

থেকে ফোর্ট আব্বাস, একটা সকালে অপরটি সন্ধ্যায়। সাড়ে সাতটার ট্রেন মিস করলে পুরো রাতটা কাটাতে হবে ভাওয়ালনগরে। সেটা হবে আমাদের জন্য খুবই বিপদজনক কারণ সমস্ত ভাওয়ালনগরটাই একটা ক্যান্টনমেন্ট। লোকাল ট্রেনের সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কোনরকম রিস্ক নেয়া চলবে না। ট্যাক্সিতে গেলে সাড়ে সাতটার অনেক আগেই পৌঁছে যাব ভাওয়ালনগর। কিছু সময় বিশ্রাম করে বিকেল ৪টায় একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে রওনা হলাম ভাওয়ালনগরের উদ্দেশ্যে। সিন্ধী ড্রাইভার। ওকে বললাম, সাতটার মধ্যে ভাওয়ালনগর পৌঁছে দিতে পারলে বকশিশ মিলবে। তরুণ ড্রাইভার জবাবে বলল, "কই বাতই নেহি হ্যায় সাব। আপকো সাতসে পেহলেই পৌঁহচা দেঙ্গে।" উল্কাবেগে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। শেভ-ইম্পালা গাড়ি। সৌখিন ছোকরা ক্যাসেটে ফিল্মী গান লাগিয়ে দিল। আমরা চুপচাপ বসে গান শুনছিলাম আর ভাবছিলাম ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যত। এক সময় ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ বিকট একটা শব্দে চমকে তিনজনেই জেগে উঠলাম। একটা ঝাকুনি দিয়ে ট্যাক্সি ততক্ষণে থেমে গেছে। "কি হল? ব্যাপার কি?" প্রায় একেইসাথে বলে উঠলাম তিনজনে। "দেখতে হেঁ সাব" বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল ড্রাইভার। কিছুক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফিরে এসে বলল,"গাড়িকা ক্র্যাঙ্কশাফ্ট টুট গিয়া।" বলে কী ব্যাটা! "ফির আব হাম কেয়া করেঙ্গে?" জিজ্ঞেস করল নূর। "ঘাবড়াও মাত স্যার, পাঁচছে মিল রেহেতে হ্যায় কোই না কোই সোয়ারী জরুর মিল যায়েগা উসমে বেঠা দেঙ্গে আপলোগকো।" কি সর্বনাশ! তবে কি ঘাটে এসে তরী ডুবল? গাড়িটাকে সবাই মিলে ঠেলে রাস্তার সাইডে রাখা হল। অন্য কোন গাড়ি না আসা পর্যন্ত কিছুই করার নেই। অপেক্ষা করতে করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। দূরে ভাওয়ালনগরের বাতিগুলো এক সময় জ্বলে উঠল। ৭টা বেজে গেল কোন গাড়ির লক্ষণ নেই। অস্থির হয়ে উঠলাম সবাই। হতাশায় মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলাম প্রায়। হঠাৎ দূরে গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল: কিছু একটা আসছে ভাওয়ালপুরের দিক থেকেই। রাস্তা ব্লক করে দাড়ালাম চার জনেই। যাই হোক না কেন থামাতে হবে। কাছে আসতে দেখলাম একটা ল্যান্ডরোভার। আমরা হাত দিয়ে ইশারা করায় গাড়িটা থামল। Roads & Highways এর এক ইঞ্জিনিয়ার যাচ্ছেন ভাওয়ালনগর। ভদ্রলোককে সবকিছু বুঝিয়ে বললাম।

তিনজন আর্মি অফিসারের দুর্গতি দেখে ভদ্রলোক সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন,

–আপনাদের কষ্ট না হলে আমি আপনাদের নিয়ে যেতে পারি।

–কষ্ট! হাতে আকাশের চাঁদ পেলাম। ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে মালপত্র নিয়ে জিপে উঠে বসলাম। অধাঘন্টার মধ্যেই ভাওয়ালনগর পৌঁছে গেলাম। তখন রাত পৌনে আটটা। আমাদের ট্রেন নিশ্চয়ই এতক্ষনে ছেড়ে চলে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,

–কোথায় নামবেন? ষ্টেশন এর কথা না বলে বললাম,

–শহরের যে কোন খানে নামিয়ে দিলেই চলবে। Town Centre এ নামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। সেখান থেকে একটা টাঙ্গা করে কাছেই ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি অসম্ভব ভীড়। এমনটি তো হবার কথা নয়। ট্রেন চলে যাবার পর ষ্টেশন থাকবে জনশূন্য তাহলে এত লোক কেন ষ্টেশনে? ট্রেন কি তাহলে এখনও আসেনি? হঠাৎ করে কিছুটা আশার আলো ঝলকে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম,

–ফোর্ট আব্বাসের ট্রেনের খবর কি? দু'বাক্যে ষ্টেশন মাষ্টার বললেন,

–ট্রেন লেট, এখনও এসে পৌঁছেনি।

জানে পানি ফিরে এল। দৌড়ে গিয়ে মতি ও নূরকে খবরটা দিতেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওরা লাফ দিয়ে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়ল। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে প্লাটফর্মে চলে এলাম। পথে একটি ভিক্ষুক দাড়িয়েছিল। আনন্দের আতিসয্যে একশ টাকার একটি পুরো নোটই তাকে দিয়ে দিলাম। সোয়া আটটায় আমাদের ট্রেন এল। ফর্ষ্টক্লাসের তিনটি টিকেট কাটা হল ফোর্ট আব্বাস পর্যন্ত। বর্ডার এলাকার ট্রেন। আমাদের মত ফৌজি ছাড়া ফার্ষ্টক্লাশের যাত্রি বিরল। অতি সহজেই একটা খালি কামরা পেয়ে উঠে বসলাম। ট্রেনে উঠেই বুফে কার থেকে ডিনার আনাবার বন্দোবস্ত করা হল। খাবার সার্ভ করে গেল বেয়ারা। দরজা বন্ধ করে খাওয়ার পাঠ চুকিয়ে নিলাম। ট্রেন ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে। খাওয়া শেষ করার পর পদযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। সবাই ডার্ক কালারের কাপড় পরে নিলাম। আমাদের কাছে তখন সর্বমোট প্রায় হাজার বিশেক টাকা। ওগুলো কাপড়ের বিভিন্ন চোরা পকেটে ঢোকানো হল। স্যুটকেস থেকে হ্যাভারস্যাক বের করে ওতে তিন জনের আর এক প্রস্থ করে কাপড় নেয়া হল। প্রয়োজনীয় সাথে নেবার সবকিছু রাখা হল হ্যাভারস্যাক এ। ম্যাপ বের করে নাইট মার্চ চার্ট আঁকা হল। পাকিস্তানের মটরাইজড ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের ডিফেন্সিভ এলাকার মধ্য দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির একটি ট্যাংক রেজিমেন্টের হেডকোয়টার্স এর পাশ ঘেঁষে যেতে হবে আমাদের। রাস্তায় পড়বে এ্যান্টি-ট্যাংক অবসট্যাকল মাইন ফিল্ড। এদের মাঝে গ্যাপ বের করে নিয়ে যাত্রাপথ নির্ধারন করা হয়েছে। পথে দুই তরফের পেট্রোল পার্টির মোকাবেলায় পড়তে হতে পারে। সিদ্ধান্ত নেয়া হল যেকোন উপায়েই হউক own troops and enemy Troops-কে এড়িয়ে চলতে হবে আমাদের। নেহায়েত বিপাকে পড়লেই সংঘর্ষের মাধ্যমে শত্রুকে পরাস্থ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। কোন অবস্থাতেই ধরা পড়া চলবে না। ধরা পড়ার আগেই আমরা আত্মহত্যা করব। কোন কারণে অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ব্যক্তিগত উদ্যোগে করনপুর পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে। কম্পাসে রুট এবং বিয়ারিং সেট করা হল, পরা হল Desert shoes. হাতিয়ার এবং গুলি নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিলাম। ম্যাপ, কম্পাস,

বাইনোকুলার, নাইট মার্চ চার্ট, একটি টর্চ, একটি কম্বল এবং সাথে নেবার হ্যাভারস্যাকটি ছাড়া সবকিছুই সুবিধামত কোন জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে হবে। নিজেদের ID Card ছাড়া অন্যান্য সব কাগজপত্র পুড়িয়ে টয়লেট দিয়ে ফেলে দেয়া হল ট্রেন থেকে। ক্যামেরা দু'টো হ্যাভারস্যাকে ভরে নিলাম। ছোট্ট কোরআন শরীফটাও নেওয়া হল হ্যাভারস্যাকে। অর্ডার অফ মার্চ – মতি আগে তারপর আমি, পেছনে নূর। হ্যাভারস্যাক পালাক্রমে বহন করা হবে। মার্চের সময় প্রতি এক ঘন্টা অন্তর দশ মিনিট বিরতি। বিরতিকালে কম্বলের নিচে ঢুকে টর্চের আলোয় ম্যাপ দেখে নেয়া হবে, ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা? প্রয়োজনে কম্পাস বিয়্যারিং এ্যাডজাষ্ট করা হবে। আমরা তিনজনই কমান্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত। নাইট মার্চের সব কৌশলই আমাদের নখদর্পনে।

রাত দশটা বেজে পনেরো মিনিটে আমাদের ট্রেন হারুণাবাদ ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। ছোট্ট ষ্টেশন। প্ল্যাটর্ফমের যেখানে আমাদের বগিটা গিয়ে থামল সেখানে বেশ জমাট অন্ধকার। আমরা নেমে পড়লাম। অল্প কয়েকজন যাত্রী উঠা-নামা করল। আমরা আঁধারে চুপ করে দাড়িয়ে থাকলাম। অল্পক্ষণ পর হুইসেল দিয়ে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। যে সমস্ত যাত্রি ট্রেন থেকে নেমেছিল তারা সবাই ষ্টেশনের চেকিং গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে। চুপচাপ দাড়িয়ে আমরা জায়গাটা ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। অপর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আলোয় ষ্টেশন ঘরটার সামনে কিছুটা অংশই আলোকিত হয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের বেশিরভাগ অংশই ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ষ্টেশনের বাইরে একটা মাঝারি আকারের উঠান, কয়েকটি চায়ের দোকান, তাদের সামনে কয়েকটি টাঙ্গা যাত্রিদের অপেক্ষা করছে। চার পাঁচশ গজ দূরে হাইওয়ে রেল লাইনের প্রায় সমান্তরালভাবেই উত্তর দক্ষিনে চলে গেছে। মাঝে মধ্যে দূরপাল্লার বড় বড় ট্রাকগুলো আওয়াজ তুলে ভীষণ বেগে আসা-যাওয়া করছে। রাস্তার ওপারেই হারুণাবাদ শহর। শহর বলতে একটি বর্ধিষ্ণু বাজার। বাজারের চারদিকে জনবসতি। আমরা হারুণাবাদ শহরের ডানদিক দিয়ে প্রয়োজনীয় দুরত্ব বজিয়ে রেখে যাত্রা শুরু করব। একেতো বর্ডার এলাকার মরু অঞ্চল, রাতও বেশ হয়েছে, লোকজন নেই খুব একটা, সমস্ত শহরটাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা প্ল্যাটফর্ম খালি হয়ে যাবার পর ষ্টেশনের সদর দরজার দিকে না গিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এলাম। অতি সাবধানে হাইওয়ে ক্রস করে একটা বাবলা ঝোপের মধ্যে অবস্থান নিলাম। হারুণাবাদ শহরের বসতির শেষপ্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে মরুভূমি। উচু-নিচু বালির পাহাড়। মাঝে মধ্যে কাটার ঝোপঝাড়। যে জায়গায় পানির আধার রয়েছে সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গৃহস্থালি। তাকে কেন্দ্র করেই ছোট ছোট চাষাবাদের খামার। অরহর, কলাই, যব, ভুট্টার ক্ষেত। মোটামুটি এ ধরণের টেরেনই (Terrain) অতিক্রম করে যেতে হবে আমাদের। যাত্রা শুরু করার আগে আমি ও মতি কম্বলের নিচে বসে কম্পাস সেটিং ও

নাইট মার্চ চার্ট ঠিক করে ম্যাপের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। ম্যাপ অনুযায়ী আমাদের অবস্থানের অদূরেই একটি কারেজ থাকার কথা। কারেজ হল মরু অঞ্চলে গভীর কুয়োঁর সারি। এগুলো খুঁড়ে তাতে বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখা হয় প্রয়োজনমত ব্যবহার করার জন্য। আবাদি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে কারেজ থেকে। নূরকে পাঠানো হল কারেজটি খুঁজে বের করার জন্য। উদ্দেশ্য আমাদের সাথের মালপত্র সব কারেজের কুয়োতেই ডাম্প করব। সেটাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ। অল্পক্ষণ পরেই নূর কারেজের সন্ধান বের করে ফিরে এল। আমরা সবাই হ্যাভারস্যাকটা রেখে বাকি মালপত্র সব নিয়ে গিয়ে কারেজের একটি কুয়োতে ফেলে দিয়ে এলাম। এবার সর্বিকভাবে যাত্রা শুরু করতে আমরা প্রস্তুত। বিসমিল্লাহ্ বলে আমরা পদযাত্রা শুরু করলাম শ্রীকরনপুরের উদ্দেশ্যে। ঘন্টায় গড়ে চার থেকে পাঁচ মাইল বেগে চলতে হবে। আকাশে বড় একটা চাঁদ। সপ্তঋষীর মন্ডল, ধ্রুবতারা, ক্যাসোপিয়া, ওরিয়েন্ট বেল্ট সবগুলোই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কম্পাস ছাড়া তারকারাজির সাহায্যেও আমাদের পদযাত্রা চলতে পারে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কিভাবে তারকারাজির সাহায্যে গন্তব্যস্থলে পৌছতে হবে সেটা আগেই ভালো করে রপ্ত করে নিয়েছি প্রত্যেকে। প্রথম ঘন্টা কেটে গেল নির্বিঘ্নে। পথে কোন লোকজনের সামনা-সামনি হতে হয়নি। বিরতি কাটিয়ে চলা শুরু হল আবার। মিনিট দশেক পর থমকে দাড়িয়ে পড়ে ইশারা করল মতি। এন্টি-ট্যাংক অবসট্যাকল (Anti Tank Obsticle) সামনে। একটি খাল, খালে পানি। খালের দুই দিকেই ৬০° এ্যাঙ্গেলের বেশি উচু পাড়। Any obsticle is always covered by fire তাই ক্রসিং এর আগে প্রথমে রেকি করতে হবে। মতি ও আমি চললাম। একে অপরকে কভার করে চলেছি। কিছু হলে যাতে অবস্থার মোকাবেলা করা যায়। নূর অপেক্ষায় থাকল একটি বাবলা ঝোপের আড়ালে। রেকি করে দেখলাম। খালে বুক পর্যন্ত পানি। হেটেই ক্রস্ করা যাবে অসুবিধা নহৈ। স্রোতও নেই তেমন। পাড়ে বসে ইনফ্রারেড বাইনোকুলার দিয়ে ক্রসিং এলাকাটা ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। মতি ফিরে গিয়ে নূরকে সাথে করে নিয়ে এল। অল ক্লিয়ার এর আদেশের সাথে সাথে একে একে ট্যাকটিক্যাল ক্রসিং শুরু হল। সবার শেষে আমিও পার হয়ে গেলাম। ওপারে উঠে রুট অনুযায়ী আবার যাত্রা শুরু করলাম। গতি এবং সময়ের সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে অবিরাম ছুটে চলেছি নিঃশব্দে। ইশারা সঙ্কেতে প্রয়োজনমত ভাবের আদান-প্রদান চলছিল। আর দশ মিনিট হাটলেই দ্বিতীয় বিরতি। মতি সঙ্কেত দিল। সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম। দেখলাম চারটি উটের একটি ছোট কাফেলা। একটি বর্ডার পেট্রোল। মরু অঞ্চলে এভাবেই একটি BOP (Border Observation Post) থেকে অন্য BOP-তে পেট্রোলিং করা হয়ে থাকে উটের পিঠে চড়ে। ক্রলিং করে কাছেই কাটা ঝোপের মাঝে আস্তে ঢুকে গিয়ে পজিশন নিয়ে নিথর হয়ে শুয়ে থাকলাম। পেট্রোলটি উত্তর দিকে চলে গেল। ওরা হদিসও পেলনা তাদের উটের প্রায় পায়ের নিচেই শুয়ে রয়েছে জলজ্যান্ত

তিনজন লোক। আমরা উঠে আবার হাটা শুরু করলাম। দ্বিতীয় বিশ্রামের পর কিছুদূর যেতেই মাটি খোড়ার শব্দ দূর থেকে ভেসে এল। থমকে দাড়িয়ে পড়লাম আমরা। ম্যাপ অনুযায়ী এখানেতো কোন পক্ষেরই কোন ডিফেনসিভ পজিশন থাকার কথা নয়। তবে মাটি খুঁড়ছে কারা? মতিকে পাঠানো হল রেকি করতে। একটি নতুন ডিফেন্সিভ লাইন তৈরি করতে বাংকার খোঁদা হচ্ছে। তাই নির্ধারিত রুট থেকে একটু বেঁকিয়ে কিছুদূর যেয়ে পরে আবার নির্ধারিত রুটে ফিরে আসতে হবে আমাদের। সেভাবেই কম্পাস বিয়ারিং এবং নাইট মার্চ চার্ট সেট করে আবার যাত্রা শুরু করলাম। ডিফেন্সিভ পজিশন বাইপাস করে এগিয়ে চললাম আমরা।

এখানে আর একটি নালা কেন? তবে কি আমরা ভুল পথে এগোচ্ছি? যাত্রা থামিয়ে ঝোপের আড়ালে তিনজনেই কম্বলের তলায় ঢুকে ম্যাপ দেখতে লাগলাম গভীর মনোযোগ দিয়ে। না আমরা ঠিক পথেই চলেছি। ওটা নতুন করে খোঁড়া হয়েছে। তবে সেটার অবস্থান ম্যাপের মার্কিং-এ নেই কেন? আমরা বর্ডার ক্রস করে ভারতীয় ডিফেন্সের সীমানায় ঢুকে পড়েছি। ঘড়িতে তখন আড়াইটা বাজে। হিসেবমত আমরা এখন ভারতীয় সীমার ভিতরে। এটা ভারতীয় ডিফেন্স এর অবসট্যাকল নতুন করা হয়েছে বিধায় ম্যাপের মার্কিং-এ নেই। একইভাবে সতর্কতার সাথে খালটা ক্রস্ করে পাড়ে উঠে এলাম। এখন থেকে বিপদের ঝুঁকি অনেক বেশি। চলতে হবে খুব সাবধানে। আর এক দেড় ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবার কথা শ্রীকরনপুর শহরের সীমানায়। খালের পরই দেখলাম বাংকারে ভারতীয় সাজোয়া বাহিনীর ট্যাংকগুলো ডিপ্লয় (Deploy) করা আছে। বাংকারগুলো থেকে মাঝে মাঝে মানুষের কথোপকথোনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। গভীর রাত; তাই সমস্ত এলাকা জুড়ে ছিল অস্বাভাবিক নিঃস্তব্ধতা। আমাদের এগিয়ে চলার জন্য এ ধরণের পরিবেশ অতি অনুকুল। চারিদিকে সর্তক দৃষ্টি রেখে ক্ষিপ্র গতিতে ভারতীয় ডিফেন্স এর বুহ্য ভেদ করে এগিয়ে চললাম আমরা। কেউ কিছু টের পেল না। বেশ কিছুদূর চলে এসেছি। হঠাৎ দেখি অল্প দুরত্বে কয়েকটি ট্যাংক। কতগুলো গাড়ি সেগুলোকে ঘিরে রয়েছে। বুঝলাম এটি হেডকোয়ার্টার্স। ঐ অবস্থানকে পাশ কাটিয়ে চুপিসারে এগিয়ে চললাম গন্তব্যস্থলের দিকে। ইতিমধ্যে দূরদিগন্তে শ্রীকরনপুরের আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছিল। আর মাত্র চার/পাচঁ মাইলের পরই পৌঁছে যাব শ্রীকরনপুরে। আমাদের জোশ দ্বিগুন হয়ে গেল। পথের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে প্রায় দৌড়ে এগুতে থাকলাম সেই আলোকচ্ছটার দিকে। পৌনে চারটায় পৌঁছে গেলাম শ্রীকরনপুর শহরের সীমানায় একটি গ্রামে। গ্রামের প্রায় সবগুলি ঘর মাটি দিয়েই গড়া। প্রতিটি বাড়ির আঙ্গিনা মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গ্রামের ভেতর কুকুর ডাকছে। আমরা একটি পরিত্যাক্ত বাড়ির উঠোনে গিয়ে বসলাম। উঠোনটিও মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বসে বসে ভাবছি এখন আমাদের কি করা উচিৎ? ঠিক এ মুহূর্তে এমন অসময়ে জনবিরল শহরে আমাদের ঢোকা ঠিক হবে কিনা? অপরিচিত শহরে এমন অসময়ে তিনজন লোক ঘোরাঘুরি করাটা সন্দেহজনক

হবে। তাই ঠিক করা হল সকাল হওয়ার পর আমরা শহরে ঢুকে জনগণের মধ্যে মিশে যাব। তারপর ঠিক করা হবে কি হবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। চুপচাপ বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ করে ট্রেনের আগমনের আওয়াজ পেলাম। দেয়ালের বাইরে উকিঁ মেরে দেখলাম প্রায় ৬-৭শত গজ দূরে একটি ট্রেন ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে থামল। বুঝলাম এটা একটা ষ্টেশন। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ট্রেনে করে এই মুহূর্তেই পালাতে হবে বর্ডার এলাকা ছেড়ে। দৌড়ে ছুটলাম ষ্টেশনের দিকে। কাছে পৌঁছে দেখলাম লাল রঙ্গের একটি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে আছে। কোথাকার ট্রেন কোথায় যাবে কিছুই জানিনা: শুধু বুঝলাম এটা যাত্রী বহনের ভারতীয় ট্রেন। ষ্টেশনে লোকজন একদম কম। দৌড়ে গিয়ে একটি খালি কামরায় উঠে গেলাম নির্দ্বিধায়। উঠেই দরজা-জানালা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেন সিটি বাজিয়ে ছেড়ে দিল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাচঁলাম প্ল্যাটফর্মে উঠেই লক্ষ্য করেছি ষ্টেশনটির নাম শ্রীকরনপুর। শ্রীকরনপুর রাজস্থান প্রভিন্সের জেলা শ্রীঙ্গানগরের অধীন একটি সাব ডিভিশন। আমাদের লক্ষ্য দিল্লী পৌছানো। ট্রেনতো যাচ্ছে দক্ষিনে কিন্তু আমাদের যেতে হবে উত্তর দিকে। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি একটি ষ্টেশনে এসে দাড়াল। একটি জংশন ষ্টেশন। উল্টো দিক থেকে আর একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আগমন ঘটল। আমরা আস্তে করে ট্রেন বদল করে অন্যটির একটি খালি কামরায় উঠে বসলাম। আমাদর ট্রেনটাই আগে ছাড়ল। চলেছি উত্তর দিকে। পথিমধ্যে আবার শ্রীকরনপুর পড়ল। করনপুর পেছনে পড়ে থাকল। আমাদের ট্রেন আমাদের নিয়ে ছুটে চলল। শারিরীক ক্লান্তি এবং মানসিক উৎকণ্ঠা সব মিলিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানিনা। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে জেগে উঠলাম। জানাল খুলে দেখি সকাল হয়ে গেছে। ষ্টেশনের নাম শ্রীগাঙ্গানগর। সবাই মহা খুশি। নেমে পড়লাম ষ্টেশনে। বর্ডার থেকে তখন আমরা অনেকে ভিতরে চলে এসেছি। আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে যেয়ে ডুকলাম। হাত মুখ ধুয়ে পোষাক বদলিয়ে ভদ্র হয়ে নিলাম প্রথমে। তারপর বসলাম ঠিক করতে, কি করা যায়? ঠিক হল এখন থেকে আমরা তিনজনই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। স্টাডি ট্যুর-এ বেড়িয়েছি, পুরো রাজস্থান ঘুরে বেড়াচ্ছি। তিনজনেই হিন্দু নাম গ্রহণ করলাম। আমি হলাম শ্রী সৌমেন ব্যানার্জি। মতি শ্রী মনোজ বোস আর নূর শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। টাকা-পয়সার বন্দোবস্ত করতে হবে। কোলকাতা থেকে আগত বাঙ্গালী ছাত্র তাই পাকিস্তানী টাকা ভাঙ্গানো বিপদজনক হবে। ঠিক হল আংটি দু'টো বিক্রি করার চেষ্টা করতে হবে। ষ্টেশন মাষ্টারের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম শহর ষ্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। দোকানপাট ৯টার আগে খুলবে না। অগত্যা ৯টা পর্যন্ত ওয়েটিং রুমেই অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক ৯টায় তিনজনই বেরিয়ে পড়লাম। আমার ও মতির গলায় ঝুলিয়ে নিলাম ক্যামেরা দু'টো, নূরের পিঠে হ্যাভ্যারস্যাক। চোখে রেবনের সানগ্লাস, টুরিষ্টের মতই লাগছিল তিনজনকে। শহরে পৌঁছে দেখলাম

কয়েকটা রাস্তাকে কেন্দ্র করেই ডিষ্ট্রিক হেডকোয়াটার্স গাঙ্গানগর শহর। মফস্বল শহর তাই খুব একটা বড় নয়। শহরের প্রধান রাস্তাগুলির দুই দিকে সব দোকানপাট। একসাথে দুই তিনটি সোনার দোকান। সবচেয়ে বড়টিতে গিয়ে ঢুকলাম। দোকানের মালিক ধুতি নিমা পড়া তিলক কাটা মোটা গোছের একটি লোক ধুপধুনো জ্বেলে গদিতে বসে পূঁজো করছিলেন। পূঁজা সেরে হরিণাম জপতে জপতে আমাদের কাছ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন,

–কি চাই? জবাবে বললাম,

–আমরা ছাত্র। কোলকাতা নিবাসী। স্টাডি ট্যুরে এসে টাকা-পয়সার অভাব দেখা দিয়েছে: তাই আংটি দু'টো বিক্রি করতে চাই।

আংটি দু'টো হাতে নিয়ে পরখ করে দেখে মালিক বলল,

–চারশো টাকা পাবে। বলে কি ব্যাটা! আমরা জানি পাকিস্তান থেকে ভারতে সোনার দাম বেশি। তাছাড়া ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যও অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে মালিক আমাদের যে দাম দিতে চাচ্ছে তার দ্বিগুন দামই আমাদের পাওয়া উচিত। ব্যাটা বেনিয়া আমাদের অসুবিধার সুযোগ নিয়ে ডাহা ঠকাবার চেষ্টা করছে। ভীষণ রাগ হল তার ফন্দি বুঝতে পেরে। আংটি দু'টো ফেরত নিয়ে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। অন্য দোকানে আর গেলাম না। বুঝতে পারলাম ওতে বিশেষ লাভ হবে না। ভীনদেশে অবস্থার সুযোগ নিয়ে সব বেনিয়াই ঠকাবার চেষ্টা করবে। ঠিক করলাম একটা ক্যামেরা বেচে দেব। একই রাস্তার উপর সবচেয়ে বড় ক্যামেরার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দোকানের মালিক ২৪-২৫ বয়সের এক তরুণ। জামা কাপড়ে বেশ ফিটফাট। হিন্দী-উর্দু মিশিয়ে তাকে আমাদের সমস্যা বুঝিয়ে বললাম,

–একটা ক্যামেরা বেচে দিতে চাই। তরুণ যুবক আমাদের অবস্থা শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। ক্যামেরা দু'টো হাতে নিয়ে বলল,

–এতো অত্যন্ত দামী ক্যামেরা। বিদেশ থেকে ইম্পোর্টেড?

–হ্যাঁ ভাই বিদেশ থেকেই প্রবাসী আত্মীয়ের মাধ্যমে খুব শখ করে আনিয়েছিলাম। নেহায়েত বিপাকে পড়েই বিক্রি করতে হচ্ছে।

–কিন্তু এতো দামী ক্যামেরা এই ছোট শহরে ভালো দামে বিক্রি করতে পারবে না। তাছাড়া শখের জিনিষ কষ্ট করে আনিয়েছ বিক্রি করে দিলে আর কিনতেও পারবে না। তাই বলছি কি, তোমাদের কাছে আর অন্য কিছুই কি নেই?

–আছে ভাই। দু'টো স্বর্নের আংটি। বলে পকেট থেকে আংটি দু'টো বের করে ওর হাতে দিলাম এবং সোনার দোকানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ওকে সব খুলে বললাম সব শুনে ও একটু হাসল। বলল,

–তোমাদের ভীনদেশি দেখে বেনিয়ারা ঠকাতে চেষ্টা করেছে। ঠিক আছে, তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর, দেখি আমি কিছু করতে পারি কিনা। বলেই যুবক দোকানের কর্মচারীটিকে ডেকে আমাদের চা এনে দিতে বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল: চায়ের কথা বলতেই আমরা বলে উঠলাম,

–চায়ের প্রয়োজন নেই ভাই। আমাদের আংটি দু'টো বিক্রি করে দিতে পারলেই আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

–সে আমি দেখছি। চা খাও। এতদূর থেকে তোমরা আমাদের রাজস্থান সফরে এসেছ। তোমাদের একটু আপ্যায়ন করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে? যুবকের আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করল। কর্মচারী ইতিমধ্যে চা-নাস্তার যোগাড় করতে বেরিয়ে গেছে। যুবকটিও আমাদের দোকানে বসিয়ে বেরিয়ে গেল। অপরিচিত তিনজন লোকের কাছে পুরো দোকান ফেলে দিয়ে যেতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হল না। অপরিচিত ভীনদেশে এমন একজন সাহায্যকারী পেয়ে ধন্য হলাম। কর্মচারী গরম গরম লুচি তরকারী ও চা এনে রাখল সামনে। খাবারের গন্ধ পেয়ে এতক্ষন কষ্ট করে ভুলে থাকা ক্ষুধা পেটে মোচড় দিয়ে উঠল। দেরি না করে গোগ্রাসে লুচি তরকারী খেলাম। তারপর আস্তে আস্তে সুখ করে খেলাম গরম ধূমায়িত চা। নাস্তা পেটে পড়ায় শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। মিনিট বিশেক পর যুবক হাসিমুখে ফিরে এল।

–তোমাদের কাজ হয়ে গেছে এই নাও। বলে আটশত পঞ্চাশ টাকা আমার হাতে দিল। চা নাস্তা খেয়েছতো?

–হ্যাঁ খুব মজা করে খেলাম লুচি তরকারী আর চা। ভাই তোমার নামটা জানতে পারি কি?

-নিশ্চয়ই, রমেশ ত্রিপাঠি। আমরাও আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু নামের পরিচয় দিলাম।

–রমেশ ভাই তুমি যদি কখনও কোলকাতায় আস তবে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। বিদেশে তোমার কাছ থেকে পাওয়া আন্তরিকতা এবং সাহায্যের কথা চিরকাল মনে থাকবে। তিন নম্বর পার্ক সার্কাস, একটা ভুঁয়া ঠিকানা দিয়ে রমেশকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে ওর দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

আজকের পৃথিবীতে ভাল লোক যে একদম নেই তা নয়। রমেশের মতো ভাল লোক কিছু রয়েছে বলেই পৃথিবীর চাকা এখনো ঘুরছে। রমেশের দোকান থেকে বেরিয়ে

সোজা গিয়ে বসলাম একটা বড় আকারের রেষ্টুরেন্টে। পেটে লুচি তরকারী এবং চা পড়ায় ক্ষুধা বেড়ে গিয়েছিল। পেটপূজা না সারা পর্যন্ত অন্য কিছুতেই মনযোগ দেয়া সম্ভব নয়। পেটভরে খাওয়া হল মুরগির রোস্ট, পরোটা, তরকারী এবং ঘন ডাল। হিন্দুদের অন্য ধাঁচের রান্না। Change of test ভালোই লাগল। আমাদের খাওয়ার নমুনা দেখে বাচ্চা বয়টা অবাকই হয়ে গিয়েছিল।

পেট পুরে খাওয়ার পর নূর গেল খবরের কাগজ কিনতে। দু'তিনটা খবরের কাগজ নিয়ে সে ফিরে এল। খবরের কাগজ খুলতেই দেখা গেল বাংলাদেশের উপর বিস্তারিত সচিত্র সংবাদ। জনাব নজরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে প্রবাসে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হওয়ার সংবাদ, মুক্তি ফৌজের সংবাদ, সবকিছুই বিস্তারিতভাবে ছাপা হয়েছে। ভারতীয় সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতার কথাও লেখা হয়েছে। রনাঙ্গনের ছবিতে মেজর খালেদ মোশাররফের ছবি ছাপা হয়েছে। মুক্তি ফৌজের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। কাগজগুলো থেকে বুঝতে পারলাম আমরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যতটুকু জানতাম ঘটনা প্রবাহ তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। সত্যিই যুদ্ধ চলছে বাংলার মাটিতে। স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদানের জন্য ঝুঁকি নিয়ে আমরা ভুল করিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রনাঙ্গনে যেয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে আমাদের। তিনজনে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম নিচুস্বরে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের চোখে ফাঁকি দিয়ে মুজিবনগর যাবার চেষ্টা করা হবে রিস্কি। নিয়ম অনুযায়ী বর্ডার ক্রস করার পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করাটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। স্বেচ্ছায় ধরা দিলে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দেবে না ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মনে। ধরা না দিলে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকবে। কিন্তু ধরা দেব কোথায়? গাঙ্গানগরে ধরা দিলে অযথা সময় নষ্ট হবে। কারণ আমাদের ব্যাপারে সব সিদ্ধান্তই আসবে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে এখানকার কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হয়ে কেন্দ্রিয় নির্দেশের অপেক্ষায় সময় নষ্ট হবে অযথা। তাছাড়া তিনজন কমান্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত পাকিস্তানী সার্মারিক অফিসারদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হবে নিম্ন পর্যায়ে তা সহ্য করার মত মানসিক এবং শারিরীক অবস্থা বর্তমানে আমাদের কারোই নেই। তার চেয়ে বরং দিল্লী পৌঁছে আত্মসমর্পন করাটাই হবে শ্রেয়। যা হবার সেখানেই হোক। ঠিক হল দিল্লী যেয়েই আত্মসর্মপন করা হবে Ministry of External Affairs-এ। কিন্তু বর্ডারে আত্মসমর্পন না করে দিল্লী পর্যন্ত পৌছানোর জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মনে যাতে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি না হয়– কেন বর্ডারে আত্মসমর্পন না করে আমরা দিল্লী রওনা হলাম, তার যুক্তি বর্ণনা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে একটি আবেদনপত্র লিখে ফেললাম তিনজনে মিলে। ঠিকানা লেখা হল মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার, প্রযত্নে Ministry of External Affairs, রাষ্ট্রপ্রতি ভবন, সাউথ ব্লক, নয়া দিল্লী। পোস্ট

অফিসে গিয়ে রেজিষ্ট্রারড মেইল-এ চিঠিটা পাঠিয়ে রশিদ নিয়ে ফিরে এলাম রেষ্টুরেন্টে। পোষ্ট মাষ্টার বলেছিলেন দু'এক দিনের মধ্যেই চিঠিটা পৌঁছে যাবে দিল্লীতে। চিঠিটার একটা কপি পাঠাতে হবে মুজিবনগর সরকারের কাছে। এ এলাকা থেকে মুজিবনগর সরকারের কাছে রেজিস্টারড পোষ্ট পাঠান যুক্তিসঙ্গত হবে না। ঠিক করলাম দিল্লী থেকে ওটা পোষ্ট করব। এরপর নূরকে পাঠানো হল ষ্টেশনে দিল্লী যাবার টিকিট করার জন্য। ফিরে এল নূর। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় কালকা মেইলে করে দিল্লী যাব আমরা। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটি টিকেট কেটে নিয়ে এসেছে নূর। পয়সা কম থাকায় প্রথম শ্রেণীর টিকেট কাটা সম্ভব হয়নি। হাতে প্রচুর সময়। দুপুরে আর একপ্রস্থ খাওয়া-দাওয়া করে শহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখার জন্য বেরুলাম। ঘুরে ফিরে দেখছি আর ক্যামেরায় ছবি তুলছি স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখার জন্য। ছোট্ট শহর ঘোরা শেষ হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। ঠিক হল সময় কাটানোর জন্য Matinee Show সিনেমা দেখব। একটি হলে গিয়ে দেখলাম 'অঞ্জনা' চলছে। ববিতা-রাজেন্দ্রকুমার অভিনীত। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। মফস্বল শহরের সিনেমা হল। ব্যবস্থা মোটামুটি। ভরদুপুর রোদে উপরের টিনের চাল তেতে উঠেছে। ভীষণ গরম লাগছিল লোকের ভীড়ে। সদ্য মুক্তি পাওয়া ছবি। House Full কিন্তু বেশ মজাই লাগছিল বাদাম, চানাচুড় চিবুতে চিবুতে ছবি দেখতে। ছবি শেষ হল। হল থেকে বেরিয়ে এলাম বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। আবার গিয়ে বসলাম সেই সকালের হোটেলে। আর একপ্রস্থ খাওয়া হল। ধীরে সুস্থে পৌনে সাতটায় ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। কালকা মেইল ট্রেন আসবে সাড়ে সাতটায় কিন্তু তখনও প্ল্যাটফর্ম একদম খালি। ব্যাপার কি? টিকেট কালেক্টরকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, ট্রেন সাড়ে ছয়টায় ছেড়ে চলে গেছে। মানে? মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! নূর বোর্ড থেকে ট্রেনের সময় সাড়ে ছয়টার জায়গায় সাড়ে সাতটা পড়েছে। ভীষণ রাগ হল। মতি ও আমি নূরকে তার গাফিলতির জন্য বকাবকি করতে লাগলাম। আমাদের বকাবকি শুনে কালেক্টর সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে। গোলমাল করে সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সি পাকড়ো। ড্রাইভারকে বকশিশ দেবার কথা বললে ও তোমাদের ট্রেন পৌঁছানোর আগেই পরের ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে।" তার মধ্যস্থতায় একটি ট্যাক্সি ঠিক করে উঠে বসলাম। কালেক্টর সাহেব ড্রাইভারকে পাঞ্জাবীতে সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শিখ ড্রাইভার তার হিন্দুস্থান ট্যাক্সি চালিয়ে দিল উল্কা বেগে। রাস্তার অবস্থা মোটামুটি। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে আমাদের ট্যাক্সি। ভাবলেশহীন অবস্থায় ষ্টায়ারিং হাতে বসে আছেন সরদারজী। আমরাও চুপ করেই বসেছিলাম। মুখে কেউ কিছু না বললেও প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে বোধ হয় আর যাওয়া হল না। রাজস্থানের এই মরুভূমিতেই মোটর দুর্ঘটনায় অক্কা পেতে হবে। মনে মনে দোয়া-দুরুদ পড়তে লাগলাম। সরদাজীর চেষ্টা সার্থক হল, ট্রেনের আগেই সে আমাদের পৌঁছে দিল পরবর্তী ষ্টেশনে। ড্রাইভার পাঞ্জাবীতে বলল, "দেখ সাবজি আছি

পৌহছ-ই-গ্যায়ে।" সরদারজীর মুখে একটা গর্বের হাসি। আমরা ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়ার উপর মোটা বকশিশ দিতেই সরদারজীর হাসি আরো বড় আকার ধারণ করল। মিনিট পনেরো পর ট্রেন এসে গেল। আমরা নিজেদের নির্দিষ্ট কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর নেমে গেল। মেইল ট্রেন ছুটে চললো। কামরায় আমরা মোট চারজন যাত্রী। দূরপাল্লার মেইল ট্রেন। বুফে কার আছে। বিছানা পত্রেরও বন্দোবস্ত রয়েছে। পয়সা দিয়ে বিছানা আনিয়ে নিয়ে যার যার বার্থে শুয়ে পড়লাম। রাতে ছুটে চলেছে কালকা মেইল। পরদিন ভোরে দিল্লী পৌছবো আমরা। ট্রেনের শব্দ ও মৃদুমন্দ দোলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকদিন পর আরামের ঘুম হল। হঠাৎ করে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখি আমাদের সহযাত্রী পাশের ভদ্রলোক আগেই ঘুম থেকে জেগে জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে বসে আছেন। শুয়ে শুয়েই দেখলাম বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। ভোরের পূর্বাভাস। দেখতে দেখতে চারিদিক ফর্সা হয়ে এল। পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্যের উদয় হল। উদীয়মান সূর্যের লালিমায় রক্তিম হয়ে উঠল পূর্ব আকাশ, সূর্যের আলোয় জেগে উঠল পৃথিবী। জানালা তুলে দিলাম আমি। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল চোখেমুখে। মুখ ঘোরাতেই চোখে পড়ল –পাশের ভদ্রলোক সূর্যের দিকে চেয়ে নমস্কার করছেন, আর বিড়বিড় করে কি সব বলছেন। বুঝলাম সূর্য দেবের ভক্তি করে মন্ত্র পাঠ করছেন ভদ্রলোক। আমি উঠে টয়েলেটে গিয়ে ঢুকলাম। প্রাতঃক্রিয়া সেরে হাতমুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে দেখি মতি ও নূর তখনও ঘুমুচ্ছে। ওদের ডেকে তুললাম। একে একে ওরাও প্রাতঃক্রিয়া সেরে আমার পাশে এসে বসল। কালকা মেইল ঘন ঘন হুঁইসেল দিতে দিতে মন্থর গতিতে এগুচ্ছিল। ঘড়িতে তখন ৬:৩০ মিনিটের উপরে বাজে। বুঝলাম দিল্লীর কাছাকাছি এসে গেছি। ৭টায় পৌছানোর কথা। ঠিক সাতটার সময় কালকা মেইল এসে থামল দিল্লী ষ্টেশনে। বিরাট বড় দিল্লী ষ্টেশন। অসম্ভব ভীড়। এত সকালেও লোকজনের অভাব নেই। ব্যস্তভাবে সবাই ছুটোছুটি করছে। একটির পর একটি গাড়ি দাড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন এসে থেমে গেল। ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না, এত সহজেই দিল্লী পৌছে গেলাম। ট্রেন থেকে নেমে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরুতেই ট্যাক্সিওয়ালারা ঝেঁকে ধরল। একজন এসে বলল,

–বাঙ্গালীবাবু, ট্যাক্সি চাইয়ে? বললাম,

–হ্যাঁ, নিয়ে চল মাঝারি দামের ভাল কোন হোটেলে। সিটি সেন্টারের কাছাকাছি হলে ভাল হয়।

–লে চল্‌তে হে, সাব আইয়ে। বলে ও আমাদেরকে ওর ট্যাক্সির কাছে নিয়ে গেল। দরজা খুলে আমরা ভেতরে বসলাম। ২০-২৫ মিনিটের মধ্যেই চালক একটি

হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল। হোটেল নটরাজ। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রিসেপশনে এগিয়ে গিয়ে দু'টো কামরা বুক করলাম। একটি সিঙ্গেল রুম আমার জন্য, আর একটি ডাবল রুম মতি ও নূরের জন্য। পাশাপাশি কামরাই পাওয়া গেল। পোর্টার আমাদের হ্যাভারস্যাক কাধে তুলে কামরায় পৌঁছে দিল। থ্রি-ফোর ষ্টার হোটেল। ভালোই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। চার্জও রিজেনেবল। প্রতিটি কামরার সাথে ছোট্ট একটা ব্যালকনি। ব্যালকনি থেকে দিল্লী শহরের অনেকদূর দেখা যায়। আমরা রুম পেয়েছিলাম চার তলায়। প্রতিটি রুমের সাথেই রয়েছে এটাচ্যাড বাথরুম। Hot shower নেয়ার পর ট্রেন সফরের ক্লান্তি গ্লানি সব দূর হয়ে গেল। রুম সার্ভিস ডাকিয়ে নাস্তা করলাম তিনজন একত্রে। নাস্তা খেতে খেতে ঠিক করে নিলাম ২০ তারিখ সকালে নিজেদের সমর্পন করব Ministry of External Affairs-এ গিয়ে। ইতিমধ্যে আমাদের পোষ্ট করা চিঠিও পৌঁছে যাবে কর্তৃপক্ষের হাতে। সঙ্গের টাকা-পয়সা প্রায় শেষ। টাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। দিল্লীতে প্রচুর টুরিষ্টের সমাগম হয়। পাকিস্তানী টাকা ভাঙ্গানো সম্ভব হতে পারে। তা না হলে ক্যামেরা বেচে দেব। নিচে এসে কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলাম সিটি সেন্টার কোথায়? কনটপ্লেস হচ্ছে সিটির কেন্দ্রস্থল। কাউন্টারের ছেলেটি বলল, "ট্যাক্সিতে যেতে ১০ মিনিট আর হেটে যেতে ১৫-২০ মিনিট লাগবে।" দিল্লী সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই ঠিক করলাম প্রথমবার ট্যাক্সিতে যাওয়াই ঠিক হবে। হোটেলের একটা কার্ড কাউন্টার থেকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সি করে পৌঁছলাম কনটপ্লেস দিল্লী শহরের প্রাণকেন্দ্রে। অগুণিত ট্যুরিষ্টে ভরা। বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন বেশের পৃথিবীর নানান দেশ থেকে আগত ট্যুরিষ্টে গিজগিজ করছে জায়গাটা। ইতিমধ্যেই সমস্ত শহর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমরাও অতি সহজেই ট্যুরিষ্টদের ভীড়ে মিশে এক হয়ে গেলাম। নানা ধরণের দালালের উৎপাত শুরু হল। কেউ জিজ্ঞাসা করছে মেয়ে সঙ্গী লাগবে কিনা। কেউবা জিজ্ঞাসা করছে মদ চাই কিনা ইত্যাদি। হঠাৎ একটা শিখ যুবক আমাদের পিছন থেকে আস্তে জিজ্ঞাসা করল,

–ডলার, ডলার?

–নো ডলার, পাকিস্তানী, হাটতে হাটতে পিছনে না ফিরেই মতি জবাব দিল।

–ওকে ওয়ান সিক্সটি।

–টু লেস, মতির জবাব।

–ওকে, ওয়ান সিক্সটি ফাইভ।

–ওকে, মতি রাজি হল।

-কাম, বলে ইশারায় আমাদের তাকে ফলো করতে বলল। আমরা তাকে ফলো করে একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম। ছেলেটি স্বয়ং চালক। ট্যাক্সি চালিয়ে ও আমাদের নিয়ে গেল লাল কেল্লার ঠিক সামনে। একটা গাছের নিচে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ও বলল,

-কতো টাকা ভাঙ্গাবে তোমরা? বললাম,

-১০ হাজার।

-ঠিক আছে তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি টাকা নিয়ে আসছি ১০-১৫মিনিটের মধ্যে।

ট্যাক্সি নিয়ে যুবক চলে গেল। আমাদের সামনে লাল কেল্লা, পেছনে জামে মস্‌জিদ। হঠাৎ খটকা লাগল। ব্যাটা আমাদের লাল কেল্লার কাছে আনলো কেন? ওটাতো ইন্ডিয়ান ডিফেন্স হেডকোয়টার্স। মনে কোন দুরভিসন্ধি নেইতো? তখন কিছুই আমাদের বিশেষ করার ছিল না। শুধু নিরাপত্তার জন্য গাছটির নিচে থেকে সরে গিয়ে রাস্তা ক্রস করে জামে মসজিদের গেটের কাছে লোকের ভীড়ে মিশে গিয়ে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় আধা ঘন্টা পর সেই ট্যাক্সি আবার ফিরে এসে থামল গাছটির নিচে। শিখ যুবক গাড়িতে একাই এসেছে। বেচারা জেনুইন, মনে কোন অন্য চিন্তা নেই; আশ্বস্ত হলাম আমরা। যুবক ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে আমাদের এদিক-ওদিক খুঁজছে। দ্রুত গতিতে রাস্তা পেরিয়ে ওর কছে গিয়ে হাজির হলাম।

-চলো ট্যাক্সিতে বসা যাক। ওর কথা মতো ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম। ভারতীয় ১০০ টাকার নোটের একটা বান্ডিল আমার হাতে সপে দিয়ে বলল,

-গুনে নাও, পুরোটাই আছে ওতে। আমিও পাকিস্তানী ১০,০০০ টাকা তুলে দিলাম ওর হাতে। যুবক টাকা পকেটে রেখে বলল,

-চল তোমাদের কনটপ্লেসে নামিয়ে দেই।

-তাই চল।

ট্যাক্সি ফিরে এল কনটপ্লেসে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে জনসমুদ্রে মিশে গেলাম। পকেটে অনেক টাকা, মনোবল অনেক বেড়ে গেল। সারাদিন ট্যুরিষ্টের মতোই ঘুরে ফিরে দিল্লী শহর দেখলাম। লাঞ্চ করা হল হোটেল ওবেরয়তে। ডিনার করলাম অশোকাতে। তখনকার দিনে দিল্লীর সবচেয়ে নামী-দামী হোটেল এ দু'টো। ডিনার সেরে সিনেমা হলে গিয়ে ঢুকলাম 'রেশমা ও সেহেরা' ছবি দেখতে। মাঝরাতের একটু আগে ছবি শেষ হল। কনটপ্লেস কিন্তু তখনো প্রাণবন্ত। লোকজনের কমতি নেই। ঢুকলাম গিয়ে একটা ডিস্‌কোতে। সারারাত ভীষন হৈ চৈ হল। সকাল চারটায় ঘুমে

ঢুলু-ঢুলু চোখে শ্রান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। আমাদের উদ্দেশ্য মন ভরে আমোদ করে নেওয়া। দু'দিন পর কি হবে কিছুই ঠিক নেই। তাই এ দু'দিন যতটুকু সম্ভব আমোদ-ফুর্তি করে তৃপ্তি মিটিয়ে নেওয়া, যাতে কোন ক্ষেদ না থেকে যায়। রুমের সামনে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সটান বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। দরজায় 'Do Not Disturb' ঝুলিয়ে দিয়ে বিছানায় পড়ার সাথে সাথেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। পরদিন বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় ঘুম ভাঙ্গল। গোসল করে নাস্তা খেয়ে আমরা কনটপ্লেসে চলে এলাম। Hi! Sharif! দূর থেকে হাত দোলাতে দোলাতে কাছে এল অনিতা। অনিতা, শেরন, লরনা এবং ক্রিসটিনা (Anita. Sheron. Lorna এবং Christine) এদের সাথে গতকাল ডিস্‌কোতে পরিচয় হয়েছিল। শেরন আমেরিকান। বাকি তিনজনই সুইডেনের। চারজন একই সাথে ইন্ডিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দলটির সাথে বেশ ভাব জমে গিয়েছিল। গতকাল সারারাত একসাথেই হৈ চৈ করেছি। আমরাও এগিয়ে গিয়ে ওদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করে প্রস্তাব দিলাম, "চলো দিল্লী শহরের আশেপাশের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখি।" সানন্দে রাজি হল সবাই। আমরা দু'টি ট্যাক্সি সারাদিনের জন্য ভাড়া করে বেড়াতে লাগলাম। দিল্লী ফোর্ট, কুতুব মিনার, আকবরের রাজপ্রাসাদ, জামে মস্‌জিদ, নিউ দিল্লী, পুরনো দিল্লী, রাষ্ট্রপতি ভবন, গেইট অফ ইন্ডিয়া, নেহেরু পার্ক, রাজপথ গান্ধীর স্মৃতিসৌধ আরো অনেক জায়গা। আকবরের প্রাসাদে সন্ধ্যায় 'লাইট এন্ড সাউন্ড' একটা মনোরম প্রোগ্রাম দেখে ফিরে এলাম আবার কনটপ্লেসে। একসাথে খেয়ে আমরা আবার গিয়ে ঢুকলাম ডিস্‌কোতে। সময় কেটে গেল নাচ-গান, হাসি-তামাসার মধ্যে।

প্রাণখোলা উদার প্রকৃতির মেয়েগুলো আনন্দময় জীবনের মূর্ত প্রতীক। আজকে নিয়ে বাঁচাই ওদের ধর্ম। আগামী দিনের কোন মূল্যই নেই ওদের কাছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই ইচ্ছে মত উপভোগ করে বাঁচতে চায় ওরা। দুঃখ-কষ্ট বলে কিছুই যেন নেই তাদের জীবনে। জীবনকে উপভোগের জন্যই যেন জন্ম হয়েছে ওদের। সহজ সরল বাঁধনহীন জীবন, মুক্ত বিহঙ্গের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। ওদের সাথে অনেক বিষয়েই আমাদের অনেক তফাৎ। তবুও দু'টোদিন ওদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সময় কাটাতে কোন অশ্বস্তি বোধ করলাম না। পরদিন সকালে আমাদেরকে মিনিষ্ট্রিতে যেতে হবে। তাই রাত দু'টোর মধ্যেই ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। সকালেই এক ফাঁকে গিয়ে মুজিবনগরের ঠিকানায় প্রবাসী বাংলাদেশী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নামে শ্রীমতি ইন্দীরা গান্ধীর কাছে লেখা আবেদনপত্রটির অনুলিপি রেজিস্টারড মেইলে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ঘুমুতে যাবার আগে সিদ্ধান্ত নেয়া হল, সকালে ঘুম থেকে উঠে ১০:৩০ মিনিটে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাব আমরা। বেরুবার আগে টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে নম্বর খুঁজে নিয়ে লোক্যাল এবং

ফরেন বার্তা সংস্থাগুলোকে জানাতে হবে যে, তিনজন পাকিস্তানী বাঙ্গালী আর্মি আফিসার রাজস্থান বর্ডার ক্রস করে দিল্লী এসে পৌছেছে। তারা ১১টায় Ministry of External Affairs-এ আত্মসর্মপন করে ভারতীয় সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবে। তাদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেয়া। সাংবাদিকদের কেউ ঐ সময় Ministry of External Affairs-এ উপস্থিত হলে পালিয়ে আসা অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে। এটা মতির আইডিয়া। আমাদের পালিয়ে আসার খবরটা প্রচার হওয়া উচিত, তাই মতির আইডিয়াটি গৃহিত হল। মতিকেই ঐ কল্পনা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দিয়ে সবাই যার যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল ৭টার মধ্যেই নাস্তা সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। মতি তার উপর আরোপিত দায়িত্ব অনুযায়ী টেলিফোন নম্বর বের করে প্রায় সব দেশী-বিদেশি সংবাদ সংস্থা, প্রধান দৈনিক এবং সাপ্তাহিক কাগজগুলোর অফিসে এক এক করে ফোন করল। ওর কাজ শেষ হলে ঠিক সাড়ে দশটায় বেরিয়ে ট্যাক্সি করে সোজা উপস্থিত হলাম রাষ্ট্রপতি ভবনের সাউথ ব্লক-এ। Ministry of External Affairs-এর অফিস খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। এগারোটা বাজতে তখনও বাকি। রাষ্ট্রপতি ভবনের গার্ড বদল হচ্ছিল। খুব Colorful event. আমরা উপভোগ করলাম গার্ড বদল ceremony. অশ্বারোহী গার্ডের সাথে ফটোও তোলা হল। লালচে পাথরের মনোরম রাষ্ট্রপতি ভবন বৃটিশ আমলে ভাইস রয় এর আবাসিক ভবন হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সেটাই হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবন। মূল বিল্ডিং এর দুই পাশে দাড়িয়ে সব মন্ত্রণালয়গুলোর প্রধান দপ্তরগুলো। মধ্যখানে সুন্দর ফুলের কেয়ারী। সিড়ির প্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে রাজপথ। দূরে গেইট অফ ইন্ডিয়া। ভারতের জাতীয় দিবসে বিরাট করে সামরিক কুচকাওয়াজ হয় এ জায়গায়। ট্যাক্সি ড্রাইভারই সবকিছুর বিবরণ দিচ্ছিল আমাদের।

ঠিক ১১টায় এসে ঢুকলাম Ministry of External Affairs-এর ভবনে। রিসেপশনে এক তরুণী বসে আছেন। অল্পদূরে সিটিং এরিয়াতে বেশ কয়েকজন লোক বসে আছেন। তাদের অনেকের হাতেই ক্যামেরা। বুঝলাম মতির বুদ্ধিতে কাজ হয়েছে। খবরের গন্ধে সাংবাদিকরা সব এসে জুটেছেন ঠিক সময়ে। কারো সাথে কোন কথা না বলে সোজা রিসেপশনিষ্ট এর কাছে গিয়ে দাড়ালাম।

–Good morning Madam. মেয়েটি চোখ তুলে তাকালেন। আমি বললাম,

–I would like to talk to the honourable Forign minister matter most urgent and confidential. আমার অদ্ভুত আবদারে ভদ্রমহিলা কিছুটা ভড়কে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন করলেন,

–Do you have any early appointment?

-No Mam.

-Then how could I get you through? যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। আমাদের কথোপকথনের সময় বসে থাকা লোকজনদের মাঝ থেকে দু'জন উঠে এসে ইতিমধ্যেই আমাদের পরখ করে গেছেন। মহিলার কছে আমাদের পরিচয় দিলে মুহুর্তেই সংবাদিকদের খপ্পরে পড়তে হবে। তাই পরিচয় গোপন করে বললাম,

-Could you be kind enough to get us in touch with some responsible person, whom we could talk to.

-Sure, let me try to get Mr. A.K Roy, the joint seccretrary. He is a Bengalee too. Sir, I have three Bengalee students here from Calcutta. They want to talk to you. রিসিভারটা আমার হাতে দিয়ে মহিলা বললেন,

-Mr. Roy is on the line.

-Good Morning Sir, we are three Bengalee Officers----- আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জনাব রায় পরিস্কার বাংলায় বলে উঠলেন,

-স্বাগতম,স্বাগতম কখন পৌঁছলেন?

-এইতো কিছুক্ষণ আগে। জবাব দিলাম।

- Please wait. I shall join you in a minuite. বলেই টেলিফোন রেখে দিলেন মিঃ রায়। নিচু গলায় আলাপ হচ্ছিল বলে সাংবাদিকরা আমাদের কথোপকথনের কিছুই শুনতে পেলেন না। কিছুক্ষণ পরেই নিচে নেমে এলেন ৬-৭ জন ভদ্রলোক। দু'জন ব্রিগেডিয়ার সামরিক পোষাকে বাকিরা In Civis. ছোট আকারের পাতলা গড়নের চশমা পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে পরিচয় দিলেন,

-AK Roy. শ্রী রায় ও অন্যদের দেখে ইতিমধ্যেই রিসেপশনিষ্ট মেয়েটি সম্ভ্রমে উঠে দাড়িয়েছেন। আমরাও নিজেদের পরিচয় দিলাম। সাংবাদিকরা সব উঠে এসে ভীড় করে ঘিরে দাড়াল। দু'একটি ফ্ল্যাশ ও ক্যামেরার সাটার টিপার আওয়াজ শুনতে পেলাম। শ্রী রায় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বার বার বলতে লাগলেন,

-Gentlemen allow us to go. Please allow us to go. এক ফাঁকে বাংলায় আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

-আপনারা মুখ খুলবেন না একদম। কোন কথা নয়। অনেক কষ্ট করে সাংবাদিকদের বেড়াজাল ভেদ করে উপরে চলে এলাম আমরা। মিঃ রায় তার কামরায় নিয়ে গিয়ে

বসালেন। সাথের লোকদের মাঝে শুধু উচা লম্বা এক শিখ ভদ্রলোক আমাদের সাথে ঘরে ঢুকে বসলেন। বাকি সবাই বাইরে অপেক্ষায় থাকলেন। জনাব রায়ের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। একটি হাফহাতা হাওয়াই শার্ট ও প্যান্ট পরেছিলেন ভদ্রলোক। শিখ ভদ্রলোকের মাথায় মেরুন রং এর টারবান। পরনে সাদা বুশ সার্ট ও সাদা প্যান্ট। মিঃ রায় পরিচয় করিয়ে দিলেন শিখ ভদ্রলোককে, "Gen. Oban Singh" পরিচয় জেনে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম। বলে কি লোকটা! এতো সাদাসিধা জেনারেল! যাই হোক, আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম। উর্দ্দিপরা বেয়ারা ইতিমধ্যে চা পরিবেশন করে গেলো। চা পান করতে করতে কথাবার্তা চলছিল।

-Well gentlemen, I once again welcome you on behalf of the Indin Govt. আপনাদের সাহস ও বুদ্ধিমত্তা সত্যিই প্রশংসনীয়। অসম্ভবকে সম্ভব করে এই ঐতিহাসিক শহর দিল্লীতে পৌঁছে আপনারাও একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ভদ্রলোক বেশ কথা বলেনতো!

-Sir, did you receive our letter addressed to the honourable Prime Minister? প্রশ্ন করলাম।

-Yes, we did. কিছুটা আশ্বস্ত হলাম।

-"May I coming Sir?" অনুমতি নিয়ে ব্রিগেডিয়ারদের একজন ভিতরে ঢুকলেন। মিঃ রায় এর সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে ব্রিগেডিয়ার আমাদের বললেন,

-Gentlemen, it is a matter of formality. আপনাদের সাথে কোন হাতিয়ার থাকলে আমাকে সেগুলো দিয়ে দিন। ক্যামেরা দু'টিও দিয়ে দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না যেনো। সময়মত ওগুলো আপনাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। 'আকেলমন্দ্ কি লিয়ে ইশারা কাফি হ্যায়।' তিনজনই যার যার হতিয়ার বের করে দিয়ে দিলাম। ক্যামেরা দু'টিও তার হাতে তুলে দেয়া হল। ধন্যবাদ জানিয়ে ব্রিগেডিয়ার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। ভদ্রলোক চলে যেতেই জনাব রায় বললেন,

-চা শেষ হলে চলুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে আসি। আমরা তাড়াতাড়ি চা পান শেষ করলাম। জনাব রায় আমাদের সাথে করে উপরের তলায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘরে নিয়ে গেলেন। সাথে জেনারেল ওবান সিং। মন্ত্রী মহোদয়ের পিএ-কে নিচু স্বরে কিছু একটা বলে জনাব রায় আমাদের নিয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের ঘরে ঢুকলেন। মন্ত্রী মহোদয়ও একজন শিখ। জনাব শরন সিং। তিনিও আমাদের স্বাগতম জানালেন। আলাপ পর্ব সংক্ষেপেই শেষ হল। আমরা বেরিয়ে এলাম।

জনাব রায় বললেন,

–এখন থেকে আপনারা ভারতীয় সরকারের অতিথি। তা আপনাদের জিনিষপত্র কোথায়? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ রায়।

–হোটেল নটরাজে।

–ঠিক আছে। এখনি কাউকে পঠিয়ে দিয়ে সেগুলো আনার বন্দোবস্ত করা হবে। You must be tired! আপনাদের Gust house এ নিয়ে যাবার সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। Go and have a rest. পরে আবার দেখা হবে। তখন জমিয়ে গল্প করা যাবে। আমিও কিন্তু ওপারেরই লোক। বাড়ি বিক্রমপুর।

হাসি-খুশি স্বভাবের রায়কে ভালোই লাগল। সবকিছুর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে জেনারেল ওবান সিং এর সাথে নিচে নেমে এলাম। ওখানে ৫-৬ জন লোক Civis-এ অপেক্ষা করছিল। আমাদের আসতে দেখে একজন বাদে বাকি সবাই ত্রস্তপায়ে সামনে পার্ক করে রাখা দু'টো হিন্দুস্থান গাড়িতে গিয়ে উঠল। আর একটি গাড়ি এল। জেনারেল ওবান সিং ইশারায় ঐ গাড়িটিতে আমাদের বসতে বললেন। আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য হাত বাড়াতেই তিনি স্মিতহাস্যে বললেন. "আমি তোমাদের পৌছে দেব।" তার বিনয় ও বদান্যতায় মুগ্ধ হলাম। তিনি ড্রাইভারের পাশের সিটে গিয়ে বসলেন। আগের দু'টো গাড়ির একটি সামনে আর একটি আমাদের পেছনে। আমাদের গাড়িটি মধ্যে। বুঝলাম নিরাপত্তার জন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা কার? আমাদের না এই জেনারেল ওবান সিং এর? কে এই ওবান সিং? স্বল্পভাষী ধীরস্থির প্রকৃতির লোক জেনারেল ওবান সিং। প্রথম থেকেই নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। যেখানেই যাচ্ছেন তার সাথে সবাই সম্ভ্রমের সাথে কথা বলছেন। নিশ্চয়ই গোয়েন্দা সংস্থার পদস্থ কোন বিশেষ কর্মকর্তা হবেন। আমার ধারণাটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম তিনিই বিখ্যাত জেনারেল ওবান সিং। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'RAW' (Research and Analysis Wings) এর প্রধান কর্মকর্তা। অনেক রাস্তা ঘুরে আমাদের গাড়ি এসে থামল একটি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা একতলা আধুনিক বাংলোর সদর দরজায়। Looking Window দিয়ে একজন মুখ বের করে পরক্ষণেই গেট খুলে দিয়ে এটেনশন হয়ে দাড়াল। গাড়িগুলো সব ভিতরে ঢুকে পোর্টিকোতে থামল। বাড়ির বারান্দায় একজন ভদ্রলোক দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে জেনারেলকে অভিনন্দন জনিয়ে হাত বাড়িয়ে করর্মদন করলেন। তার পর আমাদের পথ দেখিয়ে লাউঞ্জে নিয়ে গিয়ে বসালেন। জেনারেল ওবান সিং ভদ্রলোককে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ তোমাদের দেখাশুনা করার জন্য সবসময় তোমাদের সাথেই থাকবেন।" ভাল করে চেয়ে দেখলাম ব্রিগেডিয়ার নারায়ণকে। বয়স ত্রিশের মাঝামাঝি, শ্যাম বর্নের লোক। দেখতে অনেকটা

বাঙ্গালীদের মতই। মাথার সামনের দিকে ছোট একটি টাক। একজোড়া পাতলা গোফ। মাথার তিনদিকে কোকড়া কালো চুল। পরনে বুশ সার্ট ও ট্রাউজার। উর্দ্দিপরা ব্যায়ারা কোল্ড ড্রিংক্স এনে টেবিলে সার্ভ করল। সাথে মেনু নিয়ে এসেছে। লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছিল। ব্রিগেডিয়ার আহ্বান জানালেন। মতির সাথে চোখাচোখি হল। বেশ বন্দোবস্ত তো! মেনু খুলে দেখলাম সব রকমের খাওয়াই রয়েছে। কন্টিনেন্টাল, ফ্রেঞ্চ, মোগলাই, দেশী এবং চাইনিজ। চাইনিজ খাবারের অর্ডার দিলাম। সবার অনুরোধে আমাকেই খাওয়া পছন্দ করার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ব্যায়ারা এসে খালি গ্লাস উঠিয়ে অর্ডার লিখে নিয়ে চলে গেল।

বাড়িটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা বিভাগের সরকারি একটি সেফ হাউস। ছিমছাম করে গোছান। বাইরে সুন্দর লন ও গার্ডেন। দেয়ালের জন্য বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। গেটের সামনেই গার্ডরুম। ৬-৭ জন লোক সেখানে। সবাই সিভিল পোষাকে। আর্মির লোকজন চুলের ছাট থেকেই আন্দাজ করেছিলাম। পুরো বাড়িটা সেন্ট্রালী এয়ারকন্ডিশন্ড।

ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ দেখতে বাঙ্গালীদের মত হলেও আসলে ছিলেন ইউপির লোক। পরে জেনেছিলাম। লাঞ্চ সার্ভ করা হল ডাইনিং রুমে। জেনারেল ওবান সিং, ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ এবং আমরা সবাই একসাথে খেলাম। খাওয়া শেষে কফির পাট চুকে যাবার পর জেনারেল ওবান সিং বললেন, "I Shall be off now. Brig. Narayan shall take care of you. You all are tired. Please take a good rest. We shall get down to business tomorrow." চলে গেলেন জেনারেল ওবান সিং। ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ আমাদের প্রত্যেকের কামরা দেখিয়ে দিলেন। আমরা ঘরে ঢুকে দেখি আমাদের হ্যাভারস্যাকটা ইতিমধ্যেই কেউ রেখে গেছে। টেবিলের উপর হোটেলের লন্ড্রীতে ধুতে দেয়া কাপড়ের প্যাকেট।

ব্রিগেডিয়ার আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার নিজের কামরায় চলে গেলেন। আমরা একত্রিত হয়ে বসলাম। আগামীকাল থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে সে ইঙ্গিতই দিয়ে গেলেন জেনারেল ওবান। বিকালে ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ আমাদের নিয়ে গেলেন শপিংএ। দুই প্রস্ত করে রেডিমেট কাপড়, স্লিপিং স্যুট, স্লিপার, টুকটাক নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনলাম। আমাদের কিছুতেই বিল পে করতে দিলেন না তিনি। আমরা অতিথি, সব দায়িত্বই ভারত সরকারের; এ যুক্তি দিয়ে সব বিল বিগ্রেডিয়ার চুকিয়ে দিলেন। কেনাকাটা সেরে সন্ধ্যার পর ফিরে এলাম। সে রাত্রে গল্পচ্ছলে ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে অনেক কিছু বিস্তারিতভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে নিলেন।

পরের দিন সকালে এলেন জেনারেল ওবান সিং। তার সাথে চারজন ভদ্রলোক। জেনারেল তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। শুরু হল 'Interogation' এর পালা। কখনও এক সাথে কখনও আলাদা ভাবে, অনেক প্রশ্নের জবাব লিখিতভাবেও দিতে হল। একটানা চার দিন, চার রাত চললো ইন্টারোগেশন। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাদি, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর Organization, Deployment, Tactics and strategy থেকে শুরু করে Defence installations, Line of Communication, Training, Life style, Boarder Security, Government Foreign Policy, Politics, সদ্য বানানো কারাকোরাম হাইওয়ে কোনকিছুই বাদ পড়ল না। সকল জবাবই বিস্তারিতভাবে লিখে নিলেন তারা। তাদের সব প্রশ্নেরই সাধ্যমত জবাব দেবার চেষ্টা করলাম আমরা। আমাদের জবাবের সত্যতা যাচাই করার জন্য Check, Cross Check করা হল Systematically. আমাদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান ও গোপন তথ্যই তারা জানতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা বিগ্রেডিয়ার নারায়ণকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মুজিবনগর সরকারের সাথে আমাদের বিষয়ে ভারত সরকার কোন যোগাযোগ করছে কিনা? জবাবে বিগ্রেডিয়ার জানিয়েছিলেন যোগাযোগ করা হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের কয়েকজন নেতা আসছেন দিল্লীতে। তাদের কাছেই আমাদের হ্যান্ডওভার করে দেওয়া হবে। একদিন বিকেলে জনাব একে রায় দু'জন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক দু'জন ছিলেন জনাব শাহাবুদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেন। জনাব শাহাবুদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় সচিব হিসেবে পাকিস্তান দিল্লী মিশনে কর্মরত ছিলেন। প্রবাসী সরকার ১৭ই এপ্রিল গঠিত হওয়ার খবর জেনে তারা দু'জনে দুতাবাস থেকে Defect করে ভারতীয় সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ভারত সরকার তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে তাদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাদেরকেও আমাদের মত গোপন আরেকটি সেফ হাউজে রাখা হয়েছে। আমাদের মত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দু'জন তরুণ অফিসারও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। খুব খুশি হলাম ওদের পেয়ে। তারাও খুশি হলেন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। ওরা বাংলাদেশের সংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই বলেছিলেন। আমাদের মতো অভিজ্ঞ অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন, তারা সে কথাও উল্লেখ করলেন। আমরা তাদের জানালাম, রাজনৈতিক আশ্রয় আমরাও প্রার্থনা করেছি ভারত সরকারের কাছে। আমাদের আবেদন মঞ্জুর হবে বলেই তারা অভিমত প্রকাশ করলেন। একসাথে আমরা সেদিন রাতের খাবার খেলাম। কথাচ্ছলে জনাব রায় বলেছিলেন, "আপনাদের সাফল্য আমাদের অনেকেরই দুঃখের কারণ হয়ে দাড়াবে। চাকুরিচ্যুতও হবেন অনেকে।" বুঝতে পারলাম, সবার চোখে ধুলো দিয়ে দিল্লী পৌঁছনোর জন্য প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের

দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ভাগ্যেই এমনটি ঘটবে। কিছুই করার নেই। চুপ করে শুনে গেলাম জনাব রায় এর কথা। কথা প্রসঙ্গে শাহাবুদ্দিনকে একসময় জিজ্ঞেস করলাম,

–মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে কেউ কি সহসা দিল্লী আসছেন?

–কিছু জানিনাতো এ সম্পর্কে। জবাব দিলেন শাহাবুদ্দিন।

বুঝলাম, নেতৃবৃন্দের আগমনের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কথাটা তাদের জানাননি। আমি চেপে গেলাম। এ প্রসঙ্গে আর কিছুই আলাপ করলাম না।

আমাদের এলাকাটার নাম বসন্ত মার্গ। ইন্টারোগেশন এর ফাঁকে ফাঁকে ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ আমাদের দিল্লী শহর, ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সিনেমাও দেখলাম দু'একটা। সবসময় সাথে ছিল নিরাপত্তা প্রহরীর একটা দল। ইন্টারোগেশন শেষ, নেতারা এখনও এসে পৌঁছাননি। কিছুই করার নেই। অলস মুহুর্তগুলো কিছুতেই কাটতে চাইছে না। হঠাৎ করেই ব্রিগেডিয়ার প্রস্তাব রাখলেন, আমাদের ইচ্ছে থাকলে জয়পুর, আগ্রা, ফতেহ্পুর ঘুরে আসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অতি উত্তম প্রস্তাব। সানন্দে রাজি হলাম আমরা। দু'টো জিপে করে বাইরোড যাব। প্লেনে গেলে পথিমধ্যে অনেক কিছুই মিস্ করব তাই বাইরোড যাওয়াই ঠিক হল।

একদিন ভোর বেলায় বেরিয়ে পরলাম আমরা। প্রথম জিপটি ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ নিজেই চালাবেন। সেটাতে থাকব আমরা ৩জন ও ১জন প্রহরী। পিছনে থাকবে আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্রের সাথে প্রহরীদের বাকিরা। প্রথমে জয়পুর 'Pink city of India', পুরোনা ও আধুনিক আর্কিটেকচারের অপূর্ব সমন্বয়। শহরের বেশিরভাগ ইমারতগুলোই গোলাপী রং এর পাথরে তৈরি। তাই জয়পুরকে বলা হয় 'Pink city'। জয়পুর থেকে আগ্রা। পথে দেখলাম সিকান্দ্রা আকবর বাদ্শার সমাধি। জনবিরল শান্ত পরিবেশে শ্বেতপাথরে তৈরি সিকান্দ্রায় চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন মুঘল ইতিহাসের দোর্দন্ড প্রতাপশালী বাদ্শাহ আকবর। একই রাস্তার উপর মথুরা ও বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত হিন্দুদের দু'টি তীর্থস্থান। এরপর তাজমহল খ্যাত আগ্রা। যমুনার তীরে মাঝারি আকারের শহর আগ্রা। যমুনার এক তীরে আগ্রা ফোর্ট অন্য তীরে ধবধবে সাদা তাজমহল। মানুষের সৃষ্টির এক অপূর্ব বিস্ময় তাজমহল। বাদশাহ্ শাহজাহান তার প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের প্রতি তার ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ তৈরি করেছিলেন এই তাজমহল। সেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল মমতাজকে। অর্পূব সুন্দর তাজমহল দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তাজমহলের গায়ে খোদাই করে লেখা রয়েছে কোরআন শরীফের আয়াতগুলো। তাজমহলের ভাব-গম্ভীর পরিবেশে যে

কোন লোককেই হারিয়ে যেতে হবে অতীত ইতিহাসের অন্ধ গলিতে। মুছে যাওয়া স্মৃতি জ্যান্ত হয়ে উঠবে মনের মনিকোঠায়। এটাই তাজমহলের বৈশিষ্ট্য। তাই বোধ হয় যুগ যুগ ধরে বিশ্বের প্রতি প্রান্ত থেকে ছুটে আসে সবাই অদ্ভুত এক আকর্ষনে. মানব প্রেমের এই তীর্থস্থানে তাদের মনের শ্রদ্ধা জানাতে। তাজমহল দেখে গেলাম আগ্রা ফোর্টে। সম্রাট শাহজাহানকে শেষ বয়সে এখানে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছিল ; তার বন্দীকক্ষ থেকেই একটি পাথরে দূরে অবস্থিত তাজমহলের প্রতিবিম্ব দেখতে পারতেন তিনি। প্রাচীন ভাস্কর্য্য প্রযুক্তির এক আশ্চর্যজনক নিদর্শন : ভাবলে অবাক হতে হয়। আগ্রা থেকে গেলাম ফতেহপুর সিক্রি। সম্রাট আকবর তার রাজপুতানী বেগম যোধাবাইকে রাখার জন্য বানিয়ে ছিলেন লাল পাথরের এ বিশাল প্রাসাদ। প্রাচীনপুর্ত কার্যের এক অভূত নিদর্শন দেখলাম ফতেহপুর প্রাসাদে। দেয়ালের মধ্যদিয়ে ঠান্ডা ও গরম পানি চলাচলের ব্যবস্থা করে প্রসাদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সিষ্টেম গড়ে তোলা হয়েছিল শত শত বছর আগেই। অদ্ভুত এক বৈজ্ঞানিক কীর্তি। প্রাসাদের ঠিক মাঝখানে বিশাল উঠোনের মাঝে শ্বেত পাথরের হযরত সেলিম চিশতীর মাজার। কথিত আছে পুত্র সন্তানহীন সম্রাট আকবর হযরত সেলিম চিশতীর একজন মুরীদ ছিলেন। ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করে তোলার জন্য তিনি আল্লাহ্তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করেন। ফলে সম্রাট আকবর পুত্র সন্তান লাভ করেন। তখন থেকেই দেশ-বিদেশ থেকে এখানে আসছেন হাজার হাজার প্রার্থী। তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে। গাইড আমাদের শোনাচ্ছিল ইতিকথা। সে বলল, "খাস নিয়তে গোপনে যে কোন কিছু চেয়ে মাজারে সুতা বেঁধে দিলে সে আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে আল্লাহর ফজলে।" আমাদের প্রত্যেকের হাতেই এক টুকর সুতা তুলে দিল গাইড। আমারা ৩জন মাজার জিয়ারত করে যার যার চাওয়া মনে মনে চেয়ে সুতা বেঁধে দিলাম মাজারে। মাজারে কোটি কোটি সুতার টুকরা বাধা রয়েছে দেখতে পেলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলাম ৩জনেই। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সমস্ত প্রাসাদ। তানসেন যেখানে বসে গান গেতেন, বাদশাহ্ ও বেগম যেখানে বসে সুন্দরী নর্তকীদের গুটি বানিয়ে পাশা খেলতেন। যেখানে হাতির পায়ের নিচে পিসে মারা হত দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের। ঘোড়শালা, হাতিশালা, মজলিস, অন্দর মহল, খাস মহল, বাহির মহল। পানির অভাবে এ প্রাসাদ পরিত্যাগ করতে হয়েছিল আকবরের আমলেই। প্রাসাদের সর্বত্রই ময়ূর উড়ে বেড়াচ্ছিল। ময়ূর ইন্ডিয়ার National bird. হেটে হেটে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, আজকের এই শান্ত নিঝুমপুরী সে কালে নিশ্চয়ই শান-শওকত, জাক-জমক, লোক-লস্করের ভারে গম্ গম্ করত। কত না জানা কাহিনী-ঘটনা চাপা পড়ে আছে পাথরের ভাজে ভাজে। কত ক্ষোভ, যন্ত্রণা হাহাকার গুমরে মরছে। প্রাসাদের অন্ধ চোরাগলির বাকে বাকে গুম করে হত্যা করা হয়েছে অনেককে। জনমানবহীন পাষাণপুরীর বাতাসে সেসব অতৃপ্ত আত্মার করুণ আর্তনাদই যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। গাটা ছম্ ছম্ করে উঠেছিল। নিজের অজান্তেই দল থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিলাম।

চলতে চলতে হঠাৎ ভীষণ ভয় হল। প্রাসাদের গোলকধাঁধায় যদি পথ হারিয়ে ফেলি! পড়ন্ত বিকেল, সন্ধ্যা আগত প্রায়। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অতি কষ্টে রাস্তা খুঁজে বের করে হযরত সেলিম চিশতির মাজারের সামনে এসে দলের বাকি লোকজনদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। অল্পক্ষণ পরে তারা সব বেরিয়ে এলেন। আমরা সবই একত্রে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। এবার ফেরার পালা। একটানা গাড়ি চালিয়ে শেষরাত নাগাদ ফিরে এলাম দিল্লী। সবকিছু মিলিয়ে খুবই আনন্দদায়ক হয়েছিল আমাদের ঝটিকা সফর। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি সবাই। আগ্রা থেকে ফেরার দ্বিতীয় দিনের সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে নাস্তার টেবিলে ব্রিগেডিয়ার নারায়ণকে দেখতে না পেয়ে ব্যায়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম,

—সাব কিধার হ্যায়?

—সাবজি সুবাসুবা নাস্তা লেকে নিকালগিয়া। জবাব দিল ব্যায়ারা।

কোথায় গেছেন তার জানার কথা নয়, জানলেও বলবে না ইন্টেলিজেন্সের লোক।

নাস্তা সেরে লাউঞ্জে বসে গল্প করছিলাম। ব্রিগেডিয়ার ফিরে এসে আনন্দে ফেটে পড়লেন, "well here you are জলদি তৈরি হয়ে নাও। হাইকমান্ড থেকে নির্দেশ এসেছে মুজিবনগর থেকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব মোশতাক আহমদ এবং মুক্তিফৌজের কমান্ডার ইন চীফ কর্নেল এজিএম ওসমানী এসেছেন দিল্লীতে। আজকেই তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে।"

অত্যন্ত শুভ সংবাদ! এতদিন অসীম আগ্রহে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে এই লগ্নের প্রতিক্ষায়। কী যে খুশি হলাম সবাই, তা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ আরো বললেন, "মুজিবনগর থেকে আগত নেতৃবৃন্দ আমাদের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেবেন ভারতীয় সরকার সে নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"

কখন যেতে হবে সেটা এখনও ঠিক হয়নি। যে কোন মুহূর্তে ডাক আসতে পারে। কাপড় পরে আবেগ-বিহ্বল চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রতিটি মূহূর্তকে মনে হচ্ছিল যেন এক একটি যুগ। ঘড়ির কাটা এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব গতিতে। একসময় দেয়াল ঘড়িতে একটা বাজার সঙ্কেত ঘোষিত হল। ব্যায়ারা লাঞ্চ সার্ভ করে খাবার টেবিলে আহ্বান জানাল। খাওয়ার তেমন কোন ইচ্ছাই ছিল না। তবু ভদ্রতার খাতিরে টেবিলে গিয়ে বসলাম সকলের সাথে। খাওয়া সেরে সবেমাত্র লাউঞ্জে এসে বসেছি। একটি গাড়ি এসে দাড়াল পোর্টিকোতে। নেমে এলেন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। পরনে সিভিস্। তিনি লাউঞ্জে ঢুকতেই ব্রিগেডিয়ার উঠে গিয়ে তাকে সাদর

আহ্বান জানিয়ে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাদের পরিচয় তাকে দিলেন অথচ তার পরিচয় চেপে গেলেন অতি কৌশলে। অবান্তর কৌতুহল প্রকাশ করা against the rules of the game. তাই ঘটনাটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে চুপ থাকলাম। ভদ্রলোক ব্রিগেডিয়ার নারায়ণকে বললেন, "lets go". ব্রিগেডিয়ার আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "It's time. lets go."

সবাই বাইরে এলাম। গাড়ি বারান্দায়। ভদ্রলোকের গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া পেছনে আরো তিনজন লোক বসেছিল। আমরা তিনজন ও ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ আমাদের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে ডিটেলড্ দু'টো গাড়ির একটিতে উঠে বসলাম। দু'টো গাড়িতেই যাব আমরা। এই সেফ হাউজে আসার পর প্রথমবারের মত আমাদের সাথে এস্কট হিসাবে দ্বিতীয় গাড়িটি বের হল না। বুঝলাম ভদ্রলোকের গাড়ির লোকগুলোই আমাদের এস্কট। নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের এস্কট সঙ্গে নেয়া হল না। বেশ কিছু রাস্তা ঘুরে সামনের গাড়িটি একটা তুলনামূলক ফাকাঁ রাস্তায় একটি পার্ক করা গাড়ির সামনে এসে থেমে গেল। আমাদের গাড়িটিও থামল সাথে সাথে। সামনের গাড়ির ভদ্রলোকের ইশারা অনুযায়ী আমরা চারজনই আমাদের গাড়ি থেকে নেমে থামা গাড়িটায় গিয়ে বসলাম। ডাবল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গাড়িতে উঠে বসতেই আগের গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। আমরা সেটাকে অনুসরন করে চললাম। নিখুত প্ল্যানিং। মিনিট ১৫ পরে উচুঁ দেয়াল ঘেরা একটা দ্বিতল আধুনিক প্যার্টানের বাংলোর লোহার গেটের সামনে এসে থাএল গাড়ি দু'টো। looking window দিয়ে মুখ বের করে দেখল প্রহরী। গেট খুলে গেল। আমাদের গাড়ি দু'টো গিয়ে দাড়াল পোর্চের নিচে। সামনের গাড়ির ভদ্রলোক আমাদের একটা বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের তিনজনকে নিয়ে উপরে উঠে একটি ভেজানো দরজায় মৃদু টোকা দিলেন। ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল।

ভদ্রলোক আমাদের ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করে দরজা খুলে ধরলেন। আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভদ্রলোক ঢুকলেন সব শেষে। ভিতরে ঢুকে দেখি সাদা আদ্দির পায়জামা-পাঞ্জাবি পড়া কর্নেল ওসমানী একটি সোফায় বসে আছেন। আমাদের দেখে তিনি উঠে দাড়ালেন। সাথের ভদ্রলোক একে একে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জনাব ওসমানী সবার সাথে হাত মিলিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। পরিচয়ের পর্ব শেষ হলে সাথের ভদ্রলোক তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমাদের বসতে নির্দেশ দিলেন কর্নেল ওসমানী। আমরা তার সাথে সাথে সোফায় বসে পড়লাম।

-Welcome boys! I congratulate you all তোমাদের দেশপ্রেমে আমি মুগ্ধ হয়েছি। You have accomplished miracle তোমাদের পৌছার সংবাদ

আমরা যথা সময়ে জানতে পেরেছি। আশা করি এতদিন তোমাদের কোন অসুবিধে হয়নি? জানতে চাইলেন কর্নেল ওসমানী।

-Not at all, Sir. We have been really looked after very well by the Indian authorities. জবাব দিলাম।

-খুবই ভাল কথা। তোমাদের মত অফিসার আমার বিশেষ প্রয়োজন। পাকিস্তান থেকে তোমাদের মত আরো অনেকে আসুক সেটাই আমার কাম্য।

-স্যার! পাকিস্তান থেকে বাঙ্গালীদের অনেকেই আসতে চায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ কিংবা ভারতীয় সরকার সম্পর্কে তাদের তেমন পরিষ্কার ধারণা নেই বলেই অনেকে ঝুঁকি নিতে পারছে না। ভারত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল এটা ওদের জানাবার ব্যবস্থা করতে পারলে আমাদের জানাশোনা অনেকেই চলে আসবে।

-How this can be achieved? প্রশ্ন করলেন কর্নেল ওসমানী।

-আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধব পরিচিত সবাইকে ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে সবকিছু জানাতে পারি। আমাদের চিঠিগুলো ভারত সরকারের সহায়তায় পাকিস্তানে কোন উপায়ে পোষ্ট করতে পারলে কাজ হবে স্যার।

-Good idea. We shall see. জবাব দিলেন জনাব ওসমানী। এরপর তিনি বললেন,

-Prime minister, Foreign minister and myself are here to discuss matters of mutual interests with Indian Govt. I shall raise your valid suggestion during our talks.

এখন আমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাব। তিনি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনিই তোমাদের বলবেন, বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমাদের কি দায়িত্ব দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বুঝলাম, আমাদের ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে ইতিমধ্যেই তারা আমাদের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করে সবকিছু ঠিক করে ফেলেছেন। তিনি আমাদের নিয়ে আর একটি কামরায় গেলেন। সেটাও বসার ঘর। একটি ডাবল সোফায় একপ্রান্তে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ একটা সাফারি স্যুট পরে বসেছিলেন; অন্য প্রান্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ পায়জামা শেরওয়ানী ও তার নিজস্ব ষ্টাইলের টুপি পড়ে দু'পা সোফায় উঠিয়ে বসেছিলেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই দু'জনে উঠে দাড়ালেন। কর্নেল ওসমানী আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং জনাব মোশতাক আহ্মদের সাথে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্বাগত

জানালেন। অল্প সময় পর বেয়ারা চা-নাস্তা রেখে গেল। এটাও একটা সরকারি গেষ্ট হাউজ। চা খেতে খেতে আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে নিলেন তিনজন। আমাদের পালিয়ে আসার ব্যাপারে ওদের কৌতুহলের শেষ নেই। তাঁরা প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন আর আমরা জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে জনাব তাজুদ্দিন বললেন, "আপনারা মুক্তিযুদ্ধের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে হয়ত তেমন বিশেষ কিছু জানেন না। স্বাধীনতা যুদ্ধ কি করে শুরু হল, আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি এ সমস্ত ব্যাপারে পরিস্কার ধারণা করে নিয়েই আপনারা সংগ্রামে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবেন। আপনারা বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসার। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগ করা হবে। ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপট ও আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগতির জন্য দিল্লীতেই আপনাদের সপ্তাহ দু'য়েক আরো থাকতে হবে। জেনারেল ওবান সিং ও তার সহকর্মীরা আপনাদের সব কিছুর বিষয়ে বিস্তারিত ব্রিফিং করবেন। এভাবে আপনারা নিজেদের দায়িত্ব ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা নিয়ে মুজিবনগর আসবেন।"

তার সিদ্ধান্ত শুনে কিছুটা অবাক হলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে না জেনে ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ব্রিফিং নিতে হবে কেন? তাহলে আমাদের সংগ্রামের প্রতি ভারত সরকারের সহানুভূতি নিঃস্বার্থ নয়? বুঝতে পারলাম ভারত সরকারের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর। মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। কেমন যেন ঘোলাটে ঠেকলো ব্যাপারটা। বেশ কিছু প্রশ্ন দেখা দিল মনে। কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না। ভাবলাম, এ মুহূর্তে এসমস্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার চেষ্টা করা সঠিক নয়। সময় মতো সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব। বাইরে ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ ও সেই ভদ্রলোক আমাদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। বৈঠক শেষে একইভাবে পথিমধ্যে গাড়ি বদলিয়ে ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়।

গাড়িতে ব্রিগেডিয়ার জিজ্ঞাসা করলেন,

–তোমাদের মিটিং কেমন হল?

–ভালোই। জবাবে বললাম।

ফিরে এসে আমার ঘরে গিয়ে বসলাম তিনজন। মতি ও নূর দু'জনই বেশ গম্ভীর।

–Sir, Bangladesh is a lost case. ইসলামাবাদ থেকে রাজধানী বদল করে দিল্লীর গোলামী করার জন্য দেশ স্বাধীন করার কোন যৌক্তিকতা নেই। The Awami league Leadership has already sold themselves. যা ভেবে

এসেছি তা হবে না। this independence will be meaningless. নূর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলে উঠল।

–এতটা ভেঙ্গে পড়া ঠিক হবে না নূর। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যোগ দেবার পর এসব চিন্তা করা যাবে। মতি শান্তনা দেবার মত করে জবাব দিল। আমি নিশ্চুপ বসে থাকলাম।

সন্ধ্যায় এলেন জেনারেল ওবান সিং এবং জনাব এ কে রায়। জনাব রায় আমাদের হাতে তিনটি এনভেলাপ দিয়ে বললেন, "আপনাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকার। আপনাদের political asylum grant করা হয়েছে।" চিঠিগুলো খুলে দেখলাম ওগুলো জনাব রায়ের বক্তব্যের official conformation. জনাব ওবান সিং জানালেন আগামীকালই আমাদের এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই থাকতে হবে মুজিবনগর যাওয়ার আগ পর্যন্ত । ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ সব বন্দোবস্ত করবেন এবং এখানকার মত ওখানেও তিনি আমাদের সাথেই থাকবেন। জেনারেল ওবান সিং এবং শ্রী রায় চলে যাবার পর নিজেদের হালকা করার জন্য রাতের খাবার খেয়ে চলে গেলাম সিনেমা দেখতে। বসন্ত মার্গের কাছেই কমল সিনেমা হল। সিনেমা থেকে ফিরে এসে শুয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুম আসছিল না। দুপুরের প্রশ্নগুলো বার বার ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে। বাংলাদেশের সংগ্রাম কাদের সংগ্রাম? কাদের নিয়ন্ত্রণে সংঘটিত হচ্ছে এ যুদ্ধ? ভারত নেপথ্যে থেকে কি স্বার্থে কলকাঠি নাড়ছে?

পৃথিবীর সব দেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম হিসেবে সংগঠিত হয়েছে, জাতীয় সরকারের অধিনে। আমাদের বেলায় এর ব্যাতিক্রম কেন? কেন তড়িঘড়ি করে প্রবাসে দলীয় আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হল ভারত সরকারের প্রচ্ছন্ন অনুমোদনে? জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত আপামর জনগণের উপর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য কি? আইয়ূব বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণআন্দোলন সবকিছু সংগঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তনের প্রগতিশীল সবগুলো রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের একলা চল নীতি কি কারণে সমর্থন করছে ভারত সরকার? আগামী দিনের ঘটনা প্রবাহ থেকেই খুঁজে পেতে হবে এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব। এ মুহূর্তে কোন প্রকার তর্কে না গিয়ে নিরব দর্শক হয়ে সবকিছু শুনে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সচেতন হয়ে ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

পরদিন আমাদের স্থানান্তরিত করা হল দিল্লীর পালাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কাছে গ্যারিসন এলাকার একটি সামরিক প্রশিক্ষন কেন্দ্রে। সেখানে পরিচয় হল মেজর সুরজ সিং এর সাথে। পাকানো স্বাস্থ্যের অধিকারী মেজর সুরজ সিং একজন বিচক্ষণ

কমান্ডো এবং Insurgency and counter insurgency expert; ব্রিগেডিয়ার নারায়ণও তাই। এরা দু'জনেই আমাদের মূল শিক্ষক। আমাদের জন্য দু'সপ্তাহের একটি crash course এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে Insurgency and counter insurgency, guerilla warfare, urban warfare, jungle warfare, shall arms, explosive, unarmed combat সবকিছুই রয়েছে। Specialized officer হিসেবে আমরা তিনজনই এ সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত। তবুও যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দেবার আগে আমাদের জ্ঞানকে ঝালাই করে নেবার সুযোগ পেয়ে ভালোই হল। শুরু হল আমাদের প্রশিক্ষন। এ সমস্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি চললো স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত ব্রিফিং। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান আর্মির শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ প্রভৃতি সংগঠনের বাঙ্গালী সদস্যরা। তাদের কেন্দ্র করে জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তি সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে দলমত নির্বিশেষে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য পেশাধারী জনগণের বৃহদাংশ। ভারত সরকার বাংলাদেশের ঘটনাবলী অতি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষন করছে। বাংলাদেশ থেকে বর্ডার ক্রস করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে লক্ষ লক্ষ শরনার্থী। এভাবেই ভারত সরকার সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে, অনেকটা মানবিক কারণেই। স্বতঃস্ফুর্তভাবে গড়ে উঠা স্বাধীনতার সংগ্রামকে ফলপ্রসু করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের। আওয়ামী লীগকেই দিতে হবে সেই নেতৃত্ব। এর জন্যই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে অস্থায়ী আওয়ামী লীগ সরকার। ভারত আওয়ামী লীগ ও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে বিশ্বাস করে। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে সংগঠিত করে তুলতে হবে এ সংগ্রাম। আওয়ামী লীগ ও সদ্য গঠিত প্রবাসী সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্য কোন রাজনৈতিক দল ভিন্ন কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী গ্রুপ কিংবা ব্যক্তি কাউকেই কোন সাহায্য করবে না ভারত সরকার। আওয়ামী লীগ সরকারের একক কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বিরোধিতা করতে পারে মূলতঃ দুইটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি।

প্রথমত: পাকিস্তান সেনা বাহিনীর প্রাক্তন সব সদস্যরাই দীর্ঘ দিন যাবত রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদারিত্ব করেছে। তাদের কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। তাই এ সংগ্রামের কর্তৃত্ব দাবি করে তারা ক্ষমতালিপ্সু হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।

দ্বিতীয়ত: হুমকি আসতে পারে চরমপন্থী নকশালীদের কাছ থেকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটেছে চরমপন্থীদের। তাছাড়া বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা মনিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি

প্রদেশে নকশালী তৎপরতা ক্রমবর্ধমান। ভারতের পূর্বাঞ্চলের নকশালীরা বাংলাদেশের চরমপন্থীদের সাথে এক হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগে মিলিতভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠতে পারে। এই মিলিত শক্তি আবার একত্রিতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে নেবার চেষ্টাও করতে পারে ঐ সমস্ত অঞ্চলের চলমান বিচ্ছিন্নবাদী সংগ্রামে। এসমস্ত ক্ষমতা লিপ্সু শক্তিসমূহকে সমূলে উৎপাটন করে যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ এখন থেকেই গ্রহণ করা উচিত বলে ভারত সরকার মনে করে। একইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাতে কোনক্রমেই ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে না দাড়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চক্রান্তের ফলে তার জন্যও প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। এ ব্যাপাবে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীও একমত হয়েছেন। যৌথ উদ্যোগে একটি পরিকল্পনাও প্রনীত হয়েছে। ঠিক হয়েছে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হবে। এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হবে এক লক্ষ। বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্পে ওদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। এ বাহিনীর রিক্রুটমেন্ট, ডিপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সব কিছুই থাকবে মুক্তি বাহিনীর কমান্ডের আওতার বাইরে। এ বাহিনী সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দ্বারা। এদের সশস্ত্র করা এবং পরিচালনা করার দায়িত্ব নেবে ভারত সরকার। ভারত সরকারের তরফ থেকে এ বাহিনী গঠনের মূল দায়িত্বে থাকবেন জেনারেল ওবান সিং। এদের মূল কাজ হবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা। প্রশিক্ষণের পর এদের দলে দলে পাঠানো হবে বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে। ভেতরে গিয়ে নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকবে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি যে কোন চ্যালেঞ্জ এর মোকবিলা করার জন্য। এ বাহিনীর নাম রাখা হবে বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স)। যুদ্ধকালে এবং স্বাধীনতার পরে পর্যায়ক্রমে ঐ বাহিনীর নাম রাখা হয় মুজিব বাহিনী এবং কুখ্যাত রক্ষীবাহিনী। বাংলাদেশ সরকার আমাদের তিনজনকে মনোনীত করেছে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সহযোগিতায় এই বিএলএফ গঠন করার জন্য। আমাদের totally non-political মনে করে এবং মুজিবর রহমানের প্রতি আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা দেখেই বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমাদের পেশাগত যোগ্যতা, সাহস, অন্ধ দেশপ্রেম, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সিনসিয়ারিটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই কনভিন্সড হয়েছিলেন দুই সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল। সুদূরপ্রসারী এ নীল নকশা এবং ভারত সরকারের মনোভাব জানতে পেরে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে উঠল। গত কয়েকদিন যাবত মনে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো দেখা দিয়েছিল সেগুলোর অনেকগুলোরই জবাব পেয়ে গেলাম। জানবাজী রেখে যারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, অকাতরে প্রাণ দিতে কুন্ঠিত হচ্ছেন না যারা, তাদের প্রতি

কী অবিশ্বাস! ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করার কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র! শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সাথে কী চরম বিশ্বাসঘাতকতা! চানক্যবুদ্ধির এ নীল নকশা ফাটল সৃষ্টি করবে জাতীয় ঐক্যে। জাতি হয়ে পড়বে বিভক্ত। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত হয়ে উঠবে দুর্বল। নস্যাৎ হয়ে যাবে জাতীয় সংগ্রামী চেতনা। অর্ন্তদ্বন্দ্বে জর্জ্জরিত দুর্বল বাংলাদেশ পরিণত হবে একটি করদ রাজ্যে। নাম সর্বস্য বাংলাদেশের খোলসে অর্থহীন হয়ে পড়বে স্বাধীনতা। আট কোটি বাংলাদেশীর মুক্তির আকাঙ্খা পথ হারাবে বিশ্বাসঘাতকতার চোরাবালিতে। একই সাথে র্নিমূল করা হবে ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার স্বাধীনতার সংগ্রামগুলোকেও।

মন বিদ্রোহ করে উঠল। এ চক্রান্তের অংশীদার হতে পারব না। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এ নীল নকশার বিরুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে সহযোদ্ধাদের। ঐক্যমত্য সৃষ্টি করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে: অতি সংগোপনে। অন্যের দেয়া নামেমাত্র স্বাধীনতা নয়, প্রকৃত স্বাধীনতাই অর্জন করতে হবে। নিজেদের শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের। শিক্ষা নিতে হবে গণচীন, ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস থেকে। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, কোন কারণেই কোন প্রকার তর্কে যাওয়া চলবেনা; সবকিছু নীরবে সহ্য করে নিতে হবে। সর্বপ্রথম সংগ্রামে গিয়ে যোগ দিতে হবে। তারপর চিন্তা-ভাবনা করে এবং সহযোদ্ধাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই আমাদের করণীয় কি সেটা ঠিক করতে হবে। কোর্সের ব্যস্ততায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল বেশ তাড়াতাড়িই। কোর্সের মেয়াদ শেষ হল। আমরা একদিন মুজিবনগর সরকারে যোগদান করার জন্য বিমানযোগে কোলকাতা চলে এলাম। সাথে এলেন ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ।

জনাব শাহাবুদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেনের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম কোলকাতা মিশনের ডিফেক্শনের এর কথা। পাকিস্তানের কোলকাতা মিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন বাঙ্গালী জনাব হোসেন আলী। জনাব হোসেন আলীর পর সিনিয়রমোষ্ট বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি প্রথম সচিব হিসেবে মিশনে কনস্যুলার সেকশন এর দায়িত্বে থাকলেও তার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। কারণ তিনি জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সদস্য হিসাবে কভার এ্যাসাইনমেন্ট এ নিয়োজিত ছিলেন। মিশনের ষ্টাফ মেম্বারদের বেশিরভাগই ছিলেন বাঙ্গালী। মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনাব হোসেন আলী, জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব আনওয়ারুল করিম চৌধুরী ও অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসাররা ঠিক করলেন তারা মুজিবনগর সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করে ডিফেক্ট করবেন। যদিও জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর পরিবার তখন ঢাকায় তথাপি মিশনের অন্যান্য ষ্টাফ

মেম্বারদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করলেন না। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা একদিন সকালে সম্পূর্ণ মিশন দখল করে নিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। মিশনের অবাঙ্গালী ষ্টাফদের সব বের করে দেয়া হয়। তখন থেকে ১৯নং সার্কাস এ্যাভেনিউ বাংলাদেশের প্রথম কূটনৈতিক মিশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনাব শাহাবুদ্দিনের কাছ থেকে নিম্মীর বাবা জনাব আর আই চৌধুরীর নাম্বার যোগাড় করে নিয়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম বাপ্পি, নিম্মী এবং খালাম্মাদের কথা। তিনি টেলিফোনে বিস্তারিতভাবে কিছু না বলে শুধু বলেছিলেন, তারা ঢাকায় নেই কোলকাতাতেও এসে পোঁছায়নি। তিনি তাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তার মানে নিম্মীরা ক্র্যাকডাউনের পর যুক্তিগত কারণেই ঢাকা ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই কোলকাতা মিশনের ডিফেক্শনের খবর আকাশবাণীর প্রচারের মাধ্যমে জানতে পেরেছে। এ খবর জানার পর আত্মীয়-স্বজন সবাই তাদের কোন রকমে বর্ডার ক্রস করে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই। ঢাকায় কিংবা বাংলাদেশের কোন স্থানই জনাব আর আই চৌধুরীর ডিফেকশ্নের পর তাদের জন্য নিরাপদ নয়। যদিও পালানোর প্রচেষ্টা হবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ তবুও তাদের জন্য অন্য কোন বিকল্পও নেই। জনাব চৌধুরীর কথা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম তিনি ভীষণভাবে মানসিক দুঃশ্চিন্তায় ভুগছেন। তিনি বাপ্পিকে নিয়েই বেশি ভাবছিলেন। ও যদি খালাম্মা ও নিম্মীকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে রাজি না হয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে চলে যায় তবেই হবে বিপদ। সে অবস্থায় নিম্মী এবং খালাম্মা (নিম্মীর মা) কোনক্রমেই কোলকাতায় পালিয়ে আসতে ভরসা পাবেন না; ফলে তাদের জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিষহ। পাক বাহিনীর শ্যোনদৃষ্টি থেকে জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে থাকা তাদের জন্য কিছুতেই সম্ভব হবে না। ধরা পড়লে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। নিম্মীদের খবর জানতে পেরে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ'তায়ালার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, "আল্লাহ্ সহিসালামতে তাদের কোলকাতায় পৌছাঁবার তৌফিক ও সুযোগ করে দিও, মাবুদ।"

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদ্যনাথ তলায় গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পিঠস্থান কোলকাতা। কর্নেল ওসমানীর সাথে আলোচনা।

- সপ্তম আশ্চর্যের এক আর্শ্চয স্বপ্নপুরী কোলকাতা।
- ৫৮ নং বালিগঞ্জ।
- স্বাগতম জানালেন জনাব তাজুদ্দিন এবং কর্নেল ওসমানী।
- জনাব আর আই চৌধুরীর বাসায় ফোন করে অপ্রত্যাশিতভাবে বাপ্পির কণ্ঠ শুনতে পেলাম।
- ৩ নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ ভিআইপিদের একটি শরনার্থী শিবির।
- ২৫-২৬শে মার্চ কালোরাত্রির জীবন্ত সাক্ষী খালাম্মা, বাপ্পি এবং নিম্মী।
- বাপ্পিদের রোমাঞ্চকর পালানোর কাহিনী।
- মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কর্নেল ওসমানীর ধারণা ও পরিকল্পনা।
- কমান্ডারদের গ্রেন্ড কনফারেন্সের আভাস।
- ভারতীয় নীল নকশা অনুযায়ী বিএলএফ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কর্নেল ওসমানী এবং জনাব তাজুদ্দিনকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে।
- বিএলএফ সর্ম্পকে সবকিছু খুলে বললাম কর্নেল ওসমানীকে।
- যুদ্ধকালে কোলকাতার নার্ভ সেন্টার– ৫৮ বালিগঞ্জ, ৩ নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ , প্রিন্সেপ স্ট্রিটের বামপন্থীদের আড্ডা, বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র, ১৯ নং সার্কাস এ্যাভেনিউ ও পরে ৮ নং থিয়েটার রোড।
- বিভিন্ন সূত্রে অনেক গোপন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জোগাড় করে জানালাম কর্নেল ওসমানীকে। তিনি সেগুলো জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিনকে।
- বিষয়গুলো নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করেও কোন জবাব পাননি প্রধানমন্ত্রী।

দুপুরের পর আমাদের বিমান এসে পৌঁছলো দমদম এয়ার পোর্টে। এয়ারপোর্ট থেকে শিয়ালদাহ্ ষ্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে আমাদের উঠান হল। খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলের দিকে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য মুজিবনগর সরকার ও ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের লোক এল হোটেলে। যারা এসেছিলেন তারা ব্রিগেডিয়ার নারায়ণের সাথে একান্তভাবে কিছু কথাবার্তা বলে আমাদের তৈরি হয়ে নিতে বললেন। তৈরি হয়েই ছিলাম। বাইরে দু'টো গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বললেন, "Well I shall say good bye and good luck to you. আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি না। "I Shall go back to Delhi." খুব খারাপ লাগছিল ব্রিগেডিয়ারকে বিদায় দিতে। এতদিন একসাথে থাকাতে ভীষণ আপন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। দিল্লীর মাটিতে পা দেবার পর থেকে আজঅব্দি সবসময়ে তিনি ছিলেন ছায়ার মত। আমাদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব তিনি পূরণ করেছিলেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে। তিনজনই তাকে জড়িয়ে ধরলাম একে একে। গাড়িতে উঠার আগে বললাম, "স্যার বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে; না হলেও আপনার কথা মনে থাকবে চিরকাল। মনে থাকবে আপনার আন্তরিকতা, স্নেহ ও ভালবাসা।" ট্যাক্সি দু'টো বেরিয়ে এল হোটেলের ফটক দিয়ে। পেছনে ফিরে দেখলাম ব্রিগেডিয়ার তখনও দাড়িয়ে আছেন পোর্চে। সাথের ভদ্রলোক আমাদের তার পরিচয় দেননি। আমরাও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, "এটাই কোলকাতা মহানগরী। পথিমধ্যে শহরের বেশ কিছু অংশ তোমরা দেখতে পারবে।" কোলকাতা স্বপ্নপূরী। পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী কোলকাতা। ছোটকালে স্কুলে জেনারেল নলেজ বইতে পড়েছিলাম পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে কোলকাতা মহানগরী একটি। বেশ কৌতুহল নিয়েই চারিদিকে চুপচাপ তাকিয়ে দেখছিলাম। অসংখ্য লোক ছুটে চলেছে ভীষণ ব্যস্ততায়। একই রাস্তায় চলেছে পদযাত্রী, ইলেকট্রিক ট্রাম, মানুষ টানা রিকশা, মোটর গাড়ি, বাস সব মিলিয়ে অকল্পনীয় যানজটের মধ্য দিয়ে ভেপুঁ বাজাতে বাজাতে আমাদের গাড়ি দু'টো অতি মন্থর গতিতে চলেছে। মাঝে মধ্যে ড্রাইভার মুখ বার করে রিকশা কিংবা পদযাত্রীদের দায়িত্বহীন চাল-চলনের জন্য বিরক্ত হয়ে গালাগালি করছিল। লোকের ভীড় ছাড়াও যে জিনিসটি আমার দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল সেটা হল, রাস্তার দু'ধারের প্রায় সব দোকান-পাট, অফিস-আদালত, রাস্তার নাম সবই হিন্দি অথবা ইংরেজীতে লিখা। লোকের প্রচন্ড ভীড়, যানবাহনের exhaust থেকে বেরিয়ে আসা গরম দূষিত বায়ু এবং গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপে ইতিমধ্যেই ঘেমে উঠেছিলাম। গাড়ির জানালা খোলা রেখেও তেমন বিশেষ কোন ফায়দা হচ্ছিল না। স্বপ্নপূরী বলে কথিত কোলকাতা শহরের জৌলুসও ঠিক তেমন একটা চোখে পড়ল না। সবখানেই কেমন যেন একটা দারিদ্রের ছাপ। বৃটিশ আমলের বাড়ি-ঘরগুলো সবই জীর্ন প্রায়। তাদের পাশাপাশি যে সমস্ত আধুনিক দালানকোঠা উঠেছে সেগুলো দেখেই বোঝা যায় The city is quite unplanned. রাস্তাঘাটের অবস্থাও মেইনটেনেন্সের অভাবে

শোচনীয়। Full of bumps and pot holes. অনেক রাস্তা ঘুরে গড়ের মাঠের কাছ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। এ জায়গাটা নাকি শহরের কেন্দ্রস্থল। একদিকে সব অফিস বিল্ডিংস। নামী-দামী দোকানের সারি। বড় বড় রেস্তোরাঁ, মাঠের অন্যপ্রান্তে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল। অন্যপ্রান্ত ঘেঁষে রাস্তা চলে গেছে গঙ্গার ধারে। পার্ক ষ্ট্রিট রয়েছে একদিকে। মাঠটি বেশ বড়। ফুলের কেয়ারী ও বড় বড় গাছপালা রয়েছে মাঠে। কোন কোন জায়গায় বসার বন্দোবস্তও রয়েছে। সে সমস্ত জায়গায় অনেক লোক বসেছিল। শ্রান্ত পথযাত্রী, অফিস-আদালতের নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী, নারী-পুরুষের দল, বেকার লোকজন, স্কুল-কলেজ থেকে পালিয়ে আসা কপোত-কপোতির দল সবার জন্যই গড়ের মাঠ একটি আকর্ষণীয় জায়গা। গড়ের মাঠ ছেড়ে পার্ক সার্কাস হয়ে আমাদের গাড়ি এসে থামল বালিগঞ্জের ৫৮নং বাড়ির সামনে। আধুনিক কায়দায় তৈরি দ্বিতল বাড়ি। চারিদিকে বেশ উঁচু দেয়াল ঘেরা বাড়িটির সামনে এক চিল্‌তে একটা উঠোন। উঠোনের মাঝখানে একটি ফ্ল্যাগপোলে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত তার মাঝে হলুদ বাংলাদেশের ম্যাপ। গেটের বাইরে ছোট-খাট একটা জটলা। গাড়ির হর্ণের শব্দ পেয়ে ভিতর থেকে সেন্ট্রি গেট খুলে দিল। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। সাথের ভদ্রলোক বললেন, "মুজিবনগর সরকারের পিঠস্থানে পৌঁছে গেছি আমরা।" এটাই মুজিবনগর সরকারের প্রধান কেন্দ্রস্থল। বাড়িটির পাশে এবং পেছনে যে জায়গা রয়েছে তাতে খাটানো হয়েছে কয়েকটি তাবু। গেট পাহারা দিচ্ছে বিএসএফ (BSF)-এর সেন্ট্রি। নিরাপত্তার জন্য চার কোনায় অবজারভেশন সেন্ট্রিপোষ্ট এবং বাংকার খনন করা হয়েছে। লোকের ভীড়ে পুরো বাড়িটাই গমগম করছে। দেশে চলছে স্বাধীনতা সংগ্রাম অথচ সরকার অবস্থান নিয়েছেন কোলকাতার বালিগঞ্জে! ব্যাপারটা ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ মনে হল না। সাথের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম,

–কর্নেল ওসমানী কোথায়?

–এখানেই তিনি থাকেন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনের সাথে। জবাব দিলেন তিনি।

আমরা তাকে অনুসরন করে দোতালার একটি কামরায় গিয়ে বসলাম। ভদ্রলোক আমাদের বসিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে আমাদের নিয়ে গেলেন অন্য একটি কামরায়। সেখানে বসেছিলেন কর্নেল ওসমানী, আমরা ঢুকতেই তিনি উঠে এসে আমাদের স্বাগতম জানালেন। ঘরটির একপ্রান্তে একটি চৌকি তার উপর বিছানাপাতা; সাথেই একটা আলনা তাতে কয়েকটি কাপড় ভাঁজ করে রাখা। একটি ষ্টাডি টেবিল কয়েকটি চেয়ার ও একপাশে একটি লম্বা বেঞ্চ ছাড়া ঘরে আর কিছুই ছিল না। "Well boys. This is my office cum residence. Please seat down." আমরা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসলাম। আমরা কখন কোলকাতায় এসে পৌঁছেছি? সফর কেমন ছিল? দিল্লীতে সাক্ষাৎ হওয়ার পর

আমাদের সময় কেমন কেটেছে? এ সমস্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি বললেন, "আগামী দিনের করণীয় সম্পর্কে রাতে আলাপ হবে বিস্তারিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাবিনেট মিটিং শুরু হবে তাতে আমাকেও থাকতে হবে তাই এখন কোন কিছুই আলাপ করা সম্ভব নয়। মিটিং শুরু হবার আগেই তোমাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎকারটা করিয়ে দেয়া ভাল হবে। চল ওঠা যাক।" তার নির্দেশে আমরা উঠে দাড়ালাম, তিনি তার ব্রিফকেসে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভরে নিয়ে আমাদের সাথে করে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেটা প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন সাহেবের ঘর। কর্নেল ওসমানীর ঘরের মত একই রকমের আসবাবপত্র। চৌকির উপর কাত হয়ে শুয়ে জনাব তাজুদ্দিন কি যেন পড়ছিলেন। পরনে ফুল প্যান্ট ও হাফহাতা শার্ট। আমাদের দেখে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন তিনি। সৌজন্য ও কুশলাদি বিনিময়ের পর কর্নেল ওসমানী জনাব তাজুদ্দিনকে জানালেন আজ রাতেই তিনি আমাদের ভবিষ্যত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ঘন্টাখানেক পর আমরা তার ঘর থেকে বেরিয়ে জনাব ওসমানীর কামরায় চলে এলাম। ওনারা দু'জন ক্যাবিনেট মিটিং এর জন্য চলে গেলেন। কর্নেল ওসমানী যাবার আগে বলে গিয়েছেন ফিরে এসে একসাথে রাতের খাবার খাবেন। ইতিমধ্যে আমাদের করার কিছু নেই। তার ঘরে দু'টো টেলিফোন। দু'টোই ডাইরেক্ট লাইন। ভাবলাম দিল্লী থেকে সেই একবার কথা বলার পর জনাব আর আই চৌধুরীর সাথে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ফোন করে আমাদের কোলকাতা পৌঁছার সংবাদটা তাকে দেয়া উচিত। সাথে সাথে বাপ্পি নিম্মীদের কোন খবর আছে কিনা সেটাও জেনে নেয়া যাক। ফোন তুলে ডায়াল করলাম তার বাসায়।

–হ্যালো! অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল বাপ্পির কণ্ঠস্বর। কোন ভুল নয়। অপ্রত্যাশিত হলেও বাপ্পির গলাই বটে!!

–ডালিম বলছি, দোস্ত তুই কোলকাতায় কবে এলি?

–একি ডালিম! কোথা থেকে? বাপ্পির আবেগ মিশ্রিত জিজ্ঞাসা।

–এইতো তোদের কোলকাতা থেকেই বলছি। তা তোরা সবাই ভালতো? প্রশ্ন করলাম।

–হ্যা ভাল। মা, নিম্মীকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে এসেছি বহুকষ্টে। কি করে এলাম সে এক কাহিনী। সাক্ষাৎ-এ সব বলব। আসার আগে তোদের বাসায় গিয়েছিলাম। সবাই ভাল আছে। চাচা (আমার আব্বা) তোর ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত। অনেকদিন যাবত কোন খবরা-খবর বা চিঠিপত্র পাচ্ছেন না তাই। স্বপন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে গেরিলা হিসাবে। বদি, রুমি, জুয়েল, কাজি, বাদল, চুন্নু, আলম, মেওয়া ওরা সবাই রয়েছে একসাথে। বর্তমানে মেলাঘরে ট্রেনিং-এ আছে। ট্রেনিং শেষে ওরা সবাই ঢাকায়

অপারেশন করার দায়িত্ব নিয়ে ফিরে যাবে। তুই কোথায় আছিস বলতো? অসুবিধে না হলে চলে আয়। আমাদের বাসা ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ। পার্ক সার্কাস ময়দানের দক্ষিন দিকে একটা লাল দোতলা বিল্ডিং। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বাড়ি এটা। সব ট্যাক্সিওয়ালাই চেনে, আসতে অসুবিধে হবে না। অসুবিধে হবে মনে হলে ঠিকানা বল আমিই এসে নিয়ে যাব।

–না, না তোর আসতে হবে না। তবে দেখা করতে হলে এখনই আসতে হবে। কারণ, রাতে জরুরী একটা মিটিং আছে। মিটিং এরপর অনিশ্চিত ভবিষ্যত। কোথায় যাব, কি করব তার কোন ঠিক নেই।

–তাহলে সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি চলে আয়।

–বেশ তাই হবে।

টেলিফোন নামিয়ে মতি ও নূরকে জিজ্ঞেস করলাম আমার সাথে যাবে কিনা? ওদেরও কোন কিছু করার নেই। ওরা খুশি হয়েই আমার সাথে যেতে রাজি হল। কর্নেল ওসমানীর ব্যায়ারাটাকে বললাম, বিশেষ কাজে আমরা বাইরে যাচ্ছি। মাঝেমধ্যে টেলিফোন করব কর্নেল সাহেব ফিরলেন কিনা জানতে। ব্যায়ারা জবাব দিল, "ক্যাবিনেট মিটিং ভাঙবে অনেক রাতে।" আমরা বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে বসলাম। ঠিকানা বলতেই ড্রাইভার ট্যাক্সি চালিয়ে দিল। বুঝলাম অতি সহজেই সে ঠিকানা চিনতে পেরেছে। বিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা একটা বেশ বড়সড় লাল রঙের দোতালা বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলাম। ড্রাইভার বলল, ঐ বাড়িটাই ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ। ভাড়া মিটিয়ে গেটের কাছে আসতেই দেখলাম বাড়িটি Heavily protected by armed police. একজন হাবিলদার আমাদের পরিচয় জানতে চাইলো। বললাম, আমরা বাংলাদেশী, বাপ্পির বন্ধু। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে সে ভেতরে চলে গেল। মুহূর্তে বাপ্পি দৌড়ে দোতালা থেকে নেমে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আবেগে আমরা কিছুক্ষণ দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে দাড়িয়েছিলাম। আনন্দে চোখে পানি এসে গিয়েছিল। ভাবতেই পারিনি কোলকাতায় এভাবে দেখা হবে। কিছুক্ষণ পর দু'জনেই সামলে নিলাম। বাপ্পি this is লেফটেন্যান্ট মতি and this is লেফটেন্যান্ট নূর। আমরা তিনজন একই সাথে কোয়েটা থেকে পালিয়ে এসেছি। দিল্লীতে কিছুদিন থেকে মাত্র এসে পৌঁছেছি কোলকাতায়। উঠেছি তথাকথিত প্রবাসী বাংলাদেশী সরকারের পিঠস্থান ৫৮নং বালিগঞ্জে। বাপ্পি নূর ও মতির সাথে কোলাকুলি করে আমাদের সবাইকে নিয়ে দোতালায় উঠে বারান্দায় রাখা সোফাতে বসিয়ে ভেতরে গেল খবরটা দিতে। খবর পেয়ে জনাব আর আই চৌধুরী, খালাম্মা, বাপ্পির ছোট বোন মানুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। আমরা সবাই সালাম করলাম। সবাই আমাদের দেখে ভীষণ খুশি। বাড়িতে

লোকজন গমগম করছে। বাপ্পি এক ফাঁকে বলল, "আমাদের বাসায় প্রায় ১৭টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। সবাই বাবা-মার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব।" আমাদের আসার খবর মুহূর্তে সমস্ত বাড়িতে রটে গেল। অনেকেই এসে ভীড় করলেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা আর্মি অফিসারদের স্বচক্ষে দেখতে। যারা এলেন তাদের সাথে বাপ্পি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। সেদিনের পরিচিতজনদের মাঝে ছিলেন কোলকাতা মিশনের থার্ড সেক্রেটারী আনওয়ারুল করিম চৌধুরী জয়, জনাব খালেক ও তার পরিবার, বেগম সাজেদা চৌধুরী ও তার স্বামী জনাব গোলাম আকবর চৌধুরী, জনাব মোস্তাকিম চৌধুরী এবং তার স্ত্রী এ্যনা খালা, রাফি আকতার ডলি, জনাব আসাদুজ্জামান ও তার স্ত্রী, জনাব আলী আকবর খান, জনাব খসরুজ্জামান ও তার স্ত্রী লুসী খালা, জনাব মামুনুর রশিদ ও তার স্ত্রী রাকা, জনাব ব্রজেন দাস, কামাল সিদ্দিকী প্রমুখ। অনেকে এলেও নিম্মীর দেখা নেই। মনটা উস্‌খুস করছিল। বাপ্পি আস্তে করে বলল ও বাসায় নেই। অল্পক্ষণ পরে হাপাঁতে হাপঁতে নিম্মী এসে হাজির! আমাকে দেখে বেচারী অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে দেখছিল। চোখ দু'টো ওর টলটল করে উঠেছিল। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল,

–তুমি এখানে কেমন করে?

–পালিয়ে এসেছি সুদূর কোয়েটা থেকে আমরা তিনজন। আজই কোলকাতায় এসে পৌঁছেছি দিল্লী থেকে।

সবাই আমরা কি করে পালালাম সে বৃত্তান্ত শুনতে খুবই আগ্রহী। ঠিক সেই মুহূর্তে ওসমস্ত ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে মন চাইছিল না। খালাম্মা বোধ হয় ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন আমার মনের অবস্থা। তিনিই আমাকে উদ্ধার করলেন। বললেন "ওরা তো এইমাত্র এল। ওদের একটু বিশ্রাম নিতে দাও। পরে সময় করে ওদের গল্প শোনা যাবে একদিন। এসো বাবারা ভেতরে এস।" বলে আমাদের ভেতরের বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হঠাৎ করে রসভঙ্গ হওয়ায় কিছুটা নিরাস হয়েই যেন সবাই যার যার ঘরে চলে গেলেন। ভেতরের ঘরে গিয়ে বসলাম আমরা, বাপ্পি, নিম্মী, মানু, খালাম্মা ও চাচা। অল্প কিছুক্ষণ পর চাচা কি একটা কাজে উঠে চলে গেলেন। খালাম্মা গেলেন চা নাস্তার যোগাড়ে। রইলাম শুধু আমরা।

নিম্মীর চেহারা দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম সুদূর কোয়েটা থেকে কোলকাতায় এসে তার সামনে আমি উপস্থিত হয়েছি এটা সে তখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

–কোয়েটা থেকে এতবড় ঝুঁকি নিয়ে তুমি কি করে চলে এলে? প্রশ্ন করল নিম্মী।

–No risk no gain. ওখানে পচে মরার চেয়ে পালিয়ে আসাটা কি ভাল হয়নি? তোমরাও তো পালিয়ে এসেছ যথেষ্ট ঝুকিঁ নিয়েই? উল্টো তাকেই প্রশ্ন করলাম।

–এবার বল তোদের কাহিনী শোনা যাক। বাপ্পি আবদার জানাল।

–আমাদের কাহিনী শোনাতে অনেক সময় লাগবে। আজ বরং তোদের পালাবার কাহিনী ও ঢাকায় ২৫শে মার্চের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শোনা যাক। বাপ্পির আবদারের জবাবে বললাম।

–বলিসনে ভাই সে রাতের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা, স্মরন করলে এখনও গা শিউরে উঠে।

খালাম্মা চা-নাস্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বাপ্পি তাদের কথা বলতে শুরু করল। আমরা আগ্রহ নিয়ে চুপ করে শুনতে লাগলাম।

–ফেব্রুয়ারীর শেষে মা (খালাম্মা) কোলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। উদ্দেশ্য দেশের অবস্থা দেখে শুনে প্রয়োজন হলে আমাকে ও নিম্মীকে সঙ্গে নিয়ে কোলকাতায় ফিরে যাবেন। ২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১০টা অব্দি তিনি শেখ সাহেবের বাসাতেই ছিলেন। ৩২নং ধানমন্ডি থেকে লালবাগের বাসায় ফেরেন রাত প্রায় সাড়ে দশটায়। বাসায় ফেরার পর সবাই তাকে ধরে বসলাম নেতা কি বললেন? মা শুকনো বিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "নেতাকে অনেক বোঝানোর পরও তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে রাজি হলেন না। পার্টির নেতা কর্মীরা, ছাত্রনেতারা, অন্যান্য অনেকেই আসন্ন সামরিক অভিযান সম্পর্কে শেখ মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, পাক বাহিনী যদি জনগণের উপর ঝাপিঁয়েই পড়ে তখন জনগণের পাশে থেকে প্রতিরোধ সংগ্রামে তিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন সেটাই তাদের প্রত্যাশা। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানের এক কথা, তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। অস্ত্রের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। পাক বাহিনী নিরীহ জনগণের উপর শ্বেত সন্ত্রাসের ষ্টিম রোলার চালিয়ে দেবে এ ধারণা সম্পর্কেও তার দ্বি-মত ছিল। তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেছিলেন, প্রয়োজনবোধে সামরিক জান্তা তাকে বন্দী করবে কারণ তাদের বিরোধ তার সাথে। কিন্তু অনেকেই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে বর্তমানের দ্বন্দ্ব শুধু সামরিক জান্তা ও শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; আজকের দ্বন্দ্ব সামরিক জান্তা এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে। এ সত্যকে অস্বীকার করা হবে মারাত্মক ভুল। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উম্মুখ। যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতেও তারা প্রস্তুত। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব হবে তাদেরকে সংগঠিত করে যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকা। সামরিক অভিযানের মোকাবেলায় প্রয়োজনবোধে অস্ত্রও হাতে তুলে নিতে হতে পারে। এর জন্য মানসিকভাবে নেতৃত্ব ও জনগণকে তৈরি থেকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতিও নেয়া উচিত। এতেই কমবে সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি, জনগণ ছিনিয়ে নিতে পারবে তাদের ইপ্সিত স্বাধীনতা। কিন্তু শেখ মুজিব কোন যুক্তিই গ্রহণ করলেন না। তার শেষ কথা, '২৭শে

মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালিত হবে।' এ কর্মসূচী ঘোষণা করে তিনি সবাইকে বিদায় করলেন। ঘোষণার সাথে এটাও তিনি বলেছিলেন,'পাক বাহিনীর আক্রমণের ভয় যারা করেন তারা গোপন আস্তানায় গা ঢাকা দিতে পারেন।' সেদিন রাতে যারা ৩২নং ধানমন্ডিতে সমবেত হয়েছিলেন তারা তার নেতিবাচক মনোভাবে হতাশ হয়েই ফিরে গিয়েছিলেন তার ঘোষণা শোনার পর। মাও ফিরে এসেছিলেন চিন্তিত মন নিয়ে। যেখানে সবাই ধারণা করছে পাক বাহিনী সামরিক অভিযান চালাবে সেখানে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কি কোন কিছুই করার নেই? জনগণকে সে ধরণের শ্বেত সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করার কোন দায়িত্বই কি নেই জনাব শেখ মুজিব ও তার দলের? তাহলে সেই চরম পরিস্থিতির হাত থেকে সাধারণ নিরস্ত্র জনগণকে বাচাঁবে কোন নেতৃত্ব? শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগকেই তো নেতৃত্বের স্থানে মেনে নিয়েছে দেশবাসী। তাদের ডাকেই তো সাড়া দিয়ে সংগ্রামকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে জনগণ অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। সংগ্রামের চরম পর্যায়ে কেন তবে নেতা শেখ মুজিব পিছিয়ে যাচ্ছেন জনগণকে আগে ঠেলে দিয়ে? এ সমস্ত প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে না পেয়ে মা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল; আতংকিত হয়ে উঠেছিল তার স্পর্শকাতর মন। সচেতন বিবেক তার কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না নেতার এ ধরণের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। সব বৃত্তান্ত শুনে আমরা সবাই হতবাক! এটাই যদি শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে কি আর করার আছে? শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সময় অতিবাহিত করা ছাড়া কিছুই করার নেই। একমাত্র সময়ই বলতে পারবে শেখ মুজিবের চিন্তা-ভাবনা ও তার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কতটুকু!

মার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ রাতটা সবাই জেগেই কাটাব ঠিক হল। বাবুন ও আমি খাবার পর কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বের হলাম অবস্থা বুঝে আসার জন্য। রাত প্রায় ১১.৩০ মিনিটের দিকে ফিরে এসে জানালাম নিউমার্কেট, ইউনিভার্সিটি এলাকায় আর্মি টহল দিচ্ছে। রেডিও ষ্টেশনেও কড়া আর্মি নিরাপত্তা বহাল করা হয়েছে। সমস্ত শহর ছেয়ে গেছে আর্মিতে। রাত বেশ গভীর। হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ করে কিছু একটা এগিয়ে আসছে বলে মনে হল। শব্দটা ভালো করে শুনে আমি বললাম, শহরে ট্যাংক নামানো হয়েছে। ঐ বিকট ঘড়ঘড় শব্দটা ট্যাংক চলার শব্দ। শহরে এত রাতে ট্যাংক কেন! এক অজানা আশংকায় সবার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল। দেয়াল ঘড়িটাতে সময় এগিয়ে চলছে টিক্‌টিক্। রাত প্রায় বারোটা। আচমকা রাতের নিরবতা ভেঙ্গে গর্জে উঠল কামান, মর্টার, ট্যাংক, মেশিনগান, রিকয়েলেস্ রাইফেল। কেঁপে উঠল গোটা ঢাকা শহর। জানালার কয়েকটি কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল ভূ-কম্পনে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হুমড়ি খেয়ে পরলাম ঘরের মেঝেতে। আমি তড়িৎ গতিতে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। সবরকম অস্ত্র নিয়ে পাক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতির উপর। গোলাগুলির আওয়াজ আসছে সর্বদিক থেকেই। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালাম, সমস্ত আকাশ ফ্লেয়ার ও

ট্রেসারের আলোতে উদ্ভাসিত। আগুনের ফুলকির মত ছুটে চলেছে অগুনিত ট্রেসার বুলেট। আজিমপুর, নিউমার্কেট, পিলখানা, ইউনিভার্সিটি এলাকায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আকাশে পেঁচিয়ে উঠে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী, অল্পক্ষণ পরে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে শোনা গেল মানুষের মরনকান্না, আহতের আর্তনাদ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মৃত্যু যন্ত্রণার হাহাকার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। শ্বেত সন্ত্রাসের পাশবিক তান্ডবলীলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে পরে থাকলাম সবাই। এভাবেই কেটে গেল রাত। সকাল হল। পোড়া বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। রেডিও খুলতেই শোনা গেল বিশেষ জরুরী ঘোষণা, গতকাল মধ্যরাত থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছে। জনগণকে বাইরে বেরুতে মানা করা হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে না জড়ানোর জন্য হুশিঁয়ার করে দেয়া হচ্ছে সবাইকে। কারফিউ জারি করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে, কিছুই করার নেই। শেখ মুজিব ও তার দলের চিন্তা-ভাবনা ভুল প্রমাণিত হল। আমরা সবাই নেতার কথাই ভাবছিলাম। ক্ষণিকের জন্য মনে ভেসে উঠেছিল তার চেহারাটা। নেতা কি অবস্থায় আছেন? আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দই বা কোথায়? কারফিউ চলছে। বেরুবার কোন উপায় নেই। বাসায় দরজা-জানালা বন্ধ করে পুরো ২৬শে মার্চ সবাই অন্তরীন হয়ে থাকলাম। সন্ধ্যার পর আবার গোলাগুলি, আর্তনাদ, মিলিটারি বহনকারী যানবাহন চলাচলের শব্দ, ভারী বুটের আওয়াজ রাস্তায়। নিশ্চুপ হয়ে আলো নিভিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দোয়া-কালাম পড়তে থাকলেন সবাই। অত্যন্ত অসহায় অবস্থা। যে কোন মুহূর্তে দরজা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে জল্লাদ বাহিনী। শুরু হতে পারে লুটতরাজ, মারপিট, ধর্ষণ। বাড়ির সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে ছিলাম আমি, বাবুন, মুন্নি, নুন্নি এবং মাও। মেয়েদের সবাইকে ছাদে পানির ট্যাংকে লুকিয়ে রাখা হল। চরম যে কোন অঘটন ঘটার প্রতীক্ষায় অসহায় চেতনাহীন অবস্থায় বসে রইলেন মুরুব্বীরা। সময় কাটছিল না কিছুতেই। ভোর হল একসময়। সূর্যের আলোয় প্রাণ ফিরে পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠলাম সবাই। রেডিও খুলতেই ঘোষণা শোনা গেল, সরকার কিছু সময়ের জন্য কারফিউ তুলে নিয়েছে সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে। ঘর থেকে সামনের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। ৫-৬ জন ইপিআর এবং বাঙ্গালী সৈনিকদের একটি ছোট দল ছুটে আসছে দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে দু'জন গুরুতরভাবে আহত। রক্তে ভেসে গেছে ওদের পরিধেয় কাপড়-চোপড়। কাছাকাছি পৌঁছে তাদের একজন আকুতি জানাল,

-ভাই একটু পানি দেন। বললাম,

-নিশ্চয়ই। আসুন আমাদের বাসায়।

-না ভাই, আমাদের সময় নেই। অতি কষ্টে পালিয়ে বেঁচেছি। নদীর ওপারে না পৌঁছার আগে আমরা নিরাপদ নই। খান সেনারা আমাদের মত সবাইকে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলে রক্ষা নেই। কুকুরের মত গুলি করে মারবে।

-আমি দৌড়ে গিয়ে বাবুনের সহায়তায় বালতি করে পানি এনে তাদের খাওয়ালাম। পানি খাবার পর ওরা কিছুটা প্রকৃতস্থ হল।

-আপনাদের এ অবস্থা কেন? জিজ্ঞেস করলাম।

-ভাই হানাদার বাহিনী সব শেষ করে ফেলেছে। তারা মাঝরাতে অতর্কিতে হামলা করে পিলখানা, পুলিশ লাইন ও ক্যান্টনমেন্টের বাঙ্গালী ইউনিটগুলির উপর। ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেছে হাজার হাজার সৈনিক। যারা পেরেছে তারা পালিয়ে বেঁচেছে আমাদের মত। বস্তিগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইউনিভার্সিটির হলগুলোকে গোলার ঘায়ে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে। মারা গেছে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। সমস্ত শহরে আর্মি টহল দিচ্ছে। কাউকে দেখে এতটুকু সন্দেহ হলেই গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। আপনাদের মত তরুণরাই ওদের টার্গেট। ভাই আপনারাও পালান। চলে যান শহর ছেড়ে গ্রামে। হানাদার বাহিনীর কবল থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ সংগ্রাম। এ সংগ্রামে আপনাদের মত তরুণ যুবকদের প্রয়োজন হবে সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা চলি ভাই। বেঁচে থাকলে দেখা হবে ইনশাল্লাহ্।

বিদায় জানিয়ে একইভাবে দৌড়ে চলে গেল ওরা। জোয়ান ভাইদের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম সবাই। একি ব্যাপার! কি করে এতটা বর্বর আর হিংস্র হয়ে উঠতে পারল পাকিস্তানের শাসকরা! তাদের হঠকারী পদক্ষেপ পাকিস্তানের অখন্ডতার মূলেই কুঠারাঘাত হেনেছে। এরপর পূর্ব পাকিস্তান কোনক্রমেই আর পাকিস্তানের অংশ হিসাবে থাকতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করেই এই ন্যাক্কারজনক শ্বেত সন্ত্রাসের জবাব দিতে হবে। কারফিউ উঠিয়ে নেয়ার সুযোগে বাইরে বেরিয়ে অবস্থাটা স্বচক্ষে একটু দেখে আসার ইচ্ছে হল। বাসায় ফিরে প্রস্তাবটা দিতেই মা, বাবুন এবং নিম্মী সঙ্গে যেতে চাইলো। কোন যুক্তিই তারা শুনলনা। একা আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না ওরা। অগত্যা চারজনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পরলাম। রাস্তায় অসম্ভব ভীড়। লোকজন, যানবাহন সবই ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে। সবাই চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ বেরিয়েছে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। ব্যসার কাছের বস্তি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত বস্তি লোকশূন্য। নিউমার্কেটের পাশে, কাটাবন, নীলক্ষেত বস্তিরও একই অবস্থা। সমস্ত পিলখানা আর্মি ঘিরে রেখেছে। প্রতিটি রাস্তায় মেশিনগান ফিট করা খান সেনা বহনকারী ট্রাকগুলো টহল দিচ্ছে। রাস্তার স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি এলাকা একদম ফাঁকা। থমথম করছে। ইকবাল হল (ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রস্থল), জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল মর্টার ও

ট্যাংক ফায়ারে ইট ও কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হলগুলোর মাঠে বুলড্রেজার দিয়ে গণকবর খুঁড়ে পুতে দেয়া হয়েছে মৃত ব্যক্তিদের লাশগুলো। রোকেয়া হলের কাছে এ ধরণের একটি গণকবরে তাড়াহুড়া করে পুঁতে রাখা একটি লাশের দু'টো পা বেরিয়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। দেখে আতঁকে উঠলাম সবাই। মিলিটারি গাড়িগুলো থেকে খান সেনারা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল আমাদের। হঠাৎ মার খেয়াল হল এভাবে ঘোরাফেরা করাটা মোটেও নিরাপদ নয়। বাসাবো, রামপুরা টিভি ষ্টেশন, কমলাপুর রেল ষ্টেশন, রেডিও ষ্টেশন ঘিরে রেখেছে শত শত আর্মি। কালো পোষাক পরিহিত মিলিশিয়া বাহিনীকেও নামানো হয়েছে। সব জায়গায় বস্তিগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে দু'রাতের মধ্যেই। মালিবাগে তোদের বাসায় সবার খবর নিতে গেলাম। আমাদের দেখে চাচা অবাক হয়ে গেলেন। ভীষণ রেগে গিয়ে মাকে বললেন, 'কোন সাহসে আপনারা বেরিয়েছেন? এক্ষুনি ফিরে যান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসা ছেড়ে গ্রামে চলে যান নদী পার হয়ে। আমরাও সরে পড়ছি। ঢাকা শহর মোটেও নিরাপদ নয়।' চাচার কথা শুনে তক্ষুনি আমরা ফিরে এলাম লালবাগে। ঘটনার ব্যাপকতা জোয়ান ভাইদের বর্ণনার চেয়েও অনেক বেশি। বাসায় ফিরে সবাই সেদিনই বুড়িগঙ্গা পার হয়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। আশ্রয় নিয়েছিলাম পরিচিত একজনের বাড়িতে। সেখানে আমাদের থাকতে হয় তিনদিন তিনরাত। ইতিমধ্যে শহরের পরিবেশ কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে। পুরো ঢাকা শহর আর্মি তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় আমরা আবার ফিরে এলাম লালবাগে। বাড়ি ছেড়ে লুকিয়ে থাকলে কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে ভেবেই আমরা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। চাচা পদস্থ সরকারি চাকুরে। সরকারি কর্মচারীদের যার যার চাকুরিস্থলে অবিলম্বে যোগদান করার জন্য রেডিও, টেলিভিশনে ক্রমাগত নির্দেশ জারি করা হচ্ছিল; ফলে বাধ্য হয়ে চাচারাও ঢাকায় ফিরে আসেন কয়েকদিন পর। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বেতার থেকে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ডাক দেশের জনগণ শুনতে পেয়েছে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাপিঁয়ে পড়েছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ বাহিনীর বাঙ্গালী সেনারা। ঢাকা পাক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সংগ্রামী বাঙ্গালী সেনারা দখল করে নিয়েছিলেন চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও মফস্বলের অন্যান্য শহরগুলো। তাদের সাথে স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতায় সাড়া দিয়েছিলেন স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী, ছাত্র জনতা। সব জায়গায় শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রতিরোধ সংগ্রাম। সদ্য সংগঠিত মুক্তি বাহিনী প্রবল বিক্রমে প্রতিহত করে চলেছিল পাক বাহিনীর আক্রমণ। সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন বিভিন্ন স্থানে, নিজ উদ্যোগে। প্রধান শহরগুলো পুনর্দখল করার জন্য ঢাকা থেকে Re-inforcement পাঠানো হচ্ছিল বিপুল সংখ্যায়। পরিণামে প্রধান শহরগুলো এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাক

বাহিনী মুক্তিফৌজের হাত থেকে পূনর্দখল করে নিতে সক্ষম হয়। Defensive tactics গ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধারা শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে নিজেদের দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার সিদ্ধান্ত নেন। অনেক ইউনিট সীমান্ত ক্রস করে ভারতে গিয়ে স্থাপন করেন তাদের Re-organization ক্যাম্প। পাক বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে প্রাণ ভয়ে হাজার হাজার শরনার্থী ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। শরনার্থীদের বেশিরভাগই ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের। ভারত সরকার তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানায়। মানবিক কারণের অযুহাতে শরনার্থীদের আশ্রয় দেবার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই মুক্তি বাহিনীর কমান্ডাররা যার যার ফৌজ নিয়ে ভারতের মাটিতে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সুসজ্জিত এবং সুশিক্ষিত পাক বাহিনীকে তাৎক্ষনিক সম্মুখ সমরে পরাস্থ করা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা বলেই নিজেদের Re-organize করে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা। একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমেই পাক বাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব। জাতি যখন মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত তখন ১৭ই এপ্রিল ভারত সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ হঠাৎ করেই গঠন করে প্রবাসে অস্থায়ী সরকার। দেশবাসী সে খবর জানতে পারে বিদেশী প্রচার মাধ্যমের প্রচারণায়। কোলকাতার মিশনের ডিফেকশনের খবরও আমরা জানতে পারি। এ খবর জানার পর পরিবারের সবাই বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাবাও ডিফেক্ট করেছেন সবার সাথে। খবর পেলাম তার এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে পাকিস্তান সরকার। প্রতিশোধের আক্রোশে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে সামরিক জান্তা। সবাই একমত হলেন, আমাদের আর লালবাগে থাকা ঠিক হবে না। সরে পরতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি, মা ও নিম্মী বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলাম আমাদেরই এক ফুপুর বাড়ি। কোন জায়গায় বেশিদিন একনাগাড়ে থাকা ঠিক নয়। তাই আমরা পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম বাড়ি থেকে বাড়ি। এভাবে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম আনু মামার বাড়ি, শহিদ মামার শ্বশুর বাড়ি, আত্মীয় অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার পেরু মামার বাড়িতে। সে বাড়িতেই ঘটল বিভ্রাট। একদিন গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার এলেন পেরু মামার বাসায় কোন এক কাজে। সেখানে ঘটনাক্রমে তিনি মাকে হঠাৎ করে দেখে ফেলেন। মিসেস চৌধুরীকে চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না তার। সন্দেহপ্রবন হয়ে ফিরে গেলেন ভদ্রলোক। তিনি জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে খবরটা পৌঁছে দেন। পরদিনই পেরু মামার বাড়ি ও লালবাগের বাসায় একই সাথে রেইড করা হল আমাদের খোঁজে। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবসাব বুঝে আমরা ভদ্রলোক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেরু মামার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই। এভাবে আমরা বেঁচে যাই সে যাত্রায়। এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল পাকিস্তানী গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিশোধ হিংসায় হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে

আমাদের। বাংলাদেশে আর থাকা সম্ভব নয়। পালিয়ে যেতে হবে সীমান্ত পেরিয়ে। ইতিমধ্যে স্বপন, বদি ওরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমিও যাব তাদের সাথে। মা বাধ সাধলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে যাবে সেতো গর্বের কথা। কিন্তু তার আগে আমাদের কোলকাতায় তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। আমাদের পৌঁছে দিয়ে তুমি যুদ্ধে যাবে তার আগে নয়।' মার যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। মা ও সমর্থ বোনের পালিয়ে যাবার দায়িত্ব যার তার উপর বিশ্বাস করে দিয়ে দেয়া চলে না। আমাকেই নিতে হবে এ কঠিন দায়িত্ব। পালাবার পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ঠিক করা হয় ঢাকা থেকে পালিয়ে যাব নানা বাড়ি নবীনগর। সেখান থেকে সুযোগ মত কস্‌বা সেক্টর দিয়ে আগরতলায় পাড়ি জমাতে হবে। নবীনগর থেকে কি করে বর্ডার ক্রস করতে হবে সেটা নবীনগর গিয়েই ঠিক করতে হবে অবস্থা বুঝে। আনু মামা ,আলতু নানাকে সঙ্গে নিয়ে মা, নিম্মী ও আমি এক রাতে নরসিংদী হয়ে নবীনগর এসে পৌঁছালাম। ঢাকা থেকে নরসিংদীর গাড়িতে। সেখান থেকে লঞ্চে নবীনগর একদম বাড়ির ঘাটে। নবীনগর গ্রামে খান সেনারা তখনও হানা দেয়নি। কিন্তু তবুও দলে দলে হিন্দুরা সব বসতবাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল ভারতে। বর্ধিষ্ণু নবীনগর গ্রামে খাঁ বাড়ি বিশেষ পরিচিত। বড় আব্বা ও নানা দাপটশালী জমিদার হিসাবে এক কালে দশ গ্রামে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বড় আব্বাকে বৃটিশ সরকার খেতাবেও ভূষিত করেছিল। প্রাসাদপোম জমিদার বাড়ির সামনে জোড়া দীঘি। নবীনগরের মুক্ত পরিবেশে পৌঁছে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আনু মামা দু'একদিন বিশ্রাম করে ঢাকায় ফিরে গেলেন। তার পুরো পরিবার তখনও রয়েছে সেখানে। খান সেনাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে আমরা পালিয়ে আসতে পারায় বাড়ির সবাই মহাখুশি। নবীনগরের শান্ত পরিবেশ এবং প্রকৃতির নির্মল সংস্পর্শে কয়েক দিনেই ভুলে গেলাম ঢাকার দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা। ২৫-২৬শে মার্চ রাতের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বাড়ি বাড়ি লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাবার বিড়ম্বনা, ২৭শে মার্চ সকালের তিক্ততা সবকিছুই দুঃস্বপ্নের মত অতীত হয়ে গিয়েছিল আমাদের কাছে। সনাতন দা গ্রামের বাড়ির মুরুব্বীদের একজন। পুরনো বিশ্বাসভাজন আপনজন। বংশানুক্রমে তারা খাঁ বাড়ির জমিদারী তদারক করে এসেছেন। তিনিই সব দায়িত্ব নিলেন আমাদের বর্ডার পার করে দেবার। সার্বিক দেখাশুনা ও পালাবার পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারিনী সবার অতি আদরের ছোট নানী বেগম আমির আলী খান ও কবির। ছোট নানীর বড় ছেলে, হবিগঞ্জের এসডিও (SDO) জনাব আকবর আলী খান (খসরু মামা) খান সেনাদের শ্বেত সন্ত্রাসের বিরোধিতায় ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই সময় আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অবস্থান করছিলেন। ঠিক হল আগরতলাতে খসরু মামার কাছেই যাব আমরা। একই গ্রামের কলেজ পড়ুয়া ছেলে মোমেন আমাদের গাইড হয়ে সঙ্গে যাবে। সনাতন দা যাত্রার সব বন্দোবস্ত করে

দেবেন। অসম্ভব উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী তরুণ যুবক মোমেন অসীম সাহসীও বটে। ইতিমধ্যেই সে কয়েকটি শরনার্থী দলকে আগরতলায় নিজ তদারকিতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে খান সেনাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। কসবা সেক্টর দিয়ে আগরতলা পৌঁছানোর চোরা রাস্তাগুলো ওর নখদর্পণে। ঠিক হল নৌকাযোগে মেঘনা, তিতাস পাড়ি দিয়ে খরস্রোতা গোমতী নদী বেয়ে কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া GT Road পর্যন্ত গিয়ে তারপর পদযাত্রা। বর্ডার পার হওয়ার পর পথিমধ্যে পড়বে একটি বড়সড় বাজার। সেখান থেকে ভাড়াটে গাড়িতে আগরতলা। বড় একটা গয়না নৌকা ঠিক করলেন নানী ও সনাতন দা। মাঝি-মাল্লারা সবাই অত্যন্ত বিশ্বস্ত। দুর্যোগপূর্ণ এক ঝড়ের রাতে আল্লাহ্‌র নাম করে মোমেন, কবির ও আলতু নানাকে সঙ্গে করে নৌকায় উঠে পাড়ি জমালাম এক অজানা ঠিকানায়। দুর্যোগের রাতে খান সেনাদের চোখ অতি সহজেই ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলেই ঝড়ের রাতে নৌকা যাত্রার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। বদর বদর বলে মাঝি-মাল্লারা মেঘনার উত্তাল বুকে অন্ধকারে নৌকা ভাসিয়ে দিল। ভাল করে সাঁতার জানিনা আমি ও নিম্মী দু'জনেই। ঝড়ো হাওয়ায় মেঘনা হয়ে উঠেছে বিক্ষুব্ধ। বিশাল ঢেউয়ের পাহাড় ভেঙ্গে নৌকা এগিয়ে চললো দুলতে দুলতে। ঢেউয়ের দোলা ও ঝড়ের তীব্রতার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে চুপ করে বসে আল্লাহ্-রাসূলকে স্মরন করতে থাকলাম সবাই। এমনি করে সারারাত একটানা নৌকা বেয়ে ফজরের ওয়াক্তে এক জায়গায় নৌকা ভেড়ালো মাঝিরা। সেখানে নেমে পড়তে হল সবাইকে। শুরু হল পদযাত্রা। ধানক্ষেত, পাটক্ষেতের আলের উপর দিয়ে, কাদা পলির উপর দিয়ে খালি পায়ে হেটে পাহাড়ী টিলাগুলো পার হচ্ছিলাম। পরনে সবার গ্রাম্য লেবাস। দুপুরের আগেই GT Road এর কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। একটি পাটক্ষেতের মধ্যে সবাইকে লুকিয়ে রেখে মোমেন আর আমি এগিয়ে গেলাম রাস্তাটা রেকি করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলাম আমরা। রাস্তা ক্লিয়ার। ক্ষিপ্র গতিতে রাস্তা পার হয়ে দূরে চলে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দূরের জঙ্গলে গা ঢাকা দেবার আগে খান সেনাদের দৃষ্টিতে পড়লে রক্ষে নেই। নিঃঘাত মৃত্যু। পরি কি মরি সবাই দৌড়ে ছুটে চলেছি রাস্তা ক্রস করার জন্য। আর একটু গেলেই উঁচু রাস্তা। হঠাৎ মোমেন বলে উঠল, 'সবাই শুয়ে পড়ুন, খান সেনাদের টহল গাড়ি আসছে।' তার নির্দেশে সবাই ধানক্ষেতের কাঁদা পানিতে অসাড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। চারদিকে যতটুকু দৃষ্টি যায় ছোট ছোট পাহাড়, টিলা, ধান আর পাটের ক্ষেত। লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। ধানক্ষেতের কাদা-পানিতে মুখগুজে পড়ে থেকে সবাই প্রমাদ গুনছিলাম, 'যদি টহলদার খান সেনারা দেখে ফেলে!' ভয়ে নিম্মীর দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। আল্লাহ্‌ই বাঁচানে ওয়ালা। খান সেনাদের গাড়িটা অল্প কয়গজ দূর দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল। ওরা ধানক্ষেতে পড়ে থাকা মানুষগুলি দেখতে পেল না। গাড়িটি অনেক দূরে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলে সবাই উঠে এক দৌড়ে রাস্তা ক্রস করে অপরদিকের পাটক্ষেতে গিয়ে বসে পড়লাম। একটু দম নেয়া

দরকার। মা বেচারীর ডান পা'টা কিছুদিন আগে ভেঙ্গে গিয়েছিল ইউনিভার্সিটির সিড়ি থেকে পিছলিয়ে গিয়ে। ভাঙ্গা পা'টা দুঁনিয়ে ফুলে উঠেছে। অসম্ভব সহ্য শক্তি মার। মুখ ফুটে কখনও নিজের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করে না। তাই শুধু বলল, একটু দম নেয়া যাক। আমি ও নিম্মী মার পায়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম হাটতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে তাঁর। বুঝতে পারলেও কিছুই করার নেই। বাকিটা পথ হেটেই যেতে হবে তাঁকে। মাঝামাঝি পথ অতিক্রম করেছি আমরা। এখন থেকে বাকি পথের সবটুকুই পাহাড়ী উচু-নিচু পিচ্ছিল পথ। সবাই কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না। মাকে উৎসাহ দেবার জন্য হেসে বললাম, 'মা তুমি দেখছি হাটাতে আমাদেরকেও হার মানিয়ে দিলে। কষ্ট হচ্ছেনা তো?' কোন জবাব না দিয়ে মা উঠে দাড়াল। আবার শুরু হল হাটা। হাটতে হাটতে সন্ধ্যার সময় আমরা পৌছলাম সেই বাজারে। বর্ডার এলাকার বাজার। কিন্তু শরণার্থীদের ভীড়ে পুরো বাজারটাই গমগম করছে। চালের বস্তা ভর্তি অসংখ্য ট্রাক দাড়িয়ে আছে। মোমেন বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি।' ঐ চাল বাংলাদেশ থেকে স্মাগলড হয়ে চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়ায়। কিছুদূর এগুতেই বাজারের অন্যপ্রান্তে একইভাবে দাড়িয়ে আছে পাট ভর্তি ট্রাকের সারি। ওগুলোও পাচাঁর হচ্ছে বাংলাদেশ থেকেই। দীর্ঘপথ চলায় সবাই তখন পরিশ্রান্ত। একটা চায়ের দোকানে বসে পানি, কিছু চা-নাস্তা খেলাম সবাই। খাওয়া শেষে একটি পুরনো জিপ গাড়ি ভাড়া করে আগরতলার পথে রওনা হলাম। ছোট্ট জিপটাতে প্রায় ১২জন যাত্রী ঠাসাঠাসি করে ঢোকালো ড্রাইভার। কিছুই বলার নেই। এটাই রীতি। বাজার থেকে আগরতলার দূরত্ব প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল। পুরনো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আমলের জিপ। ১২-১৪ জন যাত্রীর ভারে আর্তনাদ করতে করতে কোনমতে এগিয়ে চললো আগরতলার পথে। কিছুদূর যাবার পর গাড়ি থামিয়ে বনেট খুলে পানি ঢেলে বুড়ো ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করতে হচ্ছিল বারবার। এভাবেই অতি কষ্টে রাত প্রায় ১২টায় আমরা এসে পৌছালাম আগরতলা শহরে। শহর থেকে ৫-৬ মাইল দূরে এক পোড়া রাজবাড়িতে খসরু মামা ও আরো কয়েকজন পদস্থ বাঙ্গালী অফিসার সপরিবারে অবস্থান করছিলেন। মোমেন জায়গাটা আগেই দেখে গেছে। জিপ থেকে নেমে রিক্সা করে চলে গেলাম সেই আস্তানায়। রাজবাড়িতে পৌছে খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হল না খসরু মামাকে। খসরু মামা আমাদের সবাইকে দেখে অবাক,

-হেনা বুজি আপনারা?

-হ্যাঁ পালিয়ে এলাম। মোমেনই নিয়ে এসেছে আমাদের। ঢাকায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

-কথা পরে হবে। হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিন। মামা বললেন।

পথের ক্লান্তি, টেনশন, পেটের ক্ষুধা সব মিলিয়ে সবার অবস্থাই কাহিল। শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। মামার কথা অনুযায়ী রাজবাড়ির পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে সবাই ফিরে এসে দেখলাম, মামা ইতিমধ্যেই গরম ভাত, ডিম ভাজি এবং ডালের বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। সেগুলো অমৃত মনে করে সবাই গোগ্রাসে পেট পুরে খেলাম। খাওয়া শেষে মামার ঘরেই ঢালা বিছানায় শুয়ে পড়লাম সটান। শোয়া মাত্রই গভীর ঘুমে চেতনা হারালাম সবাই। আল্লাহ্'তায়ালার পরম করুণায় ভালভাবেই আমরা পৌঁছে গেলাম নিরাপদ আশ্রয়ে।

পরদিন সকালে খসরু মামা কোলকাতায় যোগাযোগ করে চাচাকে বাপ্পিদের পৌঁছার সংবাদ দিয়েছিলেন। বাপ্পিরা নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পৌঁছেছে জানতে পেরে জনাব চৌধুরী আশ্বস্ত হলেন। ওদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোলকাতায় আনাবার বন্দোবস্ত করবেন বলে খসরু মামাকে জানালেন জনাব চৌধুরী। ৪-৫ দিনের মধ্যেই প্লেনে করে বাপ্পিদের কোলকাতায় যাবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। সেই পর্যায়ে বাপ্পি খালাম্মাকে জানাল, সে কোলকাতায় যাবে না। আগরতলাতে ওদের সাথে দেখা হয়েছিল মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন হায়দার, ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম শিশু প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। তাদের কাছ থেকে বাপ্পি জানতে পারে স্বপন, বদি ওরা সব তখনও মেলাঘর ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বাপ্পি ঠিক করল সেও মেলাঘর গিয়ে ওদের সাথে ক্যাম্প যোগ দেবে। খালাম্মা তাতে বাধ সাধলেন। তাঁর এক কথা কোলকাতা অব্দি ওদের পৌঁছে দেবার দায়িত্ব বাপ্পির। কোলকাতা পৌঁছাবার পরই বাপ্পি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারবে: তার আগে নয়। বাপ্পির মনে ভয় ছিল কোলকাতায় একবার গেলে ওর আর যুদ্ধে যাওয়া হবে না। জনাব চৌধুরীকেও কিছুতেই রাজি করাতে পারবে না। এ ব্যাপারে কোন যুক্তিই তিনি মানবেন না। তাই একদিন সকালে বাপ্পি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে চলে গেল মেলাঘর ক্যাম্পে। খালাম্মা এতে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। খসরু মামা, জনাব তৌফিক ইমাম ও অন্যান্য সবাই খালাম্মাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু খালাম্মার এক কথা,'বাপ্পিকে কোলকাতা পর্যন্ত সাথে যেতে হবে।' অগত্যা ক্যাপ্টেন শিশুকে ডাকা হল। তিনি দূর সম্পর্কে বাপ্পিদের আত্মীয়। খালাম্মা শিশুকেই ধরে বসলেন, 'যে করেই হউক বাপ্পিকে মেলাঘর থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।' অগত্যা ক্যাপ্টেন শিশুকে তাই করতে হল। অবশ্য বাপ্পিকে বুঝিয়ে রাজি করাতে অনেক কষ্ট হয়েছিল ক্যাপ্টেন শিশুর। এরপর খালাম্মাদের সাথে বাপ্পিকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কোলকাতায় চলে আসতে হয়। কিছুদিনের মধ্যে খসরু মামা ও জনাব তৌফিক ইমামও সপরিবারে কোলকাতায় চলে এসে মুজিবনগর সরকারে যোগদান করেন। কোলকাতায় পৌঁছার পর চাচার একগুয়েমির ফলে বাপ্পিকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যোগ দিতে হয়েছিল হেডকোয়ার্টার্সেই।

বাপ্পিদের গল্প শুনে সেদিন আমরা বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছিলাম ৫৮নং বালিগঞ্জে। সেখানে পৌঁছে দেখি কর্নেল ওসমানী তখন পর্যন্ত ফেরেননি। রাত ৯টার দিকে ফিরে এলেন তিনি। আমরা একসাথে ডিনার করলাম। ডিনার শেষে আমাদের নিয়ে বসলেন তিনি। সর্বপ্রথম কিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হল এবং শুরু থেকে কি অবস্থায় রয়েছে যুদ্ধ বর্তমানে, সে বিষয় বিশদ বিবরণ দিলেন কর্নেল ওসমানী।

তিনি শুরু করলেন, "তোমাদের মনে রাখতে হবে ২৫শে মার্চের পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের পর ২৬শে মার্চ থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈনিক, প্রাক্তন ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বীর জোয়ানরা। ২৬-২৭শে মার্চ মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বীর জোয়ানদের সঙ্গে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এসে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্র, যুবক এবং আপামর জনসাধারণ। সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে। আর এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আবদ্ধ রাখা এবং যোগাযোগের কেন্দ্রসমূহ তাদের কব্জা করতে না দেয়ার জন্য নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হচ্ছিল। নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, যত বেশি বাধা সৃষ্টি করা যায় তা সৃষ্টি করা হবে। যে সমস্ত ন্যাচারাল অবসট্যাকল রয়েছে তা রক্ষা করতে হবে, সাথে সাথে শত্রুর প্রান্ত ভাগে এবং যোগাযোগের পথে আঘাত হানতে হবে। মূলতঃ এটাই ছিল নিয়মিত বাহিনীর রণকৌশল। সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথেই এ পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি রেজিমেন্টকে দু'টি ব্রিগেডের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়। সংখ্যায় কম থাকায় নিয়মিত বাহিনীর রণকৌশলে পরে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। কমান্ডাররা ছোট ছোট পেট্রোল বা ছোট ছোট কোম্পানী, প্লাটুনের অংশ দিয়ে শত্রুপক্ষের তুলনামূলক অধিক সংখ্যক সৈন্যকে Engaged করে রাখছিলেন। একই সাথে শত্রুর উপর আচমকা হামলাও চালানো হচ্ছিল। এভাবেই চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, যশোর, খুলনাতে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল। সে সময় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা বুঝতে পারছিলেন, কেবলমাত্র নিয়মিত পন্থায় যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। কারণ তখনকার পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছিল সর্বমোট ৫টি ব্যাটালিয়ন। তাদের সাথে ছিল ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ, ছাত্র, যুবক ও জনতা। কমান্ডাররা ছাত্র যুবকদের অল্প কিছুদিনের ট্রেনিং দিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে যোদ্ধার সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এ ধরণের শক্তি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনীর ৩-৪টি ডিভিশনকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাদের উপর্যপরি আক্রমণের মুখে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধ ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সে ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের এই বিশাল শক্তিকে ধ্বংস করে দেশকে স্বাধীন করা অসম্ভব হয়ে উঠে। তখনই কমান্ডাররা অনুভব করেন তাদের প্রস্তুত হতে হবে

দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের জন্য। এই পাঁচটি ব্যাটালিয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে এক বিশাল গেরিলা বাহিনী। একমাত্র বিশাল গণবাহিনীই পারবে শত্রুপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নিউট্রেলাইজড করতে। এ গণবাহিনী এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যেমন মানুষের পেটের অন্ত্রে একটি শক্তিশালী জীবানু অন্ত্রটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তেমনি ভেতর থেকে শক্তিশালী দক্ষ গেরিলা বাহিনী শত্রুর অন্ত্রকেও বিনষ্ট করে দেবে। এছাড়া দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। কারণ শত্রুপক্ষের সংখ্যা বেশি। ওদের বিমান বাহিনী রয়েছে তাছাড়া সম্বলও তাদের অনেক বেশি।

কর্নেল ওসমানীর কথা শুনে মনে প্রশ্ন দেখা দিল? ২৫শে মার্চ রাতে পাক বাহিনী যদি নিরীহ জনগণের উপর পৈশাচিক শ্বেত সন্ত্রাস না চালাত: একই সাথে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ এবং অন্যান্য সামরিক ইউনিটগুলোর বাঙ্গালী সদস্যদের উপর হামলা না চালাত: তবে কি স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটত? স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বাঙ্গালী বীর জোয়ানরা? এ ধাঁধাঁর জবাব ঐতিহাসিকরাই আগামীতে খুঁজে বের করবেন সে বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চললাম। কর্নেল ওসমানী বলে চলেছেন, "আমার বিশ্বাস ক্লাসিক্যাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার করে দেশ মুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ জনসম্পদ। সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

জনাব ওসমানীর কথায় টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী চিন্তাধারা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ল। পৃথিবীর কোন জাতি তাদের মুক্তি অল্পত্যাগে পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। যারা হয়তো বা পেয়েছেন তাদের সে স্বাধীনতা অর্থবহ হয়নি। প্রসুতির আতুঁর ঘর থেকেই বিভিন্ন চক্রান্তের স্বীকারে পরিণত হয়েছে তাদের সে স্বাধীনতা। ভৌগলিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও স্বাধীনতার সুফল জাতীয় মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নেতৃত্ব পৌঁছে দিতে পারেননি স্বাধীনতার সুফল জনগণের ঘরে ঘরে। অদৃশ্য কলকাঠির নড়াচাড়ায় যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে; সে সমস্ত দেশের পুতুল সরকারগুলোর কাছ থেকে জনগণ পেয়েছে শুধুই বঞ্চনা, প্রতারণা আর দারিদ্রের অভিশাপ।

আবার কর্নেল ওসমানীর বক্তব্য শুনতে মনযোগ দিলাম, "যুদ্ধকে স্বল্পস্থায়ী করার জন্য এপ্রিল মাসেই আমার মাথায় একটি প্ল্যান এসেছে। একটি বড় গেরিলা বাহিনী গঠন করে ভেতর থেকে শত্রুর আঁতে আঘাত হানতে হবে এবং পাশাপাশি নিয়মিত বাহিনীর ছোট ছোট ইউনিট অর্থাৎ কোম্পানী বা প্লাটুন দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন হবার জন্য তাকে বাধ্য করতে হবে, যাতে করে কনসেনট্রেটেড অবস্থা থেকে তারা ডিসপার্সড হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তাদের সংখ্যাগরিষ্টতা অকেজো

হয়ে পড়বে। শত্রুপক্ষ ছোট ছোট গ্রুপে নিজেদের কমিট করতে বাধ্য হবে। তখন গেরিলা পদ্ধতিতে তার যোগাযোগের রাস্তা, বেতার সংযোগ, রি-ইনফোর্সমেন্টের পথ ধ্বংস করে তাকে ছোট ছোট পকেটে আইসোলেটেড করে চরম আঘাতে তাদের ধ্বংস করতে হবে। এজন্য আমার নিয়মিত বাহিনীরও প্রয়োজন রয়েছে। আমার এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিটেইলড প্ল্যান ইতিমধ্যেই অস্থায়ী সরকার এবং মিত্রদের কাছে পেশ করেছি। তাতে আমি উল্লেখ করেছি, কমপক্ষে দু'লাখের মত গেরিলা বাহিনী এবং ২৫ হাজারের মত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে কমান্ডারদের অধিনে যে সমস্ত মুক্তিফৌজ রয়েছে তাদের ছাড়া এই নূন্যতম শক্তি আমাকে অবশ্যই গড়ে তোলার অনুমতি দিতে হবে। বর্তমানে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে রয়েছে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ তাদের আমি বলি নিয়মিত বাহিনী। সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র যুবকদের বলি অনিয়মিত বাহিনী। ভারতীয়রা তাদের বলেন FF (Freedom Fighters) আমার মতে পরীক্ষিত যোগ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সাথে নতুন রিক্রুটেড বীর জোয়ানদের ট্রেনিং দিয়ে তিনটি নিয়মিত ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড গঠন করার পরিকল্পনা নিতে হবে। নিয়মিত বাহিনীর বাকি সদস্যরা Sector troops হিসাবে স্থানীয় কমান্ডারদের অধিনে থাকবে। তাদের মূল দায়িত্ব হবে গেরিলাদের জন্য বেইস তৈরি করে তাদের ট্রেনিং দেয়া এবং দেশের ভেতর ছোট ছোট গ্রুপে তাদের induct করা। গেরিলাদের Operation co-ordinate করার দায়িত্ব থাকবে সেক্টর কমান্ডারদের উপর। সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্যের জন্য গেরিলা অ্যাডভাইজার নিয়োগ করা হবে। সমগ্র বাংলাদেশের রনাঙ্গনকে তিনি ১১টি সেক্টরে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেক্টরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবেন একজন সেক্টর কমান্ডার। সেক্টরগুলোর হেডকোয়ার্টার্স স্থাপিত হবে বাংলাদেশের ভেতর মুক্তাঞ্চলে। সেক্টরগুলোই হবে গেরিলা যুদ্ধের মূল ভিত্তি। কারণ, বাংলাদেশের মত এত বড় একটা থিয়েটার অর্থাৎ দেশব্যাপী রণক্ষেত্রে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা ও ব্যাপক দূরত্ব। কেন্দ্রীভূতভাবে দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে যুক্ত সামরিক সদর দফতর, উপযুক্ত সামরিক অফিসার ও ষ্টাফ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সম্পদ এবং সঙ্গতির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আমার থাকবে ১০জন অফিসার বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স। এত বড় একটা বিরাট অঞ্চলব্যাপী সামগ্রিক যুদ্ধে একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন আদেশ, নির্দেশ প্রেরণ করা ও সে অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা শুধু অসম্ভবই নয়, অবাস্তবও বটে। তাই আমি আমার কমান্ডারদের কাছে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য, আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বিবেচ্য বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের কার্যক্রমের কোন কোন পথ উম্মুক্ত রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব সেক্টর কমান্ডারদের একটি জরুরী বৈঠক তলব করার চিন্তা-ভাবনা করছি। জাতীয় লক্ষ্য, আমাদের বাহিনীর করণীয়, বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন

এবং সাংগঠনিক ও যুদ্ধ পরিচালনার নীতি নির্দেশ জারি করার দায়িত্ব হবে আমার হেডকোয়াটার্সের। আমাদের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের নীতি নির্ধারণ ও স্থানীয়ভাবে তাদের দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। সেক্টর কমান্ডারদের সাথে লিয়াঁজো অফিসার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলার ইচ্ছা রয়েছে আমার। এছাড়া আমার কমান্ডারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা এবং যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে যাতায়াতও করব প্রয়োজনে।" কর্নেল ওসমানীর যুদ্ধ প্রস্তুতির বিশদ বিবরণ আমরা তিনজনই মনযোগ দিয়ে শুনলাম। তার বক্তব্যে সামরিক প্রস্তুতির বিশদ বিবরণ থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের মূল বিষয় তথা রাজনৈতিক দিকটির সম্পর্কে তেমন কিছুই বললেন না তিনি।

যে কোন জাতির মুক্তি সংগ্রামকে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সফল করে তোলার জন্য রাজনৈতিক আদর্শ ও নেতৃত্বের ভূমিকা মূখ্য। জনগণকে সাথে নিয়েই সংগঠিত করা হয় গেরিলা যুদ্ধ। জনগণকে গেরিলা যুদ্ধে আকৃষ্ট করতে হয় রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। কারণ রাজনৈতিক নীতি আদর্শের মাধ্যমেই জনগণ দেখতে পায় তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন এবং বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি। তাই অতি প্রয়োজনের খাতিরেই জনগণের মুক্তি ও তাদের আশা-আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি ও আদর্শ প্রণয়ন করে জাতীয় পরিসরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের জন্য গঠন করতে হয় সর্বদলীয় জাতীয় সরকার। এ সরকার সাধারণতঃ গঠিত হয় পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে। এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত জনযুদ্ধের প্রক্রিয়া। সমসাময়িক পৃথিবীতে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে পরীক্ষিত এ প্রক্রিয়ার বিপক্ষে একদলীয় একটি অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সফলভাবে এগিয়ে নেয়া কি করে সম্ভব? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম হয়েছে দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন পেশার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আদর্শ এবং নীতিমালায় সর্বস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন নেই। আওয়ামী লীগ মূলতঃ বাংলাদেশের উঠতি বুর্জুয়া এবং পাতি বুর্জুয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক দল। সেক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণকে সশস্ত্র সংগ্রামে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের একক সরকার নেতৃত্ব দেবে কোন যুক্তিতে? '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে ভোট নিয়েছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবিতে, ধর্মীয় আদর্শের আওতায় পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে সে দাবিতে। সেখানে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের কোন অঙ্গীকার ছিল না। কর্নেল ওসমানীর বক্তব্য থেকে একটি বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার সংগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আহ্বানে শুরু হয়নি। স্বাধীনতার প্রথম ডাক দিয়েছিলেন অখ্যাত এক তরুণ মেজর জিয়াউর রহমান আর তার ডাকে সাড়া

দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ। তাদের অংশগ্রহণে বাঙ্গালী বীর সৈনিক ও নওজোয়ানরা সংগঠিত করেছিলেন প্রতিরোধ মুক্তি সংগ্রাম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, আনসার, মুজাহিদ, ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর দেশপ্রেমিক যোদ্ধারাই অগ্রণী হয়ে স্বীয় উদ্যোগে গঠন করে তুলেছিলেন মুক্তিফৌজ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়া তো দূরের কথা। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও শেখ মুজিব কখনোই চিন্তা করেননি সশস্ত্র সংগ্রামের কথা। তাই ছিল না তাদের কোন পূর্ব প্রস্তুতি। তাদের পার্টি মেনিফেষ্টো, নির্বাচনী প্রচারণা এবং পরবর্তী সময়ে ইয়াহিয়া শাহীর সাথে তাদের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও অন্যান্য কার্যক্রম থেকে এ সত্যই প্রমাণিত হয়। এ সত্যকে অস্বীকার করে আজ কোন অধিকারে প্রবাসে দলীয় অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের সকল কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবিদার হয়ে উঠলেন তারা?

"মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে ছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। অনেকেরই বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগ একাই মুক্তিযুদ্ধ করবে। অন্য কোন দল বা গোষ্ঠি করুক তা হবে না।" (দৈনিক ইনকিলাবের সাথে জনাব শান্তিময় রায়ের সাক্ষাৎকার)।

এ ধরণের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের অধিনেই দেশ স্বাধীন করে গণমুক্তির স্বপ্ন দেখছেন কর্নেল ওসমানী। পরিকল্পনা করেছেন গেরিলা যুদ্ধ করার। অবশ্য তাঁর কথার ফাঁকে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পক্ষপাতী তিনি ও তার সরকার নন। তার মানেই বা কি? তবে কি পর্দার অন্তরালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অন্য কোন ষড়যন্ত্র চলছে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার এবং ভারতীয় সরকারের বোঝাপড়ার মাধ্যমে? তড়িঘড়ি করে অস্থায়ী দলীয় সরকার কায়েম করার মত তাড়াহুড়া করে স্বাভাবিক পরিণতির পরিবর্তে অস্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশকে তথাকথিত স্বাধীনতা প্রদানের ফন্দি আটা হচ্ছে কি সবার অলক্ষ্যে? ভারতীয় নীল নকশা যা আমরা দিল্লীতে অনুভব করে এসেছি তার সাথে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র খুঁজে পেলাম। তবে কি কর্নেল ওসমানীও ভারতীয় নীল নকশা বাস্তবায়নেরই একজন? এ কথা বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। কর্নেল ওসমানীকে আমরা চিনি একজন নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, স্বাধীনচেতা একজন বাঙ্গালী সৈনিক হিসেবে। অবসর গ্রহণের পর হালে রাজনীতিতে যোগদান করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে এমপি হয়েছেন তিনি। কিন্তু তাই বলে কোন লোকের চরিত্রতো রাতারাতি সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় না। তার বেলাই বা সেটা কি করে সম্ভব? একবার ভাবলাম আমাদের দিল্লীর অভিজ্ঞতা তাকে সম্পূর্ণ খুলে বলে আমাদের মনোভাব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করি। আবার ভাবলাম আগে তার কাছ থেকে

বুঝে নিতে হবে তিনি এসবের সাথে কতটুকু জড়িত। সেটা না বুঝে সবকিছু খুলে বললে হিতে বিপরীতও হতে পারে। আমরা তিনজনই মহা বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে উভয় সংকটে পড়লাম।

আলোচনাকালে কর্নেল ওসমানী হঠাৎ করেই বলে উঠলেন, "I have decided to send you and Moti as Guerilla Advisor to the sector commanders and Noor shall be at the HQ as my ADC & Personal Staff Officer (PSO)."

তার কথা শুনে চমকে উঠলাম। কি অবাক কান্ড! তাহলে কর্নেল ওসমানী আমাদেরকে নিয়ে ভারতীয় সরকার এবং প্রবাসী সরকার কি ভাবছে সে সম্পর্কে কি কিছুই জানেন না? মনে খটকা লাগল। মনে করলাম আমাদের ব্যাপারে হয়তো বা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্বয়ং তাজুদ্দিন ও ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধিরা। জনাব তাজুদ্দিন তখন পর্যন্ত কর্নেল ওসমানীকে তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছুই জানাননি। আশ্চর্য! মুক্তিফৌজের কমান্ডার-ইন-চীফ এর কাছে বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স) নামের স্পেশাল পলিটিক্যাল ফোর্স গঠনের ব্যাপারে সবকিছুই গোপন রেখেছেন অস্থায়ী সরকার প্রধান জনাব তাজুদ্দিন আহমদ। তার মানে এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীকেও বিশ্বাস করেনি ভারত এবং আওয়ামী লীগ সরকার।

মনে আশার সঞ্চার হল। কর্নেল ওসমানী নীল নকশার প্রণেতাদের একজন নয়। নিশ্চিন্ত হলাম। তাকে বিশ্বাস করে সবকিছুই বলা যায়। বেচারা কর্নেল ওসামানী! তাকে Side track করে ইতিমধ্যেই অন্য খেলা শুরু হয়ে গেছে অথচ তিনি তার কিছুই জানেন না। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আমি বললাম,

–স্যার আপনি আমাদের গেরিলা অ্যাডভাইজার হিসাবে নিয়োগ করতে চাচ্ছেন এতে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্যার, জনাব প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের নিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করছেন। আপনি কি BLF গঠন করার ব্যাপারে কিছুই জানেন না?

–What is BLF? Can you frankly tell me what is going on? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

–নিশ্চয়ই বলবো sir. আপনাকে বিশ্বাস করে সবকিছুই খুলে বলবো। মুক্তিযুদ্ধের কর্ণধার হিসেবে আপনার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। জাতির সাথে আপনি কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না সেটা আমাদের বধ্যমূল ধারণা। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী যে কোন চক্রান্তকে নস্যাত করে দেবার মত দৃঢ়তাও আপনার রয়েছে, সে ব্যাপারেও আমরা তিনজনই একমত। আমাদের অনুরোধ সবকিছু শুনে আপনি

উত্তেজিত না হয়ে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করবেন ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে; যে কোন অসতর্ক পদক্ষেপের চরম মূল্য দিতে হতে পারে আমাদের সবার।

-I promise you. It will be just between me and you three. Now, let me hear everything that you want to tell in details. তার অভয় অঙ্গীকারে আন্তরিকতার আবেদন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। আমি বলতে লাগলাম,

-স্যার, দিল্লীতে আমাদের সময় কেটেছে জেনারেল ওবান সিং ও তার সহকর্মীদের সাথে। গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রশিক্ষণ ছাড়াও রাজনৈতিক মটিভেশন দেয়া হয়েছে আমাদের। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ বর্তমান অবস্থায় গঠিত মুক্তি বাহিনীর বেশিরভাগ কর্মকর্তা এবং সদস্যদের পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করতে পারছেন না। প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি তাদের সার্বিক আনুগত্য সম্পর্কেও তারা সন্দিহান। প্রবাসী আওয়ামী সরকার ও তাদের দল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কার্যকরী effective নেতৃত্ব সফলতার সাথে কতটুকু দিতে পারবে সে সম্পর্কেও ভারত সরকার সুনিশ্চিত নয়। রাজনৈতিক দল হিসাবে চারিত্রিক দুর্বলতা আওয়ামী লীগের রয়েছে প্রচুর, আদর্শগতভাবে রক্তক্ষয়ী একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার মত মানসিকতা ও প্রস্তুতি কিংবা চরম ত্যাগ স্বীকার করার মত চারিত্রিক গুনাবলীও নেই দলের বেশিরভাগ সদস্যদের মধ্যে। সেক্ষেত্রে এ সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়লে নেতৃত্ব চলে যেতে পারে আওয়ামী লীগের হাত থেকে। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে মূলতঃ দু'টি শক্তি। চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরা অথবা প্রাক্তন সেনা বাহিনী, আনসার, ইপিআর, মুজাহিদ এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুক্তি বাহিনীর মধ্যে এদের অবস্থান অতি সুদৃঢ়। দীর্ঘকালীন যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে তাদের শক্তি যাবে বেড়ে। পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই অবস্থায় ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার স্বাধীনতা সংগ্রামগুলোও কেন্দ্রিয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে তারা বিশেষভাবে চিন্তিত। যেহেতু ভারত সরকার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বাইরে অন্য কাউকেই বিশ্বাস করছে না, সে জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে একমাত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত করতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধাত্তোর উভয় অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে কোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য বিশেষভাবে গঠন করা হবে একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী। বাহিনীর নাম হবে BLF (Bangladesh Liberation Force) এ বাহিনীর সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষ। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা এবং কেন্দ্রিয় যুব এবং ছাত্র নেতারাই বিভিন্ন অঞ্চল

এবং যুব শিবির এবং শরনার্থী শিবির থেকে রিক্রুটমেন্টে সহযোগিতা করবেন এই BLF গঠনের ব্যাপারে। রিক্রুটেড সদস্যদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিশেষ সদস্যরা। ট্রেনিং শেষে ওদের ভরন-পোষণ এবং deployment করা প্রভৃতি বিষয়ে সবকিছুই করবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। এ বাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং আমরা তিনজন ছাড়া কেউ কিছু জানতে পারবে না। আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে ভারতীয় সেনা বাহিনী ও প্রধানমন্ত্রীর মাঝে লিয়াঁজো অফিসার হিসেবে। এ বাহিনীর মূল কাজ হবে স্বাধীনতা উত্তরকালে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে থেকে আওয়ামী লীগ এবং তদীয় সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা। পরে প্রয়োজনে এ বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হতে পারে মুজিব বাহিনী। কোন সন্দেহ অথবা ভুল বোঝাবুঝির উদ্রেক যাতে না হয় তার জন্য যুক্তি হিসাবে প্রচার চালানো হবে. এ বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ এক প্রয়োজনে। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাকুঠির থেকে মুক্ত করে আনার জন্য এদের দায়িত্ব দেয়া হবে। রিক্রুটমেন্টে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় সরকার ইতিমধ্যেই চারজন যুব ও ছাত্রনেতাকে সিলেক্ট করে নিয়েছে। তারা হলেন জনাব শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক এবং জনাব তোফায়েল আহমদ (পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের কাছে 'চার খলিফা' বলে পরিচিতি লাভ করেন)। RAW (Research and Analysis Wing) ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্সীর প্রধান জেনারেল ওবান সিং এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেরাদুনের অদূরে চাকুরাউল-এ এদের ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিশেষ সদস্যরা ট্রেনিং দেবে। ট্রেনিং পর্যায়ে এবং পরবর্তিকালে ওদের Re-organize করার দায়িত্বে ভারতীয়দের সাথে আমাদেরও থাকতে হবে। মানে পর্যায়ক্রমে আমরাও হয়ে পড়বো মুজিব বাহিনীর সদস্য।

আমাদের কথা শুনে কর্নেল ওসমানী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হতবাক হয়ে বললেন,

-How strange! এ সমস্ত ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। I must find out from the Prime Minister how much does he know?

-অবশ্যই তা আপনাকে জানতে হবে তবে সেটা করতে হবে বিশেষ সতকর্তার সাথে। অত্যন্ত সেনসেটিভ ব্যাপার। তাই বুঝে শুনে কথা বলতে হবে আপনাকে। জনাব তাজুদ্দিনের সাথে আপনার আলাপের পরই না হয় আমরা সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়।

সেদিনের মত আমাদের একান্ত বৈঠক শেষ হল। কর্নেল ওসমানী শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলেন। আমরা তার ঘরের অপরপ্রান্তে মেঝেতে বিছানা পেতে তিনজনই শুয়ে পরলাম। পরদিন সকালেই কর্নেল ওসামানী জনাব তাজুদ্দিনের কাছে গিয়ে গত রাতের আলোচনা সম্পর্কে আলাপ করে ফিরে এসে জানালেন,

–প্রধানমন্ত্রীও এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

–এ কি করে সম্ভব! দিল্লীতে আমাদের বলা হয়েছে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সবকিছুই জানেন।

–No. Boys. He is as much as in dark as I am. And I don't think he is lieing. এ ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ থেকে তিনি যতটুকু সম্ভব জানার চেষ্টা করবেন। of course not exposing anyone. তোমরাও যদি আরো কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পার তবে আমাকে জানাবে। Prime Minister wants to know everything about this nefarious plan. তোমাদের ব্যক্তিগত কার্যক্রম সম্পর্কে ভেবেচিন্তে আমাকে জানিও তোমরা কি করবে? বললেন তিনি।

এখানে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে, BLF পরবর্তিকালে মুজিব বাহিনী গঠন এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW সম্পর্কে জেনারেল অরোরার মন্তব্য তুলে ধরা হল:-

মুজিব বাহিনী এমন এক বাহিনী যা মুক্তি বাহিনী থেকে ছিল একেবারেই আলাদা। আমি এই বাহিনী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। একদল ছাত্র যারা নির্বাচনের সময় মুজিবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে তারা অর্থাৎ আওয়ামী লীগের এই তরুণ অংশ আমাদের ইনটেলিজেন্সকে জানায় তারাই মুজিবের প্রকৃত সমর্থক। তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে পাঠালে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে ভালো যুদ্ধ করতে পারবে। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। তবে মুক্তি বাহিনীর সাথে যখন তাদের গোলমাল হয় তখন প্রবাসী সরকার (তাজুদ্দিনের সরকার) এ বাহিনী সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চায়। আমি আমাদের চীফ অফ ষ্টাফ জেনারেল মানিক শ'-কে এ ব্যাপারে জানাতে বলি। তিনিই আমাকে জানান যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এই বাহিনী গড়ে তুলেছে। এই বাহিনী নিয়ে সমস্যা যখন বাড়তে থাকে তখন দূর্গা প্রসাদ ধর (ইন্দিরা গান্ধীর তৎকালীন মূখ্যসচিব) আমাকে জানালেন, 'মুজিব বাহিনীর ব্যাপারটা বাংলাদেশ সরকারকে না জানানোর কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত নেই। ব্যাপারটা পরিস্থিতির জন্যই বর্তমানে গোপন রাখা হয়েছে মাত্র।' (বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতিচারন শিরোনামে নিখিল চক্রবর্তীকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার।)

দু'একদিন কোলকাতার বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন মহলে ঘোরাফেরা করে বেশকিছু চমকপ্রদ খবর যোগাড় করতে পেরেছিলাম। বাপ্পিদের বাসা, ১৯নং সার্কাস এ্যাভেনিউর বাংলাদেশ মিশন, প্রিন্সেপ স্ট্রীটের বামপন্থীদের আড্ডা, শিয়ালদাহ্‌তে প্রবাসী বাঙ্গালী তরুণদের আড্ডা কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতারের অফিস প্রভৃতি স্থানগুলো থেকেই পেয়েছিলাম খবরগুলো।

তাজুদ্দিনের হঠাৎ করে প্রবাসী সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা আওয়ামী লীগের অনেকেই পছন্দ করেনি। তাদের মধ্যে ছিলেন যুব ও ছাত্রনেতাদের অনেকেই। অনেক সাংসদ এবং আওয়ামী লীগের নেতারাও এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, শাহ্‌জাহান সিরাজ, নুরে আলম সিদ্দিকী এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ যুব ও ছাত্রনেতারা সবাই প্রকাশ্যে তাজুদ্দিনের এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন।

তাদের পরোক্ষভাবে মদদ যোগাচ্ছিলেন জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ আবদুল আজিজ, মনসুর আলী, জনাব নজরুল ইসলাম প্রমুখ। জনাব তাজুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রীত্বের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জেনারেল অরোরার মন্তব্য, "আওয়ামী লীগের যুবনেতারা তাকে পছন্দ করত না।" (বাংলাদেশের যুদ্ধের স্মৃতিচারন শিরোনামে নিখিল চক্রবর্ত্তীকে দেয়া জেনারেল অরোরার সক্ষাৎকার।)

সাধারণভাবে যুবনেতাদের অনেকেই সেদিন ভেবেছিলেন শেখ মুজিব আর জীবিত নেই। মুজিবর রহমানের অবর্তমানে তাজুদ্দিন তাদের প্রভাবকে তেমন একটা মেনে চলবেন না। শেখ মুজিব কাছে থাকলে এ সমস্ত যুব এবং ছাত্রনেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের কর্তৃত্ব অতি সহজেই স্থাপন করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তাজুদ্দিন তাদের সাথে অন্য সুরে কথা বলছেন। তাদের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে সংগ্রামের সব নেতৃত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। তাদের সংগ্রামী ভূমিকাকেও ছোট করে দেখছেন জনাব তাজুদ্দিন। সরকার পরিচালনায় যুব ও ছাত্রনেতাদের মতামত তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছেন। তাজুদ্দিনের ধৃষ্টতার শেষ নেই। তিনি সরকার প্রধান থাকার কারণে তাদের সুযোগ-সুবিধাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আত্মীয়-স্বজনকেও যথাযথ মর্যাদা দান না করে তাদের উপেক্ষা করেছেন। তাদের উপেক্ষা করা, পরোক্ষভাবে শেখ মুজিবকেই উপেক্ষা করার সমতুল্য। অতএব, যে কোন মূল্যে তাজুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারন করতে হবে। মেতে উঠলেন তারা এক ক্ষমতা লাভের চক্রান্তে। পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ মনি ও সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে কয়েকজন যুব ও ছাত্রনেতা দিল্লী গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাকে জানান যে তারা শেখ মুজিবর রহমানের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। পাক বাহিনীর হাতে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পেছনে জনাব তাজুদ্দিনের হাত রয়েছে। গ্রেফতারের আগে শেখ মুজিব তাদের সে কথা জানিয়ে তাদেরকে ভারত সরকারের সহায়তায় স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়ে যান। জনাব তাজুদ্দিনের উপর বাংলাদেশ থেকে আগত বেশিরভাগ আওয়ামী লীগ জাতীয় এবং প্রাদেশিক সাংসদদের সমর্থনও নেই। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীত্ব করার কোন অধিকার নেই তাজুদ্দিন সাহেবের। তাদের

বক্তব্যের সমর্থনে তারা মুজিবর রহমানের ভগ্নিপতি জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের একটি চিঠি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে প্রদান করেন এবং শেখ মুজিবের জেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালকে তার সম্মুখে উপস্থিত করেন। তারা শ্রীমতি গান্ধীকে এ কথা বলেও হুঁশিয়ার করে দেন যে তাজুদ্দিন যদি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকেন তবে ভারতের স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ জনাব তাজুদ্দিন শেখ মুজিবের নীতি আদর্শ কিছুতেই বাস্তবায়িত করবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'পক্ষের স্বার্থে তাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে আগত মুজিব ভক্ত এবং তাদের অনুগত তরুণদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার জন্য তারা শ্রীমতি গান্ধীর কাছে আবেদন জানান। তারা বলেন, শুধুমাত্র এ ধরণের শক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমেই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ এবং বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের মধ্যে অর্থবহ সম্পর্ক বজিয়ে রাখা সম্ভব। তা না হলে অচিরেই ভারত বিদ্বেষীদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হবে আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের এ অনুরোধ সাগ্রহে গ্রহণ করেন শ্রীমতি গান্ধী। সুদূর প্রসারী নীল নকশার কথা চিন্তা করেই Devide and Rule নীতির প্রয়োগের জন্য BLF পরবর্তিতে নাম বদলিয়ে মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি করে সেকেন্ড ফ্রন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল BLF ওরফে মুজিব বাহিনী। এ তথ্যগুলোও জনাব ওসমানীকে জানাই আমরা। তিনি সেগুলো জনাব তাজুদ্দিনকে জানান। প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন নাকি এ সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে দিল্লীতে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং এর প্রতিবিধানের দাবি জানান। কিন্তু জনাব হাকসার, ডিপিধর, 'র' এর রমানাথ রাও এবং জেনারেল ওবান সিং এ ব্যাপারে তাজুদ্দিনকে এড়িয়ে গিয়ে নিরব থাকেন। ফিরে এসে কর্নেল ওসমানীকে সে কথাই বলেছিলেন জনাব তাজুদ্দিন। আমরা পরে কর্নেল ওসমানীর কাছ থেকে তার ব্যাখ্যা জানতে পারি। পরবর্তী পর্যায়ে মুজিব বাহিনীকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ফোর্সেস হেডকোয়টার্স এর নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কর্নেল ওসমানী। কিন্তু তার কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হয়নি। নিতান্ত অপারগ হয়েই কর্নেল ওসমানীকে BLF তথা মুজিব বাহিনী সৃষ্টি করার ভারতীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এবং গ্রেন্ড কনফারেন্স

- বিএলএফ এর সাথে না জড়িয়ে মুক্তি বাহিনীর সাথে কাজ করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা তিনজনেই।
- লেঃ মতি এবং আমাকে গেরিলা এ্যাডভাইজার করে সেক্টরগুলোতে পাঠাবার এবং লেঃ নূরকে তার PSO/ADC হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত।
- বালিগঞ্জ থেকে ৮ নং থিয়েটার রোডে।
- মতি চলে গেল উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সেক্টরগুলোর দায়িত্ব নিয়ে।
- কর্নেল ওসমানী আমাকে নিয়ে গেলেন ৮ নং এবং ৯ নং সেক্টরে।
- রনাঙ্গনের ব্যস্ততা ও অভিজ্ঞতা।
- শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী আর যুব ক্যাম্পের যুবকদের চিন্তা-চেতনায় ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান।
- বয়রা সেক্টরে প্রথমবারের মত আহত হলাম।
- ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করে ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর জোয়ানরা ৮ নং সেক্টরে যোগদান করেছিল।
- গ্রেন্ড কনফারেন্সের ঠিক আগে নীতির প্রশ্নে আপোষহীন কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করলেন।
- অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কমান্ডার ইন চীফ কর্নেল ওসমানীকে বাদ দিয়েই গ্রেন্ড কনফারেন্স শুরু হল।
- উদ্বোধনী ভাষণে সবাইকে চমকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানালেন কমান্ডারদের একাংশের অনাস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই কর্নেল ওসমানী সেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন।
- তার ঐ বক্তব্য উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে চরম অসন্তোষ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করে ফলে কনফারেন্স স্থগিত হয়ে যায়।
- মুক্তিযোদ্ধাদের চাপের মুখে প্রবাসী সরকার কর্নেল ওসমানীর পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়।
- চানক্যদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয় মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যায়।
- সেক্টরসমূহের সীমানা নির্ধারন, রনকৌশল এবং সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কনফারেন্সে।
- সফলভাবে কনফারেন্স শেষ হল।

আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত কর্নেল ওসমানীকে জানিয়ে দিলাম। ভারতীয় নীল নকশার সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পরতে চাই না আমরা। রাজনৈতিক একটি দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য গঠিত ঠেঙ্গারে বাহিনীর নেতা হওয়ার খায়েশ নেই আমাদের তিনজনের একজনেরও। আমরা এতদূর থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসেছি অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার জন্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই যুদ্ধ করব আমরা। কর্নেল ওসমানীর সাজেশান অনুযায়ী গেরিলা অ্যাডভাইজার হয়ে সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্য করে মুক্তিফৌজ (অনিয়মিত বাহিনী) গঠন করার দায়িত্ব নিয়ে তখনই কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানালাম আমরা। কর্নেল ওসমানী আমাদের জবাবে খুশি হলেন। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে কি বলা যায়। তারা যদি জানতে পারে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করেছি তবে অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠবে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কর্নেল ওসমানী ঠিক করলেন, যদি প্রশ্ন উঠে তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তিনি বলবেন, BLF কিংবা মুজিব বাহিনীর মত রাজনৈতিক একটি বাহিনী তৈরি করার দায়িত্ব সার্বিকভাবেই থাকা উচিত রাজনৈতিকভাবে সচেতন পরীক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হাতে। প্রধানমন্ত্রী এবং তার মতে আমাদের তিনজনের একজনেরও সে ধরণের রাজনৈতিক ওরিয়েন্টেশন অথবা কমিটমেন্ট কোনটাই নেই। Therefore we are not fit for such as important assignment. Some more politically conscious persons have to be found out to lead such a highly politisized force. সময় মত তাদের এ যুক্তি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিলেন। ফলে 'চার খলিফা'কেই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় BLF তথা মুজিব বাহিনী গড়ার। আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম রাহুগ্রাস থেকে। আমাকে গেরিলা অ্যাডভাইজার টু দ্যা সেক্টর কমান্ডার হিসাবে ৮নং এবং ৯নং সেক্টরে পোষ্টিং অর্ডার ইস্যু করে দেন কর্নেল ওসমানী। মতিকেও একই দায়িত্ব দেয়া হল ১০ এবং ১১ নং সেক্টরে। নূরের সব যুক্তিকে খন্ডন করে প্রায় জোর করেই তাকে কর্নেল ওসমানী পার্সোনাল ষ্টাফ অফিসার হিসেবে নিয়োজিত করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন কলহ্‌কে কেন্দ্র করে বহুমূখী চক্রান্তের সূচনা ঘটে।

জনাব ওসমানীর ঘরে এক রাত কাটানোর পর পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছেই একটি খালি স্কুল ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে যেতাম ৫৮নং বালিগঞ্জের হেডকোয়াটার্সে। ফিরতাম অনেক রাতে। খাবারের ব্যবস্থা ছিল ৫৮ নং বালিগঞ্জে। একদিন কর্নেল ওসমানী বললেন, "অস্থায়ী সরকার ও মুক্তিফৌজ হেডকোয়টার্স এর জন্য একটি জায়গা ভারত সরকার নির্ধারন করেছে। চল জায়গাটা দেখে আসা যাক উপযুক্ত কিনা।" বালিগঞ্জের বাড়িটা নেহায়েতই ছোট। সবসময় অসংখ্য লোকজন ভীড় করে থাকে। নিরাপত্তা রক্ষা করা দুঃস্কর, কথাটা অতি

সত্য। সর্বক্ষণ অগুনিত লোক মাছির মত ভনভন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক কামরা ছেড়ে অন্য কামরায়, কেউবা এমপি, কেউবা জাদরেল আমলা, কেউবা নেতাদের বিশেষ পরিচিত এবং আস্থাভাজন চামচা। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য নেতা পাতি-নেতার ভীড়। গায়ে মানেনা সকলেই আপনে মোড়ল। যার যার হাতে প্রত্যেকেই সাড়ে তিন হাত। গেটে প্রহরীরা কিছু জিজ্ঞাসা করলেই লংকাকান্ড বেধে যায়। সবাই যারা আসছেন তাদের ভাবসাব হচ্ছে, 'আমরা কি হনুরে'। সবার পরিধানে নতুন নতুন কাপড়-চোপড়। হাল ফ্যাশনের অন্ত নেই। দিব্যি হেলেদুলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখা হলে দাত বের করে নিজের পরিচয় দিয়ে খাজুড়ে আলাপ জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। ঢালাওভাবে ভাত, গোস্ত আর ডাল রান্না হচ্ছে কিচেনে। যে আসছেন সেই খাচ্ছেন নির্দ্বিধায়। কেউ কাউকে কিছু বলছেন না। ভুড়ি ভোজনের পর বিভিন্ন ঘরে চেয়ারের উপর, বসার বেঞ্চে এমনকি টেবিলের উপরও সটান হয়ে শুয়ে পড়ে দিবা নিদ্রা কিংবা রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে নিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করছেন না এ সমস্ত ভিআইপি ব্যক্তিদের দল। প্রত্যেকের হাতে একটা নতুন ব্রিফকেস কিংবা ছোট এট্যাচী। কোন কোন নেতার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। তারা যা কিছুই করছেন এ সমস্ত জিনিসগুলোও থাকছে তাদের সাথে সাথে। এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাবার সময়ও সেগুলো সাথে নেয়া হচ্ছে, পাছে হারিয়ে যায়। ব্যাপার কি? এ সমস্ত ব্রিফকেস, এট্যাচী এবং ঝোলায় কি এমন দুর্লভ জিনিষ রয়েছে ভেবেই পাচ্ছিলাম না। রহস্যটা মতিই উৎঘাটন করল কিছুদিন পর। ও জানাল,

–স্যার, সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ও সাব-ডিভিশন থেকে মুক্তিফৌজের সাথে বর্ডার ক্রস করে আসার সময় ব্যাংক ট্রেজারীগুলো সব উজাড় করে নিয়ে এসেছেন স্থানীয় প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। যার ভাগ্যে যতটুকু পরেছে সেগুলো রাখা আছে এ সমস্ত ব্রিফকেসে, এট্যাচীতে এবং ঝোলায়। তাই এগুলোকে এভাবে হেফাজত করা হচ্ছে।

–বল কি?

–বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখেন? বলল মতি।

একদিন কোন এক অজানা মহারথী তার মাথার নিচে ব্রিফকেসটা রেখে খাবার পর সুখনিদ্রা দিচ্ছিলেন। ঘুমের ঘোরে ব্রিফকেসটা মাথার নিচ থেকে সরে গিয়েছিল। আশেপাশে কাউকে না দেখে মতি সেটা চট করে তুলে নিয়ে খুলে ফেলল। ভদ্রলোকের ব্রিফকেসে তালা ছিল না। খুলতেই মতি ও আমার চোখ চড়কগাছ! একি! থরে থরে সাজানো পাকিস্তানী পাচঁশত টাকার নোটের বান্ডিলে ব্রিফকেসটা বোঝাই। ব্রিফকেসটা নিয়ে আমরা চুপিসারে কেটে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে উঠে

ভদ্রলোক তার ব্রিফকেসের হদিস না পেয়ে সারা বাড়ি মাথায় তুলে হায় হায় করতে লাগলেন। আরদালীকে পাঠিয়ে ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালাম। তিনি এলেন।

জিজ্ঞেস করলাম,

–কি ব্যাপার? এতো হৈ চৈ করছেন কেন?

–আমার ব্রিফকেস চুরি হয়ে গেছে। তিনি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন।

–কি ছিল তাতে?

–আমার কিছু কাপড় ও প্রয়োজনীয় জরুরী কিছু কাগজপত্র ছিল।

টাকা সম্পর্কে সবটাই গোপন করলেন ভদ্রলোক। ইতিমধ্যে নূর উঠে গিয়ে পাশের ঘরে কর্নেল ওসমানীকে সবকিছু খুলে বলেছে। সব শুনে কর্নেল ওসমানী আমরা যে ঘরে বসেছিলাম সেখানে আসেন। তিনি ভদ্রলোককে অনেকভাবে জেরা করেন। ভদ্রলোক টাকার কথা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে ঝোলাতে শুধু কিছু কাপড় ও জরুরী কাগজপত্র ছিল সে কথাই কর্নেল ওসমানীকে জানান। সব শুনে কর্নেল ওসামানী নূরকে আদেশ করেন ব্রিফকেসটি ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিতে। ইতিমধ্যেই ব্রিফকেস থেকে প্রায় ১২ লাখ টাকা আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কাপড়-চোপড় ও কিছু কাগজপত্রসহ ব্রিফকেসটি ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তিনি তাড়াতাড়ি ব্রিফকেস খুলে দেখেন টাকা ছাড়া অন্য সবকিছুই ঠিক আছে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু অবস্থা বেগতিক বুঝে ব্রিফকেস বন্ধ করে নিয়ে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সুর সুর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর সেই ভদ্রলোককে আর কখনও দেখিনি পুরো ৯ মাস সংগ্রামকালে। উদ্ধারকৃত টাকাটা প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে জমা করে দেয়া হয়। এ ঘটনার অবতারনা এখানে এজন্য করলাম, তখন তথাকথিত মুজিবনগর সরকারের কার্যালয় দেখে বোঝা কষ্ট হত যে একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চলছে বাংলাদেশে। আর সে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন প্রবাসী বালিগঞ্জস্থ লোকজন। যে সমস্ত লোকজন তখন অকারণে বালিগঞ্জের বাড়িতে ভীড় করে সর্বদা ঘুর ঘুর করতেন তাদের হাবভাব দেখে মনে হত সবাই যেন বরযাত্রী হয়ে এসেছেন কোন দূরদেশ থেকে! কোন ভাবনা নেই, কোন চিন্তা নেই! নির্বিঘ্নে হেসে খেলে সময় কাটিয়ে আনন্দেই আবার ফিরে যাবেন তারা।

৮নং থিয়েটার রোডের বাড়িটা দেখতে গেলাম কর্নেল ওসমানী, আমি, মতি, নূর ও ব্রিগেডিয়ার গুপ্তা এবং কর্নেল ভোরা। বালিগঞ্জের বাড়িটা থেকে এটা অনেক বড়। চারদিক উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। ভেতরটা বিশাল জমিদার বাড়ির মত। বাড়িটি পুরনো কায়দায় গড়া। একপাশে বড় বড় দু'টো ব্যারাক রয়েছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে তাবু অথবা টেম্পোরারী সেল্টার গড়ে তোলার জন্য। বড় বড় গাছপালায় ছায়া

সুনিবিড় একটা শান্ত পরিবেশ। বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। বাড়িটা সবদিক দিয়েই বালিগঞ্জের বাড়িটা থেকে অনেক ভাল। সবাই একবাক্যে এটা গ্রহণীয় বলে মত দিলেন। আমরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে বালিগঞ্জ ছেড়ে উঠে এলাম ৮নং থিয়েটার রোডে। নতুন জায়গায় এসেই কর্নেল ওসমানী নূরকে আদেশ দিলেন নিরাপত্তা রক্ষার জন্য লোকজনের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা কড়াকড়ি করতে হবে। ঠিক হল পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের জন্য স্থায়ী আইডি কার্ড এবং অনুমতি সাপেক্ষে টেম্পোরারী ভিজিটারদের জন্য পাশ ইস্যু করবে লেফটেন্যান্ট নূর। এভাবে অপ্রয়োজনীয় লোকদের ভীড় কমানো সম্ভব হবে। বিএসএফ এর সেন্ট্রিদের কড়া নির্দেশ দেয়া হল এ ব্যাপারে। আমরা আমাদের অস্থায়ী বাসস্থান স্কুল ছেড়ে চলে এলাম থিয়েটার রোডের হেডকোয়াটার্সে। প্রধান বিল্ডিং এর একটি ঘরে থাকবেন কর্নেল ওসমানী এবং নূর। প্রধানমন্ত্রীর জন্যও একটি ঘর বরাদ্দ করা হল। ব্যারাকের ঘরগুলোতে আমি, ক্যাপ্টেন চৌধুরী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার এবং চীফ অব ষ্টাফ কর্নেল রব এর থাকার বন্দোবস্ত হল। অন্যান্য ঘরগুলোকে বিভিন্ন পরিদপ্তরের অফিস বানানো হল। কর্মচারীদের জন্যও থাকার বন্দোবস্ত হল। সি-ইন-সির দপ্তর থেকে সার্কুলার জারি করল নূর, "পারমানেন্ট ষ্টাফ ছাড়া অন্য সবার জন্য হেডকোয়াটার্সে ঢুকবার, থাকবার এবং খাবার জন্য লিখিত অনুমতি আগেই সি-ইন-সির সেক্রেটারীয়েট মানে লেফটেন্যান্ট নূর এর কাছ থেকে নিতে হবে।" এ ধরণের নিয়ম প্রবর্তনে সবাই প্রথমে বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন। কিন্তু নিয়মের কোন ব্যতিক্রম করা হল না। অসন্তোষ আস্তে আস্তে কমে এল। সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে হল। অন্যদিকে ১৯ নং সার্কাস এ্যাভেনিউ মানে বাংলাদেশ মিশন হয়ে উঠেছিল একটা বাজার। জনাব হোসেন আলী এবং তার প্রশাসন তেমন কোন নিয়ম প্রর্বতন করে কার্যকর করতে ব্যর্থ হন। ফলে দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা সেখানে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে লোকের ভীড় লেগেই থাকল। ব্যাপারটা হাস্যকর এবং coincidental হলেও নিয়তির হেরফের বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রধান দু'টো কর্মস্থলই প্রতিষ্ঠিত হল থিয়েটার রোড এবং সার্কাস এ্যাভিনিউতে। আমরা সবাই যেন হয়ে উঠলাম থিয়েটার এবং সার্কাসের খেলোয়াড়। থিয়েটার রোড থেকে কর্নেল ওসমানী একদিন আমাকে নিয়ে চললেন ৮নং সেক্টর হেডকোয়টার্স বনগাঁয়, সাথে নূর। শহর থেকে প্রায় ৯০-৯৫ মাইল দূরে যশোর বর্ডারের গা ঘেসে বনগাঁ। ওখানে পৌঁছে কর্নেল ওসমানী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ৮নং সেক্টর কমান্ডার মেজর ওসমান এবং ৯নং সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন জলিলের সাথে। তাদের বিস্তারিত ব্রিফিং দিলেন তিনি। সেখানে পরিচয় হল বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হাফিজ, লেফটেন্যান্ট হালিম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন, পুলিশের এসডিপিও মাহবুব, সিএসপি কামাল সিদ্দিকী এবং তৌফিক এলাহী চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট মাহবুবের সাথে। ওরা সবাই আমাকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। দুপুরের খাওয়ার পর কর্নেল ওসমানী নূরকে নিয়ে ফিরে গেলেন। যাবার

আগে জানিয়ে গেলেন শীঘ্রই তিনি সেক্টর কমান্ডারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স ডাকবেন কোলকাতায়। সে কনফারেন্সে মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান স্তর এবং ভবিষ্যত রনকৌশল ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হবে। থিয়েটার রোড ছেড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে পৌছে ভীষণ ভালো লাগছিল। মতিও আমি চলে আসার পরপরই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সেক্টরগুলোর দায়িত্ব নিয়ে চলে যায়। শুরু হল নতুন কর্মজীবন। খুলনা, যশোরের ছিন্নমূল ও বিক্ষিপ্ত অনেক ইপিআর, কিছুসংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে মেজর ওসমানের অধিনে শুরু হয় প্রতিরোধ সংগ্রাম। তার সাথে যোগ দেয় স্থানীয় ছাত্র-জনতা। নড়াইলের তরুণ এসডিও জনাব কামাল সিদ্দিকী, মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরী এবং মাগুরার এসডিও ওয়ালীউর রহমানও প্রতিরোধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মেজর ওসমান তার অধিনস্ত সমস্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের ৭টি কোম্পানীতে বিভক্ত করে সীমান্তবর্তী এলাকায় তাদের নিয়োগ করেন।

১) প্রথম কোম্পানী উত্তরে মহেশকুন্ড বিওপি এলাকায় লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীরের অধিনে।

২) দ্বিতীয় কোম্পানী তার দক্ষিনে ইছাখালী বিওপি এলাকায়। কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী।

৩) তৃতীয় কোম্পানী আরো দক্ষিনে জীবননগর বিওপি এলাকায়। নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান।

৪) চতুর্থ কোম্পানী কাশিমপুর-মুকুন্দপুর-বয়ড়া এলাকায় ক্যাপ্টেন খন্দোকার নাজমুল হুদার অধিনে।

৫) পঞ্চম কোম্পানী বেনাপোল কাস্টমস্ চেকপোষ্ট এলাকায় লেফটেন্যান্ট আবদুল হালিমের অধিনে। এ কোম্পানী পরবর্তী পর্যায়ে ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী সিএসপির অধিনে দেওয়া হয়।

৬) ষষ্ঠ কোম্পানী আরও দক্ষিনে বকশা-কাকডাঙ্গা-বেনাপোল থানার এলাকায় ক্যাপ্টেন শফিকউল্লার অধিনে।

৭) সপ্তম কোম্পানী ভোমরা এলাকার গোজভাঙ্গায় ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিনের অধিনে।

মে মাসের শেষে ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিনকে হেডকোয়ার্টারসে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব নেয়ার জন্য চলে যেতে হয় মুজিবনগর তথা ৮নং থিয়েটার রোডে। তখন ঐ সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশের এসডিপিও মাহবুবউদ্দিনকে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাক্তন ফ্ল্যাইট লেফটেন্যান্ট জামালউদ্দিন এমপি, ক্যাপ্টেন ওয়াহাব এবং

লেফটেন্যান্ট এনামুল হক ৮নং সেক্টরে যোগদান করেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামালউদ্দিনকে সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স এ ষ্টাফ অফিসার হিসাবে নিয়োজিত করা হয়।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক বাহিনীর ব্যুহ ভেদ করে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধ করতে করতে বর্ডার পেরিয়ে ৮নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেন ফার্ষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অকুতোভয় সেনারা। বেনাপোল বর্ডার পর্যন্ত মাত্র ১৮৮ জন সৈনিককে জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল হাফিজ। পুরো রেজিমেন্টের বাকি সবাই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। বেনাপোল পৌঁছে সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স এর কাছেই সে তার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। বনগাঁ বিওপির বিপরীতে মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত রাখার পবিত্র দায়িত্ব যথাযথ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে ফার্ষ্ট ইস্ট বেঙ্গলের বীর জোয়ানরা শেষদিন পর্যন্ত পালন করেছিলেন। ক্যাপ্টেন হাফিজ আমার বিশেষ বন্ধু বিধায় ওর সাথেই আমার থাকার বন্দোবস্ত করি।

বরিশাল ও খুলনায় একইভাবে ২৫শে মার্চ রাতের পর থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন জলিল। তিনি ছিলেন আর্মড কোরের একজন সৈনিক এবং পরে মেধাবলে অফিসার হয়েছিলেন তিনি। পুলিশ বাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেই তিনি শুরু করেন প্রতিরোধ সংগ্রাম। তার সাথে যোগ দেন লেঃ মেহেদী, লেঃ জিয়া এবং লেঃ নাসের। এছাড়াও তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর, লেঃ খুরশীদ প্রমুখ। লেফটেন্যান্ট খুরশীদ তথাকথিত আগরতলা মামলার একজন আসামীও ছিলেন। এরপর এমএ বেগ নামে একজন যুবক এসে নবম সেক্টরে যোগ দেয়। তিনি পাকিস্তান সেনা বাহিনীর একজন দক্ষ প্যারাস্যুট জাম্পার ও ফ্রগম্যান হিসেবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক বিধায় পরে তাকে নৌবাহিনীতে শীপম্যান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ৯নং সেক্টরকে গঠন করা হয় খুলনার কিছু অংশ, ফরিদপুরের কিছু অংশ এবং পুরো বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন জলিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমার্ধে বরিশাল, পটুয়াখালীতে ক্যাপ্টেন মেহেদী, খুলনার সুন্দরবন এলাকায় লেঃ জিয়া এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্যাপ্টেন হুদা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। জুলাই মাসে ৯নং সেক্টরকে পুনর্গঠিত করা হয়। বরিশাল জেলার দায়িত্ব দেয়া হয় পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরকে। পটুয়াখালীর দায়িত্ব দেয়া হয় ক্যাপ্টেন মেহেদীকে। সুন্দরবন ও খুলনার দায়িত্ব দেয়া হয় লেঃ জিয়াকে। পিরোজপুর, বাগেরহাট এলাকা দেয়া হয় সুবেদার তাজুল ইসলামকে। ক্যাপ্টেন হুদাকে দেয়া হয় সীমান্তবর্তী এলাকা। সেক্টর হেডকোয়টার্স প্রথম স্থাপন করা হয় হাসনাবাদে। পরে সরিয়ে নেয়া হয় টাকীতে। সেক্টর হেডকোয়াটার্সে থাকতেন ক্যাপ্টেন জলিল, এডজ্যুটেন্ট এর দায়িত্বে নিয়োজিত

ছিলেন ফ্ল্যাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও মফিজ। এদের সাথে ষ্টাফ অফিসার হিসেবে ছিল ক্যাপ্টেন আরিফিন। সেক্টরের প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল তকিপুর। ইনচার্জ ছিলেন সুবেদার গোলাম আজম। ৯নং সেক্টরের নৌবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন চীফ পেটি অফিসার এম ইউ আলম। সুন্দরবনে লেঃ জিয়ার অধিনে ছিলেন ফুল মিয়া ও মধু। প্রথম পর্যায়ে টাকী, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ এবং শমসের নগরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হল। এরপর হিঙ্গলগঞ্জের ক্যাম্প উক্‌শা পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। এরপর বরিশাল, খুলনা অঞ্চলে ক্রমে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। সীমিত পরিমাণের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ক্যাপ্টেন জলিল ও তার সহযোদ্ধারা অবস্থার মোকাবেলা করতে পারছিলেন না। প্রয়োজন অস্ত্রের। অস্ত্রের অন্বেষনে জনাব মঞ্জুর এমপি ২৪শে এপ্রিল সুন্দরবন হয়ে ভারত এসে তার পরিচিত বিএসএফ এর কয়েকজন কর্মকর্তার সহযোগিতায় অল্প কিছু হাতিয়ার নিয়ে ফিরে এসে ক্যাপ্টেন জলিলকে জানালেন যে তিনি ভারতে গেলে আরো অস্ত্র পেতে পারেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন হুদা ও মঞ্জুরকে নিয়ে ক্যাপ্টেন জলিল ভারতের পথে রওনা হলেন। ভারত সীমান্তের ওপারে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ইনসপেক্টর মি পি কে ঘোষ তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। সেখান থেকে বিএসএফ এর নিরাপত্তার অধিনে তারা এসে পৌছলেন হিঙ্গলগঞ্জে। এখানে তাদের পরিচয় হল অধিনায়ক পান্ডের সাথে। সেখান থেকে হাসনাবাদ হয়ে ব্যারাকপুর। বিএসএফ এর প্রথম ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মিঃ মুখার্জী তাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। হাসনাবাদে গণপরিষদের সদস্য মিঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর পূর্ব পরিচিত বন্ধু ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং এর সাথেও পরিচয় হয়েছিল তাদের। ব্যারাকপুরে ৭২নং বিএসএফ এর অফিসার্স মেসেই তাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দেয় এডজ্যুটেন্ট ক্যাপ্টেন সরকার। মিঃ মুখার্জী তাদের কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বর্ডার নিরাপত্তা বাহিনীর ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল মিঃ মজুমদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাকে মেজর জলিল জানালেন অধিনায়ক হিসেবে মুক্তি সংগ্রাম এবং দেশের জন্য তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন অস্ত্র সাহায্য পেলে। কি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন তা মিঃ মজুমদারকে জানানো হল। ওই দিন সন্ধ্যায় কেলকাতা আসাম হাউজে বর্ডার নিরাপত্তা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মিঃ রুস্তমজীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হল। তার সাথে আলাপের পর মিঃ মুখার্জী তাদের নিয়ে গেলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। পূর্বাঞ্চলের সামরিক বাহিনীর সদর দফতর ফোর্ট উইলিয়াম। সেখানে তাদের জেরা করেন বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল খেরা। খেরার সাথে তাদের বিশদ আলাপ-আলোচনা হল। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীন কোথায় কোথায় তারা থেকেছেন, কি কি করেছেন তা পুংখানুপুংখভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি। সব প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হয়েছিল মেজর জলিল এবং দলের সবাইকে। সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সাথেও সাক্ষাৎ হল তাদের। তাকে সবকিছু খুলে বলেছিলেন ক্যাপ্টেন জলিল। মানচিত্রে বাংলাদেশের

কোথায় কোথায় তার গেরিলা ঘাটি রয়েছে তাকে বিস্তারিত দেখান হয়েছিল। ফলে জেনারেল অরোরা তাকে অস্ত্রাদি দিতে সম্মত হন। ৫ই মে পর্যন্ত তাকে কোলকাতায় থাকতে হয়।

ইতিমধ্যে বরিশালের পতন হওয়ায় মিঃ মঞ্জুর, নাসের, ক্যাপ্টেন হুদা পরিবার-পরিজন নিয়ে হাসনাবাদে পৌঁছলে ওদের ক্যাম্পে রেখে ক্যাপ্টেন জলিল প্রায় চল্লিশজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে দু'টো লঞ্চে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে বরিশালের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু ভুল ট্যাকটিক্যাল মুভের জন্য সুন্দরবন এলাকায় তার লঞ্চ দু'টো পাকিস্তান নৌবাহিনী অ্যামবুশ করে। দু'তিনজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাপ্টেন জলিল অতি কষ্টে প্রাণে বেচেঁ হাসনাবাদ ফিরে আসেন। ক্যাপ্টেন জলিলের এভাবে ভারতে আসা এবং মুজিবনগর সরকার এবং কর্নেল ওসমানীর হেডকোয়ার্টার্সকে বাইপাস করে সরাসরি ভারতীয় ইষ্টার্ন কমান্ডের সাথে যোগাযোগ করে অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে যাবার সিদ্ধান্তে কর্নেল ওসমানী ও মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার ভীষণভাবে চটে যান। তার অদূরদর্শিতা ও হঠকারী প্ল্যানিং এর ফলে এতগুলো হাতিয়ার হারানোর জন্যও তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন কর্নেল ওসমানী। তার এ ধরণের নিয়মবর্হিভূত কাজের জন্য তাকে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে অপসারনের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরে আমাদের সবার অনুরোধে কর্নেল ওসমানী তার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা থেকে বিরত হন। তবে কর্নেল ওসমানী তাকে ডেকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন এ ধরণের গাফিলতি ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার বরদাস্ত করা হবে না।

ইতিমধ্যে ঝড়ের বেগে আমার কাজ এগিয়ে চলেছে। কৃষ্ণনগর থেকে তকীপুর, সমস্ত সেক্টর আমি ঝাটিকা সফর করে বেড়াচ্ছি। আমার মূল দায়িত্ব যুবশিবির ও শরনার্থী শিবির থেকে গেরিলাদের রিক্রুট করে তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। সাথে সাথে সেক্টর ট্রুপসদের প্রশিক্ষন ও অপারেশনে সাব সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্য করা। এরই ফাঁকে ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে পুনর্গঠিত করার কাজেও ক্যাপ্টেন হাফিজকে সাহায্য করছিলাম যতটুকু সম্ভব। রাতদিন পরিশ্রম করে জুন মাসের মধ্যেই প্রায় হাজার দশেক গেরিলা রিক্রুট করে ফেলেছিলাম। তাদেরকে ২০০ থেকে ৫০০ এর একটি ব্যাচে বিহারের চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের ট্রেনিং এ পাঠানো হচ্ছিল। একই সাথে যুব শিবির এবং সাব সেক্টরগুলোতেও আমরা কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। সেক্টরের নিয়মিত বাহিনীর অভিজ্ঞ সৈনিকরা গেরিলাদের হালকা অস্ত্র, গ্রেনেড, ডেমোলিশন, রেইড, অ্যামবুশ, আনআর্মড কাম্বেট, ম্যাপ রিডিং, আরবান এবং জঙ্গল ওয়ারফেয়ার, অবসট্যাকলস প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষন দিচ্ছিলেন। লাইভ ফায়ারিং এর বন্দোবস্তও করা হয়েছিল টেম্পোরারী রেঞ্জ তৈরি করে। একই সাথে চলছিল মটিভেশন ক্লাশ।

এখানে রিক্রুটিং এর কাজে নিয়োজিত থাকাকালে একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। যুদ্ধকালে প্রায় এক লাখের মত মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নেয়। কিন্তু এর মধ্যে শতকরা একভাগও শরনার্থী শিবিরের লোক ছিল না। শরনার্থী শিবিরের আশ্রয় গ্রহণকারী বেশিরভাগ লোকই ছিলেন হিন্দু। তাদের মধ্যে খুব কম লোকের মাঝেই ট্রেনিং গ্রহণ করে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহ দেখা যেত। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে শরনার্থী শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা পরিবারের সব সদস্য নিয়েই সেখানে থাকত। জীবন বাচাঁনোর জন্য দু'বেলা দু'মুঠো আহারের নিশ্চয়তাও শিবিরে তাদের ছিল। বাংলাদেশ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার মত তাদের খুব বেশি কেউই ছিল না। শিবিরে তাদের জীবনের নিরাপত্তাও ছিল। তাদেরকে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা কারা করছে, কিভাবে করছে, এ নিয়ে তাদের তেমন কোন মাথাব্যাথা ছিল না। মনে মনে হয়তো বা তারা চাইত কষ্টের কাজটুকু অন্যে করুক, তারা একদিন ধীরে সুস্থে ফিরতে পারলেই হয়। শরনার্থী শিবিরের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেরই আবার পশ্চিমবঙ্গে আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন শহর গ্রামে পার্টিশনের সময় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার চাপ এড়াতে বয়স্করা যুবকদের বর্ডার থেকে দূরে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দিত। ওরা সেখানে কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে জীবন চালাত। শরনার্থীদের মধ্যে এবং নিছক প্রাণের ভয়ে যারা দেশত্যাগ করেছিল তাদের মধ্যে সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিই লক্ষ্য করা গেছে। যুদ্ধে তাদের বিশেষ কোন অবদান ছিল না। কিছু থাকলে তা ছিল পরিস্থিতি সাপেক্ষে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নয়। অনেক ক্ষেত্রে শরনার্থী শিবিরগুলোতে খুঁজেও সমর্থ লোক পেতাম না। পাওয়া যেত শুধু বুড়ো মানুষ, শিশু ও মহিলাদের।

এরই বিপরীত অবস্থা ছিল যুব শিবিরগুলোতে। হাজার হাজার তরুণ, যুবক, ছাত্র/ছাত্রী, সমাজের অন্যান্য পেশাজীবি, সমর্থ ছেলেদের ভীড়ে প্রতিটি যুব শিবিরই ভরে থাকত সবসময়। বাসস্থানের সংকুলানের অভাবে অনেককে ফিরিয়েও দেয়া হত বাধ্য হয়ে। তারা তাদের আত্মীয়-পরিজনদের বাংলাদেশে ফেলে রেখে ছুটে আসত সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে হাতিয়ার নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে খান সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তারা অতি কষ্টকর পরিবেশে যুব শিবিরে দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে অনেকক্ষেত্রে অভূক্ত থেকে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করত কবে তাদের রিক্রুট করে ট্রেনিং এ পাঠানো হবে। শতকষ্টে ও তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি। প্রত্যেকের মধ্যে দেখেছি প্রতিশোধের স্পৃহা এবং দেশকে স্বাধীন করার অঙ্গীকার। আজ একটি কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করছি, শরনার্থী শিবিরে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে যারা নিরাপদ জীবন-যাপন করেছিল তাদের তুলনায় হাজার রকমের ভয়ভীতি, অজানা আশংকা ও সমূহ বিপদের

মোকাবেলা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী যারা দেশেই থেকে গিয়েছিল, স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদানের মূল্য কোন অংশে কম নয়। তাদের অনেককেই দিতে হয়েছে চরম আহুতি।

ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সহায়তায় ক্যাপ্টেন জলিলের ফোর্ট উইলিয়ামের পূর্বাঞ্চলীয় হেডকোয়াটার্সের কর্মকর্তাদের সাথে গোপন যোগাযোগ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল। ভারতীয় সরকার শুধুমাত্র প্রবাসী সরকার এবং মুক্তি বাহিনীর সদর দপ্তরের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তা নয়, তারা ক্ষমতাধর কমান্ডারদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। অত্যন্ত চতুরতার সাথে তারা তাজুদ্দিনের প্রবাসী সরকারের মধ্যে অর্ন্ত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাকেও দুর্বল করে চাপের মুখে রাখছিল যাতে তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে বাধ্য হন। অপরদিকে মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিযোদ্ধের সর্বাধিনায়ক জনাব ওসমানীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কর্নেল ওসমানীর ক্ষমতা সীমিত করে রাখা হচিছল একইভাবে। কর্নেল ওসমানীকে সাইড ট্র্যাক করে প্রবাসী সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এ ধরণের কার্যকলাপে কর্নেল ওসমানী অতি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করছিলেন। তার বক্তব্য ছিল পরিষ্কার। ভারত বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী মানবিক কারণে সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে সেটার জন্য বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামটা পূর্ব বাংলার ৮ কোটি বাঙ্গালীর নিজস্ব সংগ্রাম। এ সংগ্রাম তাদেরই সংগঠিত করতে হবে। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তাদেরকেই অর্জন করতে হবে জাতীয় স্বাধীনতা, সংগ্রামের নেতৃত্ব ও সব দায়িত্বও থাকতে হবে মুক্তিফৌজ কমান্ড ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধিন। জনাব ওসমানী নীতির এ প্রশ্নে কখনোই আপোষ করেননি। এ বিষয় নিয়ে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বের সাথে অনেক বির্তক হয়েছে তার। কিন্তু তার এ নীতির প্রতি সমর্থন দেননি আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ নেতৃত্ব ও গণপরিষদ সদস্যারা। তারা তখন নিজ নিজ ক্ষমতার বলয় তৈরি করতে ব্যস্ত। তাদের প্রায় সবার মাঝেই এক ধরণের উদ্ভট চিন্তা কাজ করছিল। শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই নয় অনেক আমলা এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের মাঝেও সেই একই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। তাদের ধারণা ছিল মুক্তিযুদ্ধ যে কারণেই হোক শুরু হয়ে গেছে। প্রতিরোধ সংগ্রামকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব অঞ্চল থেকে কোটি কোটি টাকা ও সম্পদ লুন্ঠন করে নিয়ে হিজরত করে চলে আসা হয়েছে নিরাপদ আশ্রয় ভারতে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বলতে লজ্জা লাগলেও বলতে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা অনেক বুদ্ধিজীবি ও হোমরা-চোমরা পদস্থ ব্যক্তিরাও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ মুক্তি সংগ্রামকে দেখতেন অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে। তারা মনে করতেন বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধারা কখনই পাকিস্ত

ান হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে দেশ স্বাধীন করতে সক্ষম হবে না। পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করতে সরাসরি ভারতীয় সেনা বাহিনীর হস্তক্ষেপ অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয়। রক্তক্ষয়ী দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা অথবা যোগ্যতা তাদের অনেকেরই ছিল না। যুদ্ধের ঝুঁকি এবং কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতেও তারা ছিলেন নারাজ। এতে করেই তাড়াতাড়ি 'হজ্জ্ব' শেষ করে প্রবাসী জীবনের কষ্ট থেকে রেহাই পেয়ে দেশে ফিরে লুটপাটের কালো টাকার আয়েশী জীবন খুব তাড়াতাড়ি আবার শুরু করতে পারা যাবে একমাত্র ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই। ভারতে হজ্জ্ব করার স্ট্যাম্প যখন একবার নিতে সক্ষম হয়েছেন তারা তখন দেশে ফেরার পর তাদের রাজ কায়েম করার পথে বাধা কোথায়? তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশটাকে স্বাধীন করে দেবার জন্য তাদের একাংশ গোড়া থেকেই ভারত সরকারের বিভিন্ন মহলে জোর লবিং শুরু করে দিয়েছিলেন। সমস্ত প্রবাসী সরকারের মধ্যে শুধুমাত্র দু'জন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ধরণের উদ্যোগের বিরোধিতা দৃঢ়তার সাথে করে গিয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন কর্নেল ওসমানী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ। এই দুইজন ছাড়া সিনিয়র রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রায় সবাই এবং আমলাদের উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকেই ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতিত্ব করছিলেন। পরবর্তিকালে Scissorian Operation এর মাধ্যমে বাংলাদেশের Premature birth এর জন্য মূলতঃ এরাও দায়ী ছিলেন অনেকাংশে। কিন্তু বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা, আমলাতন্ত্রের তরুণ সদস্যরা এভাবে অপরের কৃপায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার উদ্যোগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ নিয়ে প্রবীণদের সাথে তরুণদের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃই বেড়ে উঠছিল প্রতিদিন।

ইতিমধ্যেই ৮ই জুলাই কোলকাতায় সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলন ডাকা হয় কর্নেল ওসামানীর নির্দেশে। কিন্তু সম্মেলনের কয়েকদিন আগে হঠাৎ করেই একদিন ঘটল এক ঘটনা। ক্যাবিনেট মিটিং এ কর্নেল ওসমানী প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনকে পরিষ্কার ভাষায় হুশিয়াঁরী দিয়ে বললেন, "ভারতের গোয়েন্দা ও সেনা বাহিনীর কর্তৃপক্ষ যদি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকেন তবে শুধুমাত্র শিখন্ডী কমান্ডার ইন চীফ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে আমি স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেব।" তিনি মিটিং এ জনাব তাজুদ্দিনকে প্রশ্ন করেন, "বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামটা কাদের সংগ্রাম? এটা যদি ভারতের সংগ্রাম হয়ে থাকে তবে আমরা সবাই কি তাদের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে ইসলামাবাদ থেকে দিল্লীতে তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী স্থানান্তরের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছি?" ঐ বক্তব্যের পর তিনি একটি পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে সভা কক্ষ ত্যাগ করেন। কথাটা মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত থিয়েটার রোড

হেডকোয়ার্টার্সে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা ইয়াং অফিসার যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাদের মাঝে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হল। আমাদের হাবভাব দেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে থিয়েটার রোড ছেড়ে সংসদ সদস্যদের দল, মন্ত্রীবর্গ সবাই কেটে পড়লেন। আমরা সোজা প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে অনুরোধ জানালাম, "যে করেই হোক কর্নেল ওসমানীকে আপনার আশ্বাস দিতে হবে যাতে তাকে বাইপাস করে ভারতীয়রা কোন কিছু না করে। আপনি যদি এ আশ্বাস তাকে দিতে পারেন তবে আমরা তাকে তার পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ জানাব এবং যে করেই হোক তাকে রাজি করাব। এটা যদি আপনি করতে ব্যর্থ হন তবে দু'দিন পর সেক্টর কমান্ডারদের যে মিটিং এখানে হবে তার পরিণতি কি হবে সেটা আপনি নিশ্চয়ই ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন। আপনাকে শুধু এতটুকুই বলছি, আমাদের মুক্তি বাহিনীর একজন সৈনিক বেঁচে থাকতে কর্নেল ওসমানীর গায়ে এতটুকু আচড় কেউ দিতে পারবে না। আমরা কেউ তার এতটুকু অপমানও বরদাস্ত করব না। তাছাড়া তার বক্তব্যে যুক্তি রয়েছে। আগে আপনি বলেছেন বিএলএফ-মুজিব বাহিনী গঠনের ব্যাপারে আপনি কিছুই জানতেন না। এ খবর আপনি জানতে পেরে নাকি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তার অ্যাডভাইজারদের সাথে এর প্রতিবিধান করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নেহায়েত অপারগ হয়েই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আপনাদের এ ধরণের অপারগতার সুযোগে তারা তাদের নীল নকশার জাল বিস্তার করে চলেছে। তাদের জালে আটকে পড়ে থাকা নির্জীব বাংলাদেশ আমাদের কাম্য নয়। পরনির্ভরশীল পঙ্গু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য হাজার হাজার বাঙ্গালী রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিচ্ছেনা বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে। আমরা তথা আপমর জনসাধারণ বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যদি ১২ বছর, ১৫ বছর, ২০ বছর রক্তক্ষরণের ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের শক্তির বলে তাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জন করে থাকতে পারেন তবে আমরাই বা পারব না কেন আমাদের নিজ শক্তিতে স্বাধীনতার সূর্যকে হানাদার বাহিনীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে? পৃথিবীর অনেক জাতি তাদের মুক্তি সংগ্রামে মিত্র দেশের সহযোগিতা গ্রহণ করেছে সংগ্রামকালে কিন্তু তাই বলে তারা নিজেদের সত্ত্বাকে তো বিকিয়ে দেয়নি। আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সব কিছু দেখে বুঝে শুনে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দৃঢ়তার সাথে সমস্যার মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে চলেন তবে আপনি আপনার যাত্রা পথে নিঃসঙ্গ হবেন না। আমরা সবাই থাকব আপনার সাথে।"

প্রধানমন্ত্রী আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন তিনি কিছু একটা করবেন। কর্নেল ওসমানীকে passify করার দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। বাইরে এসে শুনলাম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, তাজুদ্দিন এবং প্রবাসী সরকারের সাথে কর্নেল

ওসমানীর মতানৈক্য ঘটায় তিনি নাকি কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে হুকুম দিয়েছেন সমস্ত আওয়ামী লীগ সরকারকে অ্যারেষ্ট করতে। প্রধানমন্ত্রীকে ইতিমধ্যেই নাকি অ্যারেষ্ট করে রাখা হয়েছে থিয়েটার রোডেই! বাকিরা পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। গুজবটা শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। ভাবলাম, গুজবটা ছড়িয়ে আওয়ামী লীগাররা তাদের দুর্বলতাটাকেই প্রকাশ করে দিলেন তাদের অজান্তে।

এদিকে কনফারেন্সের দিন ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডাররাও ইতিমধ্যে কোলকাতায় এসে উপস্থিত হচ্ছেন। কর্নেল ওসমানীকে আমরা একনাগাড়ে বুঝিয়ে চলেছি। অনুরোধ করে চলেছি তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে। ভীষণ একরখা মানুষ কর্নেল ওসমানী। যারা তার সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তারা সবাই সেটা জানেন। অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধী এবং অভিমানী তিনি। নীতির প্রশ্নে জীবনে কেউই তাকে আপোষ করাতে সক্ষম হয়নি। নূর ও আমাকে তিনি ভীষণভাবে স্নেহ করতেন। বকাও খেয়েছি অনেক। কোন সময় অযৌক্তিকভাবেও বটে। তবুও তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তার যে আন্তরিক ভালোবাসা আমি পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেটা এক অমূল্য অনুভূতি। একান্ত নিভৃতে শ্রদ্ধার সাথে তাকে ও তার স্মৃতিগুলো আমি স্মরন করে যাব সারাজীবন। চাকুরিতে থাকাকালীন এবং চাকুরিচ্যুত অবস্থায় আমরা নিজেদের মাঝে অনেক মতামত বিনিময় করেছি নির্দ্বিধায়। এমনকি অনেক ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কেও তার পিতৃসুলভ আচরণ ও উপদেশাবলীর কথা আজও মনে হলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। যাক সে কথা। বাইরের ওসমানীর চেয়ে তার অন্তরের কিছুটা জানতে পারার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। আমাদের আকুতি-মিনতির জবাবে তিনি কিছুই বলছেন না; এমন একটা অনিশ্চিতয়তার মাঝেই শুরু হল সম্মেলন ১১ই জুলাই ১৯৭১-এ। অধিবেশনের আগে যখন এ সমস্ত ঘটনা ঘটছিল তখনই মে মাসের শেষ দিকে একদিন বয়রা সেক্টর এর একটি অপারেশনে আমি প্রথমবারের মত গুলিবিদ্ধ হই। ইনজ্যুরিটা বিশেষ সিরিয়াস ছিল না। ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলটা ভেঙ্গে গিয়েছিল গুলি লেগে। আল্লাহর অসীম কৃপায় প্রাণে বেঁচে যাই। ক্ষত নিয়েই আমার দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হাতের ব্যান্ডেজ নিয়েই সেক্টরে সেক্টরে ঘুরে ফিরেছি। ফলে ঠিকমত ঔষধ এবং কেয়ার না নেয়ায় ক্ষতে একটা খারাপ ধরণের ইনফেকশান দেখা দেয়। ফলে হেডকোয়ার্টার্সের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আমি রক্ষা করতে পারিনি। অবশ্য নূরের মাধ্যমে মাঝেমধ্যে খবরা-খবর যতটুকু সম্ভব জানার চেষ্টা করেছি। সেক্টর থেকে যোগাযোগের ব্যবস্থাও ছিল খুবই সীমিত। সম্মেলনে সব সেক্টর থেকে কমান্ডাররা এসেছিলেন। সম্মেলনের দিন সকালে নূর এসে বলল, কর্নেল ওসমানী কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করবেন না। কারণ প্রধানমন্ত্রী ও মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে তিনি তার পদত্যাগের ব্যাপারে সন্তোষজনক কোন

জবাব পাননি। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়াটা হবে অসম্মানজনক। তাছাড়া সম্মেলনে সবাই তাকে পদত্যাগের কারণও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। পদত্যাগের সঠিক কারণ এই মুহূর্তে সবাইকে জানানোটা সমীচীন মনে করছেন না কর্নেল ওসমানী। নূর এ খবরটা আমাকে জানিয়ে অনুরোধ করল সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে। মুজিবনগর সরকারের প্রতিক্রিয়া দেখে কর্নেল ওসমানী তার পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন আভাস পেলাম।

থিয়েটার রোডেই কনফারেন্স শুরু হল। সবাই উপস্থিত। জনাব তাজুদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে হাজির হলেন। বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সেনা প্রধান হিসাবে ওসমানী অনুপস্থিত। তিনি জানিয়েছেন বিশেষ কারণবশতঃ তার পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কর্নেল ওসমানীর উপস্থিতি সেখানে ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তিনি নেই দেখে সবার কাছে ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক মনে হল। যাই হোক জনাব তাজুদ্দিন লম্বা-চওড়া ভাষণ শুরু করলেন। তার ভাষণে তিনি সবাইকে জানালেন, "সেক্টর কমান্ডারদের অনাস্থাবশতঃ কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন।" উপস্থিত সবাই প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কথাটা এতই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল যে, কমান্ডারদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কর্নেল ওসমানীর উপর কমান্ডারদের আস্থা নেই এ কথা প্রধানমন্ত্রী কি করে জানলেন সে বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার কোন জবাব দিতে পারলেন না। বাক-বিতন্ডার মাঝে অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে কনফারেন্স হল ত্যাগ করে চলে যেতে হল। সম্মেলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা। কর্নেল ওসমানী সবার কাছে বিশেষ করে বাঙ্গালী বীর যোদ্ধাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তার উপর অনাস্থা এনেছেন কারা সে রহস্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত কোন কনফারেন্স হবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হল প্রধানমন্ত্রীর অবর্তমানেই। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে আমি ও নূর মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ এবং উইং কমান্ডার বাশারকে একান্তভাবে কর্নেল ওসমানীর পদত্যাগের আসল কারণ খুলে বললাম। আমরা এটাও তাদের বুঝিয়ে বললাম কর্নেল ওসমানীর এ ধরণের ষ্ট্যান্ড এ অস্থায়ী সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নীল নকশা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা অতি কৌশলে কমান্ডার ইন চীফের পদ থেকে তাকে বাদ দেয়ার পরিকল্পনা আটছে তার পদত্যাগের সুযোগ গ্রহণ করে। তাদের এ পরিকল্পনার পেছনে মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন কমান্ডারও পরোক্ষভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা তাদের আমাদের দিল্লীর অভিজ্ঞতা এবং বিএলএফ-মুজিব বাহিনী গড়ে তোলার নীল নকশার কথাও খুলে বললাম। সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে তাদের অনুরোধ করলাম, যে করেই হোক কর্নেল ওসমানীকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাখতে হবে। তাকে সম্মুখে রাখতে না পারলে নীল নকশার মোকাবেলা করতে আমরা সবাই ব্যর্থ হব। আর তাতে জাতীয় স্বার্থ

ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের সাথে তারা একমত হলেন। ঠিক হল উপস্থিত সবার তরফ থেকে তারা কর্নেল ওসমানীর সাথে দেখা করে তাকে তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাবেন। একইসাথে তাকে আশ্বাসও দেয়া হবে তিনি যাতে সসম্মানে তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য করা হবে সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে। কর্নেল ওসমানীর সাথে গোপন বৈঠক হল। আমরা যা বলেছিলাম তার পুনরাবৃত্তিই তিনি করলেন তাদের কাছে। সবাই তার পদত্যাগ করার পেছনের যুক্তি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। সব বুঝে তারা তাকে অনুরোধ জানালেন জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সব ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করার জন্য তার নেতৃত্ব বিশেষভাবে প্রয়োজন। একমাত্র তিনিই মুক্তি বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাদের দেয়া Assurance এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ওসমানী তার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করবেন বলে আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তার সাথে আলাপের পর আমরা গেলাম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলাম ও অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিনের কাছে। আমাদের দেখে দু'জনই বেশ কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিলেন। সকালের মিটিং-এর অবস্থা বুঝে জনাব তাজুদ্দিন ইতিমধ্যেই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। সরাসরিভাবে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হল,

–আপনি কোন যুক্তির ভিত্তিতে সকালে আপনার বক্তব্যে বললেন সেক্টর কমান্ডারদের অনাস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? জবাবে কিছুটা বিব্রত হয়ে তাজুদ্দিন সাহেব বললেন,

–তার কাছে খবর রয়েছে যে বেশ কিছু কমান্ডার জনাব ওসমানীর উপর অনাস্থা পোষণ করছেন।

–মহামান্য প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, শুধুমাত্র কমান্ডারদের তরফ থেকেই নয়, সমগ্র মুক্তি ফৌজের তরফ থেকে আমাদের পূর্ণ আস্থাই যে রয়েছে কর্নেল ওসমানীর উপর মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তা নয় তিনি আমাদের অতি শ্রদ্ধার পাত্রও বটে। তার পরিবর্তে অন্য কাউকে যদি কমান্ডার ইন চীফ বানাবার চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারেন। প্রবাসী সরকারের হয়তো বা ক্ষমতা থাকতে পারে, সরকার ইচ্ছামত একজন সর্বাধিনায়কও নিয়োগ করতে পারে কিন্তু তার পরিণতি কি হবে সেটাও একটু ভেবে দেখবেন। মেজর জিয়াই প্রধানমন্ত্রীর কথার জবাব দিলেন।

জনাব নজরুল ইসলাম ও তাজুদ্দিন দু'জনই মেজর জিয়ার কথা শুনে ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ ভেবে তাজুদ্দিন সাহেব বললেন,

–ওসমানী সাহেব স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। তিনি সেটা প্রত্যাহার করলে সরকার তার পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

–তিনি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন সেটা ঠিক। কিন্তু সম্মেলনে আপনি যে কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা সত্য নয়। কি কারণে তিনি পদত্যাগ পত্র সরকারকে স্বেচ্ছায় দিয়েছেন সেটা আমরা অবশ্যই শুনব তার কাছ থেকেই। আমাদের অনুরোধ কাল সম্মেলনে আপনি বলবেন, আপনার কাছে যে খবর এসেছিল কিছু কমান্ডারের অনাস্থার ব্যাপারে সেটা তদন্তে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয় আপনি আরও বলবেন উপস্থিত সব কমান্ডার এবং সমগ্র মুক্তিফৌজের দাবি একমাত্র কর্নেল ওসমানীই থাকবেন কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে। অন্য কেউ নয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সবার তরফ থেকে আপনি স্বয়ং তাকে তার ইস্তফা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য অনুরোধ জানাবেন এবং একমাত্র সে ক্ষেত্রেই তিনি তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করবেন। কথার ধরণ থেকে বুদ্ধিমান জনাব তাজুদ্দিন আহমদ বুঝে নিলেন মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডাররা ইতিমধ্যে অনেক কিছুই জেনে গেছেন। পর্দার অন্তরালে পাশা খেলার চালগুলো সম্পর্কেও হয়তো বা অনেকেই অবগত হয়ে পড়েছেন। তাই কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে না পড়ার জন্য মেজর জিয়ার অনুরোধ মেনে নিতে রাজি হলেন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন। পুরো মিটিং এ নির্বাক নিরব সাক্ষী হয়ে নিশ্চুপ বসে ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব নজরুল ইসলাম। মিটিং এর বিস্তারিত বিবরণ নূরের মাধ্যমে জানানো হল কর্নেল ওসমানীকে। পরদিন কথামত কাজ করলেন প্রধানমন্ত্রী। তার অনুরোধে কর্নেল ওসমানী তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে সম্মেলনের নেতৃত্ব দেবার স্বীকৃতি জানালে করতালির মাধ্যমে উপস্থিত সবাই কর্নেল ওসমানীর সিদ্ধান্তকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে সম্মেলন শুরু হল। চানক্য বুদ্ধির দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে কর্নেল ওসমানীকে কমান্ডার ইন চীফ পদে বহাল রাখতে পেরে আমরা তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পেরেছিলাম বলে নিজেদের আত্মপ্রত্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের এই বিজয় থেকে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে, জানবাজ মুক্তিসেনারা অন্যায় ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কোন কিছুই মুখ বুজে সহ্য করবেন না। এ সম্মেলনে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন সমস্যা এবং ভবিষ্যতে কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কর্নেল ওসমানীর মনোভাব আমাদের আগেই জানা ছিল, সে আলোকেই আলোচনা পরিচালিত হয়। ঐ বৈঠকে লেঃ কর্নেল এম এ রব বাংলাদেশ মুক্তি ফৌজের চীফ অফ ষ্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দোকার ডেপুটি চীফ অফ ষ্টাফ নিযুক্ত হন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেসব নেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে :-

১) বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা নির্ধারন।

২) মুক্তিযুদ্ধের কৌশল পদ্ধতির সারসংক্ষেপ এবং বর্ণনা।

(ক) নির্ধারিত এলাকায় নির্দিষ্ট দায়িত্বে পাঁচ অথবা দশজনকে নিয়ে গঠিত ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা দলগুলোকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হবে।

(খ) গেরিলাদের শ্রেণী বিভক্তি :-

এ্যাকশন গ্রুপ : এ গ্রুপের সদস্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে সরাসরি তবে গেরিলা হামলা চালাবে। তারা শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ হাতিয়ার বহন করবে।

গোয়েন্দা সেনা : এই গ্রুপের গেরিলারা হেডকোয়ার্টার্সের অধিনে প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এরা সাধারণত সম্মুখ সংঘর্ষে জড়িত হবে না। এদের মূল দায়িত্ব হবে খবরা-খবর সংগ্রহ করা। এদের কাছে শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগের বেশি অস্ত্র থাকবে না।

গেরিলা ঘাটি : প্রতিটি গেরিলা ঘাটি সেক্টর ট্রুপস এর দ্বারা রক্ষিত হবে। প্রতিটি ঘাটিতে গেরিলাদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ঘাটিতে একটি করে মেডিকেল টিম থাকবে প্রয়োজনে গেরিলাদের চিকিৎসার জন্য। প্রত্যেক ঘাটিতে গেরিলাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য একজন রাজনৈতিক নেতা থাকবেন। তার দায়িত্ব হবে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তানীদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া এবং একই সঙ্গে বাঙ্গালীরা যেন মানসিক সাহস ও শক্তি হারিয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শত্রুর বিরুদ্ধে বড় ধরণের আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে আরো বেশি সংখ্যক গেরিলা কিংবা নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের সংকুলানের জন্য প্রতিটি ঘাটিকে তৈরি রাখাও এদের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু বাস্তবে পরবর্তিকালে এই রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য মুজিবনগর সরকার থেকে কোন প্রতিনিধিই আসেনি। সেক্টর এবং সাব-সেক্টর কমান্ডারদেরকেই নিজেদের উদ্যোগে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল।

৩) নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের অবিলম্বে ব্যাটালিয়ন ফোর্স এবং সেক্টর ট্রুপস এ সংগঠিত করতে হবে।

৪) যুদ্ধ পরিকল্পনার পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:-

(ক) প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য বিপুল সংখ্যক গেরিলাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে হবে।

(খ) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে দেয়া হবে না। বিদ্যুতের খুঁটি, সাবস্টেশন প্রভৃতি ধ্বংস করে বিদ্যুৎ সরবরাহ অচল করে দিতে হবে।

(গ) কোন কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানি করতে দেয়া হবে না। এ সমস্ত জিনিস যে সমস্ত গুদামে থাকবে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে।

(ঘ) শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম, রসদপত্র আনা নেয়ার জন্য ব্যবহারযোগ্য যানবাহন, রেলপথ, নৌযান, রাস্তা, পুল প্রভৃতি পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে হবে।

(ঙ) রণকৌশলগত পরিকল্পনা এভাবে করতে হবে যাতে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

(চ) শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করার পর তাদের বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর উপর গেরিলারা মরণপন আঘাত হানবে।

এ সম্মেলনে বাংলাদেশকে নিম্নোক্ত এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় :-

১নং সেক্টর : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার অংশ বিশেষ মুহুরী নদীর পূর্ব এলাকা নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সমগ্র সেক্টরকে ৫টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। মেজর জিয়া সেক্টর কমান্ডার নিয়োজিত হন। (পরে জিয়া জেড ফোর্স কমান্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন রফিক ১নং সেক্টর কমান্ডার নিয়োজিত হন।) এ সেক্টরের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ২১'শত। এর মধ্যে ১৫'শত ইপিআর, ২'শ পুলিশ, ৩'শ সামরিক বাহিনী এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১'শ। এখানে গেরিলাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। এদের মধ্যে ৮ হাজারকে এ্যাকশন গ্রুপ হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শতকরা ৩৫ ভাগ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেয়া হয় এই সেক্টরকে।

২নং সেক্টর : কুমিল্লা, ফরিদপুর জেলা, নোয়াখালী ও ঢাকার অংশ বিশেষ নিয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর খালেদ মোশাররফ। সেক্টরটিকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সমগ্র সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার। গেরিলা ছিল ৩০ হাজার। (মেজর খালেদ মোশাররফ ফোর্স কমান্ডার হিসেবে গুরুতরভাবে আহত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন হায়দার সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।)

৩নং সেক্টর : মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টরটিকে ১০টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। গেরিলাদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর শফিউল্লাহ। (এস' ফোর্স গঠনের পর মেজর শফিউল্লাহর জায়গায় মেজর নূরুজ্জামানকে ৩নং সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়।)

৪নং সেক্টর : উত্তরে সিলেট সদর এবং দক্ষিনে হবিগঞ্জ থানার মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ৪নং সেক্টর। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। সেক্টরটিকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। গেরিলা ছিল প্রায় ১২ হাজার।

৫নং সেক্টর : সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর মীর শওকত আলী। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮'শ, গেরিলা ছিল প্রায় ৫ হাজার। সেক্টরটিকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

৬ নং সেক্টর : এই সেক্টর রংপুর এবং দিনাজপুর নিয়ে গঠিত হয়। উইং কমান্ডার এম কে বাশার নিযুক্ত হন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে। সাব-সেক্টর ৫টি। নিয়মিত বাহিনী সংখ্যা প্রায় ১২'শ। গেরিলা ছিল প্রায় ৬ হাজার।

৭নং সেক্টর : রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা এবং দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত হয় এ সেক্টর। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর নাজমুল হক। (যুদ্ধকালীন সময় এক মটর দুর্ঘটনায় তিনি শহীদ হলে তার স্থলে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর এম হাসান।) সাব-সেক্টরের সংখ্যা ৮টি। সৈন্য সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। গেরিলা প্রায় ৮ হাজার।

৮নং সেক্টর : কুষ্টিয়া, যশোর এবং খুলনার অংশ বিশেষ নিয়ে এ সেক্টর গঠন করা হয়। ১৫ই জুলাই পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ ওসমান চৌধুরী। পরবর্তিকালে মেজর ওসমানকে হেডকোয়াটার্সে বদলি করে নিয়ে আসা হয়। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার পর মেজর মঞ্জুর ৮ নং সেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। গেরিলা প্রায় ৮ হাজার। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ৭টি।

৯নং সেক্টর : বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনার অংশ বিশেষ, ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ৮টি। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫'শ। গেরিলা প্রায় ১৫ হাজার।

১০নং সেক্টর : এ সেক্টরের কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। নৌ কমান্ডোরাই এ সেক্টরের অধিনে ছিল। শত্রুপক্ষের টার্গেট ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজন মত বিভিন্ন সেক্টরে গ্রুপ গঠন করে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্বে পাঠানো হবে সেই সিদ্ধান্তই নেয়া হয়। তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয় সেক্টর কমান্ডারদের। দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর নৌ কমান্ডোরা সব আবার তাদের মূল আস্তানা ১০নং সেক্টরে ফিরে আসবে ঠিক করা হয়।

১১নং সেক্টর : এ সেক্টর ছিল বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং তুরা ও গারো অঞ্চল নিয়ে। কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর তাহের। (১৫ই নভেম্বর এক অভিযানে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে একটি পা হারান।) সাব-সেক্টর ছিল ৮টি। গেরিলা সংখ্যা ২৫ হাজার।

এ সম্মেলনে সেক্টরসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার পর মুক্তি ফৌজের সৈনিকদেরকেও নিম্নলিখিত ক্যাটাগরিতে পুর্নগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ঃ-

নিয়মিত বাহিনী : ২৫শে মার্চ রাতের শ্বেত সন্ত্রাসের পর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ কোর এবং অন্যান্য সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যদের নামকরণ করা হয় নিয়মিত বাহিনী।

আর্মি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে তিনটি ব্রিগেড গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখনকার ৫টি ব্যাটালিয়নকে কেন্দ্র করেই নিয়মিত বাহিনীর পুনর্গঠনের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এইসব ব্যাটালিয়নের জনশক্তি ছিল খুবই কম। প্রত্যেক সেক্টর থেকে উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করে এদের শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে নতুন আরও ব্যাটালিয়ন দাড় করানোর সিদ্ধান্ত হয়। এগুলোকে পরে ব্রিগেড গ্রুপে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এদের দ্বারা গঠিত তিনটি ব্রিগেড গ্রুপই পরে জেড' ফোর্স, এস' ফোর্স এবং কে' ফোর্স নামে পরিচিত হয়।

সেক্টর ট্রুপস্ : উপরোক্ত ব্যাটালিয়নগুলোতে যেসব ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের অর্ন্তভূক্ত করা সম্ভব হবে না তাদেরকে সেক্টর ট্রুপস হিসাবে যুদ্ধ করার জন্য ইউনিট এবং সাব-ইউনিটে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন ধারনের জন্য নগন্য সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের তরফ থেকে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের বেশিরভাগই ঐ অর্থ গ্রহণ না করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনিয়মিত বাহিনী অথবা ফ্রিডম ফাইটার্স (এফ এফ) : গেরিলা হিসেবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাদের ট্রেনিং দেয়া হত তাদের বলা হত অনিয়মিত বাহিনী, গণবাহিনী, অথবা ফ্রিডম ফাইর্টাস। প্রথম পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ছিল। সঠিক রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং কঠোর সংগ্রামী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তাদের সুশৃঙ্খল গেরিলা হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গণবাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিংকালে সামান্য পকেট খরচা এবং বাংলাদেশের ভেতরে পাঠাবার সময় প্রথমবার তাদের কিছু রাহা খরচ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এরপর তাদের বিশাল জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমাকে, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন, লেঃ মতি ও লেঃ নূরকে আগের দায়িত্বেই বহাল রাখা হয়।

কনফারেন্সে কমান্ডারদের নিয়মিত এবং অনিয়মিত বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো এবং সদস্য সংখ্যা হিসাব করে তাদের জন্য কাপড়-চোপড়, রেশন, অস্ত্র, গোলা-বারুদ, ওয়্যারলেস সেট, টেলিফোন, অতি আবশ্যকীয় রসদপত্রের তালিকা তৈরি করে

মুজিবনগর সরকারের কাছে পেশ করতে বলা হয়। অস্থায়ী সরকার চাহিদা অনুযায়ী ভারত সরকারের কাছ থেকে জিনিসগুলো সংগ্রহ করবে সেই কথাই জানানো হয়েছিল মিটিং-এ। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কয়েকটি ফিল্ড হাসপাতাল গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এছাড়া সেক্টর এবং সাব-সেক্টরগুলোতেও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্তও গৃহিত হয়। কনফারেন্সে কর্নেল ওসমানী সবাইকে জানালেন ইতিমধ্যে পাকিস্তান থেকেও বাঙ্গালী সামরিক বাহিনীর অফিসাররা পালিয়ে আসার চেষ্টা এবং উদ্যোগ নিচ্ছে। এপ্রিল মাসে তিনজনের সর্বপ্রথম দলটির মাঝে রয়েছি আমি, লেঃ মতি ও লেঃ নূর। আমাদের কাছ থেকে জানা তথ্যের ভিত্তিতে তিনি আরও বলেছিলেন অনেক বাঙ্গালী অফিসারই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য পালিয়ে আসার সুযোগ খুঁজছে কিন্তু সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়ে এসে তারপর যুদ্ধে যোগ দেয়ার কাজটি খুবই বিপদজনক; বিশেষ করে পাকিস্তানে পরিবার-পরিজন নিয়ে যারা বসবাস করছে তাদের জন্য তো বটেই। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারত সরকারের মনোভাব কি সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে না পারায় অনেকেই পালিয়ে ভারতে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। তাদের এ ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করার আহ্বান জানানো হয়েছে বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। পাকিস্তান থেকে অফিসাররা চলে আসছে জানতে পেরে সকলেই খুশি হলেন। আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হল।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্ব

- প্রবাসী বাঙালী ডঃ জাফরুল্লা ও ডঃ মুবিনের নেতৃত্বে সবচেয়ে বড় ফিল্ড হাসপাতালটি স্থাপিত হয় বিশ্রামগঞ্জে।

- জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন সপরিবারে মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন তাহের, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী ও দুই জন সৈনিক।
- পরের দলটিতে পালিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার রশিদ খান, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর ও ক্যাপ্টেন খায়রুল আনাম।
- ফ্রন্টলাইন কমান্ডারদের সবক্ষেত্রেই নিজেদের উদ্যোগ ও চেষ্টার উপর নির্ভরশীল হয়েই সংগঠিত করতে হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ।
- রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তাঞ্চলে প্রশাসক এবং সেক্টরে পলিটিক্যাল কমিসার করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে ব্যর্থ হয় প্রবাসী সরকার।
- মুক্তিযুদ্ধের আড়ালে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ভারতীয় বাহিনী অগণিত মুক্তিকামী যোদ্ধা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের নিধন করে।
- সমমনা কমান্ডাররা ভারতীয় নীল নক্শার বিরোধিতা করার জন্য অধিনস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় মটিভেশন এবং ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে তাদের ন্যাচারাল লিডার হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে পরে আমাদের হয়েছিল তিক্ত অভিজ্ঞতা। কখনোই আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং রসদপত্র পাইনি। যা পেয়েছি তার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই সামান্য। নিঃসন্দেহে এ সমস্যার কারণে আমাদের যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় শত্রুর হাতে মার খেতে হয়েছিল অনেকক্ষেত্রে। পরবর্তিকালে কমান্ডাররা ক্রমান্বয়ে নিজেরাই সব ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যান। শত্রুপক্ষ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রই ছিল আমাদের হাতিয়ারের মূল উৎস। এতে করে আমাদের পাঁচমিশালী হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। ফলে গোলাবারুদ নিয়ে আমাদের নিদারুণ সংকটে পড়তে হত। যানবাহনের সমস্যা ছিল অতি প্রকট। আমরা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা এবং মুক্তাঞ্চল থেকে কব্জা করা গাড়িগুলোর উপরই নির্ভরশীল ছিলাম। এদের রক্ষনা-বেক্ষনের দায়িত্বও নিতে হয় কমান্ডারদেরকেই। আমাদের চিকিৎসার সমস্যাও ছিল প্রকট। ভারতীয় হাসপাতালগুলো প্রায় সময় ভরে থাকত শরনার্থীতে।

যুদ্ধকালীন সময় সবচেয়ে বড় ফিল্ড হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল ২নং সেক্টরের বিশ্রামগঞ্জে। বৃটেন থেকে আগত ডাঃ জাফরুল্লাহ, ডাঃ মোমেন এবং তাদের আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের উদ্যোগে এবং প্রবাসী বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী হিতৈশীদের সাহায্যে এই বেসরকারি ফিল্ড হাসপাতাল অতি কষ্টে স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধে তারা অমূল্য অবদান রাখেন। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে খুব কম সংখ্যক চিকিৎসকই যুদ্ধে যোগদান করে। তাই তাদের ঘাটতি পূরণ করতে হয়েছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে। তাদের নিঃস্বার্থ প্রাণঢালা সেবার কথা মুক্তিযোদ্ধারা কখনোই ভুলতে পারবেন না।

এ ধরণের আরো অনেক সমস্যা ও সমাধানের উপায় কনফারেন্সে যদিও বা আলোচিত হয়েছিল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সব চাহিদাই পূরণ করা হবে বলে মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু যুদ্ধকালীন সময় মুক্তিযোদ্ধারা কখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে কিছুই পায়নি। ঠিক সময়মত পাওয়া যায়নি অতি প্রয়োজনীয় যুদ্ধসম্ভার। বর্ষাকালে জরুরী ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আচ্ছাদন নির্মানের কথা থাকলেও সে আচ্ছাদন তৈরি করতে পারেনি আওয়ামী লীগ সরকার। মুক্তিযোদ্ধারা হাড়কাপুনী শীতে রাত কাটিয়েছেন খোলা আকাশের নিচে। তাবু এবং শীতবস্ত্রের পর্যাপ্ত কোন বন্দোবস্তই করা সম্ভব হয়নি সরকারের পক্ষে। কম্বলের উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন আহত মুক্তিযোদ্ধারা। অধিকাংশ বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন আধপেটা খেয়ে, খালিগায়ে, খালিপায়ে। সব কষ্ট, সব অসুবিধা তারা হাসিমুখে মোকাবেলা করেছিলেন একটি স্বপ্নের নেশায়। সে স্বপ্ন- স্বাধীন শোষণমুক্ত বাংলাদেশ।

জুলাই মাসে পৌঁছলেন ক্যাপ্টেন তাহের, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী এবং মেজর মঞ্জুর-তার পরিবার এবং দু'জন সৈনিক দেহরক্ষী। তারা শিয়ালকোট সেক্টর দিয়ে পালিয়ে আসেন। তাদের পর আরো যারা পালিয়ে আসেন তারা হলেন- ক্যাপ্টেন খায়রুল আনাম, ক্যাপ্টেন পাশা, ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার রশিদ খান, লেঃ বজলুল হুদা, ক্যাপ্টেন রাশেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন ফারুক রহমান, ক্যাপ্টেন রশিদ, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর প্রমুখ। কনফারেন্সের সুযোগে অনেকের সাথেই আমাদের মত বিনিময় হয় ভারতীয় নীল নকশার প্রভাব ও পরিণতি নিয়ে। যাদের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম শুধু তাদের সাথেই গোপনে আলোচনা করা হয়েছিল এই অতি স্পর্শকাতর বিষয়টি। মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন জলিল এবং উইং কমান্ডার বাশার এর অন্যতম। পরবর্তী পর্যায়ে মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন তাহের, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন, ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন হাফিজ, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন রশিদ, ক্যাপ্টেন মহসীন, লেফটেন্যান্ট হুদা, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট নূরুন্নবী ছাড়াও যাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল তাদের সাথেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। পর্দার অন্তরালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন মহল, অস্থায়ী সরকার ও ভারতীয় প্রশাসনের চক্রান্ত ও স্বার্থ নিয়ে আলোচনার ফলে কতগুলো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ঐক্যমত্যের সৃষ্টি হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত সরকারের নীতি এবং মুজিবনগর সরকারের অযোগ্যতাকে নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করা ঠিক হবে না। আমাদের বিভিন্ন মহলের উদ্দেশ্য এবং তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের চক্রান্তের ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে। একইসাথে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠন করে তাদেরকে সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে চক্রান্তের বিভিন্ন দিক। তাদের মটিভেট করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে সব চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীন করতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই। শুধুমাত্র ইসলামাবাদ থেকে দিল্লীতে রাজধানী বদলের জন্য যুদ্ধ করছি না আমরা, প্রয়োজনে পাক বাহিনীর সাথে সাথে অবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের। আট কোটি বাঙ্গালীর জন্য হাসিল করতে হবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে একটি যথার্থ স্বাধীন বাংলাদেশ। কোন করদ রাজ্য কিংবা নামেমাত্র স্বাধীনতা নয়, চাই প্রকৃত স্বাধীনতা এবং জাতীয় মুক্তি। প্রত্যেক কমান্ডারকে তার কর্মদক্ষতা, শৌর্য্য-বীর্য, সাংগঠনিক দক্ষতা, আত্মত্যাগ, রাজনৈতিক সচেতনতা, দেশপ্রেম, রণযোগ্যতা, সাহস ও নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তাঙ্গনের জনগণের হৃদয়ে নেতৃত্বের স্থান করে নিতে হবে যাতে করে যুদ্ধত্তোর পর্বে প্রয়োজনে যে কোন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে তৈরি করে তুলতে হবে জনগণের Natural Leader হিসেবে। এভাবেই সম্ভব হবে নিজেদের শক্তির

ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। এভাবে নিজেদের তৈরি করতে পারলে ভবিষ্যতে যে কোন হুমকির মোকাবেলায় জনগণকে সাথে নিয়ে পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হবেন যে কোন ক্রান্তিলগ্নে। স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন কোন্দল ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

- জনাব তাজুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারছিল না অনেকেই।
- কোলকাতায় মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয় সাজিয়ে বসলো প্রবাসী সরকার।
- প্রবাসী সরকার এবং রনাঙ্গনের সব পর্যায়ে খবরদারী এবং নজরদারীর জন্য ভারতীয় এজেন্ট নিয়োগ।
- খন্দোকার মোশতাক থিয়েটার রোড ছেড়ে সার্কাস এ্যাভেনিউতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরিয়ে আনলেন।
- দৈবক্রমে প্রবাসী সরকারের প্রধান কার্যালয় দু'টোই ছিল থিয়েটার রোডে এবং সার্কাস এ্যাভেনিউতে। অনেকের আচার-আচরণ ও ভাবসাবে মনে হত তারা যেন সত্যিই থিয়েটার ও সার্কাসের ক্লাউন।
- প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে।
- খন্দোকার মোশতাক ভারতীয়দের কাছে হয়ে উঠেন চোখের বালি।
- গুজব ছড়িয়ে পরে খন্দোকার মোশতাক নাকি সিআইএ-এর যোগসাজসে শেখ মুজিবের সম্মতিক্রমে পাকিস্তান সরকারের সাথে সমঝোতার চেষ্টা করছেন।
- সেই সময়ে হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হওয়ায় গুজবটি কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা পায়।
- সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা সব মহলেই আলোড়ন সৃষ্টি করে।

যুদ্ধে যোগ দেবার পর একটি জিনিস দেখে বারবার আমাকে অবাক হতে হয়েছে। যেখানেই গেছি, দেখেছি আত্মপ্রত্যয় আর মানসিক দৃঢ়তায় ভোরের সূর্যের দীপ্তি নিয়ে হাজার হাজার তরুণ প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা হাসিমুখে লাইন করে দাড়িয়ে থেকেছে। নির্বাচিত না হতে পেরে অতৃপ্তির ব্যথা নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে অনেককেই। যুব শিবিরে অপেক্ষা করেছে তারা দিনের পর দিন, কখন জীবন দেবার ডাক আসে। যেখানেই গেছি, সবাই আমাকে ঘিরে ধরেছে। সবার মুখে একই প্রশ্ন, আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যেতে? কি সেই তাদেয় আকুতি! জীবন দেবার জন্য সবাই তৈরি। নিজেদের মাঝে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা কে কার আগে যুদ্ধে যেতে পারে। কি সহজভাবে যুদ্ধের ভয়াবহতাকে তুচ্ছ করে তারা সংগ্রামে যোগ দিতে আগ্রহী। তাদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগের স্পৃহা, আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। রিক্রুটিং সেন্টারগুলোতে তরুণদের লাইন দেখেই আমি বুঝেছিলাম এই নিবেদিত প্রাণ তরুণদের রক্ত বিফল হবে না। কোন শক্তি কিংবা সময়ের দীর্ঘতা কোন কিছুই তাদের রুখতে পারবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য তারা ছিনিয়ে আনবেই। এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে যোগ দেবার স্পৃহা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে নেই। গণচীন, রাশিয়া, প্রাচ্য ইউরোপীয় দেশগুলোর কারও ইতিহাসই এমন দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হয়নি। বেশিরভাগ দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু বাংলার তরুণরা কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিঁয়ে পড়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য ও আত্মত্যাগের অতুলনীয় নিদর্শন রেখেছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর যে কোন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেই বিরল। এই সত্য আকাশের সূর্যের মতই উজ্জ্বল। এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল বাংলাদেশের অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা।

যদি কোন দল বা গোষ্ঠি এককভাবে মুক্তিযুদ্ধের সব কৃতিত্ব কিংবা জনগণের বিজয়কে নিজেদের বলে দাবি করে তবে সেটা হবে ইতিহাস বিকৃতির কদর্য প্রচেষ্টা এবং চরম ধৃষ্ঠতা। দীর্ঘ দিনের শোষণের তীব্রতাই আমাদের জাতীয়তাবোধ তীব্র করে তুলেছিল; আর সেই তীব্রতাই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করে তোলার প্রত্যয়কে দৃঢ়তা দান করেছিল। জাতীয় শোষণ থেকে সার্বিক মুক্তি পাবার চেতনাই জনগণ এবং তরুণ সমাজকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছে। তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ফলেই অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সব কৃতিত্বের দাবিদার সার্বিকভাবে দেশের জনগণ এবং তরুণ যোদ্ধারা। কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা দল নয়।

Guerilla Advisor to the Sector Commander হিসাবে গেরিলাদের রিক্রুটিং, ট্রেনিং থেকে সব দায়িত্বই আমাকে তুলে নিতে হয়েছিল নিজ হাতে। গেরিলা বাহিনীর প্রশাসনিক এবং অভিযান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল বিশেষ কষ্টকর। গেরিলাদের থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থাই করতে হত নিজের উদ্যোগে। শত শত মুক্তিযোদ্ধাদের এলাকা ভিত্তিক ভাগ করে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলাদা ভাবে ব্রিফিং করতে হত। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, এবং রাহা খরচের ব্যবস্থাও করতে হত আমাকেই। ছেলেদের ভেতরে পাঠানোর জন্য শত্রুবাহিনীর তৎপরতা ও চলাচল সংক্রান্ত সর্বশেষ খবরা-খবর সংগ্রহ করতে হত নিজেদের ইনটেলিজেন্স নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। পাক সেনারা এবং টহলদার বাহিনী সর্বদা জায়গা পরিবর্তন করত তাই আমাদেরকেও সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব খবরাদি সংগ্রহের প্রচেষ্টা জারি রাখতে হত সর্বক্ষণ। ইনডাকশনের জন্য আমরা গাইডের বন্দোবস্ত করতাম। এদের বেশিরভাগই ছিল পূর্বতন স্মাগলার। বর্ডার এলাকার চোরা পথগুলো থাকত তাদের নখদর্পণে। তারা নিরাপদ রাস্তায় গেরিলাদের পূর্ব র্নিধারিত ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করত। ঘাঁটি থেকে ঘাঁটিতে নতুন আগন্তুকদের আগমন বার্তা আগে থেকেই দেয়া থাকত, সেখানে তাদের খাদ্য ও থাকার ব্যবস্থাও আগে থেকেই করা হত। তারপর থেকে গেরিলারা তাদের স্বীয় ব্যবস্থায় যার যার দায়িত্ব পালন করতো। প্রত্যেক গ্রুপের সদস্যদের নাম-ঠিকানা, তাদের পরিকল্পনা, চলাফেরার উপর নজর রাখা, ঘাঁটি, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদের হিসাব, ধ্বংসপ্রাপ্ত টার্গেট, কাপড়-চোপড়, রেশন, অন্যান্য সরবরাহ এবং সব খরচের হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল টিম-লিডার এর। নিয়মিত রিপোর্ট পরে তাকে পাঠাতে হত হেডকোয়ার্টার্সে। দেশের ভেতর অপারেশনরত প্রতিটি গ্রুপের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হত। তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা এবং নির্ধারিত দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার ব্যাপারেও কমান্ডারদের তৎপর থাকতে হত। গেরিলা গ্রুপগুলো তাদের কর্মকান্ড এবং শত্রুপক্ষের গোপন ও প্রয়োজনীয় সব তথ্যাদি নিয়মিতভাবে আমাদের কাছে পাঠাত কুরিয়ারের মাধ্যমে। অনেক সময় প্রয়োজনে এ ব্যাপারে সাংকেতিক কোর্ডও ব্যবহার করা হত। অবস্থা এবং টার্গেটের গুরুত্ব বুঝে গেরিলা গ্রুপদের সাথে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমেও যোগাযোগ ও খবরা-খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হত; তবে সে সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। খবরা-খবর সংগ্রহের বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হয়েছিল প্রত্যেক কমান্ডারকে। এ ব্যাপারে অনেক রাজাকার, পিস্ কমিটির চেয়ারম্যান আমাদের সাহায্য করেছেন। অনেকে পরোক্ষভাবে গেরিলাদের অপারেশনেও সাহায্য করেছেন। তাদের থাকা-খাওয়া ও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন এমন নজীরও অনেক রয়েছে। অতএব, যুদ্ধের সময় সব রাজাকার এবং সব পিস্ কমিটির সদস্য অথবা চেয়্যারম্যানরাই যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন সেটা সত্য নয়। অনেকের ভূমিকা বরং ছিল প্রশংসনীয়। এভাবেই আমাদের আবর্তনমূলক কাজ চলতো

দিনের পর দিন। চর্তুদিকে সবকিছু ২৪ ঘন্টা চালু রাখা ছিল আমাদের দূরহ দায়িত্ব। এর কোন একটা দিকে অবহেলা হলেই ছিল বিপদের সমূহ সম্ভাবনা।

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ সামগ্রীর বন্দোবস্ত করার ওয়াদা প্রবাসী সরকার বার বার করে ব্যর্থ হলেও ফ্রন্টলাইন কমান্ডারদের ওপর সর্বদাই তাদের কাছ থেকে নির্দেশ আসতে থাকে যুদ্ধ আরো জোরদার করার। উপরওয়ালাদের সাহায্যের আশায় নিষ্ক্রিয় হয়ে না থেকে মুক্তিযোদ্ধারা কিন্তু অনবরত আঘাত হেনে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করে চলেছিল। তাদের হাতে বিপুল সংখ্যক শত্রু নিহত কিংবা আহত হয়েছিল প্রতিদিন। বন্ধ করে দেয়া সম্ভব হয়েছিল তাদের মিল-ফ্যাক্টরি, অচল করে দেয়া হয়েছিল বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং যাতায়াত ব্যবস্থা। নিজেরাও আত্মাহুতি দিয়েছিলেন অনেক। হতাহতের সংখ্যাও বেড়েছে দিনদিন। কিন্তু মুজিবনগর সরকার কিংবা উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে এ ত্যাগ ও বীরত্বের স্বীকৃতি কিংবা প্রশংসা তারা খুব একটা পাননি কখনোই। অবোধ্য কারণে তাদের সাফল্যকে ছোট করেই দেখার প্রবণতাও স্পষ্ট ধরা পড়েছে ক্ষেত্র বিশেষে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই প্রবাসী সরকার এবং আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের হোমরা-চোমরাদের প্রতি মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন ক্ষুব্ধ।

শত মাইল দুর্গম, পার্বত্য অঞ্চল ও নিবিড় বনানী পার হয়ে সমস্ত কিছু ফেলে রেখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য যারা সীমান্ত পেরিয়ে এসেছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বেশিরভাগই তাদের ব্যাপারেও তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করেননি। ট্রেনিং নেবার আশায় মাসের পর মাস তারা অপেক্ষা করেছে যুব শিবিরে অনাহারে, অর্ধহারে। রক্ত আমাশয়, জ্বরে মারাও গেছে অনেকে। তারা যে মহৎ উদ্দেশ্যে সব ছেড়ে ঘরছাড়া হয়েছিল তার স্বীকৃতিও কারো কাছ থেকে তারা পায়নি। প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার ও তাদের দলীয় নেতারা সবাই কোলকাতায় অবস্থান করে বেশিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন শরনার্থী শিবির, মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ও তাদের ভারতীয় কাউন্টার পার্টদের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে প্যালেসক্লিক ও ক্ষমতার দরকষাকষির ব্যাপারেই তারা ছিলেন বেশি ব্যস্ত। মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উপর তাদের অনাস্থাই ছিল এর মূল কারণ। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব কমান্ডারকেই স্থানীয় অধিবাসী, সুহৃদ, সহানুভূতিপ্রবণ লোকজন এবং মুক্তাঞ্চল থেকে পাওয়া সাহায্য ও দান গ্রহণ করে যুদ্ধ চালাতে হয়েছে। কারণ, কোলকাতায় অবস্থিত মুজিবনগর সরকার তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হলেও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতির কোন অবকাশ ছিল না। নিজ নিজ সাধ্যে যতটুকু পেরেছেন আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন যোদ্ধাদের দাবি এবং চাহিদা পূরণ করতে। তাদের সেই আন্তরিকতাতেই তাদের কথায় হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা বিনা প্রশ্নে,

র্নিদ্ধিধায়। সে সমস্ত শহীদ আত্মার সাথে করা প্রতিজ্ঞার কতটুকু আমরা অধিনায়ক হয়ে রক্ষা করতে পেরেছি সেটা আজও বিবেকে প্রশ্ন হয়ে জ্বলছে। যাদের রক্তে গড়া এই বাংলাদেশ সে বাংলাদেশ আজও অভিশপ্ত। কারণ শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী করে কোন দেশ বা জাতি উন্নতি করতে পারে না। আল্লাহর গজব থেকেও মুক্তি নেই সে দেশ বা জাতির। আল্লাহর বিধান, অমোঘ নিরপেক্ষ। সেখানে চলে না কোন ছলচাতুরি, প্রতারণা। দেশও জাতিকে বাঁচাতে হলে আমাদের হতে হবে পাক্কা ঈমানদার, হতে হবে বিবেকবান। সত্যকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হবে, উপযুক্তকে দিতে হবে তার ন্যায্য সম্মান। লাখো শহীদের চেতনার বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সত্যিকারের মুক্তির পথ।

মুক্তিযুদ্ধকে ভারতীয় পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ভারতীয় সরকারের তরফ থেকেও একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের একেকজনের অধিনে একটি কিংবা দু'টি করে সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ভারতীয় সেক্টর কমান্ডার এবং তাদের অফিসারদের সবাই ছিলেন কাউন্টার ইনসারজেন্সী এবং গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্য। বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর সেক্টর, সাব-সেক্টর কমান্ডারদের কার্যকলাপ, প্রশিক্ষণ, রণকৌশল, ইনডাকশন প্রভৃতি ব্যাপারে তারা খুবই সতর্কদৃষ্টি রাখতেন সর্বক্ষণ। রিক্রুটিং এর ব্যাপারেও তাদের ছিল ভীষণ সর্তকতা। পাছে নকশালী অথবা বামপন্থী প্রগ্রেসিভ মাইন্ডের ছেলেরা রিক্রুটেড হয়ে মুক্তি বাহিনীর সদস্য না হয়ে পড়ে এ বিষয়ে তাদের সতকর্তা ছিল অবিশ্বাস্য। আমরা তাদের কড়া দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বামপন্থী দেশপ্রেমিক ছেলেদেরকেও আমাদের ক্যাম্পে জায়গা দিয়েছি। ট্রেনিং দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে তাদের ভেতরেও পাঠিয়েছি যুদ্ধ করতে। কিন্তু এ সমস্ত কিছু করতে হয়েছিল অতি গোপনে।

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের বিভিন্ন জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকে যাতে কোন প্রকারে ইনফ্লুয়েন্স করতে না পারে কিংবা কোনরূপ সাহায্য তারা আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে নিতে না পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ভারতীয় সরকার ও বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগগুলো। কিন্তু তাদের অতি সর্তকতা সত্ত্বেও আমাদের মুক্তি সংগ্রাম বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল পশ্চিম বাংলা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, আসাম, মনিপুর, পাঞ্জাব এবং দক্ষিনাঞ্চলের তামিলদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলোকে। তাড়াহুড়া করে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমাপ্তি টেনে আনার জন্য এটা ছিল অন্যতম একটা প্রধান কারণ। দিল্লীর কেন্দ্রিয় শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য এ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা দীর্ঘ দিন যাবৎ তাদের মুক্তির আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য। তাই স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম তাদের মুক্তির চেতনা ও প্রেরণাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের মুক্তি

সংগ্রামের সাথে যে সমস্ত অফিসাররা জড়িত ছিলেন পরবর্তিকালে তাদের অনেকেই তাদের নিজস্ব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। শহীদ হন অনেকেই। বিশেষ করে শিখদের খালিস্থান মুভমেন্টে তাদের অনেকেই যোগদান করেছিলেন। প্রাণ দিয়েছেন জেনারেল সবেক সিং, কর্নেল সূরজ সিং প্রমুখ বীর মুক্তিযোদ্ধারা জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাদের অনেকেই আজ অব্দি বীর বিক্রমে চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। মুক্তিপাগল এ সমস্ত জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা।

ইতিমধ্যে কোলকাতায় অবস্থিত মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে পালিয়ে আসা আমলাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয়। বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র, গণ সংযোগ ও বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ বিভাগ প্রভৃতি। দপ্তর, পরিদপ্তরের ভারে মুজিবনগর সরকার কোলকাতায় ভীষণ ব্যস্ত। প্রতিটি দপ্তরের সাথে জড়িত রয়েছেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সদস্যরা। তাদের সকল ব্যস্ততা ও কর্মকান্ডের হদিস রনাঙ্গনে বসে আমরা কিছুই তেমন টের পাইনি। মাঝেমধ্যে নানা ধরণের খবর কিংবা গুজব ভেসে আসত আমাদের কানে। তাদের কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে কতটুকু অবদান রেখেছে সেটা নির্ধারন করার দায়িত্ব রইলো ঐতিহাসিকদের উপর। তবে তাদের তৎপরতার যুক্তিকতা অস্বীকার করে বেশ কয়েকজন আমলা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মতে দেশের ভেতর থেকে মুক্তি সংগ্রামকে সংগঠনের সাথে সাথে মুক্তাঞ্চলে গঠিত হওয়া উচিত ছিল এ ধরণের প্রবাসী সরকার। রনাঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সুদূর কোলকাতায় মন্ত্রণালয়, সচিবালয় সাজিয়ে বসার কোন যৌক্তিকতা নেই। কোলকাতায় বসে সবাই যার যার পদ ও মর্যাদা টিকিয়ে রাখতেই বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষমতার কোন্দলে কলুশিত হয়ে উঠেছিল থিয়েটার রোড এবং সার্কাস এ্যাভেনিউর পরিবেশ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ তার মন্ত্রণালয় স্থাপন করলেন সার্কাস এ্যাভেনিউতে। পুরো মিশনটাই তখন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান দপ্তর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিল। পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন জনাব মাহবুবুল আলম চাষী। খন্দোকার মোশতাক আহমদের একান্ত সচিব জনাব কামাল সিদ্দিকী। এ ছাড়া সার্কাস এ্যাভেনিউতে জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং জনাব মওদুদ আহমদ বর্হিবিশ্বের সাথে এবং বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একটি তথ্য সেল খুলেছিলেন। সেটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগসাজসে পরিচালিত হত। আইনজীবি হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জনাব মওদুদ আহমদ আওয়ামী লীগের পক্ষে কৌসুলী হয়ে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন তবুও প্রবাসী সরকারের কাছ থেকে তিনি তার উদ্যোগের কোন স্বীকৃতি পাননি। এ ব্যাপারে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করে জনাব মওদুদ

আহমদ প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে একটি নিবেদন পত্রও লিখেছিলেন। তিনি চাইছিলেন স্বীয় উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তিনি যা কিছুই করছিলেন প্রবাসী সরকার তার স্বীকৃতি দিয়ে তাকেও কোন একটা বড়সড় পদে বহাল করুক। কিন্তু তার সে আশা পূরণ করেনি মুজিবনগর সরকার অজানা কোন কারণবশতঃ।

ইতিমধ্যে থিয়েটার রোডের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিরোধিতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে। নীতিগত অনেক বিষয়েই জনাব তাজুদ্দিন ও তার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মাঝে ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে। ভারতীয় সরকারও জনাব মোশতাকের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। বাজারে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ গোপনে সিআইএ এর মাধ্যমে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। অস্থায়ী সরকারের অলক্ষ্যে আমেরিকার মধ্যস্থতায় তিনি নাকি পাকিস্তান সরকার ও শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাবার চেষ্টায় আছেন। তার এই উদ্যোগের পেছনে আওয়ামী লীগের দক্ষিনপন্থী বেশ একটা বড় প্রভাবশালী অংশের সমর্থনও নাকি রয়েছে। এ ধরণের গুজব ছড়িয়ে পড়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তার এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হল। নেতাদের অনেকেই তখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ করে সহসা বা কোনদিনই দেশ স্বাধীন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ পোষণ করতেন।

তাদের মনোভাব ছিল এরূপ:- যা হবার তাতো হয়েই গেছে। আখের যতটুকু গোছাবার তাও বেশ গুছিয়ে ফেলা হয়েছে সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরতে না পারলে, গোছান সম্পদ ভোগ করা যাবে না। তাই ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমার সুযোগটা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

নবম অধ্যায়

যুদ্ধকালীন সময়ে লুটপাট এবং দুর্নীতির ইতিহাস

- আওয়ামী লীগারদের লুটপাটের ইতিহাস শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়কালেই।
- ব্যাংক ও ট্রেজারী লুটের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে হোমরা-চোমরারা সব 'জয় বাংলার শেঠ' নামে পরিচিতি লাভ করে।
- ঐ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিদের আচরণ মুক্তিযুদ্ধকে কলংকিত করছিল বিধায় মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।
- পূর্ব পাকিস্তান থেকে আনা বিপুল অংকের টাকার কোন হিসাব দেয়নি আওয়ামী লীগ সরকার, লুটপাটেরও কোন বিচার হয়নি।
- প্রবাসী সরকারের ব্যর্থতা, লুটপাট সমিতির কার্যক্রম এবং নেতাদের বিলাসবহুল জীবন নিয়ে জনাব জহির রায়হান একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এটাও তার রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
- মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাওলানা ভাসানীকে গৃহবন্দী করে রেখেছিল ভারত সরকার।
- স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল বামপন্থীরা। ভারত সরকারের মনোভাবও তাদের প্রতি ছিল বিরূপ।
- নির্বাচিত সাংসদদের মুক্তাঞ্চলে প্রশাসক এবং সেক্টরগুলিতে পলিটিক্যাল কমিসার হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে ব্যর্থ হয় প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার।

তারা কোলকাতায় বেশ আরাম-আয়েশেই সময় কাটাচ্ছিলেন কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের অসৎ উপায়ে লুটপাট করার কথা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল। এতে তাদের সম্মানেরই শুধু হানি হচ্ছিল তা নয় তাদের অনেকের প্রতিই বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। তারা যেখানে অনাহারে, অস্ত্রহীন-বস্ত্রহীন অবস্থায় দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবনবাজী রেখে রণাঙ্গনে লড়ছেন তখন এ সমস্ত অসৎ রাজনীতিবিদ ও লুটেরার দল লুটপাটের বেশুমার টাকায় বিলাসী জীবন যাপন করে বাঙ্গালীদের বদনাম করছিলেন অতি নির্লজ্জভাবে। এ অপমান মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। কোটি কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে লুটে আনা হয়েছিল। শুধুমাত্র বগুড়ার ষ্টেট ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছিল ৫৬ কোটি টাকার উপর। এ সমস্ত লুটপাটের সাথে জড়িত ছিলেন রাজনৈতিক নেতারা এবং আমলাদের একটা অংশ। কোটি কোটি টাকা নিয়ে বিদেশের মাটিতে বসে ছিনিমিনি খেলার ন্যাক্কারজনক ইতিহাসের কোন জবাব আওয়ামী লীগ সরকার প্রবাসে কিংবা স্বাধীনতার পর জনগণের কাছে দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি। মনগড়া হিসাবের ফিরিস্তি দিয়ে লুটপাটের কলঙ্ক মোছা যায় না। সংগ্রামকালের লুটপাটের সম্পদে রাতারাতি রাজনৈতিক নেতারা, তাদের পরিবার-পরিজনরা এবং চিহ্নিত কিছু আমলা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিলেন। বাড়ি, গাড়ি, সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন ঐ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিরা। সেই সমস্ত রহস্য সময়ের সাথে ক্রমান্বয়ে জনগণের সম্মুখে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। সংগ্রামকালের এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ মুক্তিযোদ্ধারা একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বপ্রথম এ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীর সাথে কথাও হয়েছিল। তাকে বোঝানো হয়েছিল এ সমস্ত অসৎ নেতৃত্বের অধিনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হওয়ায় বিশ্ব পরিসরে সংগ্রামের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। শুধু তাই নয় তাদের পার্থিব লোভ-লালসা এবং চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ জাতিকেই ব্ল্যাকমেইল করা সম্ভব হবে অতি সহজেই। সব শুনে তিনি বলেছিলেন, "অভিযোগ যুক্তি সম্পন্ন কিন্তু তবুও বিদেশের মাটিতে নিজেদের মাঝে কাটাকাটি শুরু করলে মূল উদ্দেশ্য থেকে আমরা দূরে সরে যাব। অবশ্যই এ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিদের শাস্তি পেতে হবে, কিন্তু সেটা দেয়া হবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে গণআদালতে।" তার কথা মেনে নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে গণআদালত তো দূরের কথা কোন কোর্ট-আদালতেও ঐ সমস্ত অপরাধিদের বিচার হয়নি। কারণ এ সমস্ত অসৎ কার্যক্রমের সাথে প্রশাসনের প্রায় সব রুই-কাতলাই জড়িত ছিলেন। রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে উঠে তখন অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অবস্থাও হয়েছিল ঠিক তাই। লুটপাট, চুরি-চামারির বিচারের পরিবর্তে এ সমস্ত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের মাত্রা গিয়েছিল অনেক বেড়ে। কর্নেল ওসমানীর কথা শুধু কথা হয়েই থেকে যায়। স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই কোন ব্যাপারেই ন্যায়সঙ্গত

কোন বিচার পায়নি জাতি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠির কাছ থেকে, শুধু পেয়েছে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, প্রতারণা ও বঞ্চনা।

লুটপাট সমিতির কার্যকলাপে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথা সমস্ত বাঙ্গালী জাতির ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছিল তার কয়েকটি বিবরণ নিচে দেয়া হল:-

লুটপাট সমিতির সদস্যরা তখন কোলকাতার অভিজাত পাড়াগুলোতে এবং বিশেষ করে পার্ক ষ্ট্রিটের হোটেল, বার এবং রেস্তোরাগুলোতে তাদের বেহিসাবী খরচার জন্য 'জয় বাংলার শেঠ' বলে পরিচিত। যেখানেই তারা যান মুক্তহস্তে বেশুমার খরচ করেন। থাকেন বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিংবা হোটেলে। সন্ধ্যার পর হোটেল গ্র্যান্ড, প্রিন্সেস, ম্যাগস, ট্রিংকাস, ব্লু ফক্স, মলিন রুয্, হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি বার রেষ্টুরেন্টগুলো জয়বাংলার শেঠদের ভীড়ে জমে উঠে। দামী পানীয় ও খাবারের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আমেজে রঙ্গীন হয়ে উঠে তাদের আয়েশী জীবন। বয়-বাবুর্চিরাও তাদের আগমনে ভীষণ খুশি হন। এমনই একজন নেতা তার দলবল নিয়ে প্রত্যেক দিন হোটেল গ্র্যান্ডের বারে মদ্যপান করতেন। তিনি বগুড়া ব্যাংক লুটের টাকার একটা বিরাট অংশ কব্জা করেছেন কোনভাবে। তার কাছে রয়েছে প্রায় চার কোটি টাকা। একদিন মধ্যরাতে তিনি হোটেল বারে গিয়ে মদ পরিবেশন করার জন্য বারম্যানদের হুকুম দেন। বারম্যানরা কাচুমাচু হয়ে তাকে জবাব দেয় সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জবাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন বাঙ্গালী শেঠ। টলমল অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, তিনি হোটেলটাই পুরো কিনে নিতে চান। বেসামাল কিন্তু শাসালো খদ্দের, তাই বারম্যানরা চুপ করে সবকিছু হজম করে যাচ্ছিল। শেঠ আবোল-তাবোল বকে পরে একজন বারম্যানকে হুকুম দেন, "কাল বার খোলার সময় থেকে বন্ধ করার আগ পর্যন্ত তিনি ও তার সঙ্গীগণ ছাড়া অন্য কাউকে মদ পরিবেশন করা যাবে না। তারাই শুধু থাকবেন বারে।" তার হুকুম শুনে বারম্যান ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায়। ম্যানেজার এলে শেঠ তাকে প্রশ্ন করেন, "রোজ আপনাদের বারের সেল কত টাকা?" ম্যানেজার একটা অংক তাকে জানায়। শেঠ তখন তাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন পুরোদিনের সেলের টাকাই তিনি পরিশোধ করবেন। পুরো টাকার মদ ওরা খেয়ে শেষ করতে না পারলে বাকি মদ যেন তার বাথরুমের টাবে ভরে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি তাতে গোসল করবেন। ম্যানেজার তার কথা শুনে 'থ হয়ে গিয়ে মাতালের প্রলাপ মনে করে কোন রকমে সেখান থেকে কেটে পড়েন।

আর একদিন আর একজন জয়বাংলার শেঠ তার পুত্রের প্রথমবারের মত জুতো পরার দিনটি উৎযাপন করার জন্য ব্লু ফক্স রেষ্টুরেন্টে প্রায় ১০০ জনের একটি শানদার পার্টি দেন। এছাড়া অনেক শেঠরা দিল্লী এবং বোম্বেতে গিয়ে বাড়িঘর কিনতে থাকেন।

অনেকে আবার ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিতেও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের এ সমস্ত কির্তিকলাপের ওপর শহীদ জহির রায়হান একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার এ অভিপ্রায়ে অনেকেই ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন তার উপর। অনেকে তার এ ঔদ্ধত্বে ক্ষেপেও গিয়েছিলেন। তার রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। কোন এক নায়িকার জন্মদিনে তখনকার দিনে তার এক গুণমুগ্ধ ভক্ত তাকে ৯ লক্ষ টাকা দামের হীরের নেকলেস্ উপহার দিয়েছিলেন।

দরগা রোডের বিশু বাবুর বাড়িতে থাকতেন মন্ত্রী পরিষদের পরিবারবর্গ। প্রবাসী সরকারের টাকার প্রায় সবটাই কালো কালো ট্রাঙ্কে ভরে রাখা হয়েছিল বিশু বাবুর বাড়িতে এবং ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ এর তিন তলার ছাদের দু'টো কামরায়। সেখানে থাকতেন অর্থসচিব জনাব সামসুজ্জামান এবং তার পরিবার ও রাফি আক্তার ডলি। এ টাকার কোন হিসাব ছিল না। কোলকাতার বড় বাজারের মারোয়াড়ীদের সাহায্যে এগুলোর এক্সচেঞ্জ করা হত। এ কাজের দালালী করেও অনেকে কোটিপতি হয়ে উঠেন রাতারাতি। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হলেও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা লোভ সংবরণ করতে না পেরে অসৎ হয়ে উঠেন।

কোন এক সেক্টর কমান্ডার এক পাকিস্তানী সিএসপি অফিসারের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে বেয়োনেটের আঘাতে মেরে তার গা থেকে সোনার অলংকার খুলে নিয়েছিলেন; এমন ঘটনাও ঘটেছে। এ ধরণের কিছু ব্যক্তি নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করেছেন আজ অব্দি। কিন্তু তারা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের কলংক। তাদের অপকর্মের জন্য সাধারণভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কলংকের ভাগী হতে হয়েছে।

যুব শিবির, শরনার্থী শিবিরগুলোতে বরাদ্দকৃত রিলিফ সামগ্রী নিয়েও কেলেংকারী হয়েছে অনেক। ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল প্রায় ১ কোটি শরনার্থী। তাদের জন্য সারাবিশ্ব থেকে রিলিফ সামগ্রী, যানবাহন ভারতীয় সরকারের প্রযত্নে প্রচুর এসেছিল। কিন্তু তার কতটুকুইবা দেয়া হয়েছিল শরনার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে! এ সমস্ত রিলিফ সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে ভারত ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের। বগুড়ার ষ্টেট ব্যাংক ছাড়াও মোটা অংকের টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাবনার ট্রেজারি থেকে। সে টাকারও কোন সুষ্ঠ হিসাব পাওয়া যায়নি। মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল, তাদের নেতৃবর্গ এবং কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যা দেখেছিলাম তার কিছুটা বিবরণ দেয়া উচিত।

মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশ থেকে আসামে পালিয়ে আসার পর থেকেই ভারতীয় সরকারের প্রটেকটিভ কাষ্টডিতে আটক হয়ে থাকেন। মজলুম নেতাকে নিয়ে

বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল ভারত সরকার। প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে তিনি যাতে কোন প্রকার নেতৃত্ব দিতে না পারেন তার জন্য অতি সতর্কতার সাথে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারত সরকার এবং আওয়ামী লীগ কখন মাওলানাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। তার সাথে তার দলীয় নেতা ও কর্মীদেরকেও কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করতে দেয়া হয়নি পুরো নয়টি মাস। ভাসানী, ন্যাপের কর্মী ও যুবনেতারা অল্পদিনেই বুঝতে পেরেছিলেন আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার এবং ভারতীয় সরকারের কাছে তারা খুব একটা গ্রহণযোগ্য নন। মাওলানা ভাসানী এবং প্রগতিশীল যুব নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ নেতাদের দলীয় সরকারের পরিবর্তে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের আবেদন জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাদের সে আবেদনে আওয়ামী লীগ কিংবা ভারতীয় সরকার কেউই সাড়া দেয়নি বরং আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রয়োজনমত মাওলানাকে ব্যবহার করার চেষ্টাই করেছে। কিন্তু মাওলানা ভাসানী সে ফাঁদে পা দেননি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জনাব মশিউর রহমান যাদুমিয়া একবার কোলকাতায় এসেছিলেন। কোলকাতায় তিনি তার দলীয় প্রধান মাওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হন। তবে তিনি তার দলীয় যুব ও ছাত্রনেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে মত বিনিময়কালে তিনি বুঝতে পারেন ভারতের মাটিতে বসে তিনি কিংবা তার দলীয় কর্মীরা স্বাধীনতার যুদ্ধে তেমন বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারবেন না। তারা ভারত সরকারের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্যও পাবেন না, তাই তিনি দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেরূপ নির্দেশ কর্মীদের দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যান। কোলকাতায় অবস্থানকালে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ সর্বক্ষণ তাকে নজরে রাখে। আওয়ামী সরকারও তার আগমনকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তার চলে যাবার পর মেনন, জাফর, রনোরা সম্মিলিতভাবে স্বীয় উদ্যোগে তাদের কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। বামপন্থী দলগুলোর বেশিরভাগ নেতারা বিশেষ করে চীনপন্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হন। তারা এ সংগ্রামকে 'কুকুরে কুকুরে লড়াই' বলে ভুলভাবে আক্ষায়িত করে জাতীয় সংগ্রামকে উপেক্ষা করে শ্রেণী সংগ্রামের লাইন চলিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নেতা তাদের ভুল বুঝতে পেরে পরবর্তিকালে স্বাধীনতার জন্য পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার ভুল মূল্যায়নের জন্য প্রগতিশীল এবং বামপন্থীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন। তাদের এই দুর্বলতা এবং ভুল পরবর্তিকালে অনেকেই স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আজো অনেক পিছিয়ে আছে। তার জন্য আমাদের প্রগতিশীল ও বামপন্থী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা অনেকাংশে দায়ী। ভারতের মস্কোপন্থীরা যেভাবে ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে আসছিল ঠিক

সেভাবেই বাংলাদেশের তথাকথিত মস্কোপন্থীরা সংগ্রামের সময় পুরোপুরিভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের লেজুড়বৃত্তি করেছিল। প্রভুদের ইঙ্গিতে তাদের নিয়ে বিশ্ববাসীকে দেখাবার জন্য তথাকথিত পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ৮ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করেছিল প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার। প্রবাসী সরকার মুক্তিযুদ্ধের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের জন্য মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু মিটিং এবং আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এবং মুজিবনগরে অবস্থিত আমলাদের নিতে হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা মুক্ত এলাকায় এমএনএ, এমপিএ এবং কোলকাতাবাসী আমলাদের অধিকাংশই যেতে রাজি হননি। ফলে তাদের সব দায়িত্বই বহন করতে হয়েছিল সেক্টর এবং সাব-সেক্টর কমান্ডারদের। মাঝেমধ্যে কোলকাতার মুজিবনগর থেকে নামি-দামী নেতারা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেন মুক্তিযোদ্ধাদের মটিভেশন লেকচার দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ ধরণের মিশনে এসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ভীষণ বেকায়দায় পড়তে হত। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেস করতে পারতেন না তারা। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বলতেন, "গালভরা কথার ফুলঝুড়ি শোনানোর দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা যুদ্ধ করছি জানবাজী রেখে। আমাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদপত্রের কি ব্যবস্থা করে এসেছেন সেটাই আমরা জানতে চাই। আমাদের সমস্যার অন্তঃ নেই। সমস্যার সমাধান যদি করতে না পারেন তবে অন্ততঃপক্ষে আমাদের সাথে থেকে সে সমস্ত সমস্যার ভাগীদার তো হতে পারেন। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে শুধু ছবি তোলার জন্য আর বক্তৃতা দেয়ার জন্য এসে আমাদের সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারাও এ বৃথা কষ্ট না করে মুজিবনগরে বসে থাকুন। দেশ স্বাধীন হলে দেখা হবে।"

মুক্তিযোদ্ধাদের এ ধরণের বক্তব্য শুনে মুজিবনগরের আওয়ামী সরকার এবং ভারত সরকার একইভাবে শংকিত হয়ে উঠে। মুক্তিযোদ্ধা ও কমান্ডারদের আনুগত্য সর্ম্পকে সন্দিহান হয়ে উঠে তারা।

দশম অধ্যায়

দ্বিতীয়বার আহত হলাম এবং স্মরণীয় বিয়ে

- লাঠিটিলা অপারেশনে দ্বিতীয়বারের মত গুরুতর আহত হলাম।
- আহত অবস্থায় বিবিসিকে দেয়া আমার সাক্ষাৎকার।
- অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিকিৎসার জন্য আসতে হল কোলকাতায়।
- থিয়েটার রোডে বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।
- স্মরণীয় বিয়ে।

যুদ্ধ এগিয়ে চলল। জুলাই মাসের শেষার্ধে লাঠিটিলার যুদ্ধে আমি দ্বিতীয়বারের মত আহত হই মর্টারের গোলা ও মেশিনগানের গুলিতে। চিকিৎসার জন্য আমাকে শীলচরের মাসিমপুর সিএমএইচ এ নিয়ে যাওয়া হয়। আহত অবস্থাতেও আমাকে হাসপাতাল কক্ষ থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। আমার ঘরটাতেই স্থাপন করি ছোট খাট একটি op's room। এ ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন ব্রিগেডিয়ার ভট্‌কে, কর্নেল বাগচী, মেজর দাস গুপ্ত ও ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী। আমি যখন আহত অবস্থায় হাসপাতালে তখন বিবিসি লন্ডন থেকে সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধি দল এলেন আমাদের সিলেট সেক্টরে। তারা আমার সাথে আলাপ করতে চান। আমার আপত্তি নেই জেনে তারা এলেন আমার হাসপাতালের রুমে। ঘরে আমি তখন শয্যাশায়ী। পরিচয়পর্ব শেষে তাদের একজন চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে বললেন,

–এতো দেখছি একটা ছোটখাটো op's room. অসুস্থ অবস্থায় এ সমস্ত ম্যাপ, ওয়্যারলেস সেট প্রভৃতি নিয়ে আপনি কি করেন?

–আমি আহত হয়ে কিছুদিনের জন্য এখানে শয্যাশায়ী হয়ে আছি বলে যুদ্ধতো বন্ধ হয়ে যায়নি। যুদ্ধ চলছে এবং চলবে। সেক্ষেত্রে সাধ্যমত যতটুকু সম্ভব দায়িত্ব বিছানায় শুয়েও আমি পালন করে যাবার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন করলেন আর একজন,

–শুনেছি আপনি আরো দু'জন অফিসারের সাথে পাকিস্তান থেকে সর্বপ্রথম পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগদান করেছেন। আপনার আপন-পরিজনদের সবাইতো বাংলাদেশে রয়েছেন। তাদের উপর পাক বাহিনীর তরফ থেকে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা হতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

–আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম। এ সংগ্রামে অবদান রাখার পবিত্র দায়িত্ব পালন করার জন্যই আমরা পালিয়ে এসেছি। আজ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকেই সদস্যরা এসে যোগদান করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। দেশকে শত্রুর কবল থেকে স্বাধীন করার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন তারা। তাদের এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরিবার-পরিজনদের ভাগ্যে যা ঘটবে আমার আত্মীয়-স্বজনদের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটবে। অতএব, এ নিয়ে আমার চিন্তা করার কিছু নেই। আপনজনদের শত্রুর পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে দেশকে স্বাধীন করতে হবে । তাইতো আমরা মরণপন যুদ্ধ করে যাচ্ছি দেশকে শত্রুমুক্ত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আজাদী লাভ করার লক্ষ্যে। স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ নেই। দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বোই ইনশাল্লাহ্‌।

আমার জবাব শুনে তাদের একজন মন্তব্য করেছিলেন,

–আপনাদের মত সন্তান যে দেশ জন্ম দিয়েছে তার স্বাধীনতা পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারবে না।

ভদ্রলোকের কথাগুলো আজও মনে আশার আলো যোগায়, ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠি। ১২ কোটি জাগ্রত বাংলাদেশী দাসত্বের সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে চুর্নবিচুর্ন করে দেবে নিশ্চয়ই। স্বাধীন মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে সব চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে মাথা উঁচু করে দাড়াবেই একদিন। আমার সাথে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারটি পরে বিবিসি থেকে প্রচারিত হয়েছিল। এ প্রচারণা থেকেই আমার আত্মীয়-স্বজনরা সর্বপ্রথম জানতে পারেন, আমি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।

বেশ কিছুদিন যাবত কোলকাতার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। আমার আহত হওয়ার খবরটা নিম্মীকে জানাইনি ইচ্ছে করেই। বেচারী অযথা চিন্তিত হয়ে পড়বে খবরটা শুনে। কিন্তু আমি না জানালেও থিয়েটার রোড থেকে খবরটা অতি সহজেই ওর কানে পৌঁছাতে পারে। শুয়ে শুয়ে এ সমস্তই ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ আগে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বাবু ও আতিক এসেছিল। ওদের সাথে অপারেশনাল এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কিছু বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর তারা ইনস্ট্রাকশনস্ নিয়ে ফিরে গেছে। একান্ত অবসর খুব কমই পাওয়া যায়। কেউ না কেউ আসছেই। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সমস্যা। বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই আমার সময় কেটে যায়। ডাক্তার-নার্সরা অনেক সময় লোকজনদের আসা-যাওয়ার ভীড় দেখে আমাকে এসে উপদেশ দেন বিশ্রাম নেবার জন্য। হাসিমুখে তাদের আন্তরিকতার প্রতিদান দেয়া ছাড়া আমার পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব হয় না। মিসেস ভট্কে প্রতিদিন খাবার পাঠাচ্ছেন হাসপাতালে। তার স্নেহের ঋনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে সারাজীবন। হঠাৎ একাকীত্ব যেন আমায় পেয়ে বসল। মনটাও কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। নিম্মীকেই বিশেষ করে মনে পড়ছিল। স্মৃতিমধুর অতীত মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল। কিছুক্ষণের জন্য তলিয়ে গিয়েছিলাম অতীত স্মৃতিমন্থনে। হঠাৎ দেখলাম দরজায় তিনজন এসে দাড়িয়েছে। মাহবুব ও ফারুক দু'জনেই আমার প্রিয় গেরিলা কমান্ডার। কিন্তু তাদের সাথে তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখে চমকে উঠলাম! নিজের চোখকেই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না! কাছে আসতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সব। বাপ্পিই বটে!

–একি! তুই এখানে? আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম।

–থাক থাক উঠতে হবে না। বলে বাপ্পি এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। উষ্ণ আবেগে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে। ইতিমধ্যে মাহবুব বাপ্পিকে শয্যার পাশে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বসতে বলল।

–কিরে বাপ্পি! তুই এখানে এলি কি করে? পথ চিনলি কি করে? জানলিই বা কি করে আমি এখানে আছি?

–আগে বল আহত হবার কথা তুই আমাদের কেন জানাসনি? পাল্টা প্রশ্ন বাপ্পির।

–কেন জানাইনি সেটা সত্যিই কি বুঝতে পারছিস না?

–আমরা উদ্বিগ্ন হতাম ঠিকই বিশেষ করে নিম্মী। কিন্তু তবুও খবরটা তোর জানানো উচিত ছিল। তার যুক্তি মেনে নিলাম। ঝগড়া করে লাভ নেই, আমার ভুল হয়েছে মেনে নিলাম।

–কিন্তু তুই হঠাৎ করে এখানে কেন?

–তোর আহত হবার খবর নূর ভাই এবং সালাহ্উদ্দিন ভাই নিজেরা বাসায় এসে আমাদের জানান। খবরটা জানিয়ে ওরা অবশ্য নিম্মীকে বোঝাতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি যে তুই ভালোই আছিস। ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু তাদের সে সান্ত্বনা বাণী নিম্মী পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিল না কোন মতেই। তার একই সন্দেহ ওঁরা তার কাছে আসল অবস্থা লুকোচ্ছেন। নিম্মীর সে কি কান্না! সাথে সাথে খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিল। ওর অবস্থা দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। ওকে বললাম, 'ঠিক আছে আমি নিজেই যাচ্ছি শীলচরে ডালিমের অবস্থা দেখে আসতে।' কিন্তু বাধ সাধলেন বাবা-মা। তারা বললেন, 'ক্যানাডা যাবার সবকিছুই ঠিক হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শীলচর যাবার প্রশ্নই উঠে না।'

–ওহ! তুই আর নিম্মী ক্যানাডা যাচ্ছিস বুঝি? কিছুটা অবাক হলাম আমি।

–হ্যাঁ। আমাদের দু'জনের মতের বিরুদ্ধেই বাবা আমাদের গামু কাক্কুর কাছে পাঠাবার সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। মা দিব্যি দিয়েছেন আমরা না গেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। এ অবস্থায় আমাদের কি আর করার আছে বল? কিন্তু নিম্মী কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছে না। এর জন্য ওর উপর বাবা-মা ভীষণ খ্যাপা। মারধরও তাকে খেতে হচ্ছে বেধুম। ওর এক কথা, তোকে এ অবস্থায় রেখে সে কোলকাতার বাইরে এক পাও নড়বে না। প্রয়োজনে সেও আত্মহত্যাই করবে তবুও ক্যানাডা যাবে না কিছুতেই। এ বিষয় নিয়ে বাড়িতে এখন অশান্তির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সর্বদিক সামলাতে পারছি না কিছুতেই। বিশেষ করে নিম্মীর যে অবস্থা, কোন একটা অঘটন ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। অবস্থা দেখে আমিও বাবাকে মুখের উপর বলে ফেললাম, 'ডালিমকে না দেখে ক্যানাডায় আমিও যাব না।' আমার দৃঢ়তায় অবশেষে বাবা-মা রাজি হলেন আমাকে আসতে দিতে। আমার আসার অনুমতি পাওয়াতে নিম্মী বেচারীও কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। ওকে কথা দিয়ে এসেছি তোর যথাযথ ব্যবস্থা করেই আমি ফিরব। প্রয়োজন হলে কোলকাতায়ও নিয়ে যাব তোকে। তারপর ট্রেনে করে

শীলচর। শীলচর ষ্টেশনে নেমে মুক্তিযোদ্ধাদের সদর দফতর খুঁজে পেতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি আমার। ওখান থেকে মাহবুব ও ফারুককে সঙ্গে দিয়ে দেয়া হল। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল এখানে। মজার কথা কি জানিস! শীলচর পৌঁছে সবচেয়ে অবাক হয়ে গেয়েছিলাম এটা দেখে যে বাপ্পি নামটার মাধ্যমে আমি এখানে বহুলভাবে পরিচিত।

–হ্যাঁ। মাহবুব, ফারুক দু'জনেই আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। ওরা ছাড়াও আরও অনেকেই তোদের ব্যাপারে সবকিছুই জানে। কথার ফাঁকে নার্স চা-নাস্তা রেখে গিয়েছিল। বাপ্পিকে বললাম,

–আমার বা দিকের এত বড় ব্যান্ডেজ দেখে ঘাবড়াসনে। ব্যান্ডেজের তুলনায় ক্ষত অনেক ছোট। কাধে মাত্র তিনটি এলএমজি বুলেট আর তালুতে মর্টার শেলের স্প্রিন্টার লেগেছে এই যা। ডাক্তাররা বলেছেন, নন ষ্টপ ব্লিডিং এর মধ্যেও ৯০ মাইল গাড়িতে করে হাসপাতালে জীবিত অবস্থায় যখন পৌঁছতে পেরিছি তখন এ যাত্রায় মরার ফাঁরা কেটে গেছে। এখনতো বহাল তবিয়তেই রয়েছি। দেখতে পাচ্ছিস না কেমন op's room সাজিয়ে বসেছি? কোন অসুবিধে নেই।

বাপ্পির ছলছল চোখ দেখে অনেকটা বাধ্য হয়েই ওকে আশ্বস্ত করার জন্য কথাগুলো বলতে হল আমার। আমার কথায় বাপ্পির উদ্বিগ্নতা কতটুকু কএল ঠিক বুঝতে পারলাম না। অল্পক্ষণ সে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল,

–এখানে হাসপাতালে তোর পড়ে থাকা চলবে না। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তোকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

–ঠিক বলেছেন বাপ্পি ভাই। ডাক্তাররাও তাই বলছেন। কোলকাতায় গিয়ে স্পেশালিষ্ট এর আন্ডারে চিকিৎসা করানো উচিত বলে তারাও মনে করছেন। কিন্তু হক ভাই কিছুতেই সেক্টর ছেড়ে যেতে রাজি নন। তিনি চলে গেলে আমাদের এখানে অনেক অসুবিধা হবে এটা ঠিক। কিন্তু কোলকাতায় গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করিয়ে সম্পুর্ন সুস্থ্য হয়ে তিনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন সেটাই আমরা সবাই চাই। তিনি সম্পুর্ন সুস্থ্য হয়ে ফিরে এলে তার সাময়িক অনুপস্থিতির ঘাটতি অনায়াসে পুষিয়ে নিতে পারব সুদে-আসলে। মাহবুব বাপ্পির কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল।

–হক ভাইকে যে করেই হোক আপনাকে কোলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে। এখানে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তার অবস্থার চরম অবনতিও ঘটতে পারে। এর জন্য কিছু সময়ের জন্য তাকে কোলকাতায় অবশ্যই যেতে হবে। ফারুকও তার যুক্তিকে সমর্থন জানিয়ে বলল।

বাপ্পির জেদ ও সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের যুক্তির কাছে আমার কোন কথাই টিকল না। সবার কাছে বিদায় নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বাপ্পি আমাকে নিয়ে কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হল। বাই রোড আমরা গৌহাটি এলাম। সঙ্গে এল আমার প্রিয় গেরিলা কমান্ডাররা। গৌহাটি থেকে প্লেনে কোলকাতায়। সবাইকে ছেড়ে আসতে ভীষণ খারাপ লাগছিল। ওরা সবাই অশ্রুসিক্ত আবেগে বিদায় দিয়েছিল আমাদের। কথা দিয়েছিলাম, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা সেরে ফিরে আসব।"

কোলকাতায় ফিরে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন তখন হেডকোয়াটার্সে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছে। ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম শিশু স্বাস্থ্যগত কারণে সেক্টর থেকে হেডকোয়াটার্সে ষ্টাফ অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি নাকি সেক্টরে অসম্ভবভাবে স্নায়ু দুর্বলতা এবং মানসিক রোগে ভুগছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা কিছুতেই নাকি তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মেজর মঈনুল ইসলামকে যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতা ও ভুল নেতৃত্বের জন্য কমান্ড থেকে অব্যাহতি দিয়ে হেডকোয়াটার্সে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তিনি কিছুদিন যাবত হেডকোয়াটার্সেই অবস্থান করছেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে কোলকাতায় বেশকিছু পরিবারের সাথে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে মিত্রী মাসী, ডঃ গনী এবং তার পরিবার, অরূপ দা ও পারুমিতা বৌদি, জনাব আইয়ুব ও তার স্ত্রী গৌরিদী, প্রিতিশ নন্দী ও তার স্ত্রী রীনা, ইন্দু প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অসীম ভালোবাসা ও সহানুভূতি পেয়েছিলাম। তারা সবাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিভিন্নভাবে প্রচুর অবদান রেখেছিলেন। যুদ্ধের বিবরণ ও অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে শুনতে তারা সর্বদাই বিশেষভাবে উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের সবার মধ্যেই ধরা পড়ত প্রকটভাবে। কিন্তু যখনই তাদের বলেছি, "স্বায়ত্ব শাসনের দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে স্বাধীনতার জন্য আমরাতো সংগ্রাম করে যাচ্ছি, কিন্তু পশ্চিম বাংলার আপনারা নিশ্চুপ হয়ে কেন্দ্রিয় শোষণ এবং জাতীয় নির্যাতন সহ্য করছেন কেন? পুরো বাঙ্গালী জাতির মুক্তির জন্য আপনাদের কি কিছুই করার নেই?"

এ ধরণের আলোচনায় সর্বদাই তারা পাশ কাটিয়ে যেতেন অথবা থাকতেন চুপ করে। কখনও যুক্তি দেবার চেষ্টা করতেন বাংলাদেশের সাথে তাদের অবস্থাকে তুলনা করা ঠিক নয়। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যেতেন তারা এ ধরণের বিতর্কে। তাই আমরাও এ সমস্ত ব্যাপারে তেমন বিশেষ উচ্চবাচ্য করতাম না। সময় সময় আমরা এ ধরণের কথাও তাদের বলেছি, "বাংলাদেশের সংগ্রামের ছত্রছায়ায় কংগ্রেস সরকার

সিআরপি এবং বিএসএফ বাহিনীর মাধ্যমে অসংখ্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী যুবক মেরে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার অঞ্চলে।"

এ ধরণের বক্তব্যকে অস্বীকার করতে পারতেন না তারা। কিন্তু সব সত্যকেই কেমন জানি নেতিবাচকভাবে মেনে নিয়ে চুপ করে থাকতেন। তাদের এই চুপ করে থাকার রহস্য আজও মাঝেমধ্যে আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

থিয়েটার রোডেই আমার থাকার ব্যবস্থা হল। তখনকার দিনে প্রখ্যাত বোন স্পেশালিষ্ট ডঃ মুরালী মুখার্জীর সাথে আমার চিকিৎসার ব্যাপারে পারুমিতা বৌদি ইতিমধ্যেই আলাপ করেছেন। আমার ক্ষত পরীক্ষা করে তিনি বললেন, "গান পাউডার এবং বুলেট ইনজ্যুরির ফলে খারাপ ধরণের ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। ইনফেকশনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে গ্যাংরিনে টার্ন নিতে পারে। প্রথমে চেষ্টা করতে হবে ইনফেকশন বন্ধ করার।" ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু কিছুই করার নেই। বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে। তিনি ঔষধ, ইনজেকশন লিখে দিলেন এক সপ্তাহের জন্য। বৌদি আমাকে মনোবল জোগানোর জন্য বললেন, "কোন চিন্তা করবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।" বেশিরভাগ সময় আমাকে শুয়েই থাকতে হয়। বাপ্পির সাথে নিম্মী এসে আমাকে দেখে গেছে। রোজ তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। সুযোগমত ও টেলিফোন করে আমাকে। বাপ্পির মাধ্যমে ভালোমন্দ খাবার পাঠায় প্রায়ই।

একদিন বাপ্পি এল। ভীষণ গম্ভীর ভাব। বুঝলাম বাসায় কিছু একটা ঘটেছে। ঠিক তাই। ক্যানাডা যাওয়া নিয়ে ঝড় বয়ে গেছে বাসায়। কথা কাটাকাটি তারপর বেধম প্রহার। বাপ্পি বলল, "বাসার অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠেছে। এর একটা আশু সমাধান প্রয়োজন। তা না হলে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে নিম্মী। তার মত কোমল প্রকৃতির মেয়েও ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে। ওকে কিছুতেই ক্যানাডায় পাঠাতে পারবে না বাবা-মা। মানসিক চাপে ক্রমান্বয়ে তার শারীরিক অবনতিও ঘটছে। রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়ছে সে। এ অবস্থায় সব চাপ সহ্য করা কতদিন সম্ভব হবে তার পক্ষে?" সব শুনে ভীষণ চিন্তায় পড়লাম। কি করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব? কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। নূর এবং সালাহ্‌উদ্দিনের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম ওদের সাথে। তারা বলল, "সব দিক রক্ষা করার জন্য আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়া দরকার। একমাত্র বিয়ে হলেই নিম্মীর ক্যানাডা যাওয়া বন্ধ হতে পারে। একমাত্র তখনই ওর পক্ষে আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দেয়া সম্ভব।" কিন্তু এ অবস্থায় বিয়ের জন্য তার বাবা-মা রাজি হবেন কি? নূর ও সালাহ্‌উদ্দিন একদিন আমার তরফ থেকে প্রস্তাব নিয়ে গেল নিম্মীদের বাসায়। প্রস্তাবে ওর বাবা-মা রাজি হলেন না। ওদের যুক্তি যেখানে সবকিছুই আজ অনিশ্চিত সেখানে

কি করে তারা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে রাজি হন? হতাশ হয়ে ফিরে এল নূর এবং সালাহ্উদ্দিন। ওদের কোন যুক্তিই তাঁরা গ্রহণ করলেন না। অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে থাকে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পর। নিম্মী আমাকে পরিস্কার লিখে জানাল, "যেভাবেই হোক না কেন তাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তা না হলে সে আত্মহত্যা করবে কিন্তু তবুও ক্যানাডায় আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে সে কিছুতেই যাবে না।" কি অসম্ভব দৃঢ়তা! দুঃশ্চিন্তায় অধীর হয়ে অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম বিয়েই করব। নূর, সালাহউদ্দিন ওরাও আমার সিদ্ধান্তে একমত হল। এ ব্যাপারে গৌরিদী, গনী নানা, মিসেস জামানের সাথে আলাপ করে তাদের পরামর্শ চাইলাম; তারাও অভিমত প্রকাশ করলেন, "বিয়েই একমাত্র পথ।" নিম্মীকে পত্র মারফত জানিয়ে দিলাম, "আমরা কিছু একটা করছি। কিন্তু তাকে সুস্থ এবং স্থির থাকতে হবে।"

বিয়ে তো হবে। কিন্তু নিম্মীকে কি করে ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ থেকে বের করে আনা যায়। বাড়িটা তখন একটি বিশেষ নিরাপত্তাধীন দুর্গই বটে। সমস্ত VIP-V.VIP-রা বাস করছেন সেখানে। তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রায় ৩০-৪০ জন পুলিশ সার্বক্ষণিকভাবে পাহারায় মোতায়েন রয়েছে। তার উপর নিম্মীর উপর রয়েছে কড়া নজর; বাড়ির বাইরে যাওয়া ওর জন্য নিষিদ্ধ। সর্বোপরি সে শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সবাই মিলে তাকে বের করে আনার একটা পরিকল্পনা আঁটা হল। মিসেস জামান, নায়লা, লুবনা ও গৌরিদী যাবেন নিম্মীদের বাসায়। নায়লা, লুবনা নিম্মীর বন্ধু বিধায় মিসেস জামানের সাথেও নিম্মীদের পূর্ব পরিচিতি আছে। নায়লা, লুবনা এবং মিসেস জামান বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল গঠনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে কাজ করছিলেন সেটা তখন প্রায় সর্ব মহলেই জানা। নিম্মী খ্যাতিমান ক্ল্যাসিকাল নৃত্য শিল্পী তাই সেও যাতে দলে যোগদান করে সেই অনুরোধ জানাবার উছিলায় যাবেন তারা। ঠিক হল কথার ফাঁকে নায়লা ও লুবনা নিম্মীকে যে করেই হোক কোনমতে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসবে। বাইরে নূরেরা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে। এরপর গাড়ি করে সোজা মৈত্রী মাসীর বাড়ি। বিয়ে সেখানেই হবে। গনী নানা বিয়ের কাজী, রেজিষ্ট্রার এসব কিছুর দায়িত্ব নিবেন। সালাহ্উদ্দিনকে আনুসাঙ্গিক অন্যসব ব্যবস্থার ভার দেয়া হল। পরিকল্পনার ব্যাপারে অবগত থাকলেন থিয়েটার রোড হেডকোয়ার্টার্সের গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার, ক্যাপ্টেন চৌধুরী। এছাড়া অন্য কাউকে কিছু বলা হল না। বিয়ের দিন ধার্য্য হল ১৬ই আগষ্ট সকাল দশটার দিকে। নায়লারা গিয়ে উপস্থিত হল ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউতে। প্ল্যানমত আলাপের এক ফাঁকে নায়লা এবং লুবনা বসার ঘর থেকে গিয়ে হাজির হল নিম্মীর ঘরে। সেখানে পৌছে নিম্মীকে লায়লা বলল, "এক্ষুণি চলো আমাদের সাথে। আজ তোমার বিয়ে।" প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিল নিম্মী। কিন্তু মুহূর্তেই বুঝে নিল

সবকিছু। অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে এক কাপড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাড়াল নিম্মী। যে কোন কুমারী মেয়ের পক্ষে এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একটি অসম্ভব দুরহ্ কাজ। নিম্মীর ভালোবাসার একনিষ্ঠতা এবং গভীরতাই সেদিন শক্তি যুগিয়েছিল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে। শারীরিক অসুস্থতা এবং স্নায়ু দুর্বলতার জন্যে বেচারী হাটতেও পারছিল না ঠিকমত। নায়লা ও লুবনা ওকে দু'দিক থেকে ধরে প্রায় বহন করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে কোনমতে অতি কষ্টে নামিয়ে নিয়ে এল গেটের বাইরে। সেখান থেকে সোজা মৈত্রী মাসীর বাসায় নূর নিয়ে এল সবাইকে। ওখানে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। সব বন্দোবস্ত প্ল্যানমত ইতিমধ্যে করা হয়েছে। সালাহ্উদ্দিন নিম্মীর জন্য বিশ-পচিঁশ টাকা দামের দু'টো শাড়ি এবং আমার জন্য দশ টাকা দামের একটা পাঞ্জাবী কিনে নিয়ে এসেছে। সেগুলো পড়েই আমাদের বিয়ে হল। সালাহ্উদ্দিন হল নিম্মীর উকিল বাপ। সাক্ষী হয়ে রইলেন গনী নানা, গৌরিদী, নূর এবং মিসেস জামান। বিয়ের পর উপস্থিত মুরুব্বীরা এবং মৈত্রী মাসী আমাদের আশীবাদ করলেন। বিয়ের দলিল রেজিষ্ট্রি করতে দু-তিন দিন সময় লাগবে। এ সময়টা লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের। কারণ নিম্মীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিয়ে করার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তার মোকাবেলা করার জন্য বিয়ের দলিলটা অপরিহার্য। গৌরিদীই ঠিক করে ফেললেন তার পরিচিত এক ধনী ব্যবসায়ীর পার্ক ষ্টিট্রের একটা গেষ্ট হাউস। ছোট্ট কিন্তু সাজানো গেষ্ট হাউস। সেখানেই হবে আমাদের বাসর এবং মধুচন্দ্রিমা। আমাদের গোপন আস্তানার খবর বিয়েতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কাউকে জানানো হবে না। সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের চলে যেতে হল গেষ্ট হাউসে। নায়লা, গৌরিদী, নূর এবং সালাহ্উদ্দিন আমাদের পৌঁছে দিল। রজনীগন্ধা ও বেলী ফুল দিয়ে নায়লা, লুবনারা সুন্দর করে রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে দিয়েছিল আমাদের বাসর ঘর। ওরা চলে যাবার পর হঠাৎ করে আমরা দু'জন ভীষণ একলা হয়ে গেলাম। সারাদিনের ঘটনাবলী এত দ্রুত ঘটেছে যার ফলে চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশই আমরা পাইনি এতক্ষণ। একটা ঘোরের মাঝেই কেটে গেছে পুরো দিনটা। ফ্ল্যাটের নির্জন পরিবেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেঁদে উঠল নিম্মী। অতি স্বাভাবিক কারণেই ভেঙ্গে পড়ল সে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ধৈর্য্য ধরতে হবে। সময় সব সমস্যার সমাধান করে দেবে ইনশাল্লাহ্।" বেচারী ভীষণভাবে কাদঁতে কাদঁতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অতীত ও ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক সময়। পরদিন সকালেই নূর এসে জানাল, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। নিম্মীর বাবা অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেছেন, "আমি তার মেয়েকে জোর করে অপহরণ করে নিয়ে গেছি বাসা থেকে।" প্রধানমন্ত্রী গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সালাহ্উদ্দিনকে ডেকে হুকুম দিয়েছেন যে করেই হোক আমার এবং নিম্মীর খোঁজ করে তাকে বের করতেই

হবে কোথায় আছি আমরা। প্রয়োজনে অপহরণকারী আর্মি অফিসারের কাছ থেকে নিম্মীকে উদ্ধার করার জন্য ভারতীয় পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তাও গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বিয়ের দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে হাতে না আসা পর্যন্ত কিছুই কাউকে বলার উপায় নেই। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন কর্নেল ওসমানীও। ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে অন্যায়ভাবে জোর করে ভদ্রলোকের মেয়েকে যে অপহরণ করতে পারে তার কঠোর সাজা হওয়া উচিত। একই সাথে তিনি ভীষণভাবে দুঃখিতও হয়েছেন। নূরকে বলেছেন, "ডালিমের মত যোগ্য অফিসার কি করে এ ধরণের কাজ করতে পারে সেটা তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না।" নূর আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলল, "স্যার আপনারা ঘরের বাহিরে যাবেন না দলিল হাতে না পাওয়া পর্যন্ত। গনী নানা চেষ্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দলিল রেজিস্ট্রি করার। দলিলটা হয়ে গেলেই সবাইকে বুঝিয়ে ব্যাপারটার আপোষ মীমাংসা করার উদ্যোগ নেয়া হবে।" একবার স্থির করেছিলাম বাপ্পিকে একটা ফোন করে সব কিছু জানিয়ে ওকে বলি আমরা ভালোই আছি। কিন্তু নূরের কথায় সেটা করা সম্ভব হল না। ১৯ তারিখে আমাদের হাতে দলিল পৌঁছে গেল। সেদিনই সমস্ত ব্যাপারটা সালাহউদ্দিন, নূর এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার কর্নেল ওসমানী এবং তাজুদ্দিনকে বুঝিয়ে বললেন। সমস্ত কিছু বিস্তারিত জানবার পর জনাব তাজুদ্দিনকে সবাই অনুরোধ জানালেন ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে দেবার জন্য। জনাব তাজুদ্দিন সেদিনই নিম্মীর বাবাকে এবং আমাদের ডেকে পাঠালেন থিয়েটার রোডে। নিম্মীর বাবার পৌঁছার আগেই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। জনাব ওসমানী এবং জনাব তাজুদ্দিনকে সালাম করলাম দু'জনে, তারা আর্শীবাদ করলেন। জনাব তাজুদ্দিন বললেন যা হবার তা হয়ে গেছে। জনাব চৌধুরীকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি এলে তার কাছে মাফ চাইতে হবে আমাদের দু'জনকেই। এতেই কাজ হবে। কারণ জনাব চৌধুরী শক্ত অফিসার হলেও মনটা তার শিশুর মতই সরল এবং কোমল। অল্পক্ষণ পর জনাব চৌধুরী ও বাপ্পি এসে পৌঁছালো। নূর তাদের অর্ভ্যথনা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে এল। সেখানে কর্নেল ওসমানীও উপস্থিত ছিলেন। আমাদেরকেও হাজির করানো হল আসামীর মত। ঘরে ঢুকতেই জনাব তাজুদ্দিন গর্জে উঠলেন, "কি করেছ তোমরা? এত বড় দুঃসাহস হল কি করে? আমি মর্মাহত হয়েছি তোমাদের ছেলেমানুষী কার্যকলাপে। বিয়ে-শাদী বাচ্চাদের পুতুল খেলা নয়। মুরুব্বীদের আশীবাদ ছাড়া কেউ কোনদিন সুখী হতে পারে না। জলদি তোমরা বাবার কাছে মাফ চাও।" এরপর নিম্মীর বাবাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "চৌধুরী সাহেব ওরা আপনারই সন্তান। ভুল করে ফেলেছে না বুঝে। ওদের আপনি ক্ষমা করে আশীবাদ করুন।" প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হতেই আমরা বাবার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। নিম্মী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ওতেই মোক্ষম কাজ হল। মোমের মত গলে গেলেন চাচা মানে নিম্মীর বাবা। নিম্মীকে জড়িয়ে ধরে তিনিও কাঁদতে লাগলেন। আমাকেও টেনে তুলে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। নূর,

সালাহ্উদ্দিন ওরা সব তৈরিই ছিল। মিষ্টির প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল ব্যায়ারা। এক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হল থিয়েটার রোডে। চাচার কাছ থেকে জানতে পারলাম খালাম্মা মানে নিম্মীর মা ভীষণভাবে আঘাত পেয়েছেন নিম্মীর বাড়ি ছেড়ে চলে এসে বিয়ে করায়। তিনি ভীষণ জেদি এবং তীব্র অভিমানী। তার রাগ না কমলে বাড়িতে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। এতে হিতে বিপরীত হবারই সম্ভাবনা। ঠিক হল আরো কিছুদিন আমাদের গেষ্ট হাউজেই থাকতে হবে। বাপ্পিকে সমস্ত ঘটনা থেকে বাদ রাখা হয়েছিল বলে সে ভীষণভাবে অভিমান করেছিল আমাদের উপর। অতি কষ্টে তার মান ভাঙ্গাতে হয়েছিল আমাদের দু'জনকে। বাবা চলে যাবার পর জনাব তাজুদ্দিন বলেছিলেন, "দু'জনে দু'জনকে পছন্দ করে দুঃসাহসিকভাবে বিয়ে করেছ; এখন থেকে তোমরা দু'জনেই হবে দু'জনের অবলম্বন। দুঃখ কর না সময়মতো সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বিয়েও হয়েছিল ঠিক তোমাদের মত করেই সবার অমতে। আমি আশীর্বাদ করছি তোমরা চিরসুখী হও।" তাকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে আসতেই নূর, সালাহউদ্দিনরা সব আমাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় পুরো থিয়েটার রোড মাতিয়ে তুলল। কর্নেল ওসমানীও এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে। সবাই সেদিন একসাথে রাতের খাওয়া খেলাম। বিশেষ খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেদিন। বিদেশের মাটিতে জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপর্ণ সন্ধিক্ষণে সেদিন জনাব তাজুদ্দিন, কর্নেল ওসমানী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার, ক্যাপ্টেন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন, লেফটেন্যান্ট নূর, মৈত্রী মাসী, গৌরিদী, গনী নানা, মিসেস জামান, নায়লা, লুবনা, জনাব আইয়ুব, প্রীতিশ নন্দী, রীণা, ইন্দু, ডঃ মুখার্জী, অরূপদা এবং ওদের মত অন্য সবার কাছ থেকে যে উষ্ণ আন্তরিকতা এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং সহযোগিতা পেয়েছিলাম সেটা জীবনে কখনোই ভোলা যাবে না। আমরা দু'জনেই তাদের কাছে চিরঋনী হয়ে থাকব সারাজীবন।

এ ক'দিনের টেনশনে ঠিকমত ঔষধপত্র খাওয়া হয়নি ফলে চিকিৎসা বিঘ্নিত হয়েছে। তার পরিণামে হাতের ব্যাথা হঠাৎ করে বেড়ে গেল। ব্যান্ডেজের নিচ থেকে পচাঁ দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল। তাড়াতাড়ি ডঃ মুখার্জীর ওখানে আমাকে আবার নিয়ে যাওয়া হল। ব্যান্ডেজ খুলে হাতের ক্ষতের অবস্থা দেখে তার মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি বললেন, "ঠিকমত চিকিৎসা না হওয়ায় এবং ঔষধপত্র না খাওয়ায় হাতে গ্যাংরিন শুরু হয়েছে। এ পচঁনকে রোধ করতে হলে অবিলম্বে অপারেশন করতে হবে। তা না হলে পুরো হাতটাকেই কেটে ফেলতে হতে পারে।" ডাক্তারের কথা শুনে সবাই ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন। আমিও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত। আমি হাসপাতালে ভর্তি হলে নিম্মী একা একা ফ্ল্যাটে কি করে থাকবে! আবার সাহায্যের মুক্ত হাত বাড়িয়ে দিলেন ডঃ গনী, "নিম্মী আমার মেয়ে। ও আমার বাসায় থাকবে। তুমি এ নিয়ে চিন্তা কর না। আজই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাও।" গনী নানার কথায় কিছুটা

আশ্বস্ত হলাম। পারুমিতা বৌদি আমার ভর্তির সব ব্যবস্থা করে দিলেন পিজি হাসপাতালে। আমার অপারেশন করলেন ডঃ মুখার্জী। গ্যাংরিন রোধ করার জন্য বা হাতের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু অংশ কেটে ফেলে দিতে হয়েছে তবু আল্লাহ্‌র রহমতে বা হাতটা বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। ডঃ মুখার্জী অপারেশন শেষে মন্তব্য করেছিলেন আর কয়েকটা দিন দেরি হলে পুরো বা হাতটাই কেটে ফেলতে হত। পরিবারের সবচেয়ে আদরের নিম্মীকে দেখে কষ্ট হয়। আমি বুঝতে পারি ভেতরে ভেতরে তার অন্তরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর, একান্ত আপনজন সবাই থাকতেও আজ ও ভীষণ একা। একটু আশ্রয়ের জন্য আজ তাকে এখানে-ওখানে থাকতে হচ্ছে রিফিউজির মত। তার উপর আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে ও বিশেষভাবে চিন্তিত। বাপ্পির কাছ থেকে জানতে পারলাম আমাদের চিন্তায় চাচা ভেঙ্গে পড়েছেন: তিনি আমাদের এই মুহূর্তেই বাসায় নিয়ে যেতে চান কিন্তু খালাম্মার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে তার কাছে কথাটা কিছুতেই উঠাতে পারছেন না জনাব চৌধুরী। অত্যন্ত স্নেহবৎসল খালাম্মা। তিনি নিম্মীর উপর যে অভিমান করেছেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ নিম্মী তার খুব আদরের আর সেই নিম্মীই এ ধরণের একটা কাজ করে বসবে সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না খালাম্মা। তার বিশ্বাসের অবমাননা করেছে নিম্মী এটাই তার ক্ষোভের প্রধান কারণ। সবকিছু মিলিয়ে বাসায় একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর সবটুকু চাপ পড়ছে নিম্মীর মনের উপর। বেচারী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত: কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই পাছে আমি মনে কষ্ট পাই এ কারণে। শুধু আমার জন্যই বেচারী জান আমার মুখ বুজে সবকিছুই মেনে নিয়ে স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওর ত্যাগ, সহনশীলতা এবং ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম, ওর এই অসহায় অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। অত্যন্ত স্বার্থপর মনে হচ্ছিল নিজেকে। মনেমনে ঠিক করলাম যেভাবেই হোক না কেন তাকে এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার আমাকেই করতে হবে। সপ্তাহখানেক হাসপাতালে থাকতে হল। হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর একদিন নিম্মীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলাম নিম্মীদের বাসায়। চাচা, বাপ্পি, মানু আমাদের আনন্দে জড়িয়ে ধরল। আমি বাপ্পিকে জিজ্ঞেস করলাম, "খালাম্মা কোথায়?" বাপ্পি জানাল আজকাল তিনি বেশিরভাগ সময় তার নিজের ঘরেই কাটান, বের হন না খুব একটা। কারো সাথেই তেমন কোন কথাবার্তা বলেন না প্রয়োজন ছাড়া। সবশুনে আমি সোজা চলে গেলাম তার ঘরে। তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতই চমকে বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে একহাতেই জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ধরে বললাম,

–খালাম্মা আমাদের মাফ করেন। মাফ আপনাকে করতেই হবে। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন,

–আরে পাগল ছেলে কি করছ! হাতে ব্যথা পাবে যে! আমাকে নামাও শিগ্গির।

–আমি আপনাকে নামাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের ক্ষমা না করছেন। দৃঢ়তার সাথেই বললাম আমি। আবেগের উষ্ণতায় জমা বরফ গলে গেল নিমিষে। মাতৃস্নেহের আকুলতায় তিনি আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তার চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রুধারা। ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

–নিম্মী কোথায় ? বললাম,

–বসার ঘরে।

–আমাকে নিয়ে চলো। বললেন আমার অতিপ্রিয় খালাম্মা। তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এলাম ড্রইং রুমে। আমাদের দেখে সবাই অবাক। কি করে অসম্ভবকে সম্ভব করলাম সেটাই সবার চোখে প্রশ্ন হয়ে ফুটে উঠেছিল। নিম্মী প্রায় পাগলের মত দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। আদরের নিম্মীকে বুকে ধরে আবেগের আতিশয্যে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না খালাম্মা। সব বাধ ভেঙ্গে গেল। মান-অভিমান-রাগ সব ভেসে গেল অশ্রুর বন্যায়। দু'জনেরই সেকি কান্না! আমরা সব নিশ্চুপ দাড়িয়ে থেকে মা ও মেয়ের অভূতপূর্ব মিলন দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। সেদিনই গনী নানার বাড়ি থেকে চলে আসতে হল আমাদের। খালাম্মার সেবা-শুশ্রূষায় দ্রুত ভাল হয়ে উঠতে লাগলাম।

একাদশ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব এবং ভারত সরকারের স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট

- খন্দোকার মোশতাকের জাতিসংঘের উদ্দেশ্যে আমেরিকা সফর স্থগিত করে দেয়া হয় এবং তিনি ও মাহবুব আলম চাষী পদচ্যুত হন।
- আবদুস সামাদ আজাদকে বানানো হয় নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
- রিলিফ সামগ্রী নিয়েও কেলেংকারী।
- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিদেশ সফর।
- মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গী।
- সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের 'নিরাপত্তা এবং বন্ধুত্ব' চুক্তি স্বাক্ষর।
- অনেক হিসাব-নিকাশের পর ২৫ বছরের গোলামীর চুক্তির বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দিল ভারত সরকার।
- গোলামী চুক্তির বিরোধিতা করে চুক্তিতে সই করলেন না মাত্র দু'জন, কর্নেল ওসমানী এবং খন্দোকার মোশতাক আহমেদ।
- আবার রনাঙ্গনে।
- বিএলএফ এর সাথে বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ।
- মুক্তিযুদ্ধকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নেবার প্রয়োজনে জাতীয় সরকার গঠন করতে রাজি হল না প্রবাসী ও ভারত সরকার।
- কমান্ডার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনুপ্রবেশের সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল 'র।
- অপ্রত্যাশিতভাবে ছোট ভাই স্বপন ও বাল্যবন্ধু কাজির খবর পেলাম।
- ওরা ঢাকা শহরে খানসেনাদের বুকে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।
- নভেম্বর মাসে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।
- স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণচীন।

ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিতে চাচ্ছেন আওয়ামী লীগের অনেক সদস্যই। তারা বাংলাদেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে দোদুল্যমনতায় ভুগছেন। অনেকেই আবার ভারতীয় নীল নকশার কথা আচঁ করতে পেরে শংকিত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তাদের ফিরে যাবার পথে মূল বাধা হয়ে দাড়িয়েছে ইন্দিরা সরকার। ভারত সরকার কিছুতেই চাচ্ছে না বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার ইয়াহিয়া সরকারের সাথে কোনরূপ রাজনৈতিক আপোষের চেষ্টা করুক। তাদের চাপের মুখে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে জনাব তাজুদ্দিন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে বাধ্য হন, "ইয়াহিয়া সরকারের সাধারণ ক্ষমা প্রবাসী সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।" মুক্তিযোদ্ধারাও সংগ্রামের এই পর্যায়ে কোনরকম আপোষের বিরোধিতা করছিলেন। তারা চাইছিলেন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে। এভাবেই সার্বিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক আহমদ আমেরিকা যাচ্ছেন লন্ডন হয়ে এক সফরে। বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে জাতিসংঘ প্রধান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর রাষ্ট্রনায়কদের সাথে তিনি মত বিনিময় করে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করবেন তিনি এ সফরকালে। অতএব তার এই সফর হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাবার সব প্রস্তুতিই প্রায় শেষ। কামাল সিদ্দিকীও যাচ্ছে সফরসঙ্গী হয়ে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আকস্মিকভাবেই সফর স্থগিত করে দেয় প্রবাসী সরকার। শুধু তাই নয়, মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয় এবং তার স্থলে আবদুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বানানো হয়। জনাব মাহবুব আলম চাষীকেও সরিয়ে দেয়া হয় পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব থেকে। এই ধরণের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে সবকিছুই চেপে যায় তাজুদ্দিন সরকার। কিন্তু পরে সব গোপনীয়তাই ফাঁস হয়ে যায়।

জানা যায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নাকি জানতে পারে যে, জনাব মোশতাক আহমদ গোপনে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। তার লন্ডন সফরের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন সরকারের মধ্যস্থতায় শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়া সরকারের সাথে একটা চুড়ান্ত ফায়সালা করে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছা। এই চক্রান্তের খবর পেয়েই জনাব তাজুদ্দিন ভারত সরকারের নির্দেশেই ঐ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। আরো তথ্য জানা যায়– খন্দোকার মোশতাক আহমদ, ইয়াহিয়া সরকার এবং মার্কিন সরকারের ত্রি-পাক্ষিক ঐ সমঝোতা-আলোচনার প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের সমর্থন ছিল। এ ঘটনার পর আওয়ামী লীগের অন্তঃদ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। ভারত সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং বাংলাদেশ সমস্যার একটা আশু সমাধানের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। মুক্তি সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলে অবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে সেটাই ছিল তাদের

মূল আশংকা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনাব তাজুদ্দিন প্রবাসী সরকারের তরফ থেকে ভারত সরকারকে বোঝালেন– দু'পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনতিবিলম্বে ভারতীয় সামরিক অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ফেলতে হবে। ভারত সরকার তাজুদ্দিন সরকারের আবেদনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও হঠাৎ করে তখনি এককভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হল না। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঠিক করলেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে পরাশক্তিধর দেশগুলোর মনোভাব জানার পরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে এক ঝটিকা সফরে বেরিয়ে পড়লেন। সবখানেই তিনি নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ সমস্যা এবং ভারতের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করলেন। বর্বর শ্বেতসন্ত্রাসের ফলে আগত শরণার্থীদের মানবিক কারণে ভারতের মাটিতে আশ্রয় দেয়ার জন্য নেতারা ভারত সরকারের প্রশংসা করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতারা বাংলাদেশ সমস্যাকে পাকিস্তানের একটি আভ্যন্তরীন সমস্যা হিসাবেই আখ্যায়িত করেন এবং পরিষ্কারভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়ে দেন– এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরিভাবে ভারতীয় যেকোন সামরিক পদক্ষেপ তাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে। শরণার্থীদের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং ভারতের উপর যে অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে সেটা কমানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক এবং সামগ্রিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সব নেতারাই।

রিলিফের সামগ্রী নিয়েও পরে ঘটেছে অনেক কেলেংকারী। বিপুল পরিমাণের রিলিফ-সামগ্রীর কতটুকু পেয়েছিল শরণার্থীরা তার জবাব একমাত্র দিতে পারে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের কর্ণধাররাই। আমার জানামতে প্রাপ্ত রিলিফ-সামগ্রীর একটা ক্ষুদ্র অংশই ভারত এবং প্রবাসী সরকারের উদ্যোগে বিতরণ করা হয়েছিল শরণার্থীদের মাঝে। রিলিফ-সামগ্রীর সিংহভাগই বেমালুম হজম করে নিয়েছিল ভারত সরকার।

বিদেশ সফর থেকে শ্রীমতি গান্ধী বুঝতে পারেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক অভিযান চালালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো তাকে সমর্থন করবে না। পক্ষান্তরে এশীয় পরাশক্তি গণচীন হয়তো বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যেতে পারে পাকিস্তানের পক্ষে এ ধরণের সংঘাতে। সে ক্ষেত্রে ভারতের একক আগ্রাসন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব প্রস্তাবিত 'নিরাপত্তা এবং বন্ধুত্ব' চুক্তি সই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শ্রীমতি গান্ধী ও তার সরকার। ঐ চুক্তি সাক্ষরের ফলে ভারতীয় জনগণ কতটুকু উপকৃত হয়েছে জানি না তবে পাকিস্তানকে দুর্বল ও দ্বিখন্ডিত করতে এবং সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে বাংলাদেশ কায়েম করে সেখানে একটা পুতুল সরকার স্থাপন করার

ভারতীয় স্বপ্নের বাস্তবায়নে ঐ চুক্তি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল নিঃসন্দেহে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে চুক্তি সাক্ষরের পরপরই বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেয় ভারত সরকার। প্রতিদানে ভারতের সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ২৫বছর মেয়াদের এক চুক্তি সই করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। রহস্যজনক কোন কারণবশতঃ আজ পর্যন্ত সেই চুক্তির বিষয়বস্তু গোপন রাখা হয়েছে দেশের জনগণের কাছ থেকে। মুজিবনগর সরকার এবং আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ সাংসদ ঐ চুক্তিকে সমর্থন করে। বিরোধিতা করেছিলেন মাত্র দু'জন। কর্নেল ওসমানী এবং খন্দোকার মোশতাক আহমদ। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগই এ ধরণের চুক্তির ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সব বিরোধিতা উপেক্ষা করে তাজুদ্দিন সরকার এক অসম চুক্তির নাগপাশে আবদ্ধ করলেন বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে। ভারতের সাথে দীর্ঘ ২৫ বৎসরের এ অসমচুক্তি জাতীয় ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। এ চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ তথা পাক-ভারত যুদ্ধ প্রায় অবধারিত হয়ে ওঠে। মুক্তি বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ বরাবরই মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে আসছিলেন। তাদের প্রত্যাশা ছিল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীন হবে বাংলাদেশ। এতে দু'টো বিশেষ উপকার হত। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে উঠতো নিবেদিত প্রাণ-ত্যাগী-পরিক্ষীত নেতৃত্ব এবং একইভাবে সুযোগ পাওয়া যেত নিখাদ সোনার মত বলিষ্ঠ জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলার। কিন্তু নীল নকশার প্রণয়নকারীরা বাঙ্গালী জাতিকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অতি চতুরতার সাথে। খাল কেটে কুমির আনার সব ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করে ফেললো মুজিবনগর সরকার। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তাদের ভবিষ্যত সংগ্রাম হবে দু'মুখী। একদিকে তাদের যুদ্ধ করতে হবে হানাদার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্যদিকে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে 'মিত্র বাহিনীর' আধিপত্যবাদী চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতা হেফাজত রাখার জন্য। চুক্তি ও স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কোলকাতাভিত্তিক আওয়ামী সরকার ও তাদের দোসররা সবাই দিন গুনতে লাগল কবে ভারতীয় বাহিনী আগ্রাসন চালিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দেবে আর তারা ফিরে গিয়ে রাজত্ব করবে, উপভোগ করবে অসৎ উপায়ে লুটপাট করে অর্জিত ধনসম্পদ। ভারতীয় সরকারের স্বীকৃতি পাবার জন্য শুধু দাসখতই লিখে দেয়া হয়েছিল তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রও প্রণীত হবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মূল চার নীতি (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ) এর উপর ভিত্তি করে: সেই অঙ্গীকারও করেছিল মুজিবনগর সরকার। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন মহলে তখন ভবিষ্যত বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একদিন এক সামাজিক অনুষ্ঠানে সরকারের এক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বললেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের Economic Viability তেমন একটা নেই।" তার এ ধরণের বক্তব্য অবাক করেছিল অনেককেই। প্রশ্ন করা

হয়েছিল, "স্বাধীন বাংলাদেশের Economic Viability যদি নাই থাকবে তবে আপনারা ৬দফা প্রণয়ন করে জনগণকে উসকে দিয়েছিলেন কেন? কেন বলেছিলেন পাকিস্তানের শোষণের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে পারলেই সোনার বাংলা কায়েম হবে ? তাহলে কি আপনাদের এ সমস্ত প্রচারণা ছিল মিথ্যে? জনগণকে ধোকা দিয়ে পাকিস্তানকে শুধুমাত্র দ্বিখন্ডিত করার এক কূটকৌশল মাত্র ?" এ সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের জবাব উক্ত বিশারদ সেদিন দিতে পারেননি। অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় কেটে পড়ে নিজেকে বাঁচিয়েছিলেন বিড়ম্বনার হাত থেকে। ঠিক একইভাবে আরেক দিন এক ঘরোয়া পরিবেশে কিছু বাঙ্গালী জনাব ডিপি ধরকে ভবিষ্যত স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং শিল্পনীতি কি ধরণের হওয়া উচিত জানতে চাইলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "you don't have to think about all these things. you just have to grow rice that's all rest shall be taken care off by us." এ ধরণের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বাংলাদেশকে ভারতের অর্থনীতির বাজার এবং পশ্চাদভূমিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ছিল ভারতীয় আধিপত্যবাদী নীল নকশার অর্ন্তভুক্ত। শুধু কি তাই! বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে তুলে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের উপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার খায়েশটিও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছিল জনাব ধরের বক্তব্যে।

কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠার পর সেপ্টেম্বরে ফিরে গেলাম সেক্টরে। বা হাতে তখনও প্লাষ্টার। যুদ্ধ তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশে। মুক্তিফৌজ এবং গেরিলাদের হাতে প্রচন্ড মার খেয়ে হানাদার বাহিনী দিশেহারা। তাদের মনোবল সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। তীব্র গেরিলা অভিযানে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে খানসেনারা তখন বড়বড় শহরে Defensive Position-এ বাধ্য হয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। শহরগুলো ছাড়া সারা বাংলাদেশ তখন বিশাল এক মুক্তাঙ্গন। গেরিলারা প্রায় পুরো দেশই তাদের অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত করেছেন। তাদের সফল তৎপরতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই সময়সাপেক্ষে একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। মুক্তিফৌজের সাহস, উদ্দম এবং সাংগঠনিক শক্তি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। প্রধান প্রধান শহরগুলো এমনকি ঢাকা শহরেও প্রকাশ্য দিবালোকে অসীম সাহসিকতার সাথে একটার পর একটা সফল অভিযান করে চলেছে বীর মুক্তিযোদ্ধারা। নাস্তানাবুদ বেসামাল খানসেনারা 'মুক্তি'-দের সর্বদা তটস্থ অবস্থায় থাকছে। বিশেষ করে রাতের আঁধার ওদের জন্য হয়ে উঠেছে নাভিশ্বাসের কারণ। জানবাজ মুক্তিযোদ্ধাদের অভূতপূর্ব সাফল্যের খবরগুলো বিদেশী প্রচার মাধ্যগুলোতে শিরোনামে প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন। আমাদের Moral ভীষণ High. ইতিমধ্যে বিএলএফ এর ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যারা দেশের ভিতরে বিভিন্ন Strategic Point-এ অবস্থান নিয়েছে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজের তুলনায়

অনেক উচুঁমানের। এ সত্ত্বেও খান সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংঘাতে তেমন একটা অংশগ্রহণ করছে না তারা। পক্ষান্তরে অনেক জায়গায় জনগণের উপর অন্যায়-জুলুম, চাঁদাবাজী এবং লুটপাট করছিল তারা। সে সমস্ত খবর পাচ্ছিলাম আমরা। তাদের ঐ ধরণের কার্যকলাপে বাধা দেবার কালে অনেক জায়গায় মুক্তিফৌজের যোদ্ধাদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হচ্ছিল। এই সময় হঠাৎ করে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো কাদের সিদ্দিকী নামক এক বিএলএফ সদস্য সম্পর্কে ফলাও করে প্রচারণা শুরু করে এমনভাবে যেন শুধুমাত্র কাদের সিদ্দিকীই মুক্তিযুদ্ধ করছে। এ ধরণের প্রচারণায় আমরা কিছুটা বিস্মিত হলাম। পাকিস্তান আমলে ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই সৈনিক নায়েক কাদের সিদ্দিকীকে Disciplinary Charge এ শাস্তিমূলকভাবে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে তার তেমন কোন বিশেষ ভূমিকার কথাও শোনা যায়নি। সেক্ষেত্রে তাকে নিয়ে এতটা হৈ চৈ কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একইভাবে মাঝে মেজর খালেদ মোশাররফকেও focus এ আনার চেষ্টা চলেছিল কিছুদিন। পক্ষান্তরে মেজর জিয়া তার প্রাপ্য মর্যাদা কখনোই পাননি প্রবাসী ও ভারত সরকারের কাছ থেকে। দুই সরকার তার প্রতি ছিল সন্দিহান এবং বিদ্বেষপ্রবণ। কালুরঘাট থেকে দেশবাসীর প্রতি স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্বাধীনতার যে উদাত্ত আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন তাকে মেনে নিতে পারেনি আওয়ামী সরকার। তার সেই Initiative Appreciate করার মত মানসিক উদারতা নেই তাদের। তার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাকে ঔদ্ধত্যমূলক উচ্চাভিলাষ হিসেবেই মনে করে আসছে তারা। ফলে আজঅব্দি জিয়াউর রহমানের ভাবমুর্তিকে সবসময় ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করে চলেছে আওয়ামী লীগ। এই অবদানকে মেনে নিলে মুক্তিযুদ্ধের সব কৃতিত্বের একক দাবিদার হবে কি করে আওয়ামী লীগ! সেটাই সমস্যা। প্রবাসী সরকারের নতজানু নীতির তীব্র সমালোচনা করে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছিলেন তিনি। জিয়াউর রহমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শুধুমাত্র ইসলামাবাদ থেকে রাজধানী সরিয়ে ঢাকায় এনে দিল্লীর একটি তাবেদার রাষ্ট্র কায়েম করা মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য নয়। নিজেদের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে স্বাধীনতা। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়বে দেশের প্রত্যেকটি পরিবার। ত্যাগ ও তিতিক্ষায় তীক্ষ্ম হবে জাতীয়তাবাদী চেতনা। জনগণের কাছে স্বাধীনতা হয়ে উঠবে অমূল্য ধন। আর সেক্ষেত্রে কোন দামেই বেচা যাবে না স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ভিত মজবুত করার জন্য প্রয়োজন একটি জাতীয় সরকার। নীতি নির্ধারনের প্রক্রিয়ায় মুক্তিফৌজের অংশদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সরকারের অধিনে একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে প্রবাসী সরকারের কাছে উত্থাপন করায় মেজর জিয়ার প্রতি প্রবাসী ও ভারত সরকারের ক্ষোভ আরো কয়েকগুন বেড়ে গিয়েছিল। তার ঐসমস্ত প্রস্তাবের মাঝেও নাকি চক্রান্তের গন্ধ খুঁজে পেয়েছিলেন দুই সরকারের কর্তাব্যক্তিরা। মেজর জিয়াকে অপছন্দ করলেও ঠিক সেই সময়ে দেশপ্রেমিক

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রিয় কমান্ডার মেজর জিয়াকে অপদস্থ করা কিংবা তার বিরুদ্ধে কোনরূপ Action নেয়ার ক্ষমতা অস্থয়ী প্রবাসী সরকারের ছিল না।

হঠাৎ একদিন ধর্মনগর থেকে বন্ধু ক্যাপ্টেন আনাম আমাকে জানাল আমার ছোটভাই স্বপন এবং একান্ত বন্ধু কাজি কামালুদ্দিন মুর্তীর পথে এসে পৌঁছে আমার খোঁজ করছে। তাকে অনুরোধ জানালাম ওদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছল। স্বপনকে এভাবে কাছে পাবো সেটা ভাবতেও পারিনি। ওদের কাছে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলাম। আত্মীয়-পরিজনদের সব খবরা-খবরই পেলাম তাদের কাছ থেকে। শুনলাম ঢাকা শহরে ওদের দুঃসাহসিক গেরিলা অভিযানের লোমহর্ষক কাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই স্বপন, বদি, কাজি, জুয়েল, রুমী, আলম, আজাদ, সাচো বর্ডার পেরিয়ে ২নং সেক্টরের মেলাঘর ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়ে ঢাকায় ফিরে গিয়ে গেরিলা তৎপরতায় কাঁপিয়ে তোলে ঢাকা শহর। পর্যায়ক্রমে তাদের সাথে যোগ দেয় চুল্লু, ফাজলে, মোক্তার, হ্যারিস, তৈয়ব আলী, উলফাৎ, সামাদ, ফতেহ আলী, মেওয়া, জিয়া, ভুলু, সাইদ এবং আরো অনেকেই। ওদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঢাকায় অবস্থান করে বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করার যাতে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তাদের ঐ ধরণের গেরিলা তৎপরতায় এটাও প্রমাণিত হবে যে, পুরো বাংলাদেশ খানসেনাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে যে সরকারি প্রচারণা চালানো হচ্ছে সেটাও সত্যি নয়। জুরাইন, গুলবাগ পাওয়ার-ষ্টেশন, সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার-ষ্টেশন, ধোলাইখাল, যাত্রাবাড়ি, গ্রীন রোড, ইন্টারকন, ফার্মগেট, ধানমন্ডির ২নং সড়ক প্রভৃতি জায়গায় একটার পর একটা দুঃসাহসিক সফল অভিযান চালিয়ে খানসেনাদের নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল ওরা। ওদের প্রতিটি মাথার জন্য ২০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল পাকিস্তানের সামরিক সরকার। এতে কোন ফল হয়নি। খানসেনাদের সব সতর্কতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তাদের নাকের ডগার উপর দিয়ে জানবাজ মুক্তি পাগল দামাল ছেলেগুলো অসীম সাহসিকতার সাথে করে যাচ্ছিল একেকটা দুঃসাহসিক অভিযান। খানসেনাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল বিচ্ছুরা (খান সেনারা গেরিলাদের 'বিচ্ছু' কিংবা 'মুক্তি' বলে সম্বোধন করত)। ওদের তৎপরতায় আশার আলো দেখতে পেয়েছিল ঢাকাবাসী। ওদের জন্য দোয়া করতো সবাই। অনেকে নানাভাবে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় বিপদের ঝুঁকি নিয়েও। কিন্তু জাতীয় ইতিহাসে 'মীরজাফর' থেকেছে সর্ব যুগেই। তাদের বেঈমানীর ফলে অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন মোড়ে। তেমনই এক মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় স্বপন-বদি-কাজিদের ভাগ্যে নেমে আসে এক চরম বিপর্যয়। পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতার তুলনায় এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম কোন অংশেই কম নয়। ২৯শে আগষ্ট ১৯৭১ সাল। ঐ দিন সকালে ধানমন্ডির ২৮নং রোডের একটি বাসায়

ওদের এক ঘনিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী ফরিদের সাথে দেখা করতে যায় বদি পূর্ব কথামত। ফরিদ বর্তমান আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা জনাব জিল্লুর রহমানের শ্যালক তথা আইভি রহমানের ভাই। তারই বিশ্বাসঘাতকতায় দুপুর ১২টার দিকে ফরিদদের বাসা থেকে হঠাৎ রেইড করে বদিকে ধরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় খান সেনারা। ফরিদদের বাসায় পৌছানোর অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে বদি। এ থেকে বোঝা যায় আগাম খবর পেয়েই খানসেনারা বদিকে ধরার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। তারপর শুরু হয় Chain Reaction. সামাদ ধরা পরে বিকেল চারটার দিকে। আজাদের বাড়ি রেইড করা হয় রাত ১২টায়। ঐ বাসায় সে রাতে ছিল জুয়েল, বাশার, কাজি, আজাদ, আজাদের খালাতো ভাই, দুলাভাই এবং আরো কয়েকজন আত্মীয়। সবাইকেই ধরে নিয়ে যায় পাক-আর্মি। রেইড চলাকালে আচম্‌কা তদারককারী এক ক্যাপ্টেনের উপর ঝাঁপিয়ে পরে তার হাতের ষ্টেনগান ছিনিয়ে নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পেরেছিল একমাত্র কাজি। আলমদের বাসাতেও রেইড করা হয় রাত ১২টার পর। সেখানে ধরা পরে আলমের ফুপা আব্দুর রাজ্জাক এবং তার ছেলে মিজানুর রহমান। আলম বাসায় না থাকায় ধরা পরার হাত থেকে সে যাত্রায় বেঁচে যায়। আজাদদের বাসা আলমদের বাসার কাছাকাছি। রাত প্রায় দেড়টার সময় সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায় কাজি গিয়ে পৌছে আলমদের বাসায়। ভাগ্যক্রমে খানসেনারা ততক্ষণে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। কাজিকে সম্পুর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল আলমদের বাসার সবাই। আলমের ছোটবোন তাড়াতাড়ি একটা লুঙ্গি কাজির হাতে দিয়ে তক্ষুণি দূরে পালিয়ে যেতে অনুরোধ জানায়। খান সেনারা এখানেও এসেছিল জানতে পেরে কাজি কাপড়টা পরে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। হাটখোলায় শাহাদাত চৌধুরী মানে সাচোদের বাড়ি থেকে ধরা পড়েন সেজো দুলাভাই বেলায়েত চৌধুরী রাত দু'টো পর। চুল্লুর বড়ভাই জনাব এম সাদেক সিএসপি একজন পদস্থ সরকারি অফিসার। রাত ১২:৩০-১টার দিকে তার সরকারি বাসভবন এ্যালিফেন্ট রোডের ১নং টেনামেন্ট হাউজ থেকে চুল্লুকে ধরে নিয়ে যায় পাক-আর্মি। মধ্যরাতে রেইড করা হয় রুমীদের বাড়ি। বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় রুমী, রুমীর বাবা জনাব শরিফ, ছোট ভাই জামী, মাসুম এবং হাফিজকে। আমাদের বাসায় ক্যাপ্টেন কাইয়ূমের নেতৃত্বে রেইড করা হয় ১:৩০-২টার দিকে। চুল্লুদের বাসায় যে রেইডিং পার্টি গিয়েছিল তারাই চুল্লুকে চোখ বাধা অবস্থায় সাথে করে আমাদের বাসায় নিয়ে আসে। চোখ বাধা অবস্থায় চুল্লু প্রথমে বুঝতে পারেনি তাকে কোথায় আনা হয়েছে। আচমকা একজন খানসেনা বলে উঠল, “স্বপন ভাগ গিয়া।” আব্বার গলাও শুনতে পায় চুল্লু। মেয়েদের কান্না থেকে বুঝতে পারে আমার বোনেরা (মহুয়া, কেয়া, সঙ্গীতা) কান্নাকাটি করছে। দৈবক্রমে স্বপন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় আব্বা জনাব শামছুল হক, মোস্তাফিজ মামা, বাড়ির কাজের ছেলে সামু এবং হাশেমকে। আলতাফ মাহমুদের

বাসায় আর্মি যায় ভোর ৪-৫টার দিকে। সামাদকে সঙ্গে নিয়ে আর্মি গিয়েছিল ঐ বাড়িতে। আলভী ঐ রাত্রে সেই বাড়িতেই ছিল। নাম লুকিয়ে উর্দূতে নিজের নাম আব্দুল বারাক বলায় আলভী ধরা খাওয়া থেকে বেঁচে যায়। খান সেনারা ধরে নিয়ে যায় আলতাফ মাহমুদ, তার চার শ্যালক, রসুল এবং নাসেরকে।

এভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঢাকায় গেরিলাদের সবচেয়ে কার্যকরী এবং সফল দলটি বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পালাবার পর কাজি ও স্বপনের দেখা হয় তাদের ব্যেইস ক্যাম্প ধোলাইখালে। সেখান থেকে মেলাঘর। সেখানে তাদের দু'জনকেই Select করা হয় Officer's Training Course এর জন্য। কিন্তু দু'জনেরই কোন ইচ্ছে ছিল না Officer's Course এ যোগ দেবার। তারা অনেক অনুরোধ জানিয়েছিল মেজর খালেদ মোশাররফ এবং ক্যাপ্টেন হায়দারকে তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আবার ঢাকায় পাঠাবার জন্য। তারা চাইছিল ফিরে গিয়ে বন্দী সাথীদের মুক্ত করতে। জীবন গেলেও ক্ষতি নেই তবু একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায় তারা। নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ছিল তাদের। যদি মেজর খালেদ এবং ক্যাপ্টেন শিশুর পরিবারদেরকে পাক বাহিনীর সুরক্ষিত দুর্গ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এ বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পেরে থাকে তারা তবে তাদের পক্ষে বদি-জুয়েল-রুমীদেরকে ছাড়িয়ে আনাটা অসম্ভব হবে কেন? তাদের আবেগ, অনুভূতি, সহমর্মিতা মেজর খালেদের মনকে স্পর্শ করলেও ঠিক সেইক্ষণে তাদের ফেরত পাঠানো কোনক্রমেই ফলপ্রসু হবে না ভেবেই তাদেরকে Officer's Course এ পাঠাবার সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন মেজর খালেদ একজন অভিজ্ঞ কমান্ডার হিসেবে। আমার কাছে পৌঁছেও তারা একই প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আমিও মেজর খালেদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে তাদের Officer's Course-এ যোগদান করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মতপ্রকাশ করি। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুর্তীতে চলে যায় Course-এ জয়েন করার জন্য।

নভেম্বর মাসে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ব্যাপকভাবে। বর্ডারে সম্মুখ সংঘর্ষের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে পাক বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনে বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করেছে। গঠন করা হয়েছে মুক্তিফৌজ ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড। যৌথ কমান্ড গঠিত হবার পর ভারতীয় কমান্ডারদের প্রচন্ড প্রভাবে কর্নেল ওসমানী এবং তার হেডকোয়ার্টার্স প্রকৃত অর্থে অকেজো হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা এককভাবে ভারতীয় বাহিনীর ইষ্টার্ন কমান্ডই প্রণয়ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে কর্নেল ওসমানীকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যুদ্ধের আভাস পেয়ে জনাব ভুট্টোকে তার বিশেষ দূত হিসেবে চীনে পাঠালেন

ভারতীয় যেকোন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য। কিন্তু পিকিংএ গণচীনের নেতৃবৃন্দ জনাব ভুট্টোকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, "পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপকে গণচীন পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার হীন চক্রান্ত হিসাবেই দেখবে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সাথে যেকোন সামরিক সংঘাতে নীতিগতভাবে তারা পাকিস্তানের পক্ষেই থাকবে।" একইসাথে জনাব ভুট্টোর মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী বর্তমান সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য। তাদের Considered Opinion ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একটি যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায়ে রাখা সম্ভব। বল প্রয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান কখনও সম্ভব হবে না। চীনা নেতৃবৃন্দের উক্তি থেকে দু'টো বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠে।

প্রথমত: গণচীন একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার নিরসনের জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠিকে বাঙ্গালীদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান পেশ করার যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ দেন।

দ্বিতীয়ত: পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কোন সমাধান করতে ব্যর্থ হলে সেই সুযোগে উপমহাদেশে ভারতীয় সম্প্রসারনবাদের নগ্ন থাবা বিস্তার করার চক্রান্তের ব্যাপারেও তারা বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দেন। কিন্তু দেশে ফিরে জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সামরিক জান্তার কাছে চীনা নেতৃবৃন্দের বন্ধুসুলভ এবং যুক্তিসম্পন্ন অভিমতের অপব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, "ভারতের সাথে সামরিক সংঘর্ষে চীন পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে সাহায্য করবে। প্রয়োজনে গণচীন প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতে দ্বিধাবোধ করবে না এ ধরণের আভাসই নাকি তিনি পেয়েছিলেন চীনা নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে একান্ত বৈঠকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পাকিস্তানের আচমকা বিমান হামলা, মুক্তিযুদ্ধের শেষ অধ্যায়

- ৩রা ডিসেম্বর ভারতের উপর অর্তকিত বিমান হামলা চালালো পাকিস্তান।
- ফলে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।
- সেদিনই এক বিশাল জনসভায় যুদ্ধ ঘোষণা করে ইর্ষ্টান কমান্ডকে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হামলার হুকুম দিয়ে দিল্লী ফিরে গেলেন শ্রীমতি গান্ধী।
- কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ড স্থাপন করা হল।
- পূর্ব রনাঙ্গনে ভারতীয় ডিপ্লয়মেন্ট।
- কর্নেল ওসমানীকে উপেক্ষা করে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে থাকলো ভারতীয় কমান্ডাররা।
- রনাঙ্গনের প্রতিটি সেক্টরে সম্মুখ লড়াই এ মুক্তিবাহিনী বীরত্বের সাথে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও তাদেরকে রাখা হল লোকচক্ষুর অন্তরালে আর ভারতীয় বাহিনী ঢাকাসহ প্রতিটি শহর-বন্দরে প্রবেশ করল বিজয়ী হিসাবে।
- কৌশলে দেশ ও বিশ্ববাসীর কাছে দেখানো হল ভারতীয় সেনা বাহিনীই মূল বিজেতা।
- পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করানো হল ভারতীয় বাহিনীর কাছে, যৌথ কমান্ডের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীকে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগও দেয়া হল না।
- চানক্যদের চাল সার্থক হল, বিশ্ববাসী দেখলো পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর বিজয়ের ফসলই স্বাধীন বাংলাদেশ।
- মিত্র বাহিনীর রাহুগ্রাসে ম্লান হয়ে গেল মুক্তি বাহিনীর বীর গাঁথা।
- ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনে জনাব মাইদুল হাসানকে দেয়া এ ভি এম খন্দোকারের সাক্ষাৎকার।

পক্ষান্তরে ভারতীয় সরকার বুঝতে পেরেছিল গণচীন বাংলাদেশের ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে। তাছাড়া সদ্য সমাপ্ত রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পাক-ভারত যুদ্ধে গণচীনের প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পরার সম্ভাবনা খুবই কম বলেও ধারণা পোষণ করছিল ভারত সরকার। এ ধরণের চিন্তা-ভাবনার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। এ অবস্থায় ঝটিকা অভিযান চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে সেখানে তাদের পছন্দের সরকার কায়েম করতে পারা যাবে সহজেই। এ ধরণের বিশ্লেষনের পরই যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারত সরকার। যুদ্ধের জন্য অতি প্রয়োজনীয় আনুসাঙ্গিক সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেই সামরিক আগ্রাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত সরকার। এবারের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট অতীতের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমান অবস্থায় বিশ্ব জনমত সামরিক জান্তার শ্বেতসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশীদের স্বাধীনতার পক্ষে। মানবাধিকার এবং শরনার্থীর প্রশ্নে সারা বিশ্বের সহানুভূতিও ভারতের পক্ষে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা গণচীন যদি Geo-Strategic কারণে কোন পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করে তবে তাদের পরম শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়ায় 'মৈত্রী চুক্তির' আচ্ছাদনে নিশ্চুপ বসে না থেকে ভারতের পক্ষ নেবে নিশ্চিতভাবে ফলে বেধে যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বর্তমানে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার দায়-দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিতে চাইবে কিনা যুক্তরাষ্ট্র অথবা গণচীন সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা পূর্ব পাকিস্তানের ৮কোটি জনগণ আজ পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। মুক্তি বাহিনীর দেশব্যাপী প্রচন্ড তৎপরতায় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাক বাহিনীর অবস্থান সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত এবং যেকোন যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যকীয় Factor সৈনিকদের মনোবলও (Moral) সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। খান সেনারা সার্বিকভাবে শুধু দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাই নয়; তাদের Strategic Locations. Line Of Communication, Defensive Positions. Supply Points. Re-Enforcement Capabilities, Battle Tactics, Logistic Support Line এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয়ে সব খবরা-খবরই এখন রয়েছে ভারতীয় বাহিনীর নখদর্পনে। এসব খবর সংগ্রহ করা হয়েছে মুক্তি বাহিনীর ইনটেলিজেন্স ইউনিট এবং সেক্টরগুলোর নিজস্ব গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের বিরোধিতার মুখে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমাদের জবরদখল আজ অযৌক্তিক হয়ে পড়েছে। শত্রুপক্ষের অবস্থা বর্তমানে Totally Untanable. প্রয়োজন শুধু সুযোগমত আক্রমণের ধাক্কা তাহলেই কেল্লা ফতে হবে। সুযোগ এসে গেল। ৩রা ডিসেম্বর বিকেল ৫:৪৫ মিনিটে আকস্মিকভাবে Pakistan Air Force Pre-Emptive Strick করে বসলো ভারতের বিভিন্ন জায়গায় Srategic Target গুলোর উপর। একইসাথে আঘাত হানা হল শ্রীণগর, অভন্তিপুর, পাঠানকোট, উত্তরলাই, যোধপুর, আম্বালা এবং আগ্রা বিমান ঘাটির উপর। ঠিক সেই সময়ে শ্রীমতি

ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতায় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিমান হামলার খবর তাকে দেয়ামাত্র তিনি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ জনসভাতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক পাল্টা আক্রমণের ঘোষণা দিলেন। কোলকাতা থেকে সেদিন সন্ধ্যায় দিল্লী ফেরার আগেই ইষ্টান কমান্ডের GOC (Genral Officer Commanding) Genarel Arora-কে দিল্লীর সেনাসদর থেকে হুকুম দেয়া হল পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হামলা চালাবার জন্য। জেনারেল অরোরার অধিনে দেয়া হল ৩টি স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্মি কোর। ২য়, ৩৩শ এবং ৪র্থ কোর। এছাড়াও দেয়া হল 'কম্যুনিকেশন জোন হেডকোয়াটার্স' আরো একটি ভ্রাম্যমান আর্মি ইউনিট। এছাড়া ২য় কোরের অধিনে দেয়া হয়েছিল অতিরিক্ত একটি মিডিয়াম আর্মাড রেজিমেন্ট এবং একটি লাইট আর্মাড রেজিমেন্ট। এই কোরের কমান্ডার ছিলেন Lt.Gen T.N.Raina. হেডকোয়াটার্স কৃষ্ণনগর। এই কোরের অধিনে দেয়া হয়েছিল অতিরিক্ত আরো একটি মিডিয়াম আর্টিলারী রেজিমেন্ট ও একটি ইঞ্জিনিয়ারস এর ব্রিজিং ইউনিট।

৩৩ কোরের কমান্ডার ছিলেন Lt.Gen M.L.Thapa. হেডকোয়াটার্স শিলিগুরী। এই কোরের অধিনে দেয়া হয়েছিল অতিরিক্ত একটি লাইট আর্মাড রেজিমেন্ট, একটি মিডিয়াম আর্টিলারী রেজিমেন্ট এবং একটি ইঞ্জিনিয়ারস এর ব্রিজিং ইউনিট।

১০১ কম্যুনিকেশন জোনের কমান্ডার ছিলেন প্রথমদিকে Lt.Gen.Gill পরে Lt.Gen.Nagra-কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। হেডকোয়াটার্স গৌহাটি। এই ফর্মেশনের ৪র্থ কোরের হেডকোয়াটার্স ছিল আগরতলায়। কোর কমান্ডার ছিলেন Lt.Gen.Sagat Singh. এই কোরের অধিনে অতিরিক্তভাবে দেয়া হয় একটি মিডিয়াম আর্টিলারী রেজিমেন্ট এবং দু'টো লাইট আর্মাড রেজিমেন্ট। সব মিলিয়ে পূর্ব রনাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫লক্ষেরও বেশি। তার সাথে ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণের রণসম্ভার। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত প্রায় ১লক্ষ খানসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এ ধরণের বিশাল বাহিনী মোতায়ন করার প্রয়োজন ছিল না। এই বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল গণচীনের তরফ থেকে যদি কোন সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয় তার মোকাবেলা করার লক্ষ্যেই।

যাই হোক, প্রয়োজনীয় Air ও Naval Cover এবং প্রায় দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিশাল ভারতীয় বাহিনী একই সময়ে সব সেক্টর থেকে আক্রমণ চালালো। সব সেক্টরেই ভারতীয় বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার জন্য রাস্তা করে ব্রিজহেড তৈরী করে দিচ্ছিল মুক্তিবাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারাই। ঐ সমস্ত ব্রিজহেড তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল বলেই অতি সহজেই শত্রুপক্ষের ডিফেন্স ভেদ করে ঢাকা অভিমুখে তরিৎ গতিতে এগিয়ে যেতে পেরেছিল ভারতীয় মিত্র বাহিনী। যুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে কর্নেল

ওসমানীকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে চলেছিল ভারতীয় সেনাকমান্ড। ভারতীয় সেনা বাহিনীর Strategy ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শত্রুপক্ষের ডিফেন্স লাইন ভেদ করে তাদের Withdrawal এর পথ Cut Off করে তাদেরকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে পরাজিত করে ঢাকা অবরোধ করা এবং পাক বাহিনীকে Surrender করতে বাধ্য করা। বাংলাদেশে অবস্থিত পাক বাহিনী তাদের চেয়ে সংখ্যায় ৬-৭গুন বড় ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিফৌজের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে মাত্র ১২ দিনের যুদ্ধে অতি করুণ অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের জনগণের অসহযোগিতা এবং মুক্তি বাহিনীর দুঃসাহসিক গেরিলা তৎপরতা পাক বাহিনীর যুদ্ধস্পৃহা এবং মনোবল একদম নষ্ট করে দিয়েছিল। অন্য সব কারণের মধ্যে এটাই ছিল প্রধান কারণ যার জন্য পাকবাহিনীকে অতি অল্পসময়ের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এভাবেই ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের ফলে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ।

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে মুক্তিফৌজের কমান্ডার-ইন-চীফ এবং যৌথ কমান্ডের প্রধান কর্নেল ওসমানীর আমন্ত্রণে মিত্র বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরা স্বাধীন বাংলাদেশে আসবেন এবং যৌথ কমান্ডের তরফ থেকে Instrument Of Surrender এ যৌথ কমান্ডের শীর্ষ ব্যক্তি কর্নেল ওসমানীই সাক্ষর করবেন সেটাই ছিল সমগ্র জাতির প্রত্যাশা। কিন্তু ঘটনা ঘটে ঠিক তার বিপরীত। Instrument Of Surrender এ যৌথ কমান্ডের তরফ থেকে সাক্ষর দান করার সৌভাগ্য লাভ করলেন জেনারেল অরোরা। শুধু তাই নয় অদৃশ্য অঙ্গুলী হেলনে মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীকে ১৬ই ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক Surrender Cerimony-তে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত করা হল। কেন তাকে তার ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করে সেদিন জেনারেল অরোরাকে সমগ্র জাতি এবং বিশ্বপরিসরে বিজয়ী শক্তির একচ্ছত্র অধিকর্তা হিসেবে জাহির করা হল সে রহস্যের উদ্ঘাটন আজঅব্দি হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিশদ বিশ্লেষণের দাবিদার। এ থেকে জানা যাবে ভারতীয় নীল নকশা এবং প্রবাসী সরকারের নতজানু নীতির অনেক কিছুই।

কর্নেল ওসমানী চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনিই অভিনন্দন জানাবেন মিত্র বাহিনীর জুনিয়র পার্টনার জেনারেল অরোরাকে। এতে করে বিশ্বপরিসরে এটাই প্রমাণিত হবে মূলতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচেষ্টাতেই স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ, ভারতীয় বাহিনী সহায়ক শক্তি হিসেবে সাহায্য করেছে মাত্র। কিন্তু ভারতীয় সরকার তার সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। উল্টো ভারত সরকার দাবি জানায় Instrument Of Surrender-এ সাক্ষর করবে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার- বিশ্ববাসী জানুক পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের বিজয়ের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের দান। দুর্বল চিত্তের নতজানু প্রবাসী সরকার ভারতের সেই অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়। কিন্তু প্রচন্ড আত্মসম্মানবোধের অধিকারী আপোষহীন বঙ্গবীর কর্নেল ওসমানী নীতির প্রশ্নে অটল থেকে এ অন্যায়ের প্রতিবাদে নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা শহরে দেশবাসী দেখেছে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে বিজয়ীর বেশে। তাদের ঘিরে ছিল বিএলএফ, মুজিব বাহিনী এবং রাতারাতি গজিয়ে উঠা 'Sixteen Division' এর সদস্যরা। কারণ সত্যিকারের মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ঢাকা কিংবা দেশের বড়বড় শহরগুলোতে ঢুকতে দেয়া হয়নি নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ভারতীয় বাহিনীর প্রাধান্য জাহির করার জন্যই এ আদেশ জারি করা হয়েছিল। প্রকৃত মুক্তিফৌজের যোদ্ধারা ঢাকা এবং অন্যান্য শহরগুলোতে আসার অনুমতি পান ১৬ই ডিসেম্বরের অনেক পরে। এ ধরণের চক্রান্তের ফলে বিশাল ভারতীয় সেনা বাহিনীর আগমনে বাধাগ্রস্থ হয়ে শুকিয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের নিজস্ব ধারা। কালো ছায়ার আঁধারে ঢাকা পরে গেল মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ। হারিয়ে গেল অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত তাদের জয়গাথাঁ। আচমকা হোচট খেয়ে মুখথুবড়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন হয়ে উঠল সুদূরপরাহত। ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে জাতি স্বাধীনতার সঠিক মূল্য অনুধাবন করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হল। এজন্যই আজঅব্দি ক্ষমতাবলয়ে যারা অবস্থান করছেন সে সমস্ত বুদ্ধিজীবি, সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে অতি কম দামে স্বাধীনতা এবং জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেবার ন্যাক্কারজনক প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে যদি তার নিজস্ব ধারায় বয়ে যেতে দেয়া হত তবে দখলদার বাহিনীর পাশবিক নৃশংসতার শিকার হতে হত আরো অনেককেই, রক্তাহুতি দিতে হত প্রতিটি পরিবারকে। এভাবে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই হয়ে উঠতো এক অমূল্যধন। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে কষ্টার্জিত সেই পবিত্র স্বাধীনতাকে যেকোন ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই নস্যাৎ করে দিত পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা এবং ত্যাগী-সচেতন জনতা। দুর্ভাগ্য তৎকালীন দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় খাঁদহীন বলিষ্ঠ জাতীয় চরিত্র গঠন করার নূন্যতম সময় ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ ও আদর্শিক কারণে আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন

- ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন ও তার মন্ত্রী পরিষদ ঢাকায় এলেন ২২শে ডিসেম্বর।
- জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে এককভাবে ক্ষমতায় বসানো হল ইয়াহিয়া খানের এলএফও-এর আওতায় নির্বাচিত দল আওয়ামী লীগকে।
- আওয়ামী লীগের আদর্শিক দেউলিয়াপনা।
- দেশ স্বাধীন হলেও শাসকশ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটল না।
- '৭০-এর নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজতন্ত্রের কোন উল্লেখ ছিল না, কিন্তু দেশে ফিরেই সমাজতন্ত্রের জিকির তুলল আওয়ামী লীগ।
- নীতি-আদর্শের ককটেল মুজিববাদের ধুম্রজালকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনে সংকট।
- ৩রা জানুয়ারী ১৯৭২ শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবার ঘোষণা করে পাকিস্তান সরকার।
- ১০ই জানুয়ারী ভারত হয়ে দেশে ফিরলেন শেখ মুজিব।
- ছাত্রলীগের ভাঙ্গন।
- ভারতীয় শাসনতন্ত্রের স্ববিরোধী চার মূলনীতিকে বাংলাদেশের সংবিধানের চার স্তম্ভ হিসাবে গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ।
- জাতীয় পরিচিতি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়।
- দেশের ভৌগলিক পরিসীমা নিয়েও চক্রান্ত।
- মাওলানা ভাসানীর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী।
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর আত্মপ্রকাশ।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের অধিনে জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকারের LFO (Legal Frame Work) এর আওতায় পাকিস্তানের অখন্ডতা বজিয়ে রাখার ওয়াদা করে নির্বাচন করেন শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার প্রধান হবার জন্যই জনগণ তাকে সে নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগসাজশে ২৫-২৬শে মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাঙ্গালী জাতির উপর শ্বেত সন্ত্রাস চালিয়ে অস্ত্রের জোরে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচন হয়ে পড়ে অর্থহীন। বাংলাদেশের আপামর জনগণ পাকিস্তানী আচমকা হামলা ও শ্বেত সন্ত্রাসের বিরোধিতায় এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই ১৯৭০ সালের নির্বাচন তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা যখন মরণপন করে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন শেখ মুজিবর রহমান বন্দী হয়ে চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। সশস্ত্র সংগ্রামের কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না বলেই তাদের দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যেতে হয়। এরপর ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিজয়ের পিছনে রয়েছে সমগ্র জাতির অবদান। সেক্ষেত্রে এই জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বের একমাত্র দাবিদার হয়ে কোন যৌক্তিকতায় আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দলীয়ভাবে কব্জা করে নিল তার জবাব অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনে জনাব এ কে খন্দোকার ও মাঈদুল হাসানের মধ্যে প্রায় চার ঘন্টা দীর্ঘ এক আলাপ হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত সম্পর্কের মূল্যায়নের জন্য সেই আলোচনার সারাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। যুদ্ধকালে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের ডেপুটি চীফ অফ ষ্টাফ এবং জনাব মাঈদুল হাসান ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে একজন পরামর্শদাতা। তাদের কথোপকথন থেকে বোঝা যায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্নেল ওসমানীকে বাইপাস করে মূলতঃ যোগাযোগ রক্ষা করতেন জনাব তাজুদ্দিন এবং খন্দোকার সাহেবের সাথে। যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে বেশিরভাগ আলোচনাও হত গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার সাহেবের সাথেই। জেনারেল অরোরা, ব্রিগেডিয়ার জ্যাকব, ব্রিগেডিয়ার গুপ্তই ছিলেন মূলতঃ তাদের counter part.

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে বীর বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধারা যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন তার যথার্থ মূল্য ভারত কখনোই দিতে চায়নি। এ নিয়ে মুক্তি ফৌজের কমান্ডারদের সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব শুরু হয় প্রথম থেকেই। মুক্তিযোদ্ধাদের

পরিচালনার জন্য মুজিবনগরে (৮নং থিয়েটার রোড) কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে একটি হেডকোয়টার্স স্থাপন করা হলেও জনাব ওসমানীর কর্মক্ষমতা ছিল সীমিত। জুলাই মাস অব্দি মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডাররা হেডকোয়াটার্স এর কাছ থেকে তেমন কোন সাহায্যই পাননি সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য। বিভিন্ন সেক্টরে কমান্ডাররা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের উদ্যোগেই মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে এভিএম খন্দোকার বলেন, "আমি যখন কোলকাতায় গিয়ে পৌছলাম তখন দেখলাম যে, হেডকোয়াটার্সের সাথে সেক্টর কিংবা সাব-সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই এবং এ পর্যায়ে ভারত আমাদের সংগ্রামে তেমন কোন সাহায্যই দেয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে কোন সঠিক নীতিও গড়ে তুলতে পারেনি তারা। তবে তারা তখন চাচ্ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ইস্যুটা জিয়ে থাক। ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা চাচ্ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ধারাবাহিকতা এবং গতি-প্রকৃতি থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের বুঝে নিয়ে তারা তাদের নীতি চুড়ান্ত করবেন। চুড়ান্ত নীতি নির্ধারন করার সময় পর্যন্ত সমস্ত বিষয়টাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন তারা। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং সেনা বাহিনীর এ ধরণের মানসিকতার ফলে ভারতীয় সেনা বাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর মধ্যে বৈরীভাব এবং রেষারেষি পরবর্তিকালে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গড়ে উঠা বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর মধ্যে যে ভারত বিরোধী মনোভাব দেখা যায় সেটা মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই crystallize করে।" এ প্রসঙ্গে জনাব খন্দোকার আরও বলেন, "মুক্তিফৌজ এবং ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে বিরোধ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্ন থেকেই দাঁনা বেধে উঠেছিল বিভিন্ন কারণে। ঐ সেন্টিমেন্ট, আবেগ-অনুভূতি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন Disapointment এর মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ আরো বেড়েছে।" মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার বলেছেন, "মে, জুন, জুলাই, আগষ্ট পর্যন্ত ভারতের Involvement ছিল অতি সামান্য। যা ছিল তা মোটামুটিভাবে মুক্তি বাহিনীর জন্য কিছু যৎসামান্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ, কিছু Logistical support এর বেশি কিছুই নয়। মুক্তিফৌজ কমান্ডারদের মূলতঃ শত্রুপক্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সম্ভারের উপর নির্ভর করেই চালিয়ে যেতে হচ্ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম।"

মুক্তিফৌজ সেক্টর কমান্ডারদের জুলাই মাসের কনফারেন্সের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দিয়ে গেরিলা হিসেবে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো হবে। এ প্রসঙ্গে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "সেক্টর কমান্ডারদের মিটিং এর পর একদিন জেনারেল অরোরা এলেন। মিটিং হল। কর্নেল ওসমানীর সাথে সেই মিটিং এ আমিও উপস্থিত

ছিলাম। মিটিং এ আলোচনার মূল বিষয় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে। কতজনকে ট্রেনিং দেওয়া হবে, কোথায় কোথায় ট্রেনিং দেওয়া হবে, কিভাবে ট্রেনিং দেওয়া হবে, কি করে রিক্রুটমেন্ট করা হবে, কতদিন ট্রেনিং দেওয়া হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। জেনারেল অরোরা প্রস্তাব দিলেন পাঁচ হাজার গেরিলা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করলেই হবে। শুনে কর্নেল ওসমানী এবং আমি দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম। আমি বলেই ফেললাম এত অল্প সংখ্যক গেরিলা দিয়ে কি হবে? জবাবে জেনারেল অরোরা বললেন, "These are the people who will go inside, bleed the enemy and all those things." কর্নেল ওসমানী জেনারেল অরোরাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন তার দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার দরকার। সেক্টর কমান্ডারদের সদ্য সমাপ্ত কনফারেন্সে সেটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। যাই হোক ট্রেনিং শুরু হল। ট্রেনিং শেষ করে গেরিলারা ফিরে আসল। কিন্তু তারপর একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিল। এ সমস্যাটার জন্য পুরোপুরি দায়ী ভারত সরকার। ট্রেনিং এর পর ভারতীয় আর্মি সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের অধিনে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এতে ভীষণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল। ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের বিভিন্ন সেক্টর থেকে রিক্রুট করা হয়েছিল। ট্রেনিং-এর পর তারা স্ব স্ব সেক্টরে ফিরে গিয়ে তাদের প্রিয় সেক্টর কমান্ডারদের অধিনে যুদ্ধ করবে এটাই ছিল তাদের আশা। ভারতীয় সেনা কমান্ডারদের অধিনে যুদ্ধ করতে তারা রাজি হল না। ভারতীয় বাহিনী ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দেশের ভেতরে তাদের কমান্ডের আওতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেটা আমাদের হেডকোয়ার্টার্সকেও জানতে দেয়া হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু কিছু জায়গায় জোর করে ইন্ডিয়ান কমান্ডাররা গেরিলাদের পাঠায় মূলতঃ লুটপাট করে নিয়ে আসার জন্য। যুক্তি হিসেবে তাদের বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধ চালাতে হাতিয়ারপাতির সাথে টাকা-পয়সারও প্রয়োজন রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা এ ধরণের অমানবিক অপারেশন এবং ইন্ডিয়ান আর্মির অধিনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে তাদের নিজ নিজ সেক্টরে পালিয়ে যায়। এর ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া even at a later date was very bad মুক্তিযোদ্ধারা did not like the way Indian Army wanted them to be used. অল্প সময়ের মধ্যেই সব সেক্টরে এ সম্পর্কে তিক্ততা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর মাঝে অবিশ্বাসের জন্ম হয়। এ খবর জানাজানি হয়ে যাবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের সেক্টর কমান্ডারদের দাবি অনুযায়ী আমাদের হেডকোয়ার্টার্স থেকে চাপ দেয়া হল, 'আমাদের এই ট্রেইন্ড গেরিলাদের বাংলাদেশী কমান্ডারদের হাতে না দিলে This will be a disaster and catastrophe. বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত গেরিলা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশী সেক্টর কমান্ডারদের হাতে দিতেই হবে।' এ সম্পর্কে ভারতীয় মিলিটারী হাইকমান্ডের প্রথম থেকেই প্রচুর reluctance থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনিচ্ছাসত্ত্বে নেহায়েত নিরূপায় হয়েই আমাদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে

অবশ্য মুক্তিফৌজদের কাউন্টার ফোর্স হিসেবে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী (RAW) এবং সেনা বাহিনীর মিলিত চেষ্টায় গঠিত হয়েছিল বিএলএফ। সে এক অন্য অধ্যায়। ভারতীয় নেতৃত্বের এ ধরণের মনোভাবের দু'টো কারণ হতে পারে। প্রথমত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফিল্ড কমান্ডারস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভারত সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেনি। তাই তারা সবসময় মনে করত এদের উপর নির্ভর করা যায় না। দ্বিতীয়ত: তাদের মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত তাদের সরাসরি যুদ্ধের বিজয় ফল হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করবে বাংলাদেশ। তাই পাক বাহিনীকে দুর্বল করার জন্য গেরিলা বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে তাদের শুধু ব্যবহার করতে হবে সীমিত লক্ষ্যে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের বৃহৎ অংশ এবং সদস্যরা চেয়েছিলেন দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করে নিজেদের প্রচেষ্টায় তারা স্বাধীন করবেন তাদের মাতৃভূমি। কিন্তু তেমনটি হয়নি। আমার মনে হয় এখানেই মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও সেনা বাহিনীর মধ্যে একটা Credibility Gap হয়ে গেছে। আমাদের সামরিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ছিল পরিষ্কার, 'আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করব। বন্ধুরাষ্ট্র ভারত মুক্তিকামী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করলে আমরা অবশ্যই সে সাহায্যকে অভিনন্দন জানাব। কিন্তু necessarily this is our struggle and we have to fight it ourselves. তাছাড়া শুধু ভারত কেন? পৃথিবীর যে কোন দেশ আমাদের সংগ্রামে সাহায্য করতে চাইলে আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করব। মোটকথা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে ভারত ও আমাদের মধ্যে approach of mutual confidence ছিল না বা কখনো গড়ে উঠেনি because of their overall policy. একথাও সত্য যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক সেক্টরে ইন্ডিয়ান কমান্ডারদের কার্যকলাপে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টিও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সত্যিকথা বলতে গেলে ৯ই আগষ্ট রুশ-ভারত চুক্তি সই হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের চেষ্টায়। ৯ই আগষ্টের পরই ভারত সরাসরিভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করে এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে ইন্ডিয়ান আর্মি really started taking closer interest."

মাঈদুল হাসান এ পর্যায়ে জিজ্ঞেস করেন, "ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া বাংলাদেশ বোধ হয় স্বাধীনতা পেত না, কি বলেন?" খন্দোকার সাহেব মাঈদুল হাসান সাহেবের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, "যদিও মুজিবনগরের অনেকে এমনকি আমাদের মন্ত্রীসভার অনেকেই হতাশা বোধ করতেন, সংসদ সদস্যদের অনেকেই ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ নিয়ে ফিরে যাবার চিন্তা-ভাবনাও করছিলেন। মুক্তি বাহিনীর তৎপরতায় আস্থাহীন হয়ে হতাশা বোধ করতেন। দীর্ঘস্থায়ী

সংগ্রামের কথা শুনলেই আতঁকে উঠতেন। ভাবতেন কি হচ্ছে! দেশে বোধ হয় আর ফিরে যাওয়া যাবে না। এ ধরণের পরিস্থিতিতেও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম, মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতা বেড়ে গেলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে বলে যুক্তির অবতারণা করে যারা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের গতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন তাদের সে যুক্তি ছিল সম্পূর্ণ ভুল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পক্ষান্তরে আমরা যদি আমাদের সংগ্রামের তীব্রতা প্রথম থেকেই বাড়াতে সক্ষম হতাম তবে আমাদের প্রচন্ড গেরিলা তৎপরতার মুখে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মসর্মপন করতে হত মুক্তি ফৌজের কাছে। কারণ They had no chance to fight. Their moral was completely shattered and the losses would have been unacceptable to them." (সংবাদ ২৬শে মার্চ ১৯৯০)।

জনাব মাঈদুল হাসান জবাবে বলেছিলেন, "আপনার চিন্তা-ভাবনায় যুক্তি থাকলেও ভারতীয়রা ভেবেছিলেন অন্যরকম। তারা চেয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে ছোট করে দেখাতে এবং বিশ্ব পরিসরে পাক-ভারত যুদ্ধের ফল হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে। এতে ভারত এক ঢিলে দুই পাখি বধ করতে সক্ষম হয়।

প্রথমত: ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়ে নিজেকে উপমহাদেশের প্রধান সার্মরিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় ভারত।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রাখার যৌক্তিকতা অর্জন করে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের মাঝে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ তাদের সরকারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে ২২শে ডিসেম্বর ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকায় এসেই তাজুদ্দিন সরকার ঘোষণা করে, "তাদের সরকার বিপ্লবী সরকার। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য।" বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় অস্থানীয়দের স্থলে বাংলাদেশী বুর্জুয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ দেখা শুরু করলেন। ঠিক যেভাবে পাকিস্তানীরা দেখতো তাদের আপন স্বার্থ। পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে। তা যাক, কিন্তু শত্রুতো থাকতে হবে। শত্রু এখন কে? শত্রু এখন জনগণ। জনসাধারনের পক্ষের শক্তিকে উৎখাত করার তৎপরতা চালানো হল সরাসরিভাবে। তেমনি চললো তাদেরকে নিজেদের লেজুড়ে পরিণত করার চক্রান্ত। জনগণ যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার এবং নিজেদের বাচাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। তাই তাদেরকে শুধু

ধোকা দেবার জন্যই সমাজতন্ত্রকে আওয়ামী লীগ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল নিজেদের স্বার্থেই। যদিও ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজতন্ত্রের কোন অঙ্গীকার ছিল না। সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খলে বাংলাদেশের জনগণ কখনোই নিজেদের বন্দী করতে আগ্রহী ছিল না। তাদের সর্বকালের দাবি ছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার। জনাব প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল তৎকালীন প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলো। ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারী বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল অন্যান্যদের সাথে প্রশ্ন তোলে। তারা বলে, "আওয়ামী লীগ সরকার বিপ্লবী সরকার হতে পারে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি বিপ্লবই হয়ে থাকে তবে সে বিপ্লব শুধু আওয়ামী লীগই করেনি, করেছে এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। আর তাই সকল দলের প্রতিনিধি নিয়েই গঠন করতে হবে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সরকার।" তাদের এ দাবি যুক্তিসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ভারতীয় সাহায্যে প্রবাসকালের একলা চলো নীতিই ধরে রাখে। মস্কোপন্থী মোজাফফর ও মনিসিং গং ক্ষমতার অংশ না পেয়েও যুদ্ধকালীন সময় থেকেই তাদের বিদেশী মুরুব্বীদের ইচ্ছানুসারে আওয়ামী লীগ সরকারের লেজুড়বৃত্তি করতে থাকে নির্লজ্জভাবে। ভারতীয় রাজনীতিতে সিপিআই যেভাবে কংগ্রেসের লেজুড়ে পরিণত হয় ঠিক সে অবস্থাই হয়েছিল মোজাফফর ন্যাপ এবং মনিসিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টির বাংলাদেশের রাজনীতিতে।

বাংলাদেশ নামে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু শাসক বুর্জুয়াদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটল না। তাদের চরিত্রে রয়ে গেল মুৎসুদ্দী ধামাধরার প্রবণতা। আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। কোন অবস্থাতেই ভবিষ্যতে মার্কিন সাহায্য বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না এই সাহসী সরকারি ঘোষণা মুজিবনগরে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই বলতে বাধ্য হলেন যে তিনি মার্কিন সাহয্য গ্রহণ করবেন। যুদ্ধের সময় ভারত বিরোধী ছিলেন যেসব বিত্তবানেরা তাদের বেশিরভাগই ভারতপ্রেমিক হয়ে দাড়ালেন রাতারাতি। প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হল ভারতীয় মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী গোষ্ঠির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে অল্প সময়ে চোরাকারবারের মাধ্যমে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবার। যে আওয়ামী লীগ চিরকাল ছিল মার্কিন ঘেষা, আমেরিকার প্রশ্নে যেখানে সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানীর থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে, সেই আওয়ামী লীগ এর এতটুকু কষ্ট হল না সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুরাগী হয়ে পড়ে ভারতের সাথে চুক্তির দাসখত লিখে দিতে। মুলকথা মুরুব্বী চাই। 'স্বাধীন হয়েও স্বাধীন নয়, স্থানীয় বটে তবে জাতীয় নয়' প্রকৃতির আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের নীতি

গ্রহণ করেছিল জাতীয় অর্থনীতিকে তাদের দলীয় নিয়ন্ত্রণে নেবার জন্যই। রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে পাকিস্তানী বণিক সম্প্রদায় এবং শিল্পপতিদের পরিত্যক্ত ব্যবসা কেন্দ্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের পার্টির সদস্য ও সহযোগীদের পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। ব্যাবসা-বানিজ্যের লাইসেন্স পারমিটও দেয়া হয় অব্যবসায়ী অনভিজ্ঞ পার্টি টাউটদের। অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দলীয় সদস্যদের নব্য পুঁজিপতি হবার সুযোগ করে দেয়া হল সেই আদিম পদ্ধতিতে। এভাবেই একাত্তরের আগের অধ্যায়ে পাকিস্তানীরা লুট করেছে বাংলাদেশকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমাজতন্ত্রের ধুম্রঁজাল সৃষ্টি করে শুরু হল বাঙ্গালী নব্য পুজিঁপতিদের লুন্ঠন। গরীব দেশবাসী আরো গরীব হল। জাতীয় অর্থনৈতিক মেরুদন্ড গেল ভেঙ্গে। রুশ-ভারতের চাপে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হিসেবে গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রের অসাড়তাই প্রমাণ করেছিল আওয়ামী লীগ।

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ প্রচার করেছেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা খাঁটি সমাজতন্ত্রই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য কিছু নয়। তার এসব বক্তব্য ও প্রচারণাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরের ক্ষমতার অর্ন্তদ্বন্দ্বগুলো ক্রমান্বয়ে উম্মোচিত হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান সমস্যার মোকাবেলার জন্য ১৯৭২ সালের ১০ই মে চট্টগ্রামে এক জনসভায় আওয়ামী লীগের লেজুড় দল ন্যাপের সভাপতি জনাব মোজাফফর আহমদ সর্বদলীয় সরকার গঠনের আহ্‌বান জানাতে বাধ্য হন।

আগেই বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অনাস্থা ও যুদ্ধত্তোর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি যে কোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ উপদেষ্টা ভারতের অন্যতম কূটনীতিবিদ জনাব ডিপি ধরের পরামর্শে এবং বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতায় মুক্তি বাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং ভারতীয় সেনা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছিল বিএলএফ পরবর্তিকালে মুজিব বাহিনী। বাংলাদেশের চারজন ছাত্রনেতা ভারতীয় সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই চতুরঙ্গ তোফায়েল, রাজ্জাক, শেখ মনি ও আব্দুর রাজ্জাক পরবর্তিকালে বাংলাদেশের 'চার খলিফা' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাদেরই একজন জনাব তোফায়েলকে দিয়ে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ এ ঘোষণা করা হল, "মুজিববাদ কায়েম করব। মুজিববাদের চার স্তম্ভ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।" তিনি মুজিববাদের একটি ব্যাখ্যাও দিলেন। তিনি বললেন, "মহান মার্কিন নেতা আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার জনগণকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কিন্তু সমাজতন্ত্র দিতে

পারেননি। কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রের স্থপতি কিন্তু তার দর্শনে ছিল না গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা। মুজিববাদে রয়েছে দু'টোই গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। সুতরাং মুজিববাদ বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক দর্শন।" তিনি আরো বলেন, "পুজিঁবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে মুজিববাদ কায়েম করে সোনার বাংলা গড়ে তোলা হবে।" তিনি বাংলাদেশের জনগণকে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে 'জাতীয় বিপ্লব' আখ্যা দিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। জনাব তাজুদ্দিনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যই জনাব তোফায়েলের মাধ্যমে মুজিববাদ নামক এক উদ্ভট এবং অদ্ভুত রাজনৈতিক দর্শনের উপস্থাপনা করা হয়।

৩রা জানুয়ারী ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সরকার এক ঘোষণার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে বলে খবর প্রচার করে। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেই জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন শেখ মুজিবকে ছেড়ে না দিলে তিনি ৯০,০০০ হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের একজনকেও ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। তাছাড়া রাজনৈতিকভাবেও তিনি আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে এবং বিশ্ব পরিসরে ভীষণ বেকায়দায় পরবেন। শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবার ব্যাপারে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথেও তার আলোচনা হয় পর্দার অন্তরালে। শেখ মুজিবরের মুক্তির ব্যাপারে দি নিউইয়র্কস টাইমস ৩রা জানুয়ারী লেখে, "It is in everyone's interest that Sheikh Mujib be returned to Dhaka as quickly as possible." শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বোঝাপড়ার পর জনাব ভুট্টোর আদেশে ৮ই জানুয়ারী সকালে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। লন্ডন পৌছাঁলে বেগম মুজিব টেলিফোনে তাকে সোজা বাংলাদেশে আসার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেই তিনি ঢাকায় যাবেন। লন্ডন থেকেই টেলিফোনে মুজিব ইন্দিরা গান্ধীকে বললেন, "আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।" জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বললেন, "দীর্ঘ ২৫ বছরের তিক্ততার অবসান ঘটিয়ে ইতিহাসের গতি বদলিয়ে দেয়ার জন্য আপনি আমার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানবেন।"

তার মুক্তির খবরে খুশি হল আপামর জনসাধারণ। অনেকেই ভাবল শেখ মুজিব ফিরে এলে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। জননেতা শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের গণবিরোধী নীতি ও ভারতের কাছে তাদের দেয়া দাসখত কিছুতেই মেনে নেবেন না। তিনি জণগণের আশা-আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনে নতুন করে বাংলাদেশ-ভারত নীতি পূনর্নির্ধারণ করবেন। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে কোন প্রকার আপোষ করা কিছুতেই সম্ভব নয় শেখ মুজিবের পক্ষে। দলীয় স্বার্থের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে জাতীয়

স্বার্থকেই তুলে ধরবেন তিনি। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে সোনার বাংলা গড়ে তুলবেন তিনি। কিন্তু লন্ডন থেকে সোজা বাংলাদেশে আসার অনুরোধ উপেক্ষা করে দিল্লী যাবার তার সিদ্ধান্তে হতাশ এবং অবাক হলেন দেশবাসী। সেখানে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানাতেই যাননি শেখ মুজিব। সেটা টেলিফোনেই জানিয়েছিলেন লন্ডন থেকে। তার দিল্লী যাবার আসল উদ্দেশ্য ছিল ইন্দিরা গান্ধীকে আশ্বস্ত করা যে, তার অবর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যেকার সব বোঝাপড়া এবং মৈত্রী চুক্তিকে তিনিও মেনে নেবেন। এভাবেই শ্রীমতি গান্ধীকে ব্যক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট করে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরলেন শেখ মুজিব। তার এ ধরণের আচরনে সবাই বুঝতে পারলেন জাতীয় স্বার্থের বলি দিয়ে দলীয় স্বার্থের নামবলি গায়ে জড়িয়ে জাতীয় নেতা শেখ মুজিব ক্ষমতার জন্য দলীয় নেতা হয়ে গেলেন নির্দ্বিধায়। জনগণের বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করলেন না জনগণের নয়নের মণি শেখ মুজিব। এভাবেই সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে শুরু হল জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার এক অদ্ভুত উপাখ্যান। ৬ই জুন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণে স্বয়ং শেখ মুজিব বললেন, "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে; তবে সেটা হবে স্থানীয়ভিত্তিক।" তারপরই শুরু হল মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার তান্ডবলীলা। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, হবুমন্ত্রী, দলীয় নেতা, হবুনেতা, পাতিনেতার দল চরম প্রতিযোগিতায় দেশময় চিৎকার করে ত্রাসের সৃষ্টি করলেন এই বলে, "মুজিববাদ কায়েম কর। যে কেউ মুজিববাদের বিরোধিতা করবে তার বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে।" ১৯৭২ সালের ৯ই এপ্রিল আওয়ামী লীগ নেতা জনাব কামরুজ্জামান এলান করলেন, "প্রতি থানায় থানায় মুজিববাদ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।" তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী জুলাই মাসে বললেন, "মুজিববাদ বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক।" মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে তোলা হল একের পর এক বেসামরিক পেটোয়া বাহিনী। আওয়ামী লীগ সেচ্ছাসেবক বাহিনী, জয়বাংলা বাহিনী, লাল বাহিনী। এছাড়া প্রভাবশালী নেতারাও গড়ে তোলেন তাদের নিজস্ব ঠেঙ্গারে বাহিনী।

১৯৭২ সালের প্রায় গোড়া থেকেই মুজিববাদ নিয়ে ছাত্রলীগের মাঝে দেখা দেয় সংকট। সৃষ্টি করে অনৈক্য। '৭২ সালের ১২ই মে ছাত্রলীগের চার নেতা খোলাখুলিভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরেন। জনাব রব ও শাহজাহান সিরাজ বললেন, "মুজিববাদে তারা বিশ্বাসী নন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই আসিবে জনমুক্তি।" অপরদিকে আব্দুল কুদ্দুস মাখন ও নূরে আলম সিদ্দিকী ঘোষণা দিলেন, "যে কোন মূল্যে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সংকট দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে মুজিববাদী ও মুজিববাদ বিরোধী ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে যখন দুই গ্রুপই

আলাদাভাবে মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। শেখ মুজিব অবশ্য মাখনদের সম্মেলনই নিজে উদ্বোধন করেন।

ছাত্রলীগের ভাঙ্গনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক লীগেও কোন্দল ঘনীভূত হয়। ফলে শ্রমিক লীগও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মুজিববাদ বিরোধী ছাত্রলীগ এবং তাদের সমর্থক শ্রমিক লীগ তৎকালীন গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠনের আহ্বান জানান। তখন থেকেই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। একদিকে মুজিববাদ অপরদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। আসম রব ১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ এক ভাষণে বলেন, "জীবনে সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের জন্য জাতি যখন আর একটি বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক সে মুহূর্তে বেশ কিছু সংখ্যক সরকারি আমলা, শিল্পপতি, আওয়ামী লীগসহ কিছু রাজনৈতিক লোকজন জাতীয় বিপ্লবের নামে আমাদের এই প্রস্তুতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে এবং গণবিরোধী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছে। ৮ই মার্চ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তিনি আরো বলেন, "পতাকা বদল হলেই জনগণের মুক্তি আসে না, তার জন্য দরকার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী।" এর জবাবে '৭২ সালের ৫ই মে ছাত্রলীগ (মুজিববাদী) নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, "মুজিববাদের প্রতি হুমকি বিপ্লবীদের সমাজতন্ত্রের প্রতিই হুমকি স্বরূপ।" ২৩শে মে '৭২ তৎকালীন আওয়ামী সেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান এবং পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুর রাজ্জাক দিন তারিখ দিয়ে ঘোষণা করেন, "৭ই জুন থেকে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দেশব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।" ১৩ই জুন গৃহিত এক প্রস্তাবে মাখন সিদ্দিকী গ্রুপ দাবি করে, "মুজিববাদের চার নীতির উপর ভিত্তি করে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।" ৬ই জুলাই তোফায়েল আহমদ কুমিল্লার এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, "যারা বিদেশী মতবাদ প্রচার করছেন তারা দেশের জনগণের বন্ধু নয়, তারা জাতীয় শত্রু। মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সব সমস্যার সমাধান এবং মুজিববাদ দেশে সমৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।" একই জনসভায় জনাব আবদুর রাজ্জাক বলেন, "আমরা বিশ্বকে দেখিয়ে দেবো কিভাবে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে।" ১৬ই জুলাই নেতা জিল্লুর রহমান বললেন, "মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব। মুজিববাদ বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকঙ্খার প্রতীক। এর বাস্তবায়নের মধ্যেই মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি নিহিত।" একই দিনে ঢাকায় মাখন সিদ্দিকী গ্রুপ ছাত্রলীগের এক সভায় গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয়, "মাওবাদী বিভ্রান্ত নেতৃত্ব, সিআইএ-র এজেন্ট দল ও ছাত্রলীগ নামধারী বহিস্কৃত নেতৃত্ব, পলাতক আলবদর, আলশামস, রাজাকার, শান্তি কমিটির মেম্বার, মুসলিম লীগারস, জামায়াত, নেজাম, জমিয়তে ওলামা, পিডিপি সহ প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বানচাল করতে চায়।"

২৪শে জুলাই '৭২ ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় গ্রুপের মধ্যে বায়তুল মোকাররমে গোলাগুলি হল। ২১শে জুলাই ছাত্রলীগ মুজিববাদী অংশের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্মেলনে শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করা হয়। একই দিন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্রলীগ রব গ্রুপের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পল্টন ময়দানে। সেই সম্মেলনে জনাব আসম রব ঘোষণা করেন, "কার্ল মার্কসের পর সমাজতন্ত্রের কোন নতুন সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার রূপরেখাই চূড়ান্ত এবং আমাদের এই বাংলাদেশে সেই সমাজতন্ত্রই কায়েম করা হবে।" জনাব রব দৃঢ়ভাবে বললেন, "মুজিববাদের ককটেল কোন সমাজতান্ত্রিক রূপরেখা নয়।"

২৪শে জুলাই ৭২ মুজিববাদী ছাত্রলীগের একটি মিছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পল্টন ময়দানে রব গ্রুপ ছাত্রলীগের একটি সভার উপর চড়াও হয়। তাদের হামলায় জনাব রবসহ শতাধিক ছাত্র আহত হন। পরে আহতদের একজন ছাত্র হাসপাতালে মারা যায়।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার পড়াশুনার জন্য একশতটি বৃত্তি দেয়। মেধা অনুসারে একশত জন ছাত্র নির্বাচিত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। ৮ই জুলাই নির্বাচিত তালিকা থেকে হঠাৎ করে অন্যায়ভাবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৪১ জনকে বাদ দিয়ে নতুন করে তাদের জায়গায় অন্য ৪১ জনকে নির্বাচিত করা হয়। মুজিববাদে বিশ্বাসী ছিল না বলেই প্রথম নির্বাচিত ৪১ জনকে বাদ দেয়া হয়। ইতিমধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়েও মুজিববাদকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। নেতাদের বিবৃতি বক্তব্যে এ আন্তঃবিরোধ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৭২ সালের ১৮ই জুলাই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী চট্টগ্রামে ঘোষণা করলেন, "গণতন্ত্রের নীতি ও আদর্শেই দেশ পরিচালিত হবে।" তার একদিন আগে ঠাকুরগাঁয়ে এক জনসভায় লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী বললেন, "মুজিববাদের চার নীতি দ্বারাই দেশ চালিত হবে।" তার কয়েকদিন পর ৩১শে জুলাই আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটিতে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে মুজিববাদ কায়েমের শপথ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। ১২ই আগষ্ট অর্থমন্ত্রী ও প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ভাওয়ালের এক জনসভায় বললেন, "সমাজতন্ত্রের প্রতি বাধা আসলে গণতন্ত্র ত্যাগ করব।" ২০শে আগষ্ট আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুর রাজ্জাক বললেন, "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ধার করা আদর্শ এবং মাওবাদী চক্রান্ত।" রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, "গণতন্ত্র কায়েম হবে!" মন্ত্রী বলেন, "সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনে গণতন্ত্র ত্যাগ করব!!" শীর্ষ নেতা শেখ মুজিব বলেন, "দু'টাকে মিলিয়ে

মুজিববাদ কায়েম করা হবে!!!" এভাবেই দেশে সৃষ্টি করা হল আদর্শগত বিভ্রান্তিকর এক চরম অবস্থা। আর এ বিভ্রান্তির ফলে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগই নয় সমস্ত জাতি হল দ্বিধা-বিভক্ত।

ভারতে দাসখত লিখে দিয়ে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র গলধঃকরণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগ সরকার স্ববিরোধী ঐ চার নীতিকে শাসনতন্ত্রের চার স্তম্ভে পরিণত করে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখিত গণবিরোধী নীতিগুলোর ককটেল ফর্মুলা দিয়ে দেশ শাসন করে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা ও সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টার ফলে দেশ ও জাতির অবস্থা কি হয়েছিল সেটা অনুধাবন করার জন্য নীতিগুলোর কিছুটা বিশ্লেষন দরকার। জনাব তোফায়েল আহ্মদের দাম্ভিক বক্তব্য, "সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র একসাথে কায়েম করে মুজিববাদকে বিশ্বের তৃতীয় রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।" এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী বলতে হয়, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দু'টো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দর্শন। গণতন্ত্রে মূল প্রেরনা এসেছে মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে। "Man is born free and shall die free." রাষ্ট্রকাঠামোর Basic structure that is economics এবং super structure that is politics এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের থাকবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, থাকবে তাদের মেধা ও কর্মশক্তির বিকাশের অবাধ পরিবেশ, থাকবে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। এ নীতির উপরই গড়ে উঠেছে পশ্চিমা দেশগুলোর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও তাদের কৃষ্টি এবং সভ্যতা। বিকশিত হয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। গণতান্ত্রিক সভ্যতার anti thesis হিসেবেই কার্ল মার্কস উপস্থাপন করেন সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক দর্শন। ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরনের Transitionary phase-কে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক অধ্যায়। সমাজতন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্য কেড়ে নেয়া হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা। জাতীয় পরিসরে চাপিয়ে দেয়া হয় একটি বিশেষ শ্রেণীর একনায়কত্ব। রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে উৎপাদন যন্ত্রগুলোর ভাগ্য বিধাতা হয়ে উঠেন দলীয় নেতারা। উৎপাদন শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের সব সম্ভবনা ও পথ রূদ্ধ করে দেয়া হয়। Insentive হীন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের মাত্রা কমে যায়। অস্বাভাবিকভাবে মানুষকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালানো হয় যন্ত্রে। যান্ত্রিক জীবনের বিভীষিকার চাপে জনগণের কর্মস্পৃহা লোপ পায়। সাধারণ জনগণের শ্রমের ফলে অর্জিত সম্পদের ভোগী হয়ে উঠেন রাজনৈতিক পার্টির নেতারা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আমলাতন্ত্র। জনসাধারনের জীবনযাত্রার মান কমে যায় ক্রমান্বয়ে। ফলে ঘনীভূত হয়ে উঠে সামাজিক ক্ষোভ। তারই বর্হিপ্রকাশ সামাজিক বিপ্লবের স্রোতে ঠুনকো তাসের প্রাসাদের মত ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা।

সমাজতন্ত্রের নিঃসাড়তা আজ বিশ্ব পরিসরে প্রমাণিত হয়েছে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিপর্যয়ের ফলে। সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতারা আজ সমাজতন্ত্রের আদর্শকে আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির নীতিকে গ্রহণ করে অতীত ভুলেরই শুধু প্রায়শ্চিত্ত করছেন তা নয়: তারা এটাও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছেন গণতন্ত্রকে গ্রহণ করলে সমাজতন্ত্রকে বর্জন করাটা হয়ে উঠে অপরিহার্য। এ দু'য়ের সহাবস্থান বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। প্রতিটি মানুষ তার আপন স্বাতন্ত্রে বিকশিত। এ প্রাকৃতিক নিয়মকে মেনে নিয়ে গড়ে উঠেছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দর্শন। তাই আজও মানুষের কাছে আবেদন রয়েছে এ দর্শনের। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক নিয়মকে অস্বীকার করে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা এবং যন্ত্র হিসেবে মূল্যায়ন করার ফলেই সমাজতন্ত্র দর্শন হিসেবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেনি। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের জনগণ ও ঠিক একই কারণে মেনে নেয়নি সমাজতন্ত্রের চাপিয়ে দেয়া নীতি। বিশ্বাস করেনি আওয়ামী লীগের জগাখিচুড়ী মুজিববাদী আদর্শের ভাওতাবাজী।

এবার আলোচনা করা যাক ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে। ধর্মনিরপেক্ষতার আক্ষরিক মানেটা আজ অব্দি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যদি বোঝানো হয় সব ধর্ম থেকে সমদূরত্ব বজিয়ে চলা, তাহলে সেটা হয়ে পড়ে ধর্মহীনতারই শামিল। বর্তমান আধুনিক বিশ্বেও প্রতিটি মানুষ কোন না কোন আদর্শ এবং বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই বেঁচে থাকে। তারা বাঁচার উৎপ্রেরনাও পেয়ে থাকে সে সমস্ত বিশ্বাস এবং আদর্শ থেকে। কেউ কি কোন আদর্শ কিংবা বিশ্বাস ছাড়া এ পৃথিবীতে জীবনধারণ করতে পারে? হয়তো বা পারে। তবে আমার জানা মতে তেমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাত আজঅব্দি আমি পাইনি। বিশ্বাস অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন:- ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবতাবাদ, এথিজম বা নিরশ্বরবাদ, এনিমিজম, পৌত্তলিকতাবাদ প্রভৃতি। যে যাই বিশ্বাস করুক না কেন সেটা ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার। প্রত্যেকের কাছে তার বিশ্বাস তার জীবন ধর্ম। রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা জণগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার অর্থ দাড়িয়েছিল জনগণকে তাদের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস থেকে জোর করে নিরপেক্ষ রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এ ধরণের প্রচেষ্টা অবশ্যই মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সরকারিভাবে শাসনতন্ত্রের স্তম্ভ হিসাবে গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়ের লোকের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাসের অবমাননা করেছিল। বাংলাদেশের ধর্মভীরু জনতা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের এ অবমাননা কিছুতেই মেনে নেয়নি। প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে এ দেশের মানুষ চিরকাল। তাছাড়া ধর্মীয়

সহনশীলতার এক গৌরবময় ঐতিহ্য বাংলাদেশী জনগণ আদিকাল থেকে বহন করে এসেছে। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ধর্মীয় আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক হিংসাত্মক হানাহানি এমনকি ধর্মীয় যুদ্ধও হয়েছে। বর্তমান ভারতেও সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা ঘটছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায় শান্তিতে বসবাস করেছে যুগ যুগ ধরে, নির্ভয়ে, আপন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে। এটা ঐতিহাসিক সত্য এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গৌরব। এ গৌরবকে কলুশিত করার জন্য সাম্প্রদায়ীকতাকে উসকে দিয়ে কায়েমী স্বার্থ এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে অনেকেই। কিন্তু তাদের সব চক্রান্তই ব্যর্থ করে দিয়েছে বাংলাদেশের সচেতন জনতা। বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়। ধর্ম বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই নয়, ধর্ম হচ্ছে তাদের জীবন আদর্শ (Way of Life)। তারা মনেপ্রানে ধার্মিক কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ইসলাম ধর্মের অনুশাসন তাই তারা পালন করে বিচার বিবেচনা করে। ইসলাম ধর্মে অন্য ধর্মালম্বীদের ধর্ম পালনের সম্পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে শুধু তাই নয়; সংখ্যালঘু ধর্মালম্বীদের প্রতি মুসলমানদের কিংবা মুসলমান রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব সে সম্পর্কেও পরিষ্কার নির্দেশ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। সে অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করা ছিল নিঃপ্রয়োজন। বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের জীবনধারার আলোকে প্রণীত হবে স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র এটাই ছিল জনতার আশা ও আকাঙ্খা।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই জাতীয় পরিচিতি এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে শোরগোল তুলল। কিন্তু তারা পূর্বতন ঐতিহাসিক বাংলাদেশের এই মানবগোষ্ঠির জাতীয়তার মূল ও ভিত্তি সম্পর্কে কিছুই বলল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সুযোগে অনেকেই আবার সরবে মেতে উঠল। তারা বলে বেড়াতে লাগল, "মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে রাজনীতি উপমহাদেশে সংগঠিত হয়েছিল এবং পরিণতিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল, সেই দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে।" অর্থাৎ পক্ষান্তরে তারা এটাই বলার চেষ্টা করল যে, ১৯৪৮ সালে ভারত বিভক্তি অন্যায়ভাবে করা হয়েছিল।

এ ধরণের উক্তি নেহায়েত অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ধরণের বক্তব্যে অখন্ড ভারতের প্রবক্তাদের প্রচারণারই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকালে কংগ্রেস অনুসৃত অখন্ড ভারত এবং মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্ব এই বিষয় দুইটির একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে।

প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ থেকেই এই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে স্বাধীনভাবে বসবাস করে এসেছে। শুধুমাত্র বহিরাগত বিজাতীয় শক্তিরাই তাদের শোষণ পাকাপোক্ত করার জন্য অস্ত্রের বলে দেশীও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই উপমহাদেশে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। বৈদিক যুগে আর্য্য ভাষীদের আগমনের কাল থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশবাদের শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস ঘাটলে এই সত্য অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

আদিকালের বর্ণ হিন্দুরা রামরাজ্য কায়েমের ধুঁয়া তুলে অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি আফগান এবং মুঘল শাসকরাও। একমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই আধুনিক উচ্চতর মানের সমরাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বদৌলতে পুরো উপমহাদেশকে একটি প্রশাসনিক রাষ্ট্রের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। অতএব যুক্তিসঙ্গত কারণেই বলা যায় যে, একক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক।

উনিশের দশকে বৃটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির আন্দোলন যখন দানা বেধেঁ উঠছিল তখনই পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় দীক্ষিত বর্ণ হিন্দুদের নেতৃত্বে সৃষ্টি করা হয় কংগ্রেস পার্টি বৃটিশ প্ররোচণায়। মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতি সত্ত্বার স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করে বৃটিশ সৃষ্ট Indian Union-কে অটুট রেখে স্বাধীনতার পর তাদের ক্ষমতায় বসানো। এর ফলে বর্ণ হিন্দুরা দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন অখন্ড ভারতে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা দেখতে পায়। তাদের প্রতি বৃটিশ সহযোগিতার কারণ ছিল মূলতঃ দু'টি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উপমহাদেশ দখল করতে হয়েছিল মুসলমানদের বিরোধিতার মুখে। ফলে মুসলমানরা হয়ে উঠে তাদের চোখের বালি। প্রতিহিংসার রোষানলে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের ঘৃনা ও সন্দেহ করতে থাকে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা বৃটিশদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের সাহায্যই করেছিল মুসলমানদের পরাস্ত করে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে। পুরস্কার স্বরূপ মুসলমানদের ধনসম্পদ হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে বৃটিশ অনুকম্পা ও মদদপুষ্ট হিন্দুরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়। মুসলমানরা হয়ে পরে নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন। সুদীর্ঘ দুই'শ বছরের বৃটিশ গোলামীর ইতিহাসে হিন্দু সম্প্রদায় বরাবরই ছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির সহযোগী মিত্রশক্তি আর মুসলমানরা পরিণত হয় নিগৃহ ও করুণার পাত্রে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠা উচ্চবিত্ত বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের আনুগত্য সম্পর্কে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠি ছিলেন নিশ্চিত (Convinced)। তাই তারা চেয়েছিলেন স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ঐ শ্রেণীকেই অধিষ্ঠিত করতে,

যাতে করে সমগ্র উপমহাদেশে তাদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখা সম্ভব হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কংগ্রেসকে জাতীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি ছিল তাদের সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাবিদার বানাবার পূর্বশর্ত। সেটা অর্জন করার জন্য ধর্মীয় চেতনাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। অতি কৌশলে 'বন্দে মাতরম', 'ভারতমাতা', 'হিন্দুস্থান', 'জয় হিন্দ' ইত্যাদি শ্লোগান তুলে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ও আনুগত্য লাভ করে কংগ্রেসকে একমাত্র জাতীয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন 'নব্য চানক্যরা'। but every action has an equal and opposite reaction. বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলনের গায়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী কংগ্রেস যখন হিন্দু ধর্মের নামাবলী একতরফাভাবে চাপিয়ে দিল তখন সংখ্যালঘু জাতি-গোষ্ঠিগুলো নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে শংকিত হয়ে হয়ে উঠে।

এই অবস্থায় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বায় বিভক্ত মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য ভিন্ন রাষ্ট্রের দাবিতে সোচ্চার হয়ে জোর আন্দোলন গড়ে তোলে। এই প্রেক্ষাপটেই কংগ্রেসের মোকাবিলায় মুসলমানদের দাবিকে রাজনৈতিক রূপ দেবার জন্যই গঠন করা হয়েছিল রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের অখন্ড ভারত তত্ত্বের মোকাবিলায় মুসলিম লীগ প্রচার করেছিল দ্বি-জাতি তত্ত্ব। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্তান এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান, এই দু'টো দাবিতে হিন্দু-মুসলমান এই দুই ধর্ম গোষ্ঠির মেরুকরণ ভয়াবহ সংঘাতের রূপ ধারণ করে। সংঘর্ষে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটে দু'পক্ষেই। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয়েছিল বৃটিশ সরকারকে। তর্কের খাতিরেও যদি ধরে নেয়া হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা দ্বি-জাতি তত্ত্বকে খন্ডিত করেছে তবে যুক্তিগত কারণেই মেনে নিতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অখন্ড ভারত তত্ত্বকেও খন্ডিত করেছে একইভাবে।

কিন্তু আমার মনে হয় ১৯৭১ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের অসাড়তা নয় বরং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে ভারত একটি বহুজাতিক দেশ। একই সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র বিশেষ একটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে কোন জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে মূল ভূ-খন্ড, ভাষা, নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধও একইভাবে প্রভাব রাখে। নিদির্ষ্ট ভূ-খন্ডে ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠি, সম্প্রদায়, জাত, কুল নির্বিশেষে যখন কোন জনগোষ্ঠি এক সামগ্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তখনই জাতীয়তাবাদ প্রাণ পায়। জাতীয়তাবাদ মূলতঃ এক ধরণের অনুভূতি, এক ধরণের মানসিকতা, এক ধরণের জাগ্রত চেতনা, যার সৃষ্টি হয় জনসমষ্টির প্রবাহমান

ঐতিহাসিক জীবনধারায়। জাতীয় সংগ্রামের ধারায় গতিশীলতা অর্জন করার জন্য কখন কোন উপাদানটা বিশেষ ভূমিকা রাখবে সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সময়, বাস্তব পরিস্থিতি, জনগণের প্রত্যাশা এবং নেতাদের উপর।

অতীত সম্পর্কে গৌরববোধ, বর্তমানের উপভোগ বা বঞ্চনা আর ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করে এবং জনমনে গড়ে তোলে ঐক্যবদ্ধ সুরের মূর্চ্ছনা। এ ধরণের ঐক্যবদ্ধ চেতনা যখন কোন জনসমষ্টিকে একত্রিত করে তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। সামগ্রিক সত্ত্বা হিসাবে তা বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয় আর তারই ফলে একটি জাতি সবরকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আদর্শিক ও দৈহিকভাবে প্রস্তুত হয়।

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে এখনও প্রচুর বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ বিভ্রান্তিকে আরো জটিল করে তুলেছেন তাদের ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য। এ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বুদ্ধিজীবিদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন তাও প্রায় অনুপস্থিত। পরিষ্কারভাবে সত্যকে আমাদের জানতে হবে। আমাদের জাতীয়তাবাদ কি? বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ? না বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ?

প্রাচীন বঙ্গ অববাহিকা ও তৎসংলগ্ন ভূ-ভাগ যে ভারতীয় উপমহাদেশে একটি প্রাচীন এবং সুপরিচিত স্ব-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল অঞ্চল ছিল তার অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বিধৃত রয়েছে। (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০-১০০০ সালের মধ্যে) ঐতরেয় অরণ্যকে বঙ্গের কথা রয়েছে। মহাভারত ও হরিবংশেও দেখা যায় বঙ্গ প্রসঙ্গ। সুতরাং বঙ্গ জনপদকে নেহায়েত অর্বাচীন বলে আখ্যায়িত করার কোন কারণ নেই। রামায়নেও বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন জনপদ হিসেবে বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। এ দেশের দু'কুল পাত্রোর্ন ক্ষৌম কার্পাসিক বস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল বলেও কৌটিল্য বয়ান করেছেন। বরাহ মিহির (৫০০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে) তার বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলীয় দেশ অর্থাৎ বঙ্গ দেশ, পরবর্তিকালে বাংলাদেশের অন্তর্গত যে কয়টি জনপদের নাম করেছেন সেগুলো হল: হরিকল, গৌতক, পৌন্ড্র, বঙ্গ, বর্ধমান, তাম্রলিপ্তি, সমতট ও উপবঙ্গ। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোর, খুলনা সংলগ্ন দক্ষিন বঙ্গের কিছু অংশকে উপ-বঙ্গরূপে শনাক্ত করেছেন। এ ছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের আর একটি প্রাচীন জনপদ সুহ্মের কথাও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের এবং আদিকালের বঙ্গ দেশের পশ্চিম এলাকার নাম ছিল সুহ্ম, অঙ্গ, বর্তমান মিথিলা ও কলিঙ্গ উড়িষ্যা প্রদেশের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের তথা বঙ্গ দেশের অর্ন্তভূক্ত ছিল।

হিম যুগের পর থেকে বাংলাদেশ কখনও জনশূন্য থাকেনি। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মানবগোষ্ঠির মতো বাংলাদেশেও আদিম মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছিল। কারণ, এখানেও প্রত্ন ও নব্য প্রস্তর এবং তাম্র যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোদ, বাউড়ী, কোল, ভীল, মুন্ডা, সাওঁতাল, সাবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চন্ডাল, রাজবংশী সমুদয় অন্ত্যজ জাতির সমষ্টিই বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। ভাষার ও আকৃতির মূলগত ঐক্য হতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় জাতি একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠির বংশধর। এই মানবগোষ্ঠির সাথে অষ্ট্রেলিয়ার অদিবাসীদের চেহারার এবং ভাষার মিল পাওয়া গিয়েছিল বলে এদের বলা হয় অস্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অষ্ট্রিক।

বাংলাদেশের দোরগোড়ায় রাজমহল পাহাড়। সেখানে বন-জঙ্গলের অধিবাসী পাহাড়ীদের ছোট্ট-খাট্টো গড়ন, চেহারা, গায়ের রং মিশমিশে কালো, নাক থেবড়া। বেদ এবং নিষাদে যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে হুবহু মেলে সিংহলের ভেড্ডাদের। ফলে এদের নৃ-তাত্ত্বিক নাম হয় ভেড্ডিড। নিষাদ জাতি বলেও তারা আখ্যায়িত হয়েছে। প্রাচীন বাংলাদেশের নানা জায়গায় নানারকম পরিবেশে এবং জল হাওয়ায় নানান দলে ভাগ হয়ে মানুষ বসবাস করত। পরে তাদের রক্তে বহিরাগতদের নানা রক্তের ধারা এসে মিশেছে। বাচঁবার আলাদা আলাদা ধরণের দরুন এবং রক্তের মেশামেশি হওয়ায় স্থানভেদে চেহারায় নানারকম ধাঁচ সৃষ্টি হয়েছে। মনের গড়নে, মুখের ভাষায়, সভ্যতার বাস্তব উপাদানে তার প্রচুর ছাপ আছে। বাংলাদেশের মাটির গুন আর সেই মাটিতে নানা জাতের মেলামেশা এরই মধ্যে বাংলাদেশী জনপ্রকৃতির বৈচিত্র আর ঐক্যের গোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীগন আর্য্য জাতির বংশগত নন। বাংলা ভাষার বিশ্লেষন করে পন্ডিতগণ এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। উপরন্তু দ্রাবিড় বা আর্য্য আসলে নরগোষ্ঠির নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠির নাম মাত্র। একই নরগোষ্ঠির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার চলন থাকতে পারে। কাজেই শুধুমাত্র ভাষা দিয়ে কোন নরগোষ্ঠির নামকরণ সঠিক নয়।

আসমুদ্রহিমাচল আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ। প্রশ্ন দেখা দেয় বাংলা অথবা বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তি হল কি করে? বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই সমস্ত শব্দের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক। জনাব আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাংলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা হলঃ- প্রাচীন বঙ্গ শব্দের সাথে আল শব্দ যুক্ত করে সুলতান শামসুদ্দিন বাঙ্গালী শব্দের চয়ন করেন। আল শব্দের অর্থ পানি রোধ করার ছোট-বড় বাঁধ।

অন্যদিকে সুকুমার সেনের অভিমত হল প্রথমে বঙ্গ থেকে বাঙ্গালাহ্‌র সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম শাসন আমলে পারসিক বাঙ্গালাহ্‌ উচ্চারণ থেকে পুর্তুগীজরা বানিয়েছে বেঙ্গল এবং ইংরেজদের হাতে পড়ে বঙ্গ পরিণত হয়েছিল বেঙ্গলী বা বাঙ্গালীতে।

বাংলাদেশী জনগণের বাসভূমির রয়েছে একটি ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক সীমানা। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সীমা সংক্ষেপে বলতে গেলে, উত্তরে হিমালয় ও তার গায়ে নেপাল, সিকিম ও ভূটান রাজ্য, উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারভঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সীমান্তবর্তী সমভূমি, পূর্ব দিকে গারো, খাসিয়া, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা, আসাম, চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী বেয়ে দক্ষিনে সমুদ্র পর্যন্ত। পশ্চিমে রাজমহল, সাওঁতাল পরগনা, ছোট নাগপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলসমূহ, বিহারের বীরভূম, মানভূম, ধলভূম, কেওজ্ঞর, ময়ুরভজ্ঞের অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর। এই সীমারেখার মধ্যেই প্রাচীন বাংলাদেশের বা বঙ্গের গৌড়, পুন্ড্র, বারেন্দ্র, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বাঙ্গাল, হরিকল প্রভৃতি জনপদ গড়ে তুলেছিল বঙ্গবাসী বা বাংলাদেশীরা। কোল, ভীল, শবার, পুলিন্দ, হাড়ী, ডোম, চন্ডাল, সাওঁতাল, মুন্ডা, ওরাঁও, ভূমিজ, বাগদী, বাউড়ী, পোদ, মালপাহাড়ী প্রমুখ অন্তজ জনগোষ্ঠির মিলন এবং তাদের রক্তের সাথে বহিরাগত নানা রক্তের ধারা এসে মিশে এক হয়ে সৃষ্টি হয় বঙ্গবাসী অথবা বাংলাদেশী জাতিসত্ত্বার। সময়ের স্রোতে রাষ্ট্র বিধাতাদের হাতে বাংলাদেশীদের আবাসভূমি বাংলাদেশ খন্ড-বিখন্ড হলেও তার ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক সীমারেখা মুছে ফেলতে পারবে না কেউ কোনদিন। রাষ্ট্রীয় সীমারেখা অপরিবর্তনীয় নয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রাচীন বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ জনপদগুলো গড়েছেন। রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন, জন্ম দিয়েছেন বিস্ময়কর সংস্কৃতি ও শিল্প ঐতিহ্যের। এ ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় অধিকার। আজ রাষ্ট্রীয় পরিসীমা এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে গোষ্ঠি স্বার্থে অযথা যতই যুক্তিহীন বিতর্কের অবতারনা করা হোক না কেন, বাংলাদেশের সচেতন জনগণকে বোকা বানিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা সম্ভব হবে না বেশি দিন। তারা তাদের অতীত ঐতিহ্য এবং ন্যায্য অধিকার ভবিষ্যতে একদিন না একদিন আদায় করে ছাড়বেই ইনশাল্লাহ্‌। পূর্ণ মর্যাদায় একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত বাংলাদেশ এবং আমরাও বিশ্বের সামনে মাথা উচুঁ করে দাড়াতে সক্ষম হব গর্বিত বাংলাদেশী হিসাবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের কোন কোন পর্যায়ে বাংলা ভাষা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এ কথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বললে সেটা হবে বিভিন্ন নরগোষ্ঠির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাজার বছরের ঐতিহ্যে গড়ে উঠা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উপর একটি ভাষাগোষ্ঠির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ, বাঙ্গালী কোন নরগোষ্ঠির নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠির নাম মাত্র।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিসীমা নিয়ে ১৯৭১ সালে প্রথম চক্রান্ত করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রূপ নির্ধারন নিয়ে। সরকারিভাবে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকার যে রূপায়ন করা হয়েছিল সেটা ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সবুজ পটভূমিতে লাল সূর্য তার মাঝে হলদে রঙের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ। কিন্তু সচেতন জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা চক্রান্তকারীদের সব চক্রান্তের মূলে কুঠারাঘাত করে সেই জাতীয় পতাকা প্রত্যাখান করেন এবং বর্তমানের জাতীয় পতাকার রূপ গ্রহণ করতে সরকারকে বাধ্য করেন। সবুজ বাংলার পটভূমিকায় উদিয়মান রক্তিম সূর্য। উদিয়মান সূর্য ক্রমশঃ পূর্ণতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আর তার আলোকে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে আদি বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গরূপ। এটা লেখকের অবাস্তব স্বপ্ন নয়। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ভবিষ্যতে একদিন এই স্বপ্ন রূপান্তরিত হবে বাস্তব সত্যে।

বাংলাদেশী জনগণের দরদী মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী তার মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে শেষবারের মত আমায় বাংলাদেশী জনগণের মরন-বাচঁন সমস্যা নিয়ে যে সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা থেকে পাঠকগণ বর্ষিয়ান নেতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ভাবনার গভীরতা সম্পর্কে জানতে পারবেন বলেই ঘটনাটির অবতারনা করলাম। পাঠকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন তার বাস্তব জ্ঞানের প্রসারতা:-

১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন অপারেশনের জন্য। আমিও তখন লন্ডনেই অবস্থান করছিলাম। খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। খবর পেয়েই তিনি একদিন আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু সাংবাদিক জনাব গাজীউল হাসান খানের মাধ্যমে ডেকে পাঠান। সময়মত আমি ও গাজী তার ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম সকাল ১০টার দিকে। হাসপাতাল থেকে অপারেশনের পর বাংলাদেশ দূতাবাসই তাকে সেই ফ্ল্যাটে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম তার পুত্র জনাব নাসের খান ভাসানী মাওলানা সাহেবের ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। হুজুর আধশোয়া অবস্থায় বিছানায় চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ হয়ে কি যেন ভাবছিলেন! অপারেশনের ক্ষত তখনও শুকায়নি। চলাফেরা, পথ্য সব কিছুই রেসট্রিকটেড। আমরা এসেছি শুনে তিনি চোখ মেলে আমাকে ইশারায় তার বিছানায় গিয়ে বসতে বললেন। আমি তার আদেশ অনুযায়ী তাঁর শিয়রে গিয়ে বসলাম। গাজী কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিল। সালাম দোয়ার পর হুজুর জিজ্ঞেস করলেন,

–নাস্তা করছস?

–হ্যাঁ হুজুর, নাস্তা কইরাই আইছি। জবাব দিলাম।

–ভালো কথা। তাইলে আমারে নাস্তা খাওয়া। আমি ডিম খামু। স্বল্প দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জনাব নাসের ভাসানীর সাথে চোখাচোখি হল। নিচুগলায় তিনি আপত্তি জানালেন। বললেন,

–ডাক্তারকে না জানিয়ে ডিম দেয়া ঠিক হবে না। ক্ষেপে গেলেন মাওলানা। জেদ ধরে বসলেন ডিম তিনি আজ খাবেনই। অগত্যা দু'টো ডিমের পোঁচ করে আনলেন নাসের ভাসানী। ডিমের প্লেটটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ইশারায় সেটা আমাকে দিতে বলে তাকে বাহিরে গিয়ে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিলেন মাওলানা। নাসের ভাসানী চলে গেলেন। গাজী বসে আছে চুপচাপ। হুজুর বললেন,

–নে শুরু কর। খাওয়াইয়া দে।

আমি আস্তে একটু একটু করে চামচ দিয়ে তাঁকে ডিম খাওয়াতে শুরু করলাম। এ বয়সে অপারেশনের ধকলে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কথা বলছিলেন অতি ক্ষীণ স্বরে। খাওয়ার ফাঁকেই তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে নিলেন। লন্ডনে কবে এলাম? কেন এলাম? পরিবার কোথায়? সবকিছুরই সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। খাওয়া শেষে মুখ ধুইয়ে মুছে দিলাম। খাওয়ার পর কিছু ঔষধ খাওয়ার ছিল সেগুলোও তাকে খাইয়ে দিলাম। এবার তাকে কিছুটা relaxed মনে হচ্ছিল। পাশে বসে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। লক্ষ্য করলাম, মাওলানা যেন কোন এক গভীরে তলিয়ে গেছেন। বেশ অনেকক্ষণ পর হঠাৎ করেই বলা শুরু করলেন,

–বাবা, ৯৭ বছরের বেশি বয়স হইয়া গেছে। কবে আছি, কবে নাই কে জানে! তবে একটা কথা তোরে কইয়া যাইবার চাই। এ বুড়া সারাজীবনে যা করতে পারে নাই তুই ও তোর সাথীরা সেটা কইরা বাংলাদেশের ১০কোটি জনগণরে বাচাঁইছোস জালেমের হাত থ্যাইকা। এ বুইড়া তোদের দোয়া দিতাছে, আল্লাহ তোদের হায়াত দারাজ করুক। বলেই তিনি আমার মাথায় গায়ে তার ক্ষীণ হাত বুলিয়ে শরীরে, বুকে ফুঁক দিলেন। তার চোখের কোল ঘেষে তখন পানি বেরিয়ে এসেছে। চোখ বোঁজা অবস্থায় তিনি আমার জন্য দোয়া করছিলেন বিড়বিড় করে। কাছে বসেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না কোন সুরা বা আয়াত পড়ছিলেন তিনি। আমি তার অশ্রুধারা মুছিয়ে দিয়ে আবেগে বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম। আমার প্রতি তার স্নেহ ও মমতা দেখে আমার চোখ দু'টোও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। কেমন যেন এক ঐশ্বরিক স্তব্ধতায় মহীয়ান হয়ে চোখ বুজে ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক বাংলাদেশের মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী। সে এক অভূতপূর্ব পরিবেশ! অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তার হাত ধরে নিশ্চুপ বসে থাকলাম। তিনি চোখ খুললেন,

–বাবা, তোর জায়গা লন্ডন না, দেশে যাইতে হইবো।

হুজুরের কথার জবাব কি দেব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সে সময় আমাদের সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কিছু রাজনৈতিক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। ভাবছিলাম হুজুরকে সব খুলে বলবো কিনা। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনিই বলে উঠলেন,

–জিয়ার সাথে মতের অমিল হইছে; সেইডা আমি জানি; কিন্তু জিয়ারই সব ভুল। আমি গিয়া তারে বুঝামু। কথা শুনলে ভালো আর না বুঝলে আমি জানি কি করতে অইবো। তুই তৈরি থাকিছ। তবে বাবাজান একটা কথা। বুড়া মানুষের কথাটা মন দিয়া হুনিস। যে কাজ শুরু করছস তার শেষ বহুদূরে। বাংলাদেশের মধ্যেই চোখ বন্ধ কইরা উট পাখি হইয়া বইসা থাকলে চলব না। চোখ খুইলা চাইতে হইবো সীমানার বাইরে। কথাটা একটু ভাল কইরা চিন্তা কইরা দেখিছ।

কথা বলতে বলতে তিনি বেশ কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। আমি আস্তে আস্তে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম,

–হুজুর আপনি দোয়া করবেন যাতে আমি আমার নিয়তে কায়েম থাকতে পারি। আল্লাহ্‌পাক যেন আমারে সুযোগ দেন যাতে একজন মুজাহিদ হিসাবে আপনার ইশারা অনুযায়ী সঠিক রাস্তায় বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে প্রয়োজনে কোরবান করতে পারি।

আমার জবাব শুনে বিছানায় শুয়েই তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। তার উষ্ণতা ও আন্তরিকতায় আমার বুক ভরে উঠেছিল। ডাক্তার এসে গেছে। আমাদের বিদায় নিতে হবে। সালাম করে আমি আর গাজী বেরিয়ে এলাম। বুকের মাঝে গেঁথে নিয়ে এলাম মহান নেতার অমূল্য দিক নির্দেশ। সেটাই মাওলানা ভাসানীর সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। এর অল্প কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে........রাজেউন)। তার মৃত্যুতে জাতি হিসেবে আমরা হারালাম একজন জনদরদী অভিজ্ঞ মুরুব্বী এবং দূরদর্শিতা সম্পন্ন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ।

১৯৭২ সালের প্রায় গোড়া থেকেই দেশে মহা-অরাজকতার সৃষ্টি হয়। খুন, রাহাজানী, মুনাফাখোরী, গুন্ডামি দিন দিন বাড়তে থাকে। যুদ্ধকালীন সময় চক্রান্তকারী যুব ও ছাত্রনেতারা তাদের কায়েমী স্বার্থ ও দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে ভারত সরকারের অনুগ্রহ লাভ করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং ভারতীয় সেনা বাহিনীর সহায়তায় মুজিব বাহিনী পরে রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় নীল নকশা বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে বাংলাদেশের ছাত্র ও যুব সমাজের মাথা নত করে দিয়েছিল। তাদের সংগ্রামী

ঐতিহ্যের অবমাননা করে তাদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার এক কলংকিত অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

২২শে ডিসেম্বর প্রবাসী সরকার ঢাকায় এসেই অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু শেখ মনি, তোফায়েল, আব্দুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, সিরাজুল আলম খান প্রমুখ যুব ও ছাত্রনেতারা সরকারের সে আদেশ অমান্য করে। ১৬ই ডিসেম্বর অসংখ্য তরুণ মুজিব বাহিনীতে যোগদান করে রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা বনে যায়। এদের অধিকাংশই ছিল রাজাকার, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি জনধিকৃত বাহিনীর সদস্য। ছাত্র যুব নেতৃবৃন্দ তখন তাদের বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্যই এ সমস্ত সমাজ বিরোধীদের দলে টেনে নেন। এদের জনগণ পরবর্তিকালে ১৬ ডিভিশন নামে অভিহিত করে। যুব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে ফিরেই মুজিব পরিবারের অনুকম্পা ও সহানুভূতি লাভের আশায় জনাব তাজুদ্দিন আহমদ সম্পর্কে কদর্য্য প্রচারণা নতুন করে শুরু করেন। তারা বলেন, "শেখ মুজিবের প্রতি তাজুদ্দিনের কোন আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি একাই হতে চান।" তারা আরো বলেন, "শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষক সেটাও জনাব তাজুদ্দিন স্বীকার করেন না। তাছাড়া শেখ মুজিবকে উপেক্ষা করার আর একটি নজির এই যে, তিনি তাকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী না করে ক্ষমতার অভিলাষে নিজেকেই প্রধানমন্ত্রী বানান এবং শেখ মুজিবকে শুধুমাত্র সাংবিধানিক ক্ষমতাহীন রাষ্ট্রপতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য সৎ হলে তিনি শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে নিজে উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রবাসী সরকার পরিচালনা করতে পারতেন।" এমনিভাবে তাজুদ্দিনের প্রতি শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের মন বিষিয়ে তুলেছিলেন তারা। শেখ মনির এতে মুখ্য ভূমিকা ছিল। শেখ মুজিব বাংলাদেশে ফেরার পর উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে আরো সক্রিয় হয়ে উঠেন। শেখ মুজিব যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রাম কালের নয় মাস নির্বাসিত ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে সেই অনুপস্থিতির পুর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন তারা। তার সামনে কেঁদে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার নাটক করে এদের অনেকেই বলেছিলেন, "আপনার ভাবমুর্তি ও নেতৃত্ব রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাজুদ্দিনের বিরাগভাজন হয়েছি আমরা। তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। শেখ কামালকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি। শুধু আমাদের বিরোধিতায়ই সেটা সম্ভব হয়নি। আমরা জোর করে তাকে মুজিবনগর হেডকোয়ার্টার্স এ কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসাবে রেখেছিলাম।" আরো অনেক কিছু বলে তার কান ভারী করতে সক্ষম হয়েছিলেন কুচক্রী ক্ষমতালিপ্সু যুব নেতৃবৃন্দ। শেখ মুজিব তাদের কথার সত্যতা যাচাই করার সুযোগ পেলেন না। কেননা, তার পরিবারের সদস্যগণ আরো রূঢ় ভাষায় তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে তাদের

মনের খেদ প্রকাশ করেন শেখ মুজিবের কাছে। এর ফলেই দেশে ফেরার মাত্র একদিন পরই ১১ই জানুয়ারী ১৯৭২ শেখ মুজিব তার দীর্ঘ দিনের পরীক্ষিত সহকর্মী জনাব তাজুদ্দিনকে অপসারন করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন। জনাব তাজুদ্দিনকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে বাদ না দিলেও তাকে সব ব্যাপারে সম্পুর্ণ উপেক্ষা করে চলতে লাগলেন শেখ মুজিব। প্রশাসনিক ব্যাপারে আবার তিনি যুব নেতৃবৃন্দের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। ফলে যুব নেতৃবৃন্দ জাতীয় পরিসরে সর্বময় ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হল। কিন্তু শেখ মুজিবের এ ধরণের আচরণে মনোক্ষুন্ন হলেন দলের বর্ষিয়ান নেতারা।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের উপর বর্বর নির্যাতন শুরু হয়। এ নির্যাতনে শুধু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের বিভিন্ন বাহিনীই অংশগ্রহণ করেনি, তাতে অংশ নেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিভিন্ন লাঠিয়াল ও বেআইনী সশস্ত্র পেটোয়া বাহিনী। রাজনৈতিক নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগ তোলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চেয়্যারম্যান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, কাজী জাফর আহমদ, ছাত্রলীগের রব-সিরাজ গ্রুপ। তারা আওয়ামী সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাড়াবার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানান। তারা বিবৃতি সমাবেশের মাধ্যমে বলেন, "বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ও সংগ্রামী ছাত্রজনতার প্রতিরোধ শক্তিকে শেষ করে দেবার জন্য মাত্র ৯মাস আগে নির্যাতন এবং পুলিশ ও সেনা বাহিনীরা বেপরোয়া গুলি চালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতেন যারা; ক্ষমতায় আসীন হয়ে গত মাসেই প্রায় ডজনখানেক জায়গায় ছাত্রজনতার সমাবেশে ও মিছিলে গুলি চালিয়েছেন তারা। শুধু তাই নয়, ক্ষমতাসীন দল দখলদার বাহিনীর দালালদের সহায়তায় প্রশাসন যন্ত্রকে প্রভাবিত করে ছাত্র, বিরোধী দলীয় কর্মী ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করে তাদের গ্রেফতার করছেন। রাজনৈতিক নেতারা রাজধানী থেকে সরকারি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কর্মী, ছাত্র, যুবকদের শায়েস্তা করার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে তাদের অযথা হয়রানি করছেন।"

১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর মেজর (অবঃ) এমএ জলিল ও আসম আব্দুর রবকে যুগ্ন আহ্বায়ক করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এ দলের মূল দার্শনিক গুরু ছিলেন সিরাজুল আলম খান ওরফে 'কাপালিক'। পার্টি গঠনের কয়েকদিন আগে জনাব সিরাজুল আলম খানের তত্ত্বাবধানে গণকণ্ঠ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যদিও গণকণ্ঠ প্রকাশলগ্নে শেখ মুজিব কাগজটিকে আশীবাদ দিয়েছিলেন; কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই গণকণ্ঠ 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' বাণী প্রচার করতে শুরু করে এবং পরবর্তিকালে জাসদের মুখপাত্র

হিসেবে বেরুতে থাকে। এতে শেখ মুজিব ভীষণভাবে চটে যান। ২১শে জুলাই ছাত্রলীগের পল্টন ময়দানের সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে রব গ্রুপ ও গণকণ্ঠের সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, "৭০ মন গরুর গোস্ত, ৭০ মন খাসীর গোস্ত, টাকা কোথা থ্যাইকা আসে? তিরিশ বছর রাজনীতি করলাম একটা পত্রিকা বার করতে পারলাম না। এক ইঞ্চি বিজ্ঞাপন নাই। আমরা কিছু বুঝি না?" এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লাইন প্রচার করার নীতি গ্রহণ করায় গণকণ্ঠ সত্যিই এক ইঞ্চি সরকারি বিজ্ঞাপন কখনোই পায়নি। জনাব সিরাজুল আলম খান ও জনাব রব ছিলেন দু'জন জনপ্রিয় ছাত্রনেতা। মেজর জলিল ছিলেন দেশপ্রেমিক একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তি সংগ্রামে তিনি ছিলেন নবম সেক্টরের কমান্ডার। গেরিলা এ্যাডভাইজার হিসেবে তার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল কিছুদিনের জন্য। দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক এই মুক্তিযোদ্ধার প্রতি প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার ও তাদের মুরুব্বী ভারত সরকার বিশেষ করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রথম থেকেই বিরূপভাব পোষণ করত। তাদের মতে মেজর জলিল ছিলেন একজন সাচ্চা জাতীয়তাবাদী এবং আপোষহীন চরমপন্থী প্রকৃতির মুক্তিযোদ্ধা। তাই একটি অতি সামান্য অযুহাতে সংগ্রামের প্রথম পর্যায়েই তাকে সেক্টর কামান্ডারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রবাসী সরকার। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর অন্যান্য কমান্ডারদের চাপে তাদের সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। এর বিশদ বিবরণ আগেই দেয়া হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

মিত্র বাহিনীর নজীরবিহীন লুটপাট ও আওয়ামী দুঃশাসন

- বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় ভারতীয় বাহিনী।
- মেজর জলিল বীরউত্তম কে গ্রেফতার করা হয়।
- দেশের সার্বিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।
- বিরোধী দলগুলোর উপর চালানো হল অত্যাচারের ষ্টিমরোলার।
- ৭ই মার্চ রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ জারি, গঠিত হয় সেচ্ছাসেবক বাহিনী, লাল বাহিনী এবং আরো অনেক প্রাইভেট পেটোয়া বাহিনী।
- জনগণ পরিণত হয় শত্রুতে।
- সোভিয়েত এবং ভারতীয় নৌ-বহর চট্টগ্রাম বন্দর দখল করে নেয়।
- সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা সব রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে হল কলাগাছ।
- শেখ মনির নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ ঘটে আওয়ামী যুব লীগ।
- ১লা জানুয়ারী ১৯৭৩, ঢাকার রাজপথ আবার রক্তে রঞ্জিত হল।
- শেখ মুজিবকে দেয়া 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব উঠিয়ে নেয়া হয় এবং একইসাথে তার ডাকসুর আজীবন সদস্যপদও বাতিল করা হয়।
- প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন ১৯৭৩ এর নির্বাচন।
- সংসদে সংবিধান গৃহিত হয়।
- বাকশালের বীজ নিহিত ছিল রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ জারির মধ্যে।
- রক্ষীবাহিনীর নিষ্ঠুর অত্যাচারের কয়েকটি বিবরণ।
- ৩১শে মার্চ ১৯৭৪ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি গঠিত হয়।
- সেনা বাহিনীর দেশব্যাপী অস্ত্র তল্লাশী এবং চোরাচালান বিরোধী অভিযান।
- মাওলানা ভাসানীকে গৃহবন্দী করা হয়।
- ১৯৭৪ এর ভয়াবহ বন্যা।
- রিলিফ দুর্নীতির জন্য ১ লক্ষেরও বেশি লোক অনাহারে মারা যায়।
- ১৯৭৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বিশেষ ক্ষমতা আইন পাশ এবং ২৮শে ডিসেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়।
- বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ।

যুদ্ধ শেষে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর সমস্ত হাতিয়ার, গোলাবারুদ, ভারী অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম এমনকি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মেশিনপত্র সব কিছু ভারতে নিয়ে যাবার পথে মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমিক মেজর জলিল বাধা দেন। তার উদাহরণ থেকে প্রেরণা পেয়ে অন্যান্য সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররাও একইভাবে ভারতে সবকিছু পাচারের বিরোধিতা করেন। মিত্রবাহিনীর লুটপাটের বিরোধিতা করার জন্য ভারত সরকারের ইশারায় প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাকে ছলনার মাধ্যমে গ্রেফতার করে। তার গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ১১ই মার্চ তার গ্রেফতারের প্রতিবাদে তার সেক্টর বরিশালে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করা হয়। সেনা বাহিনীর তরফ থেকেও প্রধানমন্ত্রীর কাছে মেজর জলিলের মুক্তির জন্য আবেদন জানানো হয়। সরকার জনগণের প্রতিক্রিয়ার জবাবে বলে, "তার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। সামরিক আইনে তার সেই সমস্ত অপরাধের বিচার হবে।" সরকারি এই ঘোষণায় প্রতিবাদ আরো জোরালো হয়ে উঠে। মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষেপে উঠেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড বিক্ষোভ ও জনমতের চাপের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে বাধ্য হয়ে সরকারকে পরে বিনাশর্তে মেজর জলিলকে মুক্তি দিতে হয়।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বেসামরিক বাহিনীর তৎপরতা ভীষণভাবে বেড়ে উঠে। ৯ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান আব্দুর রাজ্জাক বললেন, "আওয়ামী লীগ বিশ্বের নব মতবাদ মুজিববাদ বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" বাহিনীর জেলা প্রধান ও উপ-প্রধানদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, প্রতিটি ইউনিয়নে লাঠিসহ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং দেয়া হবে। তারপর ট্রেনিং শুরু হয়। ইতিমধ্যে জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রধান আব্দুল মান্নান এক লাখ সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করেন লালবাহিনী। ১লা মে ১৯৭২ এ লালবাহিনীর জঙ্গী সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, "৭ই জুন থেকে তারা সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন। এ অভিযানকে সার্থক করে তোলার জন্য ৪ঠা জুন তারা সরকারের কাছে গ্রেফতার, মারপিট, আটক করা, শাস্তি দেয়া প্রভৃতি ক্ষমতার দাবি জানান। দেশের প্রচলিত আইন থাকতে এ ধরণের দাবি জানিয়ে আইনকে নিজেদের হাতেই তুলে নেয়ার চেষ্টা করেন তারা। আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযান শুরু হওয়ার ৭দিন পর খুলনায় লালবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষ ঘটে দেশের আরো অনেক জায়গায়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। ক্ষমতার দাপটে তারা সাধারণ মানুষের উপর চালাতে থাকে অকথ্য নির্যাতন। অবস্থার এতই অবনতি ঘটে যে, আওয়ামী লীগের 'বি' টিম মোজাফফর ন্যাপ প্রধান ২০শে জুলাই সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে বিভিন্ন দলীয় বাহিনীর বেআইনী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি

জানান। তিনি বলেন, "কোন এক বিশেষ দলের স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য বাহিনী বেআইনী কার্যকলাপ ও নানারকম দুষ্কর্মে লিপ্ত রয়েছে। ক্ষমতাসীন দল, তার সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িত বাহিনীগুলো দলীয় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখছে না। তারা সরকারি প্রশাসনকে উপেক্ষা করে নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচার ও জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ ও প্রশাসন ঐ সমস্ত বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে রহস্যময় নিরবতা পালন করছেন।" তিনি এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বান জানান। 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠা করার এ সংগ্রাম পরিচালনা কালেই আওয়ামী লীগ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। এ সময়ের খবরের কাগজগুলোতে প্রতিদিন খবর বের হত গুপ্ত হত্যা, রাহাজানী, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং এবং গণপিটুনীতে মানুষ মারা যাবার খবর। সরকারি হিসাবে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে '৭৩ সালের জুন মাসের মধ্যে গুপ্ত হত্যা হয়েছে ২০৩৫টি, কিডন্যাপিং হয়েছে ৩৩৭টি, ধর্ষণ হয়েছে ১৯০ জনের, ডাকাতির সংখ্যা ৪৯০৭টি এবং আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে ৪৯২৫ জন নিরীহ ব্যক্তি।

১৯৭৩ সালের প্রথম পাচঁ মাসের মধ্যে ৬০টি থানা লুট করে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যায়। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ারে মনে করেছিলাম আমাদের সকল সংকীর্ণতা ধুয়ে মুছে গেছে। ভেবেছিলাম একটা সুস্থ ভিত্তির উপর জাতিকে নুতন করে গড়ে তোলার সুযোগ আমরা পাব। কিন্তু আজাদী লাভের পর একমাস না যেতে দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধের উম্মাদনা, অভিজ্ঞতা, রক্তপাত আমাদের শাসকগোষ্ঠির চরিত্রকে এতটুকু বদলাতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশে হৃদয়হীনতাই রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে নিয়ামক হয়ে দাঁড়াল। সেই অভিশাপ থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন লক্ষণও দেখা গেল না। স্বাধীনতার পর দু'বছর না যেতেই ঢাকা শহরের রাস্তা-ঘাটে যখন গন্ডায় গন্ডায় অনাহারে মৃতের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল তখন দেখেছি কি নিশ্চিন্তে অচিন্তনীয় বিলাসের স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছেন নব্য বিত্তশালীরা। বিদেশের টেলিভিশনে ধরা পড়েছে একপাশে না খেয়ে মরা লাশের স্তুপ ও অন্যপাশে বিকট কুৎসিত আলোকে সজ্জিত মন্ডপে বিবাহ অনুষ্ঠানে ভুরি-ভোজনের ছবি। এ হৃদয়হীনতা প্রকট হয়ে উঠে সংগ্রামের সাথীদের মাঝে কোন্দল সৃষ্টি করে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করার মধ্যে। আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে এ হৃদয়হীনতা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাকর একটি ব্যাপার। আর্থিক লোভ-লালসা, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের উগ্র বাসনাই এই হৃদয়হীনতার প্রধান কারণ। দেশের গণ মানুষের দুর্গতির সত্যিকারের অংশীদার হওয়াই যে সুষ্ঠ রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার আদর্শিক পূর্বশর্ত শুধুমাত্র চটকদার আমদানি করা বুলি নয়, এ সত্যটি আজঅব্দি রাজনৈতিক নেতারা কিংবা কর্মীদের বৃহৎ অংশ উপলব্দি করতে পারেননি। করলেও বাস্তবে এই নীতি কার্যে পরিণত করা হয়নি। এজন্যেই

আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে গণমানুষের সীমাহীন ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও তাদের ইপ্সিত ফল তারা লাভ করতে পারেননি আজঅব্দি। তাদের প্রতিটি সংগ্রাম প্রতারণার অন্ধ গলিতে হারিয়ে গেছে বারবার।

১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সংবিধান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের LFO (Legal Frame Work) এর আওতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সাংসদদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম গণপরিষদের অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল। ১২ই অক্টোবরের সংসদ অধিবেশনে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন প্রণীত সংবিধান গৃহিত হয়। যদিও সংবিধানে সরাসরিভাবে মুজিববাদের উল্লেখ ছিল না তবুও মুজিববাদের মূলনীতির উপর তথা ভারতীয় সংবিধানের নীতিমালার উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান বা শাসনতন্ত্র। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়, "আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল –জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সে সমস্ত আদর্শই এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে। আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।" কিন্তু সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় রাষ্ট্রের চার মূলনীতির সুস্পষ্ট স্ব-বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। সমাজতন্ত্রের কথাই ধরা যাক:–

সংবিধানের ১০নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়নুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" কিন্তু সংবিধানের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, বাংলাদেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করা হবে। অথচ ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজতন্ত্রের আদর্শের সাথে সম্পুর্ণ সামঞ্জস্যহীন। সংবিধানের ১৩ নং ধারায় বলা হয়:-

১৩। উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থা সমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে :-

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা: অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠ ও গতিশীল রাষ্ট্রীয় ও সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা।

(খ) সমবায় মালিকানা: আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সমবায় সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায় সমূহের মালিকানা।

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা: আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

সংবিধানের ৪২নং ধারায় আরো বলা হয়:-

৪২। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও বিলি ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতিত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ব বা দখল করা যাইবে না।

আওয়ামী লীগের 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে জনাব বদরুদ্দিন ওমর সাপ্তাহিক স্বাধিকারে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে একটি নিবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পদক্ষেপ হিসাবে জাতীয়করণের নীতি সত্যিকার অর্থে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য গৃহিত হয়নি। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শিল্প, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণ করা মানেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়। রাষ্ট্রায়ত্বকরণ মানেই সমাজতন্ত্র নয়। রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত না এক বিশেষ চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে, শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটিয়ে তা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের কথা বলা শঠতা ও বাচালতা ব্যতিত আর কিছুই নয়। বুর্জুয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের হাতে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে কোন কিছু রাষ্ট্রীয়করণের অর্থ সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ নয় বরং তা হল সমাজতন্ত্রের উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে কৃষক-শ্রমিক-জনগণকে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা। আওয়ামী লীগ সরকারের সমাজতন্ত্রের নীতি দেশে আজ যে অরাজকতার সৃষ্টি করেছে সেটা বিস্ময়কর নয় বরং অতি স্বাভাবিক। কারণ, যে রাষ্ট্র আজ বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি জাতীয়করণ করছে; সে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী নেই আছে বুর্জুয়া সামন্ত শ্রেণী। কাজেই তাদের নিজেদের দ্বারা রচিত যে কোন নীতির মত এই জাতীয়করণের নীতিও তাদের শ্রেণীর স্বার্থই উদ্ধার করছে। সমাজতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করে তারা যে জাতীয়করণ প্রথা প্রবর্তন করেছে তাতে জনগণের কোন উপকার হচ্ছে না। বরং তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেই এ নীতির ফলে সরকারি দল ও তাদের দোসররা নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে অবাধে লুটপাট করে দেশীয় সম্পদ উজাড় করে চলেছে। আওয়ামী লীগের জাতীয়করণ প্রসঙ্গে তাদের ভূমি নীতির চরম ব্যর্থতাও আজ বাস্তব সত্য। আমাদের কৃষি সমস্যার যা বর্তমান চরিত্র তাতে পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ উৎপাদন ব্যবস্থা অথবা কৃষকের অবস্থার কোন পরিবর্তনই আনতে পারে না। তাছাড়া কৃষকদের বিশাল অংশ ভূমিহীন ও বর্গা চাষীদের এ খাজনা মওকুফের ফায়দা একেবারেই স্পর্শ করে না। তাদেরকে যা কিছুটা স্পর্শ করতো তা হল সরকারের অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের

নীতি। কিন্তু এই অতিরিক্ত জমি সরকার কর্তৃক সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে পরিবার প্রতি জমির উর্ধ্বতন পরিমাণ একশত বিঘা ধার্য করে দেয়া। তাদের এই নীতির ফলে একদিকে যেমন জমির মালিকরা নানা প্রকার ফন্দির মাধ্যমে শুধু পরিবার প্রতি একশ বিঘা নয় আরও অনেক বেশি জমি নিজেদের হাতে রাখতে পারবে তেমনি অন্যদিকে বর্গা প্রথার মাধ্যমে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের উপর নিজেদের সামন্ত শোষণও কায়েম রাখতে সক্ষম হবে। সামন্ত শোষণের ফলে কায়েম থাকবে মহাজনী শোষণ। এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বর্গাধারী এবং মহাজনী প্রথার আধিপত্য বজিয়ে রেখে কৃষকদের শ্রেণী শত্রুরা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাব বজিয়ে রাখবে সনাতনী কায়দায়। ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্লথ গতি হতে বাধ্য। এ অবস্থার ফলে একদিকে যেমন খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হবে না তেমনি শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরতাও কমবে না।" সরকারি ভূমি নীতির ব্যর্থতার এই দিকটি পরিষ্কার হয়ে পড়ায় বিরোধী দলসমূহ এমনকি বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মনি সিং), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) ইত্যাদি আধা-সরকারি দলগুলো পর্যন্ত সরকারের সমালোচনা না করে পারেনি।

মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ প্রণীত সংবিধানের নিম্নে বর্ণিত তিনটি ধারা পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে কি করে অতি কৌশলে আওয়ামী সরকার নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে।

৩৫। (ক) অপরাধ দায়যুক্ত কার্য সংগঠনকালে বলবত ছিল। এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যাতিত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ সংগঠনকালে বলবত সেই আইন বলে যে দন্ড দেয়া যাইতে পারিত, তাহাকে তাহার অধিকার বা তাহা হইতে ভিন্ন কোন দন্ড দেয়া যাইবে না।

(খ) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ করা যাইবে না।

(গ) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ন্যায়পীঠে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, জননিরাপত্তার বা নৈতিকতার কারণে বা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে গোপনে কার্যধারা পরিচালনার জন্য সংসদ আইনের ধারা বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(ঘ) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(ঙ) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর অমানুষিক অথবা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(চ) জনস্বার্থ আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বার্থের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোকসভায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

উল্লেখিত ধারাগুলো সংবিধানে থাকলে জনগণের মৌলিক অধিকার মূলতঃ কেতাবী আকারে পরিণত হয়। ৩৫নং ধারায় প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ বিচারের অধিকার দেয়া হয় ঠিকই। কিন্তু জননিরাপত্তা, নৈতিকতা ও যুক্তিসঙ্গত কারণে গোপন বিচার অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে বিধান রাখা হয়। কিন্তু ঐ যুক্তিসঙ্গত কারণটি যুক্তিগত কিনা, তা নির্ধারন করার দায়িত্ব কোন কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়নি সংবিধানে। ফলে মূল ক্ষমতা পক্ষান্তরে চলে যায় সরকারের হাতেই। অতি কৌশলে ৩৬ ও ৩৭নং ধারায় যুক্তিসঙ্গত কথাটি যোগ করে মূলতঃ মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয় জনগণের কাছ থেকে। সংবাদপত্র, বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে সংবিধানের ৩৯নং ধারায় বলা হয়।

৩৯। (ক) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(খ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচণা সর্ম্পকে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে:- প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান করা হইলো।

এই ধারা অনুযায়ী কোন বন্ধুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র কিছু লিখতে পারবে না। অর্থাৎ সরকার যাকে বন্ধুরাষ্ট্র বলে মনে করবে তার সম্পর্কে কোন বক্তব্য কেউ উচ্চারণ ও প্রকাশ করতে পারবে না। সংবিধানের ৬৩(গ) ধারায় বলা হয়:- যুদ্ধ কিংবা আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহকালে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সংসদের কোন আইনকে এই সংবিধানের আওতায় অবৈধ প্রমাণিত করার জন্য কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না। এ ধারায় যুদ্ধ ও আক্রমণের সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রশ্নটি কৌশলে যেমন জড়িত করে দেয়া হয়েছে তেমনি বলা হয়েছে যে ঐ ধরণের অবস্থায় সংসদ যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সংবিধানের ধারা মতে

এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাইবে না। সংবিধানের উল্লেখিত ধারাসমূহ পরবর্তিকালে বিরোধীদের দমন করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে। তারা আইয়ূব আমলের 'জননিরাপত্তার' ধূয়াঁ তুলে অনেক বাংলাদেশী নাগরিকের নাগরিকত্বও অন্যায়ভাবে হরণ করে। পাক স্বৈরশাসনের আমলে যেভাবে বিরোধীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হত, '৭২ এর সংবিধানে ৬৩(গ) ধারা প্রবর্তণের মাধ্যমে ঠিক সেই ব্যবস্থাটিকেই অব্যাহত রাখা হয়।

ভাসানী ন্যাপের তৎকালীন ভাইস চেয়্যারম্যান ডাঃ আলীম আল রাজি সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ধারাগুলোর উল্লেখ করে বলেন, "তাড়াহুড়া করে সংবিধান রচনায় কোন বাহাদুরী নেই এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ক্ষমতায় গেলে এই সংবিধানকে চৈত্র মাসের তুলোর মত ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে।" ১৮ই অক্টোবর ১৯৭২ শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের মুখপাত্র এই সংবিধানকে 'পরিত্যাক্ত সম্পত্তি গ্রাস করার সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র' বলে অভিহিত করেন। সংবিধানে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ও বিনা বিচারে আটক রাখার বিধি বহাল থাকে। আওয়ামী লীগের দোসর মনিসিং ও মোজাফফর গংরাও জনগণের মনোভাব বুঝে সংবিধানের কিছু কিছু ধারা অগণতান্ত্রিক বলে এলান করতে বাধ্য হন। লেনিনবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির অমল সেন বলেন, "এই সংবিধান সমাজতান্ত্রিক তো নয়ই এমনকি অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের যে ধরণের গণতান্ত্রিক ও ফান্ডামেন্টাল সাংবিধানিক অধিকার থাকে তাও নেই।" মোজাফফর ন্যাপ সংবিধানের উপর জনমত যাচাই করার আহ্বান জানান। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা আসম আব্দুর রব বলেন, "সংবিধানে জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন নেই।" সংবিধানের ৪২ ও ৪৭নং ধারার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের দু'জন সদস্য আপত্তি তোলেন। ধারাগুলো ছিল ব্যক্তি মালিকানা প্রসঙ্গে। ৭০নং ধারার পক্ষে বিপক্ষে আওয়ামী লীগ সদস্যগণ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েন। চারজন প্রতিবাদ করে বলেন, "এই ধারা গণতান্ত্রিক সকল নীতিকে ভঙ্গ করেছে এবং এতে করে ভোটারদের ভোটাধিকার এর প্রতি ও অমর্যাদা প্রদর্শিত হয়েছে। এটাও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণেরই সামিল।" ৭০নং ধারায় বলা হয় যে, কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়ে কেউ যদি সংসদ নির্বাচনে জয়ী হন এবং পরবর্তিকালে যদি পার্টি থেকে তাকে বহিস্কৃত করা হয় অথবা তিনি পদত্যাগ করেন তবে তার সংসদ পদ বাতিল হয়ে যাবে। মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সংবিধান গঠনের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "বর্তমান সংসদ গঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালের LFO (Legal Frame Work) এর অধিনে সংগঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের LFO মোতাবেক নির্বাচিত জাতীয় সংসদের দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করা। আওয়ামী লীগ দল হিসাবে ছয় দফার ভিত্তিতে জনগণের কাছ থেকে ভোট গ্রহণ করেছিল। ছয় দফার দাবি ছিল

পাকিস্তানের ভৌগলিক অখন্ডতা বজিয়ে রেখে প্রদেশ ভিত্তিক পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন কায়েম করা। অতএব স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কোন বৈধ অধিকার তাদের নেই। তিনি সর্বদলীয় জাতীয় কনভেনশন গঠন করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানান। তিনি বলেন, জাতীয় কনভেনশনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিই থাকবে না তাতে বিভিন্ন সংগঠন যাদের সদস্যরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রতিনিধিদেরও অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। এ ধরণের জাতীয় কনভেনশনের দ্বারা প্রণীত সংবিধান পরে গণভোটের মাধ্যমে গৃহিত হবে।" যদি এমনটি না করা হয় তবে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের দলীয় সংবিধানকে তিনি এবং তার পার্টি কিছুতেই মেনে নেবেন না বলেও তিনি হুশিঁয়ারী উচ্চারণ করেন। তার এ অভিমতকে সমর্থন জানায় বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল বাশার। তিনি আরো বলেন, "এ সংবিধান গণতান্ত্রিক নয়, সমাজতান্ত্রিকও নয়। এ সংবিধানে গণমানুষের নুন্যতম দাবি- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার কোন প্রতিশ্রুতি নেই।"

বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে বর্তমান সংবিধানে আইয়ূব আমলে যতটুকু মানবিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণের জন্য দেয়া হয়েছিল সেটুকুও দেয়া হয়নি। ভাসানী ন্যাপ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, শ্রমিক-কৃষক-সমাজবাদী দল, বিভিন্ন প্রগতিশীল গণসংগঠন ও রাজনৈতিক দল গণবিরোধী এই সংবিধানের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বিরোধী দলের সমালোচনার জবাবে আওয়ামী লীগের নেতা জনাব মনসুর আলী বলেন, "সংবিধানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় করা হয়েছে।" '৭২ এর সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সালে সংসদ অধিবেশনে দুই ঘন্টারও কম সময়ে সংবিধানটি গৃহিত হয়। সংবিধানের মূল চার নীতি যার মাধ্যমে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায় আওয়ামী লীগ মাঠে নামল: সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে সেই চার নীতির স্ববিরোধিতা ও গণস্বার্থ বিরোধী চরিত্রের কিছুটা বিশ্লেষন পাঠকদের অবগতির জন্য তুলে ধরা হল। এ সম্পর্কে আরো বিশদ বিশ্লেষনের অবকাশ রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং সাংবিধানিক পন্ডিতগণই সে দায়িত্ব পূরণ করবেন আশা করি। নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতেই যে কোন রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। তাই এ ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষন না করলে আমরা এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কেন সে সময় সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে পড়েছিল সে সর্ম্পকে সঠিক কারণ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হব। শুধু তাই নয়; জাতি হিসেবে আজ স্বাধীনতার দুই দশক পরেও কেন আমরা কোন ক্ষেত্রেই আশানুযায়ী ফল লাভে ব্যর্থ হলাম সেটা ও বুঝতে পারব না। অতীতের ফলশ্রুতি বর্তমান আর তার উপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যত।

১৯৭২ সালের যে কোন জাতীয় সংবাদপত্র খুললে প্রথমেই চোখে পড়বে খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানী, আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির খবর। প্রতিদিন দেশের শহরগুলোতে ঘটছিল প্রকাশ্য খুন, ডাকাতি ও রাহাজানীর ঘটনা। গ্রামে-গঞ্জেও চলছিল ত্রাসের রাজত্ব। ক্রমবর্ধমান এ ত্রাসের নাগপাশে জনগণ এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কাল অতিবাহিত করছিল। যখন জনগণের পরনে কাপড় নেই তখনই ঘটেছিল সুতা নিয়ে কেলেংকারী। পেটে যখন ভাত নেই তখন লাখ লাখ টন বিদেশী সাহায্যে প্রাপ্ত খাদ্য নির্বিবাদে পাচার হয়ে গিয়েছিল সীমান্তের ওপারে।

মজলুম নেতা ভাসানী অবাধে চোরাচালানের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তিনি আওয়াজ তোলেন সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারনবাদের বিরুদ্ধে। জবাবে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে চীন ও পাকিস্তানের দালাল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে ১৯৬৮-১৯৬৯ এর সাড়া জাগানো আন্দোলনকালে বরফের উপর আঘাত করেছিলেন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তার নাম মাওলানা ভাসানী। মাওলানার সার্বজনীন আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই ছাত্ররা দিলেন ১১ দফা। তারই নির্দেশে ন্যাপ তার নিজস্ব ১৪ দফা বাদ দিয়ে ১১ দফাকেই তাদের দাবি হিসাবে গ্রহণ করে। উনসত্তোরের কারাবন্দী মুজিবর রহমানকে মুক্ত করার দুর্বার গণ আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন এই মাওলানা ভাসানীই। ১৬ই ফেব্রুয়ারী পল্টনের বিশাল জনসভায় তিনি বজ্রকণ্ঠে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন, "প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মত জেলখানা ভেঙ্গে মুজিবকে বের করে আনব।" তার মতো একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ রাজনৈতিক উদারপন্থী নেতাকে সাম্প্রদায়ীক উস্কানিদাতা বলে গালাগালি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি শাসক দল। এই গালাগাল পর্ব শুরু করেন তরুণ নেতারা। পরে প্রবীণরাও ক্রমে তাদের সাথে যোগদান করেন। মার্চের শুরু থেকেই খবর আসতে থাকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে- মানুষ মরছে অনাহারে, না খেয়ে। বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইলে বিরাজ করছে দুর্ভিক্ষ অবস্থা। আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের হতে থাকে স্থানে স্থানে। এ অবস্থায় ভারতীয় দূতাবাসের মুখপাত্রও স্বীকার করেন যে, চোরাচালান হচ্ছে ব্যাপক হারে। তারা বলেন, "সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি হয়ে গেলেই এই চোরাচালান বন্ধ হবে।" এ বক্তব্য দূতাবাস থেকে দেয়া হয় ২৩-৩-১৯৭২ তারিখে। দুর্নীতি ছড়িয়ে পরে দেশের সব জায়গায়, সর্বস্তরে।

১৯৭২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব তার সংসদ সদস্যদের প্রতি এক নির্দেশ জারি করে বলেন, "চাকুরি, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না। প্রশাসনকে চলতে দিন।" ১১ই মার্চ দৈনিক বাংলায় এক খবর বের হয় সিগারেটের পারমিট নিয়ে, "বাংলাদেশ ট্যোবাকো কোম্পানীর ২৫জন ডিষ্ট্রিবিউটর

নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ তিন হাজার সুপারিশপত্র পেয়েছেন। সুপারিশকারীরা প্রত্যেকেই এমন প্রভাবশালী যে, কোম্পানী কাকে ছেড়ে কাকে ডিলারশীপ দেবেন সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারছেন না।" ৬ই জুন চোরাচালানের স্বর্গ সিলেট থেকে দৈনিক বাংলার প্রতিনিধি খবর পাঠান যে, গ্রেফতারকৃত চোরাচালানীরা প্রভাবশালী ক্ষমতাসীন নেতাদের চাপে ছাড়া পাচ্ছে। একইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য নেমে আসে সরকারের পারমিটবাজী নীতির সূচনায়। সুতার পারমিট যে পাচ্ছে তার তাঁত নেই, কেরসিনের পারমিট যে পেল সে কোন ডিলার নয়। পারমিট দেয়া হল অব্যবসায়ী রাজনৈতিক টাউটবাজদের খুশি করার জন্য। ফলে দুর্ভোগ গিয়ে বর্তাল জনগণের উপর। পারমিট হাত বদল প্রথায় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেল কয়েকগুন। কাপড়ের অভাবে মা-বোনেরা দিনের বেলায় ঘর থেকে বেরুতে পারতেন না। মেয়ে-মা একখানি কাপড় গোসল করে পালা বদলিয়ে পরছে। এ সমস্ত খবরও প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক পত্রিকায়। ঠিক সেই সময় সরকার টিসিবি'র মাধ্যমে ভারত থেকে আনল 'সুন্দরী শাড়ী'। যে শাড়ীতে হাঁটু ঢাকে না, পর্দাও হয় না। ভারতীয় দূতাবাস বলল টিসিবি দেখেই এনেছে এই শাড়ী। টিসিবি কোন জবাব দিতে পারল না। এ অবস্থায় সরকারের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে যখন দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ হচ্ছে; তখন ১৯৭২ সালের ২৯ মার্চ আওয়ামী লীগ, মোজফফর ন্যাপ আর সিপিবি মিলে গঠিত হয় ত্রিদলীয় ঐক্যজোট। অল্পদিনের মধ্যেই ঐক্যজোটে ফাটল দেখা দেয়। প্রথম দিকে মোজফফর সাহেব ও মতিয়া চৌধুরী ঘোষণা করেন, "আমাদের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, অন্য কিছু নয়।" ন্যাপের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী ঘোষণা করেন, "স্বাধীনতা কেউ একলা আনেনি। তাই কেউ যথেচ্ছাভাবে এটা ভোগ করতে পারে না।" (দৈনিক বাংলা ২৩-৩-১৯৭২)। কিন্তু ২০শে মে ১৯৭২ ন্যাপ (মোজাফফর) কাউন্সিল অধিবেশনে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এবং প্রশাসন থেকে আইন বিভাগকে পৃথক রাখার আহ্বান জানান। ২১শে মে মোজাফফর সাহেব স্বয়ং এক জনসভায় বলেন, "চরম খাদ্যাভাবে মানুষের চোখে ঘুম নেই। দুর্নীতি, রিলিফ চুরি, এমপিদের অপকর্ম, স্বজনপ্রীতি, অবিচার, বাধাহীন লুটপাট, রাহাজানী, চোরাকারবারীদের দৌরাত্ম্যের জন্য জনগণের মনে শান্তি নেই।"

ইতিমধ্যে সারা দেশে বিরোধীদের উপর চলতে থাকে হয়রানি ও নির্যাতন। আওয়ামী লীগের দোসর হয়েও ন্যাপ কর্মীরা এ হয়রানি থেকে রেহাই পাননি। '৭২ সালের ৮ই জুলাই মোজাফফর ন্যাপের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রী পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য এক বিবৃতিতে বলেন, "ন্যাপ কর্মীরা দুর্নীতি, অরাজকতা ও দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণের পর বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনযন্ত্র তাদের গ্রেফতার ও হয়রানি করছে। স্বার্থবাদী মহল ন্যাপ অফিসে হামলা চালাচ্ছে ও কর্মীদের জীবননাশের হুমকি

দিচ্ছে।" ৩১শে জুলাই অধ্যাপক মোজফফর বড় বেশি সাহসী হয়ে ঘোষণা করে বসলেন, "আমাদের দল আর মনি সিংয়ের কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়া আর কোনো বামপন্থী দল দেশে নেই।" ১৬ই আগষ্ট সরকারের কাছে দেয়া এক স্মারকলিপিতে মোজফফর ন্যাপ ঘোষণা করেন যে, "সরকার কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করেননি। স্বাধীনতার পর সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও গণবিরোধী তৎপরতা রোধে সরকারের অনিচ্ছা ও অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি।" ২০শে আগষ্ট ন্যাপ মোজফফর সিপিবি এবং ছাত্র ইউনিয়ন দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও দুর্নীতি রোধের জন্য গণআন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৭শে আগষ্ট পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে মোজাফফর আহমদ বলেন, "আপনি ভাত দিতে পারবেন না তবে কিল মারার গোসাই কেন? চোখ থাকতে দেখছেন না, কান থাকতে শুনছেন না কেন? দুর্নীতিবাজ এমপিএ, আড়তদার, মুনাফাখোর, দালাল কর্মচারীদের শাস্তি দেয়া হয় না কেন? শুধুমাত্র কয়েকটি ভাল কথা ও ঘোষণা ছাড়া সত্যিকার অর্থে জনগণ কি পেয়েছে?" সে দিনের একই জনসভায় মতিয়া চৌধুরী বলেন, "বাইশ পরিবারের বদলে ২২'শত পরিবার গড়ে তোলা হচ্ছে।"

কিন্তু রাজনীতির বিচিত্র খেলায় তারপরও অদৃশ্য সংকেতে মোজফফর ন্যাপ এবং মনি সিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টির গাটছড়া বাঁধা থাকে আওয়ামী লীগের সাথে। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে মাওলানা ভাসানী ও জাসদের বিরুদ্ধে জোরেসোরে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের আওয়াজ আওয়ামী লীগকেও ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর মোজাফফর ন্যাপ ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। আওয়ামী লীগকে সমর্থন, কখনো আওয়ামী লীগের বিরোধিতা, একবার বাকশালে যোগদান আবার আওয়ামী লীগে বিলীন হয়ে যাবার চিন্তা-ভাবনা: এই নিয়েই মোজাফফর ন্যাপের বিচিত্র ইতিহাস!!

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ দিন ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে মস্কোপন্থী বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন 'ভিয়েতনাম দিবস' পালনের ডাক দেয়। এ উপলক্ষে ঐ দিন ছাত্র ইউনিয়ন এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি প্রেসক্লাবের বিপরীত দিকে অবস্থিত তৎকালীন মার্কিন তথ্য সার্ভিস ইউএসআইএস (ইউসিস) দফতরের সামনে এসে ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদুনে গ্যাস বা লাঠিচার্জ ছাড়াই নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী বিনা উস্কানিতে ছাত্র মিছিলের উপর বর্বরোচিতভাবে গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ দর্শনের (অনার্স) ছাত্র মতিউল ইসলাম ও মীর্জা কাদেরুল ইসলাম নামক অপর আর একজন ছাত্র। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে রাজপথে পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে

আসে পরের দিনের সংবাদপত্রগুলিতে। নূরুল আমিন, আইয়ুব খান, মোনেম খান, ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান আমলে তাদের নির্যাতনমূলক গণবিরোধী স্বৈরশাসনের জন্য ধিকৃত হয়েছিল জনগণের কাছে। একই ন্যাক্কারজনক বর্বরতার জন্য এদেশের মানুষ ধিক্কার দিল আওয়ামী লীগ সরকারকে। স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের পরই আওয়ামী লীগ সরকারের এহেন প্রকাশ্যে ছাত্র হত্যা হতবাক করে দিয়েছিল দেশবাসীকে। উৎকণ্ঠায় আতংকিত হয়ে পড়ে তারা। প্রেসক্লাবের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা সাংবাদিকরা স্তব্ধ হয়ে অবলোকন করেন পুলিশের বর্বরোচিত প্রাণহানিকর আচরণ। সেদিন পুলিশী নির্যাতনের হাত থেকে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফাররাও রেহাই পাননি। মুজিব সরকারের পুলিশ বাহিনী উপস্থিত প্রেস ফটোগ্রাফারদের হাত থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে নির্মমভাবে। সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান এই পুলিশী সন্ত্রাসের ব্যাপারে কোন বিবৃতি দেবারই প্রয়োজন বোধ করেননি সেদিন। গুলি চালনার খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে পুরো শহরে। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট, যানবাহন সব কিছুই বন্ধ হয়ে যায় সারা শহরে। স্বতঃস্ফুর্তভাবে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে ইট দিয়ে ঘেরা রক্তে রঞ্জিত রাজপথের অংশ দেখার জন্য। শহরের অলিতে-গলিতে মানুষ পুলিশের পাশবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মৌন মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পরদিন ২রা জানুয়ারী এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐদিন প্রফেসর মোজফফর আহমদ ঘোষণা করলেন, "আওয়ামী লীগের ছাত্র হত্যা ইয়াহিয়া-মোনেম স্বৈরাচারী সরকারের কার্যকলাপেরই নামান্তর। আমরা দেশবাসীর দাবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আশু পদত্যাগ দাবি করছি।" তিনি আরো বলেন, "নূরুল আমিন সরকারের ভাগ্যে যে পরিণতি ঘটেছিল, শেখ মুজিবের ভাগ্যেও সেই একই পরিণতি অনিবার্য।"

৩রা জানুয়ারী পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত এক সভায় ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ঘোষণা করেন, "দরকার হলে আরো রক্ত দেব। তবুও সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সরকারকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবই।" ঐ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি সেলিম ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ থেকে শেখ মুজিবর রহমানকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। এবং সদস্যপদ বই থেকে সংশ্লিষ্ট পাতাটি জনসভায় ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেন।

রাজনীতির পরিহাস, ১৯৭২ সালের ৬ই মে এই ছাত্রনেতাই শেখ মুজিবর রহমানকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। জনাব সেলিম ডাকসুর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে প্রদত্ত 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিও প্রত্যাহার করে

সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন, "সংবাদপত্র, টিভি ও বেতারে শেখ মুজিবের 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ব্যবহার করা চলবে না।" তিনি বাড়িতে, অফিস-আদালতে ও দোকানে টানানো শেখ মুজিবর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলারও আহ্বান জানান। একই দিনে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মনি সিং বলেন, "বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অযোগ্য।" ২রা জানুয়ারী শেখ মুজিবর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি এক বিবৃতিতে বলেন, "পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী যুবলীগ ও বহু দেশপ্রেমিক গ্রুপ সহ জনগণের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিন্দা প্রকাশ করছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি জাতি আজ যখন ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য সরকারের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগকে অভিনন্দিত করছে এসময় জনগণকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করে দিয়ে এক শ্রেণীর অরাজকতা সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদের ধারক ও ভাসানীর পরিচালনায় উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টিকারী আল বদর, রাজাকার এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্টের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছে। এই বিশেষ অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো তথাকথিত বিরোধী দলের ছদ্মাবরণে এমন আচরণ প্রদর্শন করছে যা খুবই উস্কানিমূলক এবং তারা দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র করছে বলে ধরে নেয়া যায়। এসব শক্তি সমাজতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দু'জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে প্রহার ও একজনকে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে। তারা মোজাফফর ন্যাপের অফিসের সামনে ছাত্রলীগের একটি মিছিলের উপরও হামলা চালিয়েছে। তারা তেঁজগাও শিল্প এলাকা ও ঢাকেশ্বরী কটন মিলে খোলা অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়েছে। এমনকি ন্যাপ সভাপতি মোজাফফর আহমদের ন্যায় লোকও ব্যক্তিগতভাবে একটি সংবাদপত্র অফিসে হামলা চালাবার চেষ্টা করেছে।"

৩রা জানুয়ারী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি সম্পাদিত বাংলার বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ নিবন্ধে বলা হয়, "ঢাকায় ২রা জানুয়ারী পূর্ণ হরতাল পালনের নামে মোজাফফর ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া, মেনন ও মাহাবুবউল্লাহ গ্রুপদ্বয় এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত অংশের কর্মী নামধারী ফ্যাসিবাদী গুন্ডারা মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও চকবাজার এলাকায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের উপর নগ্ন হামলা চালায়। পাটুয়াটুলী এলাকায় মোজাফফর ন্যাপের গুন্ডারা ছাত্রলীগের আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব মীর জাহানকে অপহরণ করে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরদিন মুজিববাদী ছাত্রলীগ এই হত্যার প্রতিবাদে এক জঙ্গী মিছিল বের করে।"

৩রা জানুয়ারী কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে মুজিববাদী ছাত্রলীগ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ শহিদুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভনীয় উক্তি

উচ্চারণের জন্য ন্যাপ মোজাফফর, জাসদ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের আগামী ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে জনতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য হুশিঁয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "যদি ক্ষমা না চাওয়া হয় তাহলে জনতা ৭ই জানুয়ারীর পর থেকে বাংলার মাটিতে ন্যাপ মোজাফফর, জাসদ ও ছাত্র ইউনিয়নের কোন জনসভা অনুষ্ঠিত হতে দেবে না।" তিনি আরো বলেন, "যেসব লোক মন্ত্রী হবার খায়েসে সর্বদলীয় সরকার গঠনের জন্য সরকারের কাছে শতবার তোষামোদ করছেন, তারা এবং তাদের ছত্রছায়ায় থেকে ছাত্র ইউনিয়ন আজ গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করার সাহস পাচ্ছেন।" তিনি ঘোষণা করেন, "আজ বৃহঃস্পতিবার ৪ঠা জানুয়ারী থেকে যে পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর নামের পূর্ণ মর্যাদা দেবে না সংগ্রামী জনতা বাংলার মাটিতে সেই পত্রিকার অস্তিত্ব রাখবে না।" তিনি আরো বলেন,"বঙ্গবন্ধুকে ডাকসুর আজীবন সদস্য করা হয়েছে ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে। সুতরাং সেখানে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অন্য কারো নেই। বর্তমান ডাকসু যেহেতু ছাত্রসমাজের মতবিরোধী কাজ করছে এবং তাদের আস্থা ও ভালোবাসা হারিয়েছে তাই এই ডাকুস বাতিল।" ছাত্রনেতারা এই তৎপরতাকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ইতিমধ্যে ডাকসু অফিসও তছনছ করে ফেলা হয়।

ঐ দিনই বাংলার বাণীতে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে শেখ মুজিবের ছবি নামিয়ে ফেলার দায়ে এক ব্যক্তির কান কেটে দেয়া হয়েছে। পরদিন ঐ একই পত্রিকা খবর ছাপে যে, একই কারণে রংপুরে দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

৫ই জানুয়ারী পল্টনে ছাত্রলীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ছাত্রলীগ নেতারা শ্লোগান দেন, "রব-ভাসানী-মোজফফর, বাংলার তিন মীরজাফর।"

৬ই জানুয়ারী গোপালগঞ্জের এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "স্বার্থান্বেষী মহল নির্বাচনের প্রাক্কালে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ ও আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে। চরম দুঃখের দিনগুলিতে এসব লোকদের খুঁজেও পাওয়া যায়নাই। তারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দেশে যাতে বিদেশ থেকে কোন সাহায্য না আসতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বে বাঙ্গালী জাতির মর্যাদা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করছে।"

বিস্ময়কর ও চরম নির্লজ্জভাবে ৬ই জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ন্যাপের মোজফফর আহমদ তাদের ৭ই জানুয়ারীর প্রস্তাবিত জনসভা বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি সম্মেলনে স্বীকার করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি ভয় পেয়েছেন। ঐ

সাংবাদিক সম্মেলনে মোজাফফর সাহেব বাংলাদেশ সরকারের পদত্যাগ দাবি করেননি। ভিয়েতনামের প্রশ্নও তোলেননি এবং ছাত্রহত্যার বিচারও চাননি।

৮ই জানুয়ারী অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ অতি চমকপ্রদভাবে আইয়ুব-ইয়াহিয়া সরকারের নামান্তর শেখ মুজিব সরকারের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন, "কেউ কেউ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে।" একই দিনে মনি সিং-এর কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক বারীন দত্ত ওরফে আবদুস সালাম বলেন, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী, চীন ও পাকিস্তানী চরেরা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টায় দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।" তিনি স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবার জন্য দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার আহবান জানান। সম্মেলনের শুরুতেই জনাব দত্ত বলেন, "কোন প্রশ্ন করবেন না কেবল শুনে যান।" এবং সত্যি সত্যি সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়েই সম্মেলন শেষ করে দেয়া হয়। এরপর এই দুই দল আওয়ামী লীগের সাথে আপোষ করার জন্য বিভিন্ন মহলে জোর তদবীর করতে থাকে। তারই এক পর্যায়ে ২২শে জানুয়ারী অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ লাভ করেন। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি তার সরকার বিরোধী বক্তব্য ও তৎপরতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। একই দিন মনি সিং জিল্লুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে আপোষ আলোচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে এই দুই দলই বাকশালে যোগদান করে।

কিন্তু নিহত ছাত্র মতিউল ও কাদের হত্যার তদন্ত রিপোর্ট ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত অপ্রকাশিত থেকে যায়। অনেকের মতে আপোষের শর্ত হিসেবে তারা ঐ হত্যাকান্ডের বিচার দাবি করবেন না বলে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে ১লা জানুয়ারীর ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যে কমিটির দায়িত্বে ছিল পুলিশ। কি এবং কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল সেটাই তদন্ত করা ছিল কমিটির দায়িত্ব দোষীদের খুঁজে বের করা নয়। সেই কমিটি আদৌ কোন তদন্ত করেছে কি না তা এ দেশের মানুষ আজও জানতে পারেনি। শহীদ মতিউল কাদেরের পিতামাতা তাদের সন্তান হত্যার সুবিচার হতে আজও বঞ্চিত।

১৯৭২ সালের শেষে সংসদের এক অধিবেশনে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ দেশে সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।

১৯৭২ সালের ১১ই নভেম্বর মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন সংগঠন আওয়ামী যুবলীগ। নূরে আলম সিদ্দিকীও যোগ দেন

এই যুবলীগে। নির্বাচনী প্রচারণা চলতে থাকে। মোজাফফর ন্যাপ ও মনি সিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টি অনেক চেষ্টা করেও আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনী জোট গঠন করতে ব্যর্থ হয়। নির্বাচনী প্রচারণায় আওয়ামী লীগ ১লা জানুয়ারীর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে দেশব্যাপী স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিক্রিয়াকে নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত বলে অভিহিত করতে থাকে। ২০শে জানুয়ারী যুবলীগের সভায় বিরোধীদের নির্মূল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচন সম্পর্কে লীগ নেতারা প্রচার করতে থাকেন যে এই নির্বাচন হবে মুজিববাদের উপর ম্যান্ডেট। ২রা ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ মুজিববাদের উপর রায় চাইবে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও তারা মুজিববাদের উপর রায় চায়।

'৭২ সালের ২১শে নভেম্বর অধ্যাপক মোজফফর আহমদ নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন। তার জবাবে ২২শে নভেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান ঘোষণা করেন, "নির্বাচনের আগে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করবে না। পদত্যাগ করার কোনো কারণ নেই।"

'৭৩ এর নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল নিয়েও অভিযোগ এসেছিল অনেক। ৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল অভিযোগ করে যে, জায়গায় জায়গায় তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে দেয়া হয়নি। তারা এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনারের হস্তক্ষেপ কামনা করলে জনাব জিল্লুর রহমান বলেন, "নির্বাচনে ভরাডুবি জেনে জাসদ নির্বাচন বর্জনের পথ খুঁজছে।" ইতিমধ্যে সারাদেশ থেকে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের খবর আসতে থাকে। ৪ঠা মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করে যে, ক্ষমতাসীন দল ত্রাস সৃষ্টি করে একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী ৩রা মার্চ ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, "গত এক বছরে অবাধ লুটতরাজ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর রিলিফ চুরির বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ এবার বঙ্গবন্ধুকে একমাত্র পুজিঁ করে জনতার কাছে ভোট চাইতে এসেছে। একদিকে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে অন্যদিকে আওয়ামী মন্ত্রীরা ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছেন শ্লোগান দিয়ে, 'সামনে আছে জোর লড়াই, বঙ্গবন্ধু অস্ত্র চাই।' এটা কোন ধরণের গণতন্ত্র?"

৫ই মার্চ দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, "নিশ্চিত ভরাডুবি জেনে বেসামাল মুজিববাদীরা গতকাল রোববার (৪ঠা মার্চ) সন্ধ্যায় আবার তারাবো বাজারে ন্যাপের নির্বাচনী প্রচার মিছিলের উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য ১৫ থেকে ২০ রাউন্ড ষ্টেনগান ও পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। তারা স্থানীয় ন্যাপ ও

ছাত্র ইউনিয়নের অফিসের মূল্যবান কাগজপত্র, পোষ্টার, আসবাবপত্র লুটপাট ও তছনছ করে এবং ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন অফিসে অগ্নি সংযোগ করে ভস্মীভূত করে। মুজিববাদীরা জনৈক ন্যাপ কর্মীর দোকানও লুট করে।"

৭ই মার্চ একতরফা প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন সম্পর্কে দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক গণকণ্ঠের প্রতিবেদনে সন্ত্রাস, গুন্ডামি, নির্যাতন, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং এজেন্ট প্রহৃত, খুন প্রভৃতির খবর ছাপা হয়। ৮ই মার্চের দৈনিক সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কয়েকটি খবরের শিরোনাম ছিল : 'সিলেট-১ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই', 'পটুয়াখালীতে ব্যালট পেপার ছিনতাই', 'চট্টগ্রামে ৩১টি ব্যালট পেপারসহ ২ব্যক্তি গ্রেফতার', 'ধামরাইতে রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাস', 'ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে', 'নির্বাচন দারুন অবাধ হয়েছে, 'একজন একাধিকবার অবাধে ভোট দিতে পেরেছে', 'জাসদের দু'জন কর্মী হাইজ্যাক', 'ঢাকার একটি কেন্দ্রে সন্ত্রাস ও গুলি', 'পটিয়ায় ভোট সন্ত্রাসী-মাস্তানরাই দিয়েছে', 'কুমিল্লা শহরে ব্যাপক সন্ত্রাস', 'নির্বাচন প্রহসনে পরিণত', 'কালিগঞ্জে সন্ত্রাস', 'রাজশাহী ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস', 'ভোট নাট্যের দু'টি দৃশ্য' প্রভৃতি।

৯ই মার্চ ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, "কমপক্ষে ৭০টি আসনে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সুনিশ্চিত বিজয়কে শাসকদল ক্ষমতার চরম অপব্যবহার, ভুয়া ভোট, পোলিং বুথ দখল, পোলিং এজেন্ট অপহরণ, বিদেশী সাহায্য সংস্থা, জাতিসংঘ, সরকারি গাড়ি ও রেডক্রসের গাড়ির অপব্যবহার প্রভৃতি চরম অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে উক্ত নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদের জোর পূর্বক পরাজিত করেছে।"

৯ই মার্চ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাসদ সভাপতি মেজর (অবঃ) জলিল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব যেভাবে নির্বাচনের সময় প্রচলিত কোন ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন এতে আমি তাকে জাতির পিতা বলতে ঘৃনাবোধ করি।"

তিনি আরো বলেন, "নির্বাচনের দিন গণভবনেই নির্বাচনী কন্ট্রোলরুম স্থাপিত হয়েছিল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিরোধী দলের প্রার্থীরা যখন ভোট গননায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই অকস্মাৎ বেতার টেলিভিশনে এই সকল কেন্দ্রের ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং

সন্দেহজনকভাবে দীর্ঘ সময় পর নিজেদের পছন্দসই ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।" জাসদ সভাপতি আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের তাবেদার বলে অভিহিত করে তাদের নির্বাচনী বিজয়কে হিটলার, মুসোলিনী, চিয়াংকাই সেকের বিজয়ের সঙ্গে তুলনা করেন।

৯ই জুলাই প্রেসক্লাবে ভাসানী ন্যাপের তৎকালীন সহ-সভাপতি ডাঃ আলিম আল রাজি বলেন, "ক্ষমতাসীন সরকার এক দলীয় স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিগত নির্বাচনে ক্ষমতার প্রকাশ্য অপব্যবহার, সন্ত্রাস সৃষ্টি, শক্তি প্রয়োগ করে ভুয়া ভোটদান, বিপুল অর্থ ব্যায়, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে।" বিরোধী দলগুলো যাতে জনগণের কাছে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে না পারে সেজন্য ক্ষমতাসীন দল তাদের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনী, নীলবাহিনীর হাতে বিপুল অস্ত্র দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণকে ভোটাদানে বিরতই শুধু করেনি; হয়রানির এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি সকল প্রচার মাধ্যম সরকারি দলের দলীয় স্বার্থে যদেচ্ছা ব্যবহারের উল্লেখ করে প্রচার মাধ্যমকে এক 'ব্যাবিলিয়ন ক্যাপটিভ প্রেস' বলে অভিহিত করেন। জানুয়ারীতে প্রকাশ্যে রাজপথে দু'জন ছাত্র হত্যার কথা উল্লেখ করে ডাঃ রাজি বলেন, "ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন মুজিব সরকার যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, দু'শ বছরের ইতিহাসে তার নজির নেই।" তিনি হুশিয়ারীও উচ্চারণ করে বলেন, "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যত অন্ধকার।" নীল নকশার আওতায় সুপরিকল্পিত উপায়ে জনগণের সকল মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্র ছিনিয়ে নেবার উক্ত প্রচেষ্টা পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে সত্য হয়ে উঠে।

একতরফা পাতানো খেলার নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১টিতে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রামের একটি কেন্দ্র থেকে প্রথমে ন্যাপের মোশতাক আহমদ চৌধুরীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলেও পরে তাকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। সবকয়টি বিরোধী দল এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। মোশতাক আহমদ চৌধুরী এই নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি রীট আবেদন করেন। সম্পূর্ণ আইন বিভাগ তখন পুরোপুরিভাবে দলীয় স্বার্থের অনুগত বিধায় মোশতাক চৌধুরীর রীটের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সুবিচার পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১০ই মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় লীগের প্রবীণ নেতা জনাব আতাউর রহমান খান নির্বাচন প্রচারাভিযানের সময়, নির্বাচনের দিন ও ফলাফল ঘোষণার পর

তার নির্বাচনী এলাকা ধামরাইতে সংগঠিত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ নেতা কর্মী ও রক্ষীবাহিনীর সার্বিক সন্ত্রাসকে "দুঃস্বপ্নের কালোরাত্রি" বলে আখ্যায়িত করেন

১১ই মার্চ যুবলীগের নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, "৭ই মার্চের নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, তারা রাজাকার, আল বদর, স্বাধীনতার শত্রু। এইসব বিদেশী চরদের মুজিববাদের নিড়ানী দিয়ে উৎখাত করা হবে।" পরদিন বায়তুল মোকাররমে শেখ ফজলুল হক মনি মুজিববাদ বিরোধীদের উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল ৩০ হাজারেরও বেশি লোককে। দেশপ্রেমিক বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, শ্রমিক নেতা, ছাত্রসমাজ, আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবর্গও এই শ্বেতসন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই পাননি। জাতীয় পরিসরে যেখানেই কেউ স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করেছেন অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তাকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে নতুবা তাকে হতে হয়েছে অকথ্য নির্যাতনের শিকার।

১৯৭৩ সালে ঐ সময়ের উপমহাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক সাংবাদিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ দৈনিক ইত্তেফাকে বিভিন্ন বিষয়ে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে অসীম সাহসের পরিচয় দেন।

'আজ আর একচেঞ্জ অব-হার্ট নয়, চাই চেক অফ হার্ট' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বলেন, "মানুষের হৃদয়ের চার চেম্বারের মতই আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতির সকল ক্ষেত্রেই চারটি করিয়া চেম্বার আছে। প্রথমত: আমাদের সংবিধান দাড়াইয়া আছে চারটি স্বতন্ত্র মজবুত মূল নৈতিক খুঁটির উপর। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ (জাতীয়তা তন্ত্রই বেশি শুদ্ধ হইত) ও ধর্মনিরপেক্ষতা (এখানেও তন্ত্রযোগ করিলে ভাল হইত)। এই চারটি নৈতিক খুটিকে 'স্বতন্ত্র' বলিলাম এই দন্ডে যে, সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, ওই চারটি খুঁটি এক ঘরের খুঁটি হইতে পারে না। খুঁটিগুলির উচ্চতা সমান নয় বলিয়াই তারা এক ঘরের খুঁটি হইতে পারে না। নীতি ও পন্থা হিসাবে এই চার বস্তুর মিল নাই একথাই বোধ করি সমালোচকরা বলিতে চান। তার মানে হৃদপিন্ডের চারটি চেম্বারের মধ্যে যেমন সহযোজক দরজা (কানেকটিং ভালব) আছে, আমাদের চার নীতির মধ্যে তেমন কোন কানেকটিং ভালব নাই। তারপর সংবিধানের বেলাতেও আমরা প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে টানিয়া বুনিয়া চারি চক্রে আনিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং যথাসম্ভব সফলও হইয়াছি। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেটিভ ও

জুডিশিয়ারী এই তিনটি ইন্সটিটিউশনকে 'নির্বাহী বিভাগ', 'আইন বিভাগ' ও 'বিচার বিভাগ' নামে সংবিধানে গুঞ্জায়েস করিয়াছি সত্য; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে যা অত্যাবশ্যক অথচ সংবিধানের কর্মবিভাগ বা দেশরক্ষা বিভাগে যার বিধান করা সম্ভব ছিলনাঃ সেই রূপ একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করিয়া আমরা রাষ্ট্রকে চারটি শক্তি স্তম্ভের উপর দাড় করাইয়াছি: এই চারটি শক্তি স্তম্ভের সাথে পাঠকগণ চারটি মূলনীতি স্তম্ভের সাথে তালগোল পাকাইয়া ফেলিবেন না।"

তার ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধে শিল্পকারখানা সম্পর্কে জনাব আবুল মনসুর আহমদ লেখেন, "হৃদয়ের চার চেম্বারের অনুকরণে আমরা শুধু আমাদের জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, পার্টি জীবনে ও সামাজিক জীবনে চার-বর্ণের প্রবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইনাই। অর্থনৈতিক জীবনেও উহার সম্প্রসারন করিয়াছি। 'মিনস অফ প্রডাকশন' অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানাকে সংবিধানেই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যথাঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা। এই তিন শ্রেণীর মালিকানা ছাড়া আর সব সম্পত্তি যা প্রডাকটিভ নয়, সেগুলি অটোম্যেটিক্যালী ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকার ব্যবস্থা করিয়া গোটা সম্পত্তি জগতকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া হৃদয়ের চার চেম্বারের সামাঞ্জস্য বিধান করিয়াছি। যাতে মিল কারখানাদির 'মিনস্ অফ প্রডাকশনকে' হরতাল স্ট্রাইকারদের দ্বারা আন প্রডাকটিভ করিয়া অন্য প্রকার মালিকানার সৃষ্টি করিতে কেউ না পারে এবং ঐ পন্থায় চার প্রকার মূলনীতিতে যাতে কেউ বত্যয় ঘটাইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আমরা হরতাল-স্ট্রাইককে ন্যাশনালাইজ করিয়া ফেলিয়াছি। সরকারি দল ছাড়া অপর সকলের হরতাল স্ট্রাইক নিষিদ্ধ করিয়াছি।"

প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক প্রশ্নে একই প্রবন্ধে জনাব আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "হৃদয়ের চার চেম্বারের প্রতি আমাদের এই সামগ্রিক ও সার্বজনীন আকর্ষণ দেখিয়া বিদেশী বন্ধুরা বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু তাদের সেই বিস্ময় সেই মুহুর্তেই কাটিয়া যাইবে যখন তারা জানতে পারিবেন যে, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতার নেতৃত্ব কেবলমাত্র আমাদের হৃদয়ের উপরই নির্ভরশীল। আমাদের নেতা প্রেমিক; তিনি দেশবাসীকে ভালোবাসেন; দেশবাসী তাকে ভালোবাসে। এ দেশে নেতা আর জনতার মধ্যে ভালোবাসা-বাসি ছাড়া আর কোন বৈষয়িক স্বার্থের সম্পর্ক নাই। পুরোটাই হৃদয়ের ব্যাপার। তাই হৃদয়ের চার চেম্বারের সাথে মিল রাখিয়াই আমাদের সামগ্রিক জীবনকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। হৃদয়ের অনুকরণেই আমাদের রাষ্ট্রীয় আর্থিক জীবনকে উপরের তলা নীচের তলা এই দুই তলা বিশিষ্ট করিয়াছি। হৃদয়ের অনুকরণেই আমরা উভয় তলাতেই অর্থাৎ অবিকল ভেনট্রিকস উভয়টাতেই লেফট রাইট রাখিয়াছি। সাধারণতঃ নেতার ভালোবাসা-বাসির ব্যাপারই হৃদয়ের চার

চেম্বারের প্রতি আমাদের আসক্ত করিয়াছে ঠিকই। কিন্তু চারের প্রতি আকৃষ্ট হইবার আমাদের আরও কারণ আছে। আমাদের রাষ্ট্র সেক্যিউলার হইলেও আমরা নিজেরা আজও ধর্মবিরোধী হইনাই। ধর্মনিরপেক্ষ হইয়াছি মাত্র। আমাদের মধ্যে বিপুল মেজরিটি লোকই মুসলমান। আমরা মুসলমানেরা এখনও ধর্ম ছাড়িনাই। তাই চারের মায়াও ছাড়িতে পারিনাই। আমাদের চার কিতাব, চার কলেমা, চার ফেরেশতা, চার মাযহাব, চার খলিফা, চার ইমাম এ অবস্থায় রাষ্ট্রের চার মূলনীতি, সমাজের চার মালিকানা নীতি, পলিটিকস এ চার পার্টি নীতি। এসবে আমাদের আকর্ষণ সহজাত। শুধু মুসলমানরা হইবে কেন? আমাদের দেশের হিন্দুদের ধর্মেও চারের প্রাধান্য রহিয়াছে। তাদের চার বেদ, চার বর্ন, চার যুগ এমনই চার যোগও আছে। এইভাবে আমরা চারের গোলকধাধাঁয় ঢুকিয়াছি। সরকারি দফতরে চার তাসের কর্মচারী বহাল হওয়ায় বাজারে আমরা চার কায়দায় ব্যবসা চালু করিয়াছি। কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, মজুতদারী ও চোরাচালানী আমরা ছাড়তে পারি না এই চারের মায়াতেই।

হার্টের চার চেম্বারের সবচেয়ে বড় ত্রুটি দেখা দিয়াছে 'জাতির পিতা' ও তার সন্তানদের সর্ম্পকের মধ্যে। জাতির পিতা তার সন্তানদের ভালোবাসেন, সন্তানরাও পিতাকে ভালোবাসে। সবাই পিতাকে অন্তর দিয়া ভালোবাসে বলিয়াই তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা–প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিণামে খুন-খারাবী। জাতির পিতা খুন-খারাবী বন্ধ করিতে সন্তানদের প্রথমে অনুরোধ পরে নির্দেশ অবশেষে ধমক দিয়েছেন। কিন্তু সন্তানেরা পিতার কথা শুনিতেছে না। পিতা ও কঠোর হইয়া সন্তানদের শাস্তি দিতে পারিতেছেন না। এটা ঘটিতেছে হৃদয়ের জন্যই। বিশেষত: হৃদয়ের চারটি চেম্বারের দোষেই। জাতির পিতা সকলের কল্যাণের জন্য যতই চেঞ্জ অফ হার্টের কথা বলিতেছেন সন্তানেরা ততই স্টেনগানের সাহায্যে এক্সচেঞ্জ অফ হার্ট করিতেছে। এটা অধিক দিন চলিতে দিলে সকলেরই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে।" এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর জনাব মনসুরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মহল থেকে নানারকমের কটূক্তি শুরু হয়।

বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগের (বাকশাল) একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বীজ নিহিত ছিল ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ রক্ষীবাহিনী আদেশ জারি করার মধ্যে। তারই সূত্র ধরে '৭২ সালের এপ্রিলে শ্রমিক ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ এবং প্রেসিডেন্টের ৯নং ও ৫০নং (৭২) আদেশ জারি হয় এবং সবশেষে ১৯৭৪ সালে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে আওয়ামী লীগ গঠন করে একদলীয় বাকশাল। যাতে যোগ দিয়েছিল মনি সিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টি, মোজাফফর আহ্‌মদের ন্যাপ আর আতাউর রহমানের জাতীয় লীগ।

১৯৭৪ সালের বাকশাল গঠনের আগে আওয়ামী লীগ কোনদিন একদলীয় শাসনের কথা বলেনি। বরং অধিক হারে বলেছে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা, সংসদের সার্বভৌমত্বের কথা, বলেছে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কথা, বলেছে সংবাদপত্রে স্বাধীনতার কথা, বলেছে আইনের শাসনের কথা। জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ এমনকি মোজফফর আহমদ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন, "সরকার একদলীয় শাসন কায়েম করতে চায়।" মাওলানা ভাসানী নিরন্তন প্রতিবাদ করেছেন এই সরকারের গণবিরোধী নীতির, নিস্পেষনের, দলীয় দুর্নীতির। আতাউর রহমান খান চতুর্থ সংশোধনীর আগ পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু মোজাফফর আহমদ ৪/৪/৭৩ তাদের কাউন্সিল অধিবেশনে সংসদীয় গণতন্ত্রের শপথ ঘোষণা করলেও ১৯৭৩ থেকেই মূলতঃ একদলীয় স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। '৭৩ সালের ৩০শে এপ্রিল ভাসানী ন্যাপের সহ-সভাপতি ডাঃ আলিম আল রাজি পল্টনের এক জনসভায় অভিযোগ করেন যে, বিরোধী দলগুলোর উপর সরকার নির্যাতন চালাচ্ছে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখছে। তিনি বিনা বিচারে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করেন। একই অভিযোগ করে জাসদ। একই অভিযোগ করেন তৎকালীন জাতীয় লীগের অলি আহাদ।

এই সময় ১৯৭৩ সালের ১৫ই মে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। একই সময় ১৭ই মে মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন মিলে গঠন করে কেন্দ্রিয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এটাই বাকশালের সঙ্গে মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্টদের বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রথম আলামত। মাওলানার অনশনকে কেন্দ্র করে তোফায়েল আহমদ, আব্দুর রাজ্জাকসহ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, হবুমন্ত্রীরা মাওলানা ভাসানীকে আর এক দফা সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট, রাজাকারদের দালাল ও দেশের স্বাধীনতা নস্যাত করার চক্রান্তকারী বলে অভিহিত করতে শুরু করেন। মাওলানা ভাসানীর ডাকে ২১শে মে সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ভাসানী ন্যাপের তদানীন্তন নেতা কাজী জাফরের অভিযোগ অনুযায়ী হরতালকে বানচাল করার জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে মুজিববাদীরা সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিল।

মাওলানা যখন সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক মুক্তির দাবি নিয়ে অনশন করে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময়ই ২২শে মে ঐক্য জোটের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হল। আওয়ামী লীগ মোজাফফর ন্যাপ, মনি সিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টি, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ও ছাত্র ইউনিয়ন মিলে। উল্লেখ্য, এরা সবাই পরে বাকশালে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। বায়তুল মোকাররমে

অনুষ্ঠিত এক সভায় তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নস্যাতের ষড়যন্ত্রকারী চীন, মার্কিন ও পাকিস্তানের দালালদের প্রতিহত করার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। বক্তারা সমাবেশে মাওলানা ভাসানীর অনশনকে মূলধন করে রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তিরা তৎপরতা শুরু করেছে বলে সোচ্চার দাবি তোলেন। একই সভায় মোজাফফর আহমদ বলেন, "অনেকে সরকারের বিরোধিতা করছে এই কারণে যে পাকিস্তানে ভাঙ্গা হয়েছে। কেউ কেউ আবার শিল্প জাতীয়করণের জন্য সরকারের বিরোধিতা করছে।" আমরা এদের সঙ্গে একমত নই। এছাড়া যে গণতন্ত্রে দেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব হয় এবং মজলুম জনতার মুক্তি আসে না, সে গণতন্ত্রকে আমরা পদাঘাত করি। কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রধান মনি সিং বলেন, "মাওলানার অনশন খাদ্যাভাবের জন্য নয়, দেশকে বিপাকে ফেলার জন্য।"

এ সময়ে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। জনতার সাথে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে বিভিন্ন স্থানে। শহরবাসীরা ঐসব হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। ৮ই জুন মাইজদীতে জনতার সাথে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটে। ৯ই জুন ঐ হামলা ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। এর পিছনে কোনো রাজনৈতিক উস্কানি ছিল না। ঐ দিনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনার তদন্ত করার জন্য মাইজদী যেতে বাধ্য হন। তারপর ১০ই জুন '৭৩ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল ঘোষণা করেন, "মাইজদীর ঘটনার জন্য দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।" কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সে খবর কোথাও ছাপা হয়নি। আজঅব্দি জানতে পারেননি এদেশের নির্যাতিত জনগণ সেখানে কি ঘটেছিল।

১০ই জুন বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টির এক সভায় দলীয় প্রধান জনাব মনি সিং উচ্চকণ্ঠে বলেন, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীনের নেতৃত্ব এবং তাদের দেশীয় সহযোগী ভাসানী ন্যাপ উগ্রপন্থী জাসদ, মুসলিম লীগ ও জামায়াতপন্থীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে।" এরপর ১৯৭৩ সালের ১৯ই জুন ঢাকার প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণায় নির্দেশ জারি করেন, "শহরে বিনা অনুমতিতে মাইক ব্যবহার করা যাবে না।" মাইক ব্যবহারের উপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সুস্পষ্টভাবে বিরোধী দলের জনসভার উপর। মোজাফফর ন্যাপ বা সিপিবি-এর কোন প্রতিবাদ করেনি। বরং ২৪শে জুন মোজাফফর ন্যাপের সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, "তার দল বাস্তব অবস্থাতে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।" ঐ জনসভাতেও তিনি মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীকে সাম্রাজ্যবাদের চর বলে অভিহিত করেন। ইতিমধ্যে মজুতদারী, চোরাচালানী, দুর্নীতিতে ছেয়ে যায় দেশ। রক্ষীবাহিনীর হামলা

ও হত্যা বাড়তে থাকে। ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুন পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে দেখা গেল যে, '৭২ সালের তুলনায় দ্রব্যমূল্য চার'শ গুন বেড়েছে।

এই সময় ২৯শে জুন চট্টগ্রামে ঘটে এক চমকপ্রদ ঘটনা। চট্টগামের ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর বাসের উপর রক্ষীবাহিনীর গুলিবর্ষণে নিহত হয় একজন কর্মচারী। গুরুতর আহত হয় দু'জন শ্রমিক। ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর একটি বাস কর্মচারীদের রিফাইনারীতে নিয়ে যাবার পথে রক্ষীবাহিনীর একটি ট্রাককে ওভারটেক করে। এ কারণে রক্ষীবাহিনীর ক্রুদ্ধ সদস্যরা একটি রেল ক্রসিংয়ের মুখে ঐ গাড়ি ঘেরাও করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এমনি সামান্য ছুতোঁতেই রক্ষীবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে স্বাধীন এ দেশের সাধারণ মানুষকে।

এই সময় দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক নির্মল সেন (অনিকেত) মার্চের নির্বাচনের ক'দিন পরে লিখেছিলেন, "আমি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই" শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ। লেখায় তিনি এক সপ্তাহের একটি ঠিকুজি তুলে ধরেন ১৩টি হত্যাকান্ডের। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন যে, এ খবর সব খবর নয়। সব খবর সংবাদপত্রে পৌঁছে না। সব খবর পৌঁছে না থানায়। দূর-দূরান্ত থেকে কে দেয় কার খবর? আর দিতে গেলে জীবনের যে ঝুঁকি আছে সে ঝুঁকি নিতেই বা কতজন রাজি? এই নির্বিচার হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করে নির্মল সেন জানতে চেয়েছিলেন -

(১) ১৯৭২ সাল হতে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কয়টি হত্যাকান্ডের কিনারা হয়েছে?

(২) কয়জন হত্যাকারী গ্রেফতার হয়েছে?

(৩) ক'টি গাড়ি হাইজ্যাক হয়েছে? সে হাইজ্যাকার কারা? কি তাদের পরিচয়? কি তাদের ঠিকানা?

(৪) কারা গ্রেফতার হয়েছে?

(৫) পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্তদের ধরা হলে ফোনের জন্য তাদের মুক্তি দিতে হয়। এ অভিযোগ কতটুকু সত্য? এই ফোন কারা করে থাকেন?

তিনি বলেন, "খুঁজে দেখতে হবে এই হত্যাকারীরা কাদের প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠছে। নইলে দিনের পর দিন হত্যা, রাহাজানীর খবর বের হয়? অথচ একটি অপরাধীরও শাস্তি হয় না। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে কি করে?" এ প্রশ্ন শুধু নির্মল সেনেরই ছিল না এ প্রশ্ন ছিল দেশের জনগণেরও। আওয়ামী লীগ সরকার এ প্রশ্নগুলোর কোন জবাব দিতে পারেনি।

চট্টগ্রামের রিফাইনারী কর্মচারীদের উপর গুলিবর্ষণের অকারণ হত্যার জন্য রক্ষীবাহিনীর কেউ সাজা পায়নি। উপরন্তু ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুলাই প্রেসিডেন্টের অগণতান্ত্রিক ৫০নং ধারা অনুযায়ী রক্ষীবাহিনীকে দেয়া হল নতুন ক্ষমতা। তাতে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি লিডার ও তার উপরস্থ সকল অফিসারকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া অপরাধ করেছে সন্দেহে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও তল্লাশীর ক্ষমতা দেয়া হয়। ২০শে জুলাই ভাসানী ন্যাপের ডাঃ আলিম আল রাজি প্রেসিডেন্টের ৫০নং আদেশ বাতিলের দাবি করেন। তিনি বলেন, "ঐ ধারার যথেচ্ছা প্রয়োগ করে বিরোধীদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল আটক রাখা হচ্ছে।" ১৫ই আগষ্ট বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ঐ ধারার প্রতিবাদ করেন। এমনকি ১৯৭৩ সালের ১৮ই অক্টোবরে সংসদে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত ইত্তেফাক সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেনও প্রেসিডেন্টের ৫০নং অধ্যাদেশের প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "এই আইনে গ্রেফতারের বিধান আছে কিন্তু জামিনের বিধান নাই। ফলে আইনের শাসনের প্রতি মানুষের বিদ্বেষই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এর ফলে অনেকেই দুস্কৃতিকারী হচ্ছে। দেশে ৫০নং অধ্যাদেশের যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে।" বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনিও ৫০নং অধ্যাদেশের সংশোধনী দাবি করেন। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে, এতবড় একটি অগণতান্ত্রিক কালা-কানুনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মোজাফফর ন্যাপ একটি শব্দ ও উচ্চারণ করেনি।

এরপর ১৯৭৩ সালের ২৯শে আগষ্ট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে, অন্ন-বস্ত্রের দাবিতে, কালা-কানুন রোধ ও নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেন। তার ক'দিন আগ থেকে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণের প্রতি এই জনবিরোধী হরতাল প্রতিহত করার আহ্বান জানান। ত্রিদলীয় ঐক্য জোটের সভায় হরতালের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয়। পংকজ ভট্টাচার্য্য বলেন, "জাসদ ও ভাসানী ন্যাপ বাংলাদেশকে মার্কিন পদানত করতে চায়।" কিন্তু সরকারি পক্ষের সব চেষ্টার ফলেও হরতাল পুরোপুরি সফল হয়। হরতালের দিন ঐক্যজোটের লোকেরা সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে হরতালকে বানচাল করার প্রয়াস চালায়। তার বিবরণ পরদিন কিছু কিছু কাগজে ছাপা হয়। এভাবে গণতন্ত্রকে বিকলাঙ্গ করার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়।

১৯৭৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর অধিবেশনে সংসদকে নির্যাতনমূলক আটক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়। প্রেসিডেন্টকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। সংসদের সকল বিরোধী ও র্নিদলীয় সদস্য এ সময়ে ওয়াক আউট করেন। দেশের প্রত্যেকটি

রাজনৈতিক দল যখন দাবি করছে যে, প্রেসিডেন্টের ৫০নং ধারায় বহু লোককে গ্রেফতার করা হচ্ছে; আওয়ামী লীগ সদস্যরাও যখন একথার সত্যতা স্বীকার করছিলেন সেই সময় ৪ঠা অক্টোবর সংসদে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৎকালীন স্বরাষ্টমন্ত্রী জনাব আব্দুল মালেক উকিল বললেন যে রাজনৈতিক কারণে কাউকে আটক করা হয়নি। এদিকে ২৯শে সেপ্টেম্বর জনাব উকিল ঘোষণা করেন, "থানায় থানায় দুর্বৃত্তের তালিকা তৈরি হচ্ছে। সারাদেশ থেকে দুস্কৃতিকারীদের উৎখাত করা হবে।" তার ক'দিন পর ১২ই অক্টোবর বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করে যে, "থানায় থানায় রক্ষীবাহিনী বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রানি করছে।" এরপর ১৪ই অক্টোবর ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের (মনি, মোজাফফর, আওয়ামী লীগ) ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, "চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে দেশ গঠন, দেশের সংহতি ও স্বাধীনতা রক্ষা, দুস্কৃতিকারী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর, মুজদদার, সাম্রাজ্যবাদদের দোসর, স্বাধীনতার শত্রুদের উৎখাত করার ক্ষেত্রে এই তিনটি দল ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে যাবে। জোটের কেন্দ্রিয় কমিটিতে আওয়ামী লীগের সদস্য থাকবে ১১ জন, মোজাফফর ন্যাপের ৫ জন এবং মনিসিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টির ৩ জন।"

১৫ই অক্টোবর ন্যাপের মোজাফফর আহমদ ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ সুবিমল দত্তের সঙ্গে দেখা করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। ২১শে অক্টোবর ঐক্যজোটের কেন্দ্রিয় কমিটি গঠিত হয়। তাতে আওয়ামী লীগের জনাব জিল্লুর রহমান আহ্বায়ক হন। মোজাফফর আহমদ ও মনি সিং থাকেন ঐ কমিটিতে। ইতিমধ্যে ১৮ই অক্টোবর জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান অভিযোগ করেন যে, "দুস্কৃতিকারী আখ্যা দিয়ে বিরোধী দলীয় কর্মীদের উপর পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন চলছে। সরকার অস্ত্র দিচ্ছে। এটা উদ্বেগজনক। এ পদক্ষেপ দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।"

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ২১শে অক্টোবর অভিযোগ করে যে, রক্ষীবাহিনী তাদের রাজবাড়ি জেলা শাখার সম্পাদককে গ্রেফতার করে পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছে। ২৪শে অক্টোবর তারা অভিযোগ করেন যে, বাগমারার জাসদ নেতাকে রক্ষীবাহিনী খুন করেছে। একই অভিযোগ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ঐক্যজোটের মোজাফফর ন্যাপ, ১৬ই অক্টোবর পাবনার ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকে রক্ষীবাহিনীর গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে জেলা ন্যাপ কমিটি একটি বিবৃতি দেন। ২রা নভেম্বর মোজাফফর ন্যাপের সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করেন যে, তার কর্মীদের উপর রক্ষীবাহিনীর হামলা, হত্যা, নির্যাতন চলছে। তিনি বলেন, "১লা নভেম্বর সুনামগঞ্জ মহকুমার ন্যাপ প্রধান বন্ধু দাসকে রক্ষীবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

পীরগাছার ন্যাপ কর্মীদের নির্বিচারে মারধর করা হয়েছে। ৩০শে অক্টোবর নাটোরে ন্যাপ কর্মীকে রক্ষীবাহিনী অপহরণ করেছে।" সেই সঙ্গে পংকজ ভট্টাচার্য্য অনুনয় করেন যে, এদের উপর হামলা হলে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের শক্তিই বৃদ্ধি পাবে।

'৭৩ সালের ২৫শে অক্টোবর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মালেক উকিল জানান, "গ্রামরক্ষী দল গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে শর্টগান দেয়া হবে। কাজের মেয়াদ শেষ হলে এসব অস্ত্র থানায় জমা দেয়া হবে।" তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেন, "এ ব্যাপারে মহকুমা হাকিমের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং এম পির সাথে আলোচনা করে গ্রামরক্ষী দল গঠনের জন্য ওসির প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

এরপর ২৯শে নভেম্বর সরকারের অস্ত্র সংক্রান্ত এক ঘোষণায় বলা হয়, "রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মন্ত্রীগণ, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যরা লাইসেন্স ছাড়াই নিষিদ্ধ (প্রোহিবেটেড বোরের) অস্ত্র নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন।" এর বৈধতার প্রশ্ন ছাড়াও এই সিদ্ধান্ত থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠে যে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি ঘটেছিল।

১২ই নভেম্বর নজীরবিহীনভাবে বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব স্বয়ং। সেখানে মনি সিং বলেন, "ঐক্যজোটের ঘোষণায় যাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (ভাসানী ন্যাপ ও জাসদ সহ) আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফলতা লাভ করতে পারি তাহলে দেশে বিপ্লবের বিরাট অগ্রগতি হবে। এটি আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য।" ৭ই ডিসেম্বর ত্রিদলীয় ঐক্যজোট ঘোষণা করে, "সমাজতন্ত্রের পথ বাধামুক্ত করা হবে। সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়ন প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য।"

ইতিমধ্যে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সরকারি প্রশাসকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসে। অবাধ লুটপাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে জনগণ। আকাশচুম্বি দ্রব্যমুল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। চার মাসে সরকার ৬৩ কোটি টাকা ছাড়ে বাজারে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

এই অবস্থায় ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঘটে ব্যাংক ডাকাতির প্রচেষ্টায় এক চমকপ্রদ ঘটনা। দুস্কৃতিকারীদের সাথে গুলি বিনিময়ের পর পুলিশ ছয়জন

দুস্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল। পরে অবশ্য পুলিশ জানায়, "দুস্কৃতিকারীদের তাড়া করার সময় এরা আকস্মিকভাবে গুলিবিদ্ধ হন।"

১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার রেল, পাটকল, বিদ্যুৎ, বিআরটিসি, স্বাস্থ্য দপ্তর, নৌ পরিবহন সংস্থা প্রভৃতি স্থানে শ্রমিকদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে দেয়। এ সময় পাটগুদামে প্রায় আগুন লাগা প্রতিদিনের খবরে রূপ নেয়। কোটি কোটি টাকার পাট পুড়িয়ে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ এমপি শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, "রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য মালিকরা পাট পোড়াচ্ছে।" এই অবস্থায় ২৪শে ডিসেম্বর '৭৩ প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিদায় নিতে হয়। তিনি প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে স্পীকারের কাছে তার পদত্যাগপত্র না দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। পদত্যাগপত্রে প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে লেখেন, "আপনার সঙ্গে আলোচনার পর এবং জরুরী জাতীয় স্বার্থে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করছি।" তারপর স্পীকার মোহাম্মদউল্লাহ্ প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ এর শেষদিকে স্বরাষ্টমন্ত্রী ঢাকার কমলাপুরে এক জনসভায় বলেন, "দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাতে অস্ত্র দেয়া হবে।" কত অস্ত্র এইসব বাহিনীর হাতে দেয়া হয়েছিল সেটা আজ অব্দি দেশবাসী ৩০ হাজারেরও বেশি দেশপ্রেমিকের প্রাণের বিনিময়েও জানতে পারেনি।

বাকশালে প্রাথমিক পর্ব ১৯৭৩ সালের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। ১৯৭৪ সালে শুরু হয় এর ব্যাপক প্রস্তুতি পর্ব। '৭৪ সালের ১৩ই জানুয়ারী জাসদ ঘোষণা করে যে, ২০শে জানুয়ারী পল্টনে তারা জনসভা করবে। উক্ত জনসভা ভন্ডুল করতে আওয়ামী লীগও একই দিনে পল্টনে জনসভা ডাকে। এ নিয়ে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক নির্দেশে ১৪ই জানুয়ারী থেকে শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। পরে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়িয়ে দেয়া হয়। ২০শে জানুয়ারী রাজশাহীতেও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪ই জানুয়ারী জাসদ এই ১৪৪ ধারা জারির তীব্র প্রতিবাদ করে এবং এই ধারা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ১৬ই জানুয়ারী জাসদের ঢাকা নগর শাখার সহ-সম্পাদক অপহৃত হন। ১৮ই জানুয়ারী জাসদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ে, লাঠিচার্জ করে এবং বহু কর্মীকে গ্রেফতার করে। জাসদের ডাকে ২০শে জানুয়ারী '৭৪ সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ঐ দিন বিকেলে তারা এক বিরাট জঙ্গী মশাল মিছিল রাজধানীর রাজপথে বের করে। সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়। তারা মিছিলের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। পরদিন এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে

ঘোষণা করা হয় মিছিলকালে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ঐ প্রেসনোটের পাশে দৈনিক ইত্তেফাক সচিত্র খবর পরিবেশন করে যে পঞ্চাশ ব্যক্তি আহত হয়েছে এবং দু'জনের অবস্থা গুরুতর। চিত্রে দেখা যায় আওয়ামী সরকারের রক্ষীবাহিনী বায়তুল মোকাররমের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারীদের উপরও হামলা চালাচ্ছে। জাসদ দাবি করে ঐদিন তাদের এক হাজারেরও বেশি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২রা ফেব্রুয়ারী জাসদের সহ-সভাপতি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গুলিতে নিহত হন।

এ সময় ১৯৭৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসে। সংসদের স্পীকার হন জনাব আব্দুল মালেক উকিল। এই অধিবেশনেই মোহাম্মদউল্লাহকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করে। ২৮শে জানুয়ারী আব্দুল মালেকের স্পীকারিত্বের সময় প্রথম যে আইনটি তিনি কণ্ঠ ভোটে পাশ করেন তা ছিল রক্ষীবাহিনী আইন। বিলটি ছিল চরমভাবে গণবিরোধী এবং এতে রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার, তল্লাশী ও আটক করার ক্ষমতা দান করা হয়। বিরোধীদলের সদস্যরা এর প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেন। বিলটি উথাপন করেন তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর। বিরোধী দলের সদস্যদের ওয়াক আউটের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছিলেন তিনি।

'৭৩ সালের প্রারম্ভ থেকেই গ্রামে গ্রামে চলে রক্ষীবাহিনীর বর্বর, নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক অভিযান। মুজিব আমলের স্বৈরাচার ও বিরোধী নির্যাতনের একটি দলিল আত্মগোপনকারী কম্যুনিষ্ট নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী শ্রীমতি অরুণা সেনের বিবৃতি। অরুনা সেন, রানী সিংহ ও হনুফা বেগমকে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার রামভদ্রপুর গ্রাম থেকে রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করেনি। তাদেরকে কোন আদালতেও হাজির করেননি। ঢাকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয় এবং পরে সুপ্রীম কোর্টে তাদের পক্ষে রীট আবেদন করার পর কোর্টের নির্দেশে তাদেরকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার শুনানির সময় সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণযোগ্য অভিযোগ আনতে অক্ষম হওয়ায় সুপ্রীম কোর্ট অবিলম্বে তাদের তিনজনকেই বিনা শর্তে মুক্তিদানের নির্দেশ দেন। অরুণা সেন ও অন্যান্যদের পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ ও ব্যারিষ্টার জমিরুদ্দিন সরকার।

মুক্তি পাবার পর আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যায়-নির্যাতনের স্বরূপ প্রকাশের জন্য শ্রীমতি অরুণা সেনের সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, "গত ১৭ই আশ্বিন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা আমাদের গ্রামের ওপর হামলা করে। ঐদিন ছিল দূর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরে আমাকে গ্রেফতার করে। গ্রামের অনেক যুবককে

ধরে বেদম মারপিট করে। লক্ষণ নামের একটি কলেজের ছাত্র ও আমাকে ধরে তারা নড়িয়া রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার স্বামী শান্তি সেন ও পুত্র চঞ্চল সেন কোথায়? বলে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের ধরিয়ে দিন। আরো জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যার দিকে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। লক্ষণকে সেদিন রেখে পরদিন ছেড়ে দেয়। সে যখন বাড়ি ফেরে, দেখি বেদম মারের ফলে সে গুরুতররূপে আহত ও অসুস্থ্য হয়ে পড়েছে। চার/পাঁচ দিন পর আবার তারা আমাদের গ্রামের উপর হামলা চালায়। অনেক বাড়ি তল্লাশী করে। অনেককে মারধর করে। কৃষ্ণ ও ফজলু নামের দু'জন যুবককে তারা মারতে মারতে নিয়ে যায়। আজও তারা বাড়ি ফিরে আসেনি। তাদের আত্মীয়রা ক্যাম্পে গিয়ে তাদের খোঁজ করলে বলে দেওয়া হয় তারা সেখানে নেই। তাদেরকে খুন করে গুম করে ফেলা হয়েছে বলেই মনে হয়। এরপর মাঝে মাঝেই তারা গ্রামে এসে যুবক ছেলেদের খোঁজ করত।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ রাতে রক্ষীবাহিনী এসে সম্পূর্ণ গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে। ভোরে আমাকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম, গ্রামের উপস্থিত প্রায় অধিকাংশ সক্ষম দেহী পুরুষ এমনকি বালকদের পর্যন্ত এনে হাজির করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের থানা সম্পাদক হোসেন খাঁ সবকিছুর তদারকি করছে। আমার সামনে রক্ষীবাহিনী উপস্থিত সকলকে বেদম মারপিট শুরু করে। শুনলাম এদের ধরতে গিয়ে বাড়ির মেয়ে-ছেলেদেরও তারা মারধর করে এবং অনেকক্ষেত্রে অশালীন আচরণ করেছে। এরপর আমাকে রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার হুকুম করল পানিতে নেমে দাড়াতে। সেখানে নাকি আমাকে গুলি করা হবে। আমি নিজেই পানির দিকে নেমে গেলাম। ওরা রাইফেল উচিঁয়ে তাক করল গুলি করবে বলে। কিন্তু পরস্পর কী সব বলাবলি করে রাইফেল নামিয়ে নিল। আমি কাদাঁ-পানিতে দাড়িয়েই থাকলাম। কমান্ডার গ্রেফতার করা সবাইকে হিন্দু মুসলমান দুই কাতারে ভাগ করে দাড় করালো। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বলল, 'মালাউনরা আমাদের দুশমন। তাদের ক্ষমা করা হবে না। তোমরা মুসলমানরা মালাউনদের সাথে থেকো না। তোমাদের এবারের মত মাফ করে দেয়া হল।' এই বলে কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফা নামের দু'জন মুসলমান যুবককে রেখে বাকি সবাইকে এক একটা বেতের বাড়ি দিয়ে বলল, 'ছুটে পালাও'। তারা ছুটে পালিয়ে গেল। আমার পাক বাহিনীর কথা মনে পড়ল। তারাও বিক্ষুব্ধ জনতাকে বিভক্ত করতে এমনিভাবে সাম্প্রদায়ীকতার আশ্রয় নিয়েছিল। পার্থক্য শুধু তারা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়ীকতার আশ্রয় নিত আর এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধজাধারীরা ভন্ডামীর আশ্রয় নিচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফাসহ ২০জন হিন্দু যুবককে নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। তিনজন ছাড়া এরা সবাই পেশায় জেলে। মাছ ধরে কোনরকমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা সব আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতে থাকল। সে এক হৃদয় বিদারক

দৃশ্য! সন্ধ্যার সময় কলিমুদ্দিন, মোস্তফা, গোবিন্দনাগ ও হরিপদ ঘোষ ছাড়া বাকি সবাই গ্রামে ফিরে এল। আমি গেলাম তাদের দেখতে। দেখলাম তারা সবাই চলতে অক্ষম। সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে তাদের। বেত ও বন্দুকের দাগ শরীর কেটে বসে গেছে। চোখ-মুখ ফোলা; হাতপায়ের গিরোতে রক্ত জমে আছে। তাদের কাছে শুনলাম, সারাদিন দফায় দফায় তাদের চাবুক মেরেছে। গলা ও পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে পানিতে বার বার ছুড়ে ফেলে ডুবিয়েছে। পিঠের নিচে ও বুকের উপর পা দিয়ে দু'দিক থেকে দু'জন লোক তাদের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। মই দিয়ে ডলেছে। এদের অনেককেই আত্মীয়রা বয়ে এনেছে। এদের অবস্থা দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, যারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও একবেলা পেটপুরে খেতে পায়না, অনাহার, দুঃখ-দারিদ্রের জ্বালায় আজ অর্ধমৃত তাদের 'মরার উপর খাড়ার ঘাঁ'-র অবসান কবে হবে? যে শাসকরা মানুষের সামান্য প্রয়োজন ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, শোষণ, নির্যাতন যারা বন্ধ করতে পারছে না, তারা কোন অধিকারে আজ নিঃস্ব মানুষের উপর চালাচ্ছে এই বর্বর নির্যাতন? অবশেষে চরম নির্যাতন আমার উপরও নেমে এল। ৬ই ফেব্রুয়ারীর রাতে ভোর না হতেই রক্ষীবাহিনী ঘুম থেকে আমাকে তুলল। আমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এলে দেখলাম রানীও রয়েছে। আমাদের নিয়ে তারা দুই মাইল দূরে ভেদরগঞ্জ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। রাস্তায় তারা রানীর প্রতি নানারকমের অশ্লীল উক্তি করেছিল। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলাম সেখানে কলিমুদ্দিন, মোস্তফা, গোবিন্দনাগ এবং হরিপদও রয়েছে। বুঝতে পারলাম তাদের উপর চরম দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে। বিশেষ করে কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফাকেই বেশি অসুস্থ্য দেখলাম। কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফা দুই ভাই। এদের সংসারে আর কোন সক্ষম ব্যক্তি নেই। অপরের জমিতে চাষ করে ওরা কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে। এরা বিবাহিত ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জনক। আমরা ক্যাম্পে আসতেই অনেক রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের ঘিরে দাড়াল; কেউ অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ চড় মারে, কেউ খোঁচা দেয়। এমন সব বর্বরতা। কিছুক্ষণ পর আমাদের রোদের মধ্যে বসিয়ে রেখে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় আমাকে উপরে দোতালায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম রানীর হৃদয়বিদারী চিৎকার। প্রায় আধঘন্টা পর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে থেমে গেল। নিঃস্তব্ধ রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছিল বেতের সপাং সপাং শব্দ আর পাশবিক গর্জন। রানীকে যখন এনে তারা কামরার মধ্যে ফেলল, রাত্রি তখন কত জানিনা। রানীর অচৈতন্য দেহ তখন বেতের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত। রক্ত ঝড়ছে। জ্ঞান ফিরলে রানী পানি চাইলো, আমি তাকে পানি খাওয়ালাম। রানী আস্তে আস্তে কথা বলতে পারল। রাত্রি তখন ভোর হয়ে এসেছে। রানীর মুখে শুনলাম উপরে ভেদরগঞ্জ ও ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সম্পাদকরা এবং ঐ দুই স্থানের ক্যাম্প কমান্ডাররা উপস্থিত ছিল। তারা শান্তি সেন ও চঞ্চলকে ধরিয়ে দিতে বলে এবং অস্ত্র কোথায়

আছে জিজ্ঞাসা করে। রানী কিছুই জানে না বলায় তাকে এমন সব অশ্লীল কথা বলে যা কোন সভ্য মানুষের পক্ষে বলা তো দূরের কথা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ও গালি বর্ষণের পর ভেদরগঞ্জ ক্যাম্প কমান্ডার বেত নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি এমন পেটাতে থাকে যে তিনখানা বেত ভেঙ্গে যায়। আবার জিজ্ঞাসা করে, শান্তি ও চঞ্চল কোথায়? রানীর একই উত্তর। ক্ষীপ্ত হয়ে রানীকে তারা সিলিং এর সাথে ঝুলিয়ে দেয় এবং দুই কমান্ডার এবার একই সাথে চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করে। মারার সময় অসহ্য যন্ত্রণায় রানী বলেছিল, 'আমাকে এভাবে না মেরে গুলি করে মেরে ফেলুন।' জবাবে একজন বলে, 'সরকারের একটা গুলির দাম আছে। তোকে সাতদিন ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলব। এখন পর্যন্ত মারার দেখেছোটা কি?' অল্পক্ষণ পরেই রানী অচেতন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের চাবুক চালানো বন্ধ হয়নি। যখন জ্ঞান ফেরে রানী দেখে সে মেঝেতে পরে আছে। পানি চাইলে তারা তাকে পানি দেয় নাই। ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রথমে আমাকে ও পরে রানীকে দোতালায় নেয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী ফজলু মিঞা ও ভেদরগঞ্জের সেক্রেটারী হোসেন খাঁ। তারা চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে বলল, তোমার স্বামী ও ছেলেকে ধরিয়ে দাও। অস্ত্র কোথায় আছে বলে দাও। তারা ডাকাত, অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে। আমি বললাম, তারা ডাকাত নয়। তারা সৎ দেশপ্রেমিক, আমার স্বামী রাজনীতি করেন এ কথা কে না জানে। দেশের সাধারণ লোকের অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় তিনি। রানীকে তারা একই প্রশ্ন করেন। রানী কিছুই জানে না বলায় তারা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। ডামুড্যা ক্যাম্পের কমান্ডার করম আলী এবং ভেদরগঞ্জ ক্যাম্প কমান্ডার ফজলুর রহমান আমাদের অশ্লীল গালাগাল দিতে শুরু করে এবং আমাকে ও রানীকে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রানীর বস্ত্র খুলে নেয়। তারপর আমাদের দু'জনকে দু'দিক থেকে চাবুক মারতে থাকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান হলে দেখি দু'জনেই মেঝেতে পরে আছি। রানীর সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমার গায়ে কাপড় থাকায় অপেক্ষাকৃত কম আহত হয়েছি। তবুও এই রুগ্ন বৃদ্ধ দেহে এই আঘাতই মর্মান্তিক। সর্বাঙ্গ ব্যাথায় জর্জরিত। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে নারকীয় হাসি হাসছে। এদের হুকুমে দু'জন সিপাই আমাকে টেনে তুলল। আমি অতিকষ্টে দাড়াতে পারলাম। রানী পারল না। দু'জন রক্ষী তার দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে তাকে টেনে তুলল ও তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিল। তারপর টানতে টানতে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। কমান্ডার পেছন থেকে নির্দেশ দেয় ওকে ভালো করে হাটা নয়তো মরে যাবে। সকালে কমান্ডার কয়জন রক্ষীসহ রানীকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হল। বলল, 'বাচঁবিতো না, চল তোর মাকে দেখিয়ে আনি।' রানীর সর্বাঙ্গ ফুলে কালো হয়ে গিয়েছে। পা ফেলবার ক্ষমতা নেই। সে অবস্থায় তাকে হেচঁড়াতে হেচঁড়াতে দু'মাইল পথ টেনে নিয়ে যাওয়া হল। রানীর মা রানীকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে যান। কমান্ডার রানীকে তার মার মাথায় পানি দিতে বলে। রানীর মার

জ্ঞান এলে রানীর চেহারা এমন কেন জিজ্ঞেস করায় কমান্ডার বলে পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। রানীকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানালে কমান্ডার বলে 'খাসী খাওয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।' এরপর আবার দু'মাইল রাস্তা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তাকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হল। ঐ দিন ছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪। হনুফাকেও তারা ধরে নিয়ে এল ঐদিন। করিম নামের আর একটি কৃষক যুবককেও ওরা ধরে এনেছে দেখলাম রামভদ্রপুর থেকে। তাকে এত মারা হয়েছে যে তার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। নড়িয়া থানার পন্ডিতসার থেকেও একজন স্কুল শিক্ষক ও দু'জন যুবককে এনেছে দেখলাম। বিপ্লব নামের একটি ছেলে নাকি মারের চোটে পথেই মারা যায়। রক্ষীবাহিনীর সিপাইরা বলাবলি করছিল। একজন জল্লাদ গর্জন করে বলছিল, 'দেখ এখনও হাতে রক্ত লেগে আছে!' শুনেছি মতি নামের আর একটি যুবককেও তারা পিটিয়ে মেরেছে। আর আমাদের ধরে আনার দু'দিন আগে কৃষি ব্যাংকের পিয়ন আলতাফকে পিটাবার পর হাত-পা বেধে দোতালার ছাদ থেকে ফেলে মেরে ফেলেছে। ৯ তারিখ দুপুরের অল্প পরে তারা হনুফা, রানী ও আমাকে নিয়ে গেল পুকুরের ধারে। সেখানে আমাদের একদফা বেত দিয়ে পিটিয়ে চুবানোর জন্য পানিতে নামাল। প্রথমে ওরা আমাদের সাতঁরাতে বাধ্য করল। আমরা ক্লান্ত হয়ে কিনারায় উঠতে চেষ্টা করি, ওরা আমাদের বাঁশ দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। পরিশ্রান্ত হয়ে যখন আমরা আর সাঁতরাতে পারছিলাম না তখন পানি থেকে তুলে আবার বেত মারতে থাকে। শেষের দিকে আমরা যখন আর সাতঁরাতে পারছিলাম না, তখন আমাদের পানিতে ডুবিয়ে দেহের উপর দু'পা দিয়ে দাড়িয়ে থাকত।

এভাবে আমাদের তিন দফা পেটানো ও চুবানো হয়। কিছুক্ষণ আগেই করিম মারের চোটে মরে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আর একটি অল্প বয়সী যুবককে চুবিয়ে অচেতন করে ফেলেছিল। তাকে ঘাটলার উপর ফেলে রাখে। আমার আঁচল দিয়ে গা মোছানোর সময় হঠাৎ ছেলেটি চোখ খুলে তাকায়। আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। রক্ষীরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে শুনেছি ছেলেটাকে নাকি মেরে ফেলেছে। সন্ধ্যার অল্প আগে আমাদের পানি থেকে তুলে ভিজা কাপড়েই থাকতে বাধ্য করল। দারুন শীতে আমরা কাঁপছি। প্রচন্ড জ্বর এসে গেছে সকলের। এমনি করেই রাতভর ছালার চটের উপর পরে থাকলাম। পরদিন রাতে রানীকে আবার নিয়ে গেল দোতালায়। সেখানে আবার তাকে ঝুলিয়ে বেত মারল। ১১ তারিখে আবার রানীর ওপর চলল একই অত্যাচার। রানী জ্ঞান হারাল। রক্ষী সিপাইদের বলাবলি করতে শুনলাম 'রানী মরে গিয়েছে'। রানীর কাছে শুনলাম তার যখন জ্ঞান হল তখন সে দেখে তার পাশে ডাক্তার বসা। রানী জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে,আমি কোথায়?' ডাক্তার জবাব দেয়, 'আমি ডাক্তার, তুমি কথা বলো না।' কিছুক্ষণ পর ডাক্তার চলে গেলে রানীকে তারা ধরাধরি করে নিচে আমাদের কাছে নিয়ে এল।

একজন সিপাই রানী ও হনুফাকে বলল, 'তোরাতো মরেই যাবি। তার আগে আমরা প্রতি রাতে পাঁচজন করে তোদের ভোগ করব। তারা অবশ্য 'ভোগ' শব্দটি বলে নাই, বলেছিল অতি অশ্লীল কথা। একদিন রাতে দু'জন রক্ষী সিপাই ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দেয় এবং রানী ও হনুফার মুখ চেপে ধরে। ধস্তাধস্তি করে তারা ছুটে গিয়ে চিৎকার করে। চিৎকার শুনে ক্যাম্পের অন্য রক্ষীরা ছুটে আসে। কমান্ডারও আসে। ওরা তাকে সব বললে সে বলে, 'খবরদার এ কথা প্রকাশ করবি না। তাহলে মেরে ফেলব।'

রক্ষী সিপাইদের কারও কারও মাঝে মানবতাবোধের লক্ষণ পাচ্ছিলাম। তাদেরই একজন সিপাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছ?' প্রশ্ন শুনে সে চমকে উঠল। বলল, 'বাংলাদেশে লেখাপড়া দিয়ে কি করব? আমরা জল্লাদ, জল্লাদের আবার লেখাপড়ার দরকার কি?' এই বলে সে দে ছুট্। মনে হয় যেন চাবুক খেয়ে একটি ছাগল ছুটে পালাল। রক্ষী সিপাইদের কানাঘুষায় শুনছিলাম, আমাকে আর হনুফাকে অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবে আর রানী ও অন্যান্য পুরুষ বন্দীকে মেরে ফেলা হবে। ১২ই ফেব্রুয়ারী আমাকে ও হনুফাকে নিয়ে রক্ষীরা রওনা দিল। আমরা রানীকে ফেলে যেতে আপত্তি জানালাম। রানীও আমাদের সাথে যেতে খুব কান্নাকাটি করছিল। কমান্ডারের কাছে অনুনয়-বিনয় করছিল। কমান্ডার তার সহকর্মীদের সাথে কি যেন আলাপ করে সেদিন আমাদের পাঠানো স্থগিত রাখল। ১২তারিখ রাতেও ওরা আবার রানীকে ঝুলিয়ে হান্টার দিয়ে পেটায়। ১৩ তারিখে তারা রানীকে মারে না, কিন্তু নির্যাতনের নতুন কৌশল নেয়। দম বন্ধ করে রাখে। জোর করে চেপে ধরে রাখে নাক-মুখ-চোখ। এমনি করে জ্ঞান হারালে ওরা তাকে ছেড়ে দেয়।

১৯শে ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে ওরা আমাদের তিনজনকে নিয়েই রওনা দিল প্রায় চার মাইল দূরে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পের দিকে। কলিমুদ্দিন, মোস্তফা, গোবিন্দ ও হরিপদ থেকে গেল। রক্ষীরা বলাবলি করছিল তাদের মেরে ফেলা হবে। আমরা কিছুদূর এলে ক্যাম্পের দিক থেকে চারবার গুলির আওয়াজ পেলাম। ভাবলাম ওদের বুজি মেরে ফেলল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আমাদের শরীরের অবস্থা এমন ছিল যে, হাটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তবু আমরা বাধ্য হচ্ছিলাম হাটতে। বোধ হয় আমাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে। বোধ হয় বেঁচে যাব। এ চিন্তাই আমাদের হাটতে শক্তি যোগাচ্ছিল। অনেক রাতে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে স্পীডবোট করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সমস্তক্ষণ আমাদের কম্বল চাপা দিয়ে মুর্দার মত ঢেকে রাখা হল। বেদনা জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত শরীর। তার উপর কম্বল চাপা থাকায় শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। যেন জ্যান্ত কবর! সমস্ত দিন আমাদের ওভাবেই রাখল। খেতে দিল না। শেষরাতে আবার কম্বল চাপা দিয়ে জিপে

করে ঢাকার দিকে রওনা দিল। আবার সেই সুদীর্ঘ পথ জ্যান্ত কবরের যন্ত্রণা। ঢাকায় আমাদের প্রথমে রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে গেল। সে আমাদের খুব ধমকাল। সেখান থেকে নিয়ে গেল তেজগাঁ থানায়, তারপর লালবাগ থানায়। রাতে সেখানে থাকলাম। পরদিন পাঠাল সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পাঁচদিন রাখার পর আমাদের নিয়ে এল তেজগাঁ গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। জেলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মত রাখা হত। দিনরাত সেলে বন্দী। একই আহার্য দেয়া হত। সেখানে রাজনৈতিক অভিযোগে আরোও বন্দিনী আছেন। তার মধ্যে ১৭ই মার্চে গ্রেফতারকৃত জাসদ নেত্রী মোমতাজ বেগম আছেন; অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত পারভীন; আরও একজন আছেন নাম রুমা। সবাইকেই তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে রাখা হয়েছে। সাধারণ কয়েদীদের মত খাটানো হচ্ছে। এর উপর জমাদারনীরা (মেয়ে সিপাই জমাদার) তাদের নিজেদের জামা-কাপড় সেলাই, কাঁথা সেলাই, কাপড়-চোপড় ধোয়ানো সর্বকিছুই মেয়ে কয়েদীদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দীরাও রেহাই পাচ্ছেন না।"

এমনই হাজার হাজার করুণ কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে আওয়ামী লীগের শাসন আমলে বাংলাদেশে। যার সবগুলো গুমড়ে মরেছে নির্বিচারে, প্রকাশিত হতে পারেনি। রক্ষীবাহিনীর বর্বরতার আর একটি চিত্র তুলে ধরা যাক। ঘটনাটি ঘটেছিল পাবনার বাজিতপুরের কোরাটিয়া গ্রামের কৃষক আব্দুল আলীর ছেলে রশীদকে খুন করার কাহিনী।

আবদুল আলীর সাক্ষাৎকারটা ছিল নিম্নরূপ :-

"আমার সামনে ছেলেকে গুলি করে হত্যা করল। আমার হাতে কুঠার দিয়ে বলল, 'মাথা কেটে দে, ফুটবল খেলবো।' আমি কি তা পারি! আমি যে বাপ। কিন্তু অকথ্য নির্যাতন কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে ছেলের মাথা কেটে দিয়েছি। রশীদ নাকি রাজনীতি করত আমি জানতাম না। একদিন মাতু আর শাহজাহান এসে ধরে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ অফিসে সারারাত ওরা ওকে বেদম মার মারল। সকালে বলল এক হাজার টাকা দিলে ছেড়ে দেবে। রশীদ স্বীকার করে এল এক হাজার টাকা দেবার। আমার কাছে টাকা চাইল। কিন্তু আমি দিন আনি দিন খাই, মজুর মানুষ। হঠাৎ তিন দিনের মধ্যে এক হাজার টাকা কোথেকে দেব? বললাম, তুই বরং পালিয়ে সিলেট চলে যা। রশীদ সিলেট চলে গেল। কিন্তু ১০-১২ দিন পর ফিরে এসে বলল, 'বাবা মন মানেনা তোমাদের ফেলে থাকতে।' সিলেট থেকে ফেরার পরই কঠিন অসুখে পড়ল। টাইফয়েড। অসুখ সারার পর একদিন তার মাকে বলল, 'মা আজ ভাত খাব।' তার মা শৈলমাছ দিয়ে তরকারী রানল। এমন সময় আওয়ামী লীগের পান্ডারা রক্ষীবাহিনীসহ বাড়ি ঘেরাও করল।

অসুস্থ্য মানুষ। কোন রকমে বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে দৌড় দিল। বাবা আমার জানত না সেখানেও ঘাপটি মেরে বসে আছে আজরাইল। পাষন্ডরা দৌড়ে এসে ধরল তাকে। রশীদ সিরাজের পা ধরে বলল, 'সিরাজ ভাই, বিমারী মানুষ আমায় ছেড়ে দেন।' ছাড়ল না। তারপর বাপ-বেটা দু'জনকেই বেধে মার শুরু করল। কত হাতে পায়ে ধরলাম। এরপর মাতু গুলি করল রশীদকে। ঢলে পড়ল রশীদ। আমি নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। মরার পর একজন বলল, 'চল ওর কল্লাটা নিয়ে যাই ফুটবল খেলব।' মাতু বলল, 'হ্যাঁ। তাই নেব। তবে ওর কল্লা আমরা কাটব না। তার বাবা কেটে দেবে।' বলেই আমার হাতে কুঠার দিয়ে বলল কেটে দিতে। আমার মুখে রা নেই। বলে কি পাষন্ডগুলো? চুপ করে আছি দেখে বেদম পেটাতে শুরু করল। বুড়ো মানুষ কতক্ষণ আর সহ্য হয়। সিরাজ এসে বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে বলল, 'এক্ষুনি কাট, নইলে তোকেও গুলি করব।' ইতিমধ্যে দেড় ঘন্টার মত সময় পার হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম না কাটলে ওরা সত্যি আমাকেও মেরে ফেলবে কিনা? শেষে কুঠার দিয়ে কেটে দিলাম মাথা। নিয়ে সউল্লাসে চলে গেল তারা। আল্লায় কি সহ্য করব?"

'৭৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী আব্দুল মালেক উকিলের স্পীকারিত্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন পাশ হয়। যার অর্ন্তভূক্ত ছিল নির্যাতনমূলক আটক আইন আর প্রেস সেন্সরশীপের ব্যবস্থা, সংগঠন গঠনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ ও নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা। বিরোধী সদস্যরা একে আর একটি কালা-কানুন বলে অভিহিত করে ওয়াক আউট করেন। এ সর্ম্পকে জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, "জনসাধারণের জন্য এই দিনটি একটি কালো দিন এবং বিলটি কৃষ্ণতার বিল। এটি সাংবাদিকদের দমনের একটি নিকৃষ্ট ব্যবস্থা।" তিনি বলেন, "জনসাধারণ আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সদস্যগণকে কালো আইন প্রণয়নের জন্য ভোট দেয়নি। যদি তাই হয় দেশে আবার নির্বাচন দিন।" তিনি বলেন, "পাক আমলে এই আইনে নাশকতামূলক কাজের অভিযোগে শেখ মুজিব, তাজুদ্দিন গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি। আওয়ামী লীগের মুজিব সরকার একের পর এক কালা-কানুন জারি করে যাচ্ছে, কিন্তু এতেও কোন ফল হবে না।"

ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে প্রতিদিন। বাজার থেকে নতুন নতুন পণ্য উধাও হতে থাকে। এ সময় চার আনা সেরের লবনের দাম বেড়ে হয় ৬০টাকা। পাঁচ টাকা সেরের শুকনো মরিচের ছটাক হয় ৮টাকা। শীঘ্রই দেশে অধিক মূল্যেও আর লবন পাওয়া যাবে না এ মর্মে সাক্ষাৎকার দেয়ায় ঢাকা বণিক সমিতির সভাপতি খন্দোকার আব্দুস সাত্তারকে পুলিশ ২৭শে জুলাই গ্রেফতার করে। লবনের এই কেলেঙ্কারীর খবর ছাপার জন্য দৈনিক পূর্বদেশ বাকশাল গঠনের পর সরকার বন্ধ করে

দেয়। পত্রিকার দু'জন সাংবাদিক চাকুরী হারান। সভ্য দুনিয়ায় আওয়ামী লীগের এই কেলেঙ্কারীর কোন নজির নেই।

১৭ই মার্চ '৭৪ পল্টনে জাসদ এক জনসভার ডাক দেয়। জনসভার পর জাসদ সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনসুর আলীর বাসভবন ঘেরাও করতে যায়। সেখানে পুলিশের গুলিতে সরকারি হিসাবে নিহত হয় ৬ জন, আহত হয় শতাধিক। জাসদ দাবি করে ঐ গুলিবর্ষণের ফলে তাদের ৫০জন কর্মী নিহত হয়েছেন। সেখান থেকে আসম আব্দুর রবসহ জাসদের প্রায় সব নেতাই আহত অবস্থায় গ্রেফতার হন। জাসদের এই মিছিলের উপর রক্ষীবাহিনীর বর্বরতার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। সেদিনই সরকার জাসদের মুখপাত্র দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক দেশের বিশিষ্ট কবি আল মাহমুদসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। ফলে পরদিন গণকণ্ঠ প্রকাশিত হতে পারেনি। মোজাফফর ন্যাপ জাসদের এই মিছিলকে হঠকারী ও উস্কানিমূলক বলে অভিহিত করে এর নিন্দা করে। সিপিবি বলে, "জাসদ অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টায় মেতেছে।" মনি সিং জনগণের কাছে এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করার আহ্বান জানান। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের আভ্যন্তরীন কোন্দলের ফলে ১৯৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলে ৭জন ছাত্র নিহত হয়। এভাবেই প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হত্যার ঘটনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল অন্য কেউ নয় আওয়ামী লীগেরই ছাত্র সংগঠন। রক্তের সেই হোলি খেলার তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে সময়ের সাথে।

এ সময় ৩১শে মার্চ ১৯৭৪, জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সভায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ আহমদ শরীফ। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন কবি সিকান্দার আবু জাফর। এ ছাড়া মীর্জা গোলাম হাফিজকে আইন পর্যালোচনা সাব কমিটির, ডঃ আহমদ শরীফকে প্রকাশনা সাব কমিটির, বিনোদ দাশগুপ্তকে তথ্য অনুসন্ধান সাব কমিটির চেয়ারম্যান, এনায়েতউল্লাহ খানকে কোষাধ্যক্ষ, মওদুদ আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক ও সৈয়দ জাফরকে সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির ঐ সভায় জনগণের মৌলিক অধিকার ও তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ প্রস্তাবও গৃহিত হয়। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল :-

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'গণতন্ত্র' রাষ্ট্রের একটি নিয়ামক নীতি হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। ৩১,৩২ এবং ৩৩ নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শাসনতন্ত্র মোতাবেক জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে এবং

প্রত্যেক নাগরিকই নিজেকে গ্রেফতার ও আটকের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আইনের সাহায্য প্রার্থনা করার অধিকার ভোগ করবেন।

(২) কিন্তু এরূপ সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা সত্ত্বেও উপরোক্ত শাসনতান্ত্রিক ওয়াদা এবং নাগরিক অধিকার খেলাপ করা হচ্ছে বলে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত খবর পাওয়া যায়। এসব খবরে জানা যায় যে, কোন আদালতে হাজির না করেই অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করে আটক রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং যে সব সংস্থার নাগরিকদের অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা তাদের হাতেই অনেক লোক শারীরিকভাবে গুম হয়ে যাচ্ছে।

(৩) কাজেই যেসব দায়িত্বশীল নাগরিক আইনের শাসনের বিশ্বাসী তাদের মতামত সংগঠিত করা দরকার। এবং এই কাজের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও শান্তিকামী ব্যাপক জণগণের মৌলিক অধিকার হরণের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অভিহিত করে জনমত সংগঠিত করা প্রয়োজন। যাতে শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত আইনের শাসনের নিশ্চয়তাকে নগ্নভাবে উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি নিপীড়নের কাজ চলছে তা প্রতিরোধ করা যায়।

(৪) এর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি দায়িত্ব পালন করতে হবে। অনেকক্ষেত্রে আটক ব্যক্তিগণকে বিনা বিচারেই ধরে রাখা এবং অনেককেই আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই সাজা দেয়া হচ্ছে। সুতরাং এ ধরণের আটক ব্যক্তিদেরকে আইনের সাহায্য দেয়া প্রয়োজন।

(৫) আইনের এই সাহায্য দেয়ার জন্য উপযুক্ত সংগঠন ও ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(৬) তহবিল ছাড়া সংগঠনের প্রয়োজনীয় কাজ যথাযথভাবে চালানো সম্ভব নয়। কাজেই সুষ্টভাবে এই কাজ চালানোর জন্য একটি তহবিল সৃষ্টি করাও প্রয়োজন।

(৭) এই কমিটির কাজ শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কমিটিকে একটি কার্যকর সংগঠন পরিণত করার জন্য এবং সারাদেশের জনগণ যাতে আইনের সাহায্য পেতে পারে তার জন্য জেলা পর্যায়ে এমনকি তার নিম্ন পর্যায়ে ও এই কমিটি গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে নিম্ন আদালতেও জনগণ আইনের সাহায্য লাভ করতে পারে।

(৮) এই সংগঠন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাগরিক অধিকার রক্ষামূলক সমিতিগুলোর সঙ্গেও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখবে। ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত প্রস্তাবলী ছিল নিম্নরূপ :-

দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১,৩২ এবং ৩৩ নং ধারায় ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে যে সমস্ত অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে সেগুলো নানান সরকারি বাহিনী ও প্রশাসন যন্ত্রের দ্বারা খর্ব বা হরণ

করা হচ্ছে শুধু তাই নয়; নতুন নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংবিধানে প্রদত্ত অনেক অধিকারকে ইতিমধ্যেই কাগুজে অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। এই সভা সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসমূহের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই সমস্ত আইন প্রত্যাহার করে নেয়া এবং বিভিন্ন সরকারি বাহিনীও প্রশাসন যন্ত্র কর্তৃক ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ ও হামলা বন্ধ করার জন্য সাধারণভাবে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিকে কোন কারণ না দেখিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখা, যে কোন সংবাদপত্রকে যে কোন সময় বন্ধ করে দেয়া এবং ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহের উপর যে কোন প্রকার হামলার তীব্র নিন্দা করা হচ্ছে। সভা বিশেষ ক্ষমতা আইনকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং বর্তমান সংবিধানের বিরোধী বলে মনে করছে এবং তা বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

রক্ষীবাহিনী আইনের মাধ্যমে যে সমস্ত ক্ষমতা রক্ষীবাহিনীর হাতে অর্পন করা হয়েছে সে ক্ষমতাগুলি এতকাল পুলিশের হাতেই একান্তভাবে ন্যস্ত ছিল। যে ক্ষমতা পুলিশের হাতে এতকাল ন্যস্ত ছিল এবং এখনও ন্যস্ত আছে সে একই ক্ষমতা আবার একটি নতুন বাহিনীর হাতে আইনের মাধ্যমে নতুন করে অর্পন করার উদ্দেশ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের প্রচেষ্টা নয় বরং নানা ক্ষেত্রে যারা সরকারি নীতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার হরণ এবং তাদের উপর রাজনৈতিক নির্যাতন পরিচালনা করাই হল এর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় রক্ষীবাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদপত্রে বহু বিবরণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। কমিটি রক্ষীবাহিনীর এই নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করছে এবং রক্ষীবাহিনী আইন বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সভা বর্তমান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য ব্যক্তিকে বিনা বিচারে এবং কোন কারণ না দেখিয়ে এ দেশের নাগরিকদের জেলে আটক রাখার নীতি ও কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করছে এবং বিনা বিচারে আটক সকল বন্দীর আশু মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত হয়েছে। সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সরকার বিভিন্ন বিরোধী মতাবলম্বী সংবাদপত্রের ওপর নিয়মিত হামলা করে সংবাদপত্র সম্পাদক ও কর্মীদের

উপর রাজনৈতিক নির্যাতন চালাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে প্রচলিত সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসমূহ নিজেরাই খর্ব ও হরণ করেছে। দৈনিক গণকণ্ঠের ওপর সাম্প্রতিক হামলা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই সভা বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির কার্যকরী সংসদের সদস্য গণকণ্ঠ সম্পাদক জনাব আল মাহ্‌মুদসহ অন্যান্য আটক বা গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রাপ্ত সংবাদপত্র কর্মীদের মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে জারিকৃত পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। পরবর্তিতে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি সরকারের বিরুদ্ধে বহু হামলা পরিচালনা করে। এসবের মধ্যে জাসদ নেতা শাহজাহান সিরাজের মামলাও ছিল। বহুক্ষেত্রে কমিটি সাফল্য লাভ করে।

দেশে মানবিক ও মৌলিক অধিকার যখন পর্যদুস্ত, বর্বর রক্ষীবাহিনীর মধ্যযুগীয় অত্যাচারে যখন কম্যুনিষ্ট পার্টির অকৃত্রিম দোসর মোজাফফর ন্যাপও প্রতিবাদ জানাচ্ছে বিবৃতি দিয়ে, তখন একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে এই নির্যাতনে মদদ দানের উদ্দেশ্যে গৃহিত এই প্রস্তাব যে কতটা ঘৃণ্য তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

এদিকে সরকারের নির্দেশে সেনা বাহিনী সারাদেশে ব্যাপক অস্ত্র তল্লাশী ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচলানা শুরু করে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র উদ্ধার করতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে মে মাসে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এ মাসেই সেনা বাহিনীর অভিযানের ফলে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগমের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। মওজুদ করা প্রচুর পরিমাণে রিলিফের সামগ্রী ও গুড়াঁ দুধ তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। সেনা বাহিনী ও জনমতের চাপে মমতাজ বেগমকে সাময়িকভাবে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে অবশ্য আবার তার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আওয়ামী লীগের দু'সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে পরে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে বাকশালে তার নাম অর্ন্তভুক্ত হওয়ায় এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তার বাড়িতে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র আওয়ামী শীর্ষস্থানীয় নেতাদের জ্ঞাতসারেই মওজুত করা হয়েছিল। সেনা বাহিনীর অভিযানে যখন ক্রমান্বয়ে আওয়ামী লীগের হোমরা-চোমরা নেতৃবৃন্দের স্বরূপ জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল ঠিক তখনই ১৪ই মে মাওলানা ভাসানী সরকারের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে বলেন, "যৌথ বাহিনীর অভিযান বন্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে।" এর কয়েকদিন পর আওয়ামী লীগ সরকার সত্যিই যৌথ অভিযান বন্ধ করে দেয়। এতে জনগণ ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে দেশে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতির অস্বাভাবিক অবনতি ঘটে। আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় টাউট, মজুদদার, মুনাফাখোর আর অস্ত্রধারীরা তাদের কুকর্ম অবাধে চালিয়ে যেতে থাকে। সারাদেশে একটি ত্রাসের

রাজত্ব কায়েম হয়। ২৯শে জুন মাওলানা ভাসানী জনসভার চেষ্টা করলে তাকে গৃহবন্দী করে সন্তোষে আটক করে রাখা হয়। একই সাথে অলি আহাদ ও মশিউর রহমানসহ অনেক রাজনৈতিক নেতাকর্মীকেও সেদিন গ্রেফতার করা হয়। তখন সংসদে বাজেট অধিবেশন চলছিল। ঐ বাজেটে পোস্টকার্ড, চা, চিনি, সিমেন্ট, ঢেউটিন, রং, রেডিও, টিভির দাম বৃদ্ধি করা হয় এবং রেলের ভাড়া বাড়ানো হয়। সংসদের এই অধিবেশনেই ২রা জুলাই '৭৪ আতাউর রহমান খান অভিযোগ করেন, "দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ সংকুচিত।" তিনি আরো বলেন, "ভোটের পর এমপিরা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ নয়; বটগাছ হয়েছে।" তিনি প্রশ্ন করেন, "তিন হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য গেল কোথায়?" সরকারি হিসাব মতে যুদ্ধে নাকি দেশের এক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল।

২রা জুলাই মাওলানা ভাসানীকে অন্তরীণ রাখার প্রশ্নে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী বলেন, "ভাসানী নিরাপত্তার জন্য পুলিশ চেয়েছিল। দেশের যে কোন সাংবাদিক সন্তোষে গিয়ে ভাসানীর অবস্থা দেখে আসতে পারেন যে তিনি গৃহবন্দী নন।" তার পরদিনই দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা ২রা জুলাই মাওলানা ভাসানীর স্বহস্তে লেখা একটি চিঠি ছাপে। ঐ চিঠিতে মাওলানা শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে বলেন, "২৯শে জুন আমার ঐক্য ফ্রন্ট কর্মীদের ওপর রমনা থানার পুলিশ যে দুর্ব্যবহার এবং প্রহার করেছে তার তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দানের দাবি জানাচ্ছি। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এবং আমাদের ঐক্য ফ্রন্ট এবং ছাত্র, কর্মী ও নেতাদের আশু মুক্তি দানের দাবি জানাচ্ছি। ২৯শে জুন দিবাগত রাত আড়াইটার সময় জনাব মশিউর রহমানের বাড়িতে বহু পুলিশ ও উচ্চপদস্ত পুলিশ অফিসার ঢাকার এডিসির দস্তখতযুক্ত ডিটেনশনের অর্ডার দেখিয়ে ৩০দিনের জন্য ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখার জন্য আমাকে গ্রেফতার করে। পরে সেন্ট্রাল জেলে না নিয়ে সন্তোষে কড়া পুলিশ পাহারায় আমাকে নজরবন্দী করে রাখে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আইয়ুব শাহীর আমলে তোমার (শেখ মুজিব) বাসার নিকট ৮জন পুলিশ, ২জন হাবিলদার, ১জন সাব-ইন্সপেক্টরের পাহারায় তোমাকে ধানমন্ডিতে নজরবন্দী করে রেখেছিল। আজ তোমার আমলে সন্তোষে অসংখ্য পুলিশ, হাবিলদার, এসআই, আরআই, একজন ডেপুটি সুপার দ্বারা আমার বাসার চারদিক ঘিরে রেখেছ, এমনকি পায়খানা-পেশাবখানাও বাদ পরেনাই। আমার গরু ঘরেও পুলিশ আছে। সরকারের কোন ঘরের ব্যবস্থা নাই। আমার মেহমানখানা ও ছেলে-মেয়ে থাকার ঘরেও পুলিশ পাহারা আছে। একজন ডিআইবি ওয়াচার আমার ঘরের দরজার সামনে (আমার বিবাহিতা মেয়ের জন্য এই ঘর) সর্বদা পাহারায় থাকে। বাইরে ভিতরে বাসার লোকজন ডেপুটি সুপারের পারমিশন নিয়ে যাতায়াত করে। তোমার (শেখ মুজিব) আমলে আমি

অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করব এটা কল্পনাও করিনি। অদৃষ্টের পরিহাস! তাই তুমি যত শীঘ্র পার অনুগ্রহ করে আমার বাড়ির মেয়েদের পর্দাপুষিদা রক্ষার জন্য নিজস্ব ঘর কিংবা তাম্বুর ব্যবস্থা করে পুলিশ ও অফিসারদের রাখার ব্যবস্থা করবা। অথবা টাঙ্গাইল বা অন্য কোন স্থানে আমার পরিবারবর্গসহ থাকার স্থান পরিবর্তন করার ব্যবস্থা অতিসত্ত্বর করবা।"

এই চিঠি যে দিন প্রকাশিত হয়, সেদিনই ইত্তেফাকসহ কয়েকটি পত্রিকার প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথামত মাওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎকার নিতে সন্তোষ যান। তখন ভাসানীর বাড়িতে পাহারারত এক পুলিশ অফিসার একজন ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে নষ্ট করে ফেলেন। তাদের সঙ্গে মাওলানাকে সাক্ষাত করতে দিতেও অস্বীকার করেন পুলিশ কর্মকর্তারা। মাওলানা ভাসানী প্রতিনিধিগণকে কি অবস্থায় তিনি আছেন তা দেখে যেতে বলেন। ৪ঠা জুলাই সে খবর পত্রিকায় ছাপা হয়। ২০শে জুলাই সাংবাদিকরা আবার মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার তাদের জানান যে, মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাংবাদিকদের ও রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাতের অনুমতি নেই।

আগষ্ট মাসে দেশে বন্যা শুরু হয়। আসে বিস্তর রিলিফ। রিলিফ নিয়ে লুটপাটের কাহিনী পাওয়া যাবে ১৯৭৪ সালের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসের সংবাদপত্রসমূহে। অবাধ লুটপাট চলে বাঁশ, টিন, খাদ্যসামগ্রী, রিলিফের ঔষধপত্র এবং কম্বল নিয়ে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে ছাপা হয় ক্ষুধাতুর মানুষের ছবি। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, মাথা গোজাঁর ঠাঁই নেই। কোটি কোটি লোক হয় ক্ষতিগ্রস্থ ও বাস্তুহারা। ৩রা আগষ্ট ইত্তেফাকে ছাপা হয় এসব ছবি। দৈনিক বাংলায় খবর বের হয়, বমি খাচ্ছে মানুষ। বাংলাদেশ রেডক্রস সম্পর্কে প্রকাশিত হয় চুরি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অসংখ্য অভিযোগ। গ্রামে-গঞ্জে রেডক্রস প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফার নামে ছড়া বের হয়। আতাউর রহমান খান রেডক্রসের অসাধু তৎপরতার প্রতিবাদ করেন। দুর্নীতির অভিযোগ করেন। ১০ই আগষ্টের ইত্তেফাকে সে বিবৃতি ছাপা হয়। ১৩ তারিখ সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যায় যে, সারাদেশের মানুষ কচু-ঘেচু খেয়ে জীবনধারণ করছে। আতাউর রহমান খান অভিযোগ করেন যে, বিরোধী দলীয় সদস্যদের ত্রান সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টায় পুলিশ বাধা দিচ্ছে। তাদের গ্রেফতার করছে। জনাব খান ১১ই আগষ্ট কাগজে বিবৃতি দেন যে, দুনিয়ায় এমন কোন নজির নেই যে রেডক্রস সমিতির চেয়ারম্যান কোন দলীয় লোক হয়। তিনি একজন বিচারপতি অথবা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে এ সমিতির দায়িত্ব দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

গ্রাম থেকে, উপদ্রুত এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ শহরে আসতে থাকে। ঢাকা শহরে ১৩৫টি রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ১২ আগষ্ট যাত্রাবাড়ির রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণকারীরা বলেন যে, তিনদিনে তাদের জন্য একমুঠো খাবারও বরাদ্দ করা হয়নি। ১৬ই আগষ্ট আইসিআরসির সদস্য মিঃ এলভিন কাজ পরিদর্শনের জন্য আদমজী রিলিফ ক্যাম্পে গেলে লোকেরা কমিটির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে চুরি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করে। এলভিন চলে এলে কমিটির চেয়ারম্যান তার গুন্ডা বাহিনী দ্বারা অভিযোগকারীদের উপর হামলা চালায়। এতে ছুরিকাহত দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খাওয়ার অনুপযুক্ত পচাঁ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। তা থেকে ক্যাম্পগুলোতে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেয়। মরতে থাকে মানুষ।

মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে। সে সময়কার পত্রিকার পাতা উল্টালে গা শিউরে উঠে। মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ কেড়ে নেয় লাখ লাখ মানুষের প্রাণ। হাজার হাজার চাষী যারা একদা কষে ধরতো লাঙ্গল, মাঠ ভরে তুলত সবুজ শস্যের সমারোহে, তারা ভিক্ষার জন্য শহরের মানুষের কাছে হাত পাতে। ফিরে যায় ভিক্ষা না পেয়ে। তারপর বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকে। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম প্রতিদিন ঢাকা শহর থেকেই তিরিশ থেকে চল্লিশটি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করছিল। সে কাহিনী ও ছবি আছে সেই সময়কার দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর পাতায় পাতায়। ঢাকায় প্রতি ঘন্টায় ৩-৪ জন লোক মারা যেতে থাকে অনাহারে। এর এক পর্যায়ে আঞ্জুমানের লাশ দাফনের কথা খবরের কাগজে প্রকাশ করা বন্ধ করে দেয়া হয় সরকারি আদেশে। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর মাস অব্দি প্রতিটি জেলা থেকে খবর আসতে থাকে যে, শত শত লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। ভাত নেই, কাপড় নেই, বাসস্থান নেই। ১০ই সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক ছবি ছাপে- মাছ ধরার জাল পরে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে গ্রামের কোন কুল বধু। চট পরে ভিক্ষার আশায় সন্তান কোলে ঘুরে ফিরছে অসহায় জননী। গৃহবধুরা ক্ষুধার জালায় হচ্ছে প্রমোদবালা। রিলিফের কেলেঙ্কারীর খবর ছাপা হচ্ছিল খবরের কাগজে। কিন্তু অপরাধী ব্যক্তিদের একজনেরও বিচার হয়েছে এমন কথা শোনা যায়নি কখনো। কেন হয়নি সে খবরও সংবাদপত্রের পাতায় আসেনি। উত্তরাঞ্চলে পানির দামে বিক্রি হতে থাকে জমি। অসংখ্য সম্ভ্রান্ত কৃষক চাষাভিক্ষুকে পরিণত হন। সে সময়ের ২২শে সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাররমে দুই শতাধিক উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ নারী পুরুষ অন্নবস্ত্রের দাবিতে মিছিল করে। গ্রাম থেকে আসা অসহায় মানুষের আর্তনাদ একটুও কম্পিত করতে পারেনি আওয়ামী লীগের শাসককূলের হৃদয়। আর সেই সময়েই শেখ মুজিবের ৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৫৫ পাউন্ড ওজনের কেক কাটেন শেখ মুজিব নিজেই!

২৩শে সেপ্টেম্বর সারাদেশে ৪৩০০ লঙ্গরখানা খোলার কথা ঘোষণা করা হয়। সে সমস্ত লঙ্গরখানার ইতিহাস আর এক করুণ কেলেঙ্কারীর ইতিহাস। নওগাঁর আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য ২৪শে সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি দিয়ে জানান যে, সারা জেলার মানুষ গত ৩-৪ দিন ধরে না খেয়ে আছে। চালের সের সাত টাকা। তার ক'দিন পরেই ৬ই অক্টোবর ইত্তেফাক খবর দেয় যে, ২১ লাখ টাকার বিদেশী মদ ও সিগারেট আমদানি করা হয়েছে সরকারি টাকায়।

ঐ দিনই খাদ্যমন্ত্রী বললেন, "তখন পর্যন্ত অনাহারে কতলোক মরেছে সরকারের তা জানা নেই। প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর খবর অতিরঞ্জিত।" তবে তিনি স্বীকার করেন চোরাচালান কিছুটা হয়েছে।

৮ই অক্টোবর অধ্যাপক আবুল ফজলসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে বলেন, "জাতির জীবনে দুর্যোগ মোকাবেলার প্রতি এত অনাসক্তি, এত অবজ্ঞা, এত অদ্ভুত রকম ঔদাসীন্য কখনও দেখা গেছে বলে মনে হয় না। নিজের প্রতি আস্থাহীন জাতি যে কী রকম জড় পদার্থে পরিণত হতে পারে বর্তমান বাংলাদেশ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই একাত্মতা, ত্যাগের মহৎ শক্তির সেই প্রচন্ডতা পরবর্তিকালে সিদ্ধান্তহীনতায়, ভুল সিদ্ধান্তে, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় আর গুটিকতক লোকের লাগামহীন দুর্নীতির সয়লাবে সব ধুয়ে গেছে। দেশের নেতৃত্বের প্রতি এই জাতীয় দুর্দিনে আমাদের আকুল প্রার্থনা, জাতি হিসেবে আমাদের শক্তিতে আস্থাবান হওয়ার পরিবেশ ফিরিয়ে দিন।"

৮ই অক্টোবর ১৯৭৪ শ্রমিক লীগের আব্দুল মান্নান এমপি জানান, "লবনের দুঃস্প্রাপ্যতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল প্রকার খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যে, মজুতদার উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে ২টাকা মন দরে লবন কিনে থাকে। সরকারিভাবে মজুতদারদের জন্য অশোধিত লবনের দাম ১৫ টাকা আর শোধিত লবনের দাম ৫৫ টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "অশোধিত লবনের দাম ৪০ টাকা করা হলে বাজারে প্রচুর লবন পাওয়া যাবে। প্রকাশ, এ ব্যাপারে নাকি আমাদের দলীয় কোন কোন সংসদ সদস্য জড়িত রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।"

১৩ই অক্টোবর ঢাকার সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায় যে, প্রতিদিন গড়ে ৮৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন হচ্ছে। ২৭শে অক্টোবর খবর আসে জামালপুরে প্রতিদিন অনাহারে শতাধিক লোক মারা যাচ্ছে। সরকার এই মৃত্যুকে পুষ্টিহীনতা বলে অভিহিত করে। অনাহারে মানুষ মরছে সরকার সেটা অস্বীকার করে। ২৫শে অক্টোবর ঢাকার সংবাদপত্রে বের হয় ট্রাক বোঝাই ধানচাল ভারতে পাচাঁর হচ্ছে। দিনাজপুরে চালের

সের ৮ টাকা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানিকগঞ্জের এক পরিবারের ৭জন আত্মহত্যা করেছে। এসময়ে ২৫শে অক্টোবর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান দাবি করেন, "দেশের প্রচলিত আইনে চোরাচালানীদের দমন করা হচ্ছে না। কয়েক মাস আগে সংসদে চোরাচালানীদের গুলি করে হত্যা করার বিধান পাশ হয়। কিন্তু কাউকে কোন দিন ঐ বিধানে হত্যা করা হয়নি।" একই সঙ্গে কামরুজ্জামান অবশ্য বলেন, "দলের ভেতর থেকে দলের সমালোচনা চলবে না।" তখন থেকে আওয়ামী লীগের ভেতরেও কোন্দল দানা বেঁধে উঠে। সেই ক্রান্তিলগ্নে ২৬শে অক্টোবর '৭৪ স্বাধীনতা সংগ্রামকালের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের নির্দেশে মন্ত্রীত্ব হারান। জনাব তাজুদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, "জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তিনি কোন বিতর্ক সৃষ্টি করতে চান না।" ঢাকার এবং বিদেশী সাংবাদিকদের মতে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করায় জনাব তাজুদ্দিন আহমদের যে ইমেজ গড়ে উঠে তা পাকিস্তানে আটক শেখ মুজিবর রহমান সহ্য করতে পারছিলেন না। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আটক শেখ মুজিবের চেয়ে স্বাধীনতার প্রশ্নকে বড় করে দেখার জন্য বেগম মুজিবও তাজুদ্দিনকে সহ্য করতে পারতেন না বলে জানা যায়। তাজুদ্দিন সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয় যে, তিনি অর্থমন্ত্রী থাকাকালে দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের পথে চলে যায়। তাজুদ্দিন আহমদ বাকশালের কেন্দ্রিয় কমিটি থেকেও পরবর্তিতে বাদ পড়েন।

২৯শে অক্টোবর সারাদেশে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একই দিন মজুতদারী আর কালোবাজারের দায়ে আওয়ামী লীগের আর একজন সংসদ সদস্য গ্রেফতার হন। ৩০ তারিখে লবন মজুতের জন্য আওয়ামী লীগের এমপি ডঃ শামসুদ্দিন আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

এ অবস্থায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির উদ্যোগে ১লা নভেম্বর ১৯৭৪ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে শিক্ষক, আইনজীবি, চিকিৎসক, লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, চিত্রশিল্পী ও ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বর্তমান মন্বন্তর প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সমাবেশে যোগদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবিদের এত বিরাট সমাবেশ ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির' সভাপতি সিকান্দার আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুই ঘন্টার উপর এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ, ডঃ আহমদ শরীফ, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, এনায়েত উল্লাহ খান, কামরুন্নাহার লাইলী, নিজামুদ্দিন আহমদ, মহিউদ্দিন আলমগীর,

মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মুহাম্মদ জাকারিয়া এবং বদরুদ্দিন উমর। সমাবেশে বিদ্যমান মন্বন্তর পরিস্থিতি ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ১৭টি প্রস্তাব গৃহিত হয়। সমাবেশের পর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গন থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত যায় এবং সেখানেই সমাবেশের কর্মসূচী শেষ হয়। সমাবেশে গৃহিত প্রস্তাববলীর বিবরণ:-

১৯৭৪ সালের ১লা নভেম্বর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মন্বন্তরের গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকেও অতিক্রম করেছে এবং এই মন্বন্তর, বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি হয়নি বরং শাসকশ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের গণবিরোধী নীতি ও কর্মকান্ডেরই প্রত্যক্ষ পরিণতি। সমাবেশের প্রস্তাবে এই মন্বন্তরকে 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলে বর্ণনা না করে একে মন্বন্তর বলে ঘোষণার জোর দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবে বৈদেশিক সাহায্যের একটি শ্বেতপত্র ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশের প্রস্তাবে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনে সরকারের বিরোধিতার নিন্দা করে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করার দাবি জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে বিরোধী দলসমূহের প্রতি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও রেশনিং এলাকা সম্প্রসারন ও টেষ্ট রিলিফ চালু করার দাবি জানানো হয়। সমাবেশের প্রস্তাবে লঙ্গরখানার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেখানে নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন সমাবেশে রেডক্রসের চেয়ারম্যান হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়। রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ ও মিথ্যা মামলায় আটক ও বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানানো হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর থেকে এদেশের মানুষকে সবচেয়ে বেশি যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত যতগুলো সরকার এসেছে তাদের প্রত্যেকের প্রতিশ্রুতি ছিল মানুষ মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তারা নিশ্চিত করবে। কিন্তু প্রায় সব সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের জন্য জারি করেছে নতুন কালা-কানুন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল কুশাসন, কালা-কানুন, নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে গোটা দেশবাসীর প্রতিবাদ। স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ। স্বাভাবিকভাবেই এদেশের মানুষ আশা করেছিল এবার সত্যিকারের মুক্তি আসবে সর্বোপরিসরে। কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়েই

আওয়ামী লীগ সরকার যার উপর হামলা চালায় সেও সংবাদপত্রই। আইয়ূব শাহীর কুখ্যাত 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিনেন্সের' বদলে আওয়ামী লীগ জারি করল 'প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স', যা আইয়ূব শাহীর কালা-কানুন অপেক্ষাও ছিল ঘৃণ্য ও বর্বর। তাছাড়া বিরোধী সংবাদপত্র অফিসে পুলিশী হামলা ছিল মুজিব আমলের নিয়মিত ঘটনা।

আওয়ামী লীগের জনাব মনসুর আলী ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারী পাবনায় ঘোষণা করেছিলেন, "সরকার সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।" ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন জারি করার পরও তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী শেখ আব্দুল আজিজ বলেছিলেন, "সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায়।" আবার ১৯৭৫ সালের জুনে সকল সংবাদপত্র বন্ধ ঘোষণার পর বাকশালের তথ্যমন্ত্রী কোরবান আলী বলেছিলেন, "নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই সংবাদপত্র প্রকাশনা বাতিল করা হয়েছে। আর কোন সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেয়া হবে না।" এভাবেই যাত্রার শুরু ও শেষ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 'সোনার হরিণ' কোনদিন ধরা দেয়নি। বাক স্বাধীনতাও 'সোনার হরিণ' হয়েই থাকে জনগণের কাছে।

তৎকালীন আওয়ামী মন্ত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা। '৭২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "শুধু প্রশংসা নয়; সরকারের ভুলত্রুটিও তুলে ধরুন।" ৫ই মার্চ তৎকালীন ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, "সরকার সংবাদপত্রের উপর বিধি-নিষেধ আরোপের চেষ্টা করলে ছাত্রসমাজই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবে।" আর ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ' করে যখন 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' পাস করা হয় সেই অধিবেশনে নূরে আলম সিদ্দিকীসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকামী মন্ত্রী, নেতা, উপনেতা, পাতিনেতা ও এমপিরা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু কেউই এর প্রতিবাদ করেননি। ১৯৭৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর যখন গণবিরোধী ও মৌলিক অধিকার বিরোধী 'প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' পাস হয় তখন তার পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন তথাকথিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকামীরা। তখন তাদের আর আন্দোলন করার কথা মনে থাকেনি। ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সমাজসেবা সম্পাদক জনাব একেএম ওবায়েদুর রহমান বলেছিলেন, "সংবাদপত্রের সমালোচনা গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ এবং গণতন্ত্রের সুষ্ঠ বিকাশের জন্য এর ভূমিকা অপরিসীম।" ১৫ই এপ্রিল '৭২ তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" ৪ঠা মে সংসদের তৎকালীন স্পীকার মাহমুদ উল্লাহ বলেন, "দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা অপরিহার্য। সরকারের পক্ষেই যাক আর বিপক্ষেই যাক সাংবাদিকদের প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতেই হবে।" কিন্তু ২২শে মে আসে একটি সংবাদ- "গণপরিষদ সদস্যের সাথে বচসার কারণে সাতক্ষীরায় একজন সাংবাদিক গ্রেফতার।" ২৯শে মে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, "আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করে আসছি যে, গণশক্তি (সাম্যবাদী দলের জনাব তোয়াহা সম্পাদিত) নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এখনও পূর্ব বাংলা নাম ব্যবহার করছে। তাছাড়া হক কথা, চরমপত্র ও হলিডে নামক অপর তিনটি পত্রিকাও বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর বন্ধুত্বে ফাটল ধরানোর জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করছে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে। তারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসেবে স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারণ করছে এবং এখন দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই সমস্ত পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী কি এত সহজেই ভুলে গেছেন যে গত বছর এই সময়ে উক্ত বন্ধুরাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কী বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন? আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার মাত্র চার মাসের মধ্যে কী করে এই কতিপয় পত্রিকা এত অকৃতজ্ঞ হতে পারে? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিষ্ঠিত সরকারের দেয়া গণতন্ত্রের জন্যই কি তারা এই স্পর্ধা পাচ্ছে? আমি তাদের সাবধান করে দিতে চাই গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে এভাবে গণবিরোধী ও বিদেশী চক্রান্ত সহ্য করা হবে না। কারণ এই জঘণ্য ষড়যন্ত্র আমাদের প্রতিও বন্ধুরাষ্ট্র সমূহের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। আমরা সরকারের কাছে অবিলম্বে এই সমস্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানাচ্ছি। সরকার যদি এর আশু ব্যবস্থা না করেন তবে জনগণই ঐ পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" তার এই হুমকি পরে হয়রানিতে রূপান্তরিত হয়। সেই প্রেক্ষিতে ২০শে জুন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন, "জাতির কাছে বাস্তবধর্মী সত্য তুলে ধরতে সাংবাদিকরা কারো হস্তক্ষেপ বা হুমকির কাছে মাথা নোয়াবে না।" তারা বিবৃতিতে আরো বলেন, "এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে বিভিন্ন মহল সংবাদ প্রকাশের জন্য হুমকির আশ্রয় নিচ্ছে। বিগত দিনে এ ধরণের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক ইউনিয়ন হুমকি প্রদানকারীদের সংবাদ ছাপাতে অস্বীকার করেছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রচেষ্টা যাতে না করা হয় তার জন্য ইউনিয়ন সকল মহলের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছে।"

সরকার এসবে কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেনি। '৭২ সালের ২১শে জুন হক কথার সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। ১৭ই জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় শেখ মুজিবর রহমান এরপরও প্রতিশ্রুতি দেন, "সরকার কোনদিনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।" একই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "তথাকথিত প্রগতিবাদীরা সরকারের সমালোচনা শুরু করেছে। এদের

সমালোচনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত হানছে। এ ধরণের ফ্রি-ষ্টাইল কোন সরকার সহ্য করবে না।" তারপর আগষ্ট মাসে দৈনিক বাংলার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভাইস প্রেসিডেন্ট কোরবান আলী বলেন, "সংবাদপত্রকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে না।" এরপর ৬ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির জারিকৃত বিশেষ ক্ষমতা আইনে সাপ্তাহিক মুখপাত্র ও স্পোকসম্যান সম্পাদক ফয়জুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের দেশবাংলা অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়। হুমকি ও চাপের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। ৬ই অক্টোবর এই প্রেক্ষিতে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে দাবি জানান, "আদালতের সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন পত্রিকা বন্ধ করা যাবে না। বন্ধ করে দেয়া পত্রিকাগুলোকে আদালতে মামলা করতে দেয়ার অধিকার দিতে হবে। অবিলম্বে 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' বাতিল করতে হবে।" সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি, হয়রানির পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকার '৭২ সালের অক্টোবরে এক আদেশ জারি করে। ঐ নির্দেশে বলা হয়, "সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেতার, টিভি ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চিন্তা ও মতামত প্রকাশের পূর্বে সরকারি অনুমোদন নিতে হবে। পূর্বানুমতি ছাড়া তারা তাদের বক্তব্য কিংবা প্রতিবেদন কোথাও ছাপাতে পারবেন না।"

এই হিসাবে ঐ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সংবাদপত্রে চিঠিপত্র লেখাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ২৬শে অক্টোবর ডঃ আহমদ শরীফসহ ৫জন বুদ্ধিজীবি এই সরকারি নির্দেশের প্রতিবাদ করেন। দেশে প্রণীত সংবিধানে কিন্তু প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিনেন্সের কোন হেরফের না করে সেটাকে তেমন ভাবেই বহাল রাখা হয়েছিল। প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম সংবিধান সম্পর্কে বলেন, "এতে বাক-স্বাধীনতা অস্বীকৃত হয়েছে এবং দেশ আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে।"

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী প্রেসক্লাবের উল্টো দিকে ইউএসআইএস অফিসের সামনে পুলিশ দুইজন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করে। দৈনিক বাংলা সেদিন বিকেলে একটি টেলিগ্রাম বের করে। এর জন্য দৈনিক বাংলার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান এবং সম্পাদক আব্দুল তোয়াব খান চাকুরিচ্যুত হন। দৈনিক বাংলার সাংবাদিক, শ্রমিক এবং কর্মচারীরা ৪ঠা জানুয়ারী শেখ মুজিবের কাছে ঐ দু'জন সাংবাদিককে পুনর্বহালের দাবি জানালে প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান ২রা জানুয়ারীর পত্রিকাটি স্বহস্তে তুলে নিয়ে বলেন, "আমার কাগজে এসব কি লিখছো? তোমাদের যদি কোন নীতি থাকে প্রেসক্লাবে ফলাইও, নিজের ড্রইংরুমে ফলাইও। আমার কাগজে এসব চলবে না।" ঐ দিন জাতি জানতে পারলো সরকার নিয়ন্ত্রিত সবগুলো কাগজের মালিক হলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজে। পরিহাস! এর মাত্র ৯ দিন

আগে ২২শে ডিসেম্বর '৭২ তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী ঘোষণা করেছিলেন, "সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্রগুলোর স্বাধীনতায় সরকার বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করবেন না। আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন।" অনেক চেষ্টা করেও ঐ দু'জন চাকুরিচ্যুত সাংবাদিককে আর দৈনিক বাংলায় পুনর্নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

৫ই জানুয়ারী ছাত্রলীগ নেতা শেখ শহীদুল ইসলাম পল্টন ময়দানে বলেন, "দৈনিক বাংলা পত্রিকা থেকে দু'জন পাকিস্তানী দালালকে অপসারণ করা হয়েছে।" তিনি অভিযোগ তোলেন, "অন্যান্য পত্রিকাতেও পাকিস্তানী দালাল রয়েছে।" তিনি বলেন, "১৫ই মার্চ থেকে ছাত্রলীগ এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে।" শহীদ বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর নামের আগে 'জাতির পিতা' ও 'বঙ্গবন্ধু' না লিখলে পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।" এরপরও জনাব এম আর সিদ্দিকী ও শেখ আব্দুল আজিজ বলতে থাকেন, "সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর।" এ ধরণের বিপরীতধর্মী বক্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের মুখ থেকে শোনা যেতে থাকে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে দলের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও সংবাদপত্রের উপর আওয়ামী সরকারের হামলা বিভিন্ন কৌশলে চলতে থাকে। জাসদের দৈনিক মুখপত্র গণকণ্ঠ পত্রিকা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রেস জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস থেকে প্রকাশিত হত। ২৯শে মার্চ ঐ সংস্থায় সরকার একজন নতুন প্রশাসক নিয়োগ করেন। নতুন প্রশাসক নিয়োজিত হওয়ার পরই ঐ পত্রিকার সাংবাদিকসহ সকল কর্মীদের ওখান থেকে বের করে দেন। ৩১শে মার্চ গণকণ্ঠের সাংবাদিক ও কর্মীদের প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্য ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রতিবাদ সভা এবং প্রতীক ধর্মঘট করে। ১৩ই মে দৈনিক স্বদেশ বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮ই জুন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বলে সরকার নয়াযুগ সম্পাদককে গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যে হক কথা, মুখপত্র, স্পোকসম্যান, লাল পতাকা, গণশক্তি প্রভৃতি পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়।

'৭৩ সালের ২৯শে জুন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন শিল্পমন্ত্রীর সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কটুক্তির জবাবে বলেন, "সত্য বলা বিপদজনক হয়ে দাড়িয়েছে। আমরা হুমকির মুখে সীমিত স্বাধীনতায় কাজ করছি।" ৫ই জুলাই সংসদে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী শেখ আজিজ আবারও বলেন, "দেশে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।" এরপর ১২ই আগষ্ট সরকার বিনা নোটিশে চট্টগ্রামের দেশবাংলা পত্রিকাটি জোর করে বন্ধ করে দেন। ২৩শে নভেম্বর সাপ্তাহিক ওয়েভ পত্রিকাকে আদালতের ইনজাংশন উপেক্ষা করে বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশবাংলার সম্পাদককে রাষ্ট্রপতির ৪০নং আদেশ বলে গ্রেফতার করা হয়। এর একদিন পর ১৪ই আগষ্ট আওয়ামী লীগের তথ্যমন্ত্রী বলেন, "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বর্তমান সরকারের ঈমানের অঙ্গ।" আওয়ামী লীগ সরকারের

এ রকম নির্লজ্জ আচরনের নজির বৃটিশ অথবা পাকিস্তান আমলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেশবাংলার বিরুদ্ধে গৃহিত ব্যবস্থার জন্য সাংবাদিক ইউনিয়ন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২৭শে আগষ্ট বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল সেন বলেন, "চোরাচালানীদের জন্য গৃহিত রাষ্ট্রপতির ৫০নং ধারা বলে সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা চলবে না।" ২৮শে আগষ্ট আওয়ামী লীগ সরকার 'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন (রেজিষ্ট্রেশন এন্ড ডিক্লারেশন) অর্ডিন্যান্স ৭৩' নামে একটি গণবিরোধী কালা-কানুন জারি করে আগের 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের' স্থলাভিষিক্ত করেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর সংসদ অধিবেশনে ঐ অর্ডিন্যান্সটি পাশ করা হয়। এই অর্ডিন্যান্স এর উপর বক্তৃতাকালে স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল বলেন, "রাষ্ট্রবিরোধী কোন প্রকাশনা সহ্য করা হবে না।" তিনি বলেন, "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এ বিলের উদ্দেশ্য নয়। তবে অন্য সব দেশের মত সংবাদপত্রের যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ থাকা বাঞ্ছনীয়।" বিলের উপর আলোচনাকালে জাসদের আবদুল্লাহ সরকার বলেন, "এই বিল আইয়ূব আমলের কালা-কানুনের সমতুল্য। এর মাধ্যমে সরকারের গুনকীর্তন ছাড়া আর কিছুই সম্ভব না।" তিনি বলেন, "রাষ্ট্রবিরোধী কিছু করলে জনগণই ঐ সংবাদপত্র প্রত্যাখান করবে। আইনের দরকার হবে না।" এর জবাবে মালেক উকিল বলেন, "কাউকে প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা ও সৌজন্যতার পরিপন্থী আলোচনা বা সংবাদ প্রকাশ করতে দেয়া হবে না।" হলিডে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হলিডে সম্পাদক জনাব এনায়েত উল্লাহ খানকে তিনি জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাকে উদ্দেশ্য করে জনাব মালেক উকিল অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন। সংসদে এ ধরণের অশালীন উক্তির নজির বিশ্বের কোন সভ্য দেশে নেই। মালেক উকিল মিথ্যে বলেন, "এই অর্ডিন্যান্স নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।" বিএফইউজ ২৩শে সেপ্টেম্বর '৭৩ এক প্রতিবাদলিপিতে অস্বীকার করে বলেন, "এই অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে কোন সাংবাদিকের সাথে আলোচনা করা হয়নি। এছাড়া অবৈধ সন্তান কথাটি সংসদে, কোন ভদ্র সমাজে ব্যবহার করা হয় না। এটি সভ্য জগতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই উক্তি অশালীন, সভ্যতা বিবর্জিত এবং কদর্য।" এ প্রেক্ষিতে হলিডে সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান এক বিবৃতিতে বলেন, "হলিডে বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।" একই সময়ে সরকারের ভারত প্রীতি চরম আকার ধারণ করে। "ভারতের বিরুদ্ধে তথা বন্ধুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাউকে কোন কথা বলতে দেয়া হবে না"-এ ধরণের হুমকি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্য সব মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও হবু মন্ত্রীরা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকেন। তখন কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা ভারতকে বাংলাদেশের মুক্তিদাতা বলে অভিহিত করে একটি নিবন্ধ লেখে। এতে 'মাওলানার জেহাদী জিগির' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে মাওলানা ভাসানীর প্রতি অশালীন উক্তি করা হয়। ৫ই

আগষ্ট ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন বলেন, "ভারত বাংলাদেশের মুক্তিদাতা এ কথায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের প্রতিই কটাক্ষ করা হয়েছে।" সারাদেশে এর স্বপক্ষে সমর্থন গর্জে উঠে। কিন্তু আওয়ামী নেতারা, মনি-মোজাফফর গংরা কেউই সেদিন ঐ উক্তির বিরোধিতা করে টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। তবে কি এদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে কোন কৃতিত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের আছে বলে আওয়ামী লীগ বা তার দোসররা বিশ্বাস করে না?

ইতিমধ্যে বার বার গণকণ্ঠ পত্রিকার উপর হামলা চলে। হামলা হুমকি আসে অন্যান্য পত্রিকার উপরও। '৭৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী এই প্রেক্ষিতে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলেন, "বিভিন্ন মহলের নিকট হতে সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, ঘোষিত ও অঘোষিত নানারকম হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই বলেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।"

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীর ২ তারিখে সংসদের অধিবেশনে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন ৭৪' পাস করা হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলেন, "বিএফইউজ অতীব ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছে যে, অধুনা সমাপ্ত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪' পাস করে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নয়া বিধি-নিষেধ আরোপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে কুখ্যাত আইয়ূব প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স এর জঘণ্যতম ধারাগুলোও অব্যাহত রয়েছে। এই আইনে সংবাদ প্রকাশে বাধা আরোপ যে কোন সংবাদ প্রকাশের জন্য এমনকি এই আইন রচনার পূর্বে প্রকাশিত কোন সংবাদের জন্য ও ছাপাখানার মুদ্রাকর, প্রকাশক, রিপোর্টার এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এই আইনের শর্তানুযায়ী সরকার দৃশ্য, অদৃশ্য, সত্য বা মিথ্যা যে কোন সংবাদ আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী মনে করলে ব্যবস্থা নিতে পারবেন। বিএফইউজ একদিকে আইয়ূবী কালা-কানুন বাতিল অপরদিকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের নামে কালা-কানুনটি আবার চাপিয়ে দেবার এই ব্যবস্থাকে প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ বলে মনে করে এবং সরকারের এই দ্বিমুখী নীতির তীব্র নিন্দা করছে। ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছে যে বিশেষ ক্ষমতা আইন পাসের মাত্র একদিন পূর্বে প্রেস কাউন্সিল গঠনের আইন পাস করা হয়। বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও প্রেস কাউন্সিল গঠনের আইন পরস্পর বিরোধী। বিশেষ ক্ষমতা আইনের খড়্গ ঝুলিয়ে রেখে প্রেস কাউন্সিল গঠন আইনের কোন সার্থকতা নেই। বিএফইউজ তাই অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন তুলে নেবার আহ্বান জানাচ্ছে।"

এরপর '৭৪ সালের ১৭ই মার্চ জাসদের জনসভাকে কেন্দ্র করে ঘটে আর একদফা হয়রানি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করতে গিয়ে বহু জাসদ কর্মী নিহত হয়। গণকণ্ঠ বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮ই মার্চ জিপিও-র বিপরীত দিকে কসকোর দোকানের উপর তলায় অবস্থিত জাসদ অফিস আওয়ামী গুন্ডারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদ ও অন্যান্য সাংবাদিক কর্মচারী গ্রেফতার হন। তারপর জুলাই মাসে মাওলানা ভাসানীর পত্রিকা প্রাচ্য বার্তার সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। বন্ধ করে দেয়া হয় চট্টগ্রামের ইষ্টার্ণ একজামিনার পত্রিকা। এরপর ১৬ই ডিসেম্বর '৭৪ সিরাজ সিকদার সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছাপার জন্য ঢাকার সাপ্তাহিক অভিমত পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা নেয়া হয়। গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় এর সম্পাদক আলী আশরাফ এর বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের ৬, ৭ ও ৮ই জুলাই বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের ৩দিন ব্যাপী অধিবেশন বসে। ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের তৎকালীন সভাপতি নির্মল সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয় :

"ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের বক্তব্য হচ্ছে, দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ। এই আওয়ামী লীগ পাকিস্তান আমলে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে। সাংবাদিকদের রুটি-রুজির সংগ্রামে সমর্থন যুগিয়েছে। সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আইয়ূব আমলের কালা-কানুন 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' এর বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সংগ্রামে একাত্মতা জানিয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিকরা আশা করছেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা হরণ করা হবে না, সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ হবে, 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' বাতিল হবে, সরকার কোন সিদ্ধান্তই একতরফাভাবে সাংবাদিকদের উপর চাপিয়ে দেবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে আইয়ূবের কালা-কানুনের আশ্রয় নিয়ে সরকার কতিপয় পত্রিকা বন্ধ করেছেন। সম্পাদকদের কারাবন্দী করেছেন। স্বাধীনতার দেড় বছরের মধ্যেও 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' বাতিল সম্পর্কে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অথচ এই কালা-কানুন বাতিল করা ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার। বিস্ময়ের হলেও সত্য যে, কোন ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সরকার সাংবাদিক ইউনিয়নের সাথে কোন বিষয়েই আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেননি। প্রত্যেকটি বিষয়ে এবং ক্ষেত্রে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঘটনা এখানেই শেষ নয়। বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং 'প্রেস এন্ড প্রিন্টিং প্রসেস এ্যাক্ট' জারি করে এই এ্যাক্ট-এ আইয়ূব আমলের কালা-কানুনের বহু ধারাকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু জানুয়ারীতে সংসদে গৃহিত বিশেষ ক্ষমতা আইনে শুধুমাত্র আইয়ূব আমলের কালা-কানুন নয় ব্রিটিশ আমল থেকে

আইয়ুব আমল পর্যন্ত সংবাদপত্র দমনের জন্য যত আইন প্রণীত হয়েছিল তার প্রতিটি ধারাও এ আইনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। দেশবাসীর কাছে আমাদের প্রশ্ন- এ পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের অবকাশ কোথায়? দুঃখ শুধু এখানেই না। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশে সেনা বাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমর্থন জানানো হল। অথচ সেনা বাহিনী নিয়োগের সাথে সাথে সাংবাদিকদের ডেকে বলা হল যে, সংশ্লিষ্ট মহলের অনুমতি ব্যাতিরেকে সেনা বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে কোন সংবাদ পরিবেশন করা যাবে না। আমাদের জিজ্ঞাসা- এই পরিস্থিতিতে সহযোগিতার অবকাশ কোথায়? বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ কোথায়? আলোচনা-সমালোচনায় সেনা বাহিনীর যে অভিযান সার্থক হতে পারত; একতরফা সরকারি প্রচারণার কবলে পড়ে সে অভিযান আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের পরিস্থিতি। এ প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকারসহ দেশের সকল সরকার সমর্থক ও বিরোধী দলের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা পরিস্থিতি অনুধাবন করুন। আপনাদের দেয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা সাংবাদিকতার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছেন।"

দেশবাসীর মৌলিক অধিকার প্রশ্নে জুলাই মাসে 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি'-র কার্যনির্বাহী পরিষদ জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির ক্রমাবনতি এবং এ বিষয়ে সরকারি নীতি লক্ষ্য করে এক বিবৃতিতে বলেন, "বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সরকার বিরোধী মতামত ও সরকার বিরোধী ব্যক্তিদের দমন করার জন্য রক্ষীবাহিনীকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। তারা 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' এর অস্ত্র দ্বারা নিজেদেরকে সজ্জিত করেছেন। বাহ্যতঃ সমাজ বিরোধী লোকদের মোকাবেলা করার জন্য প্রণীত এই আইন বস্তুত বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলোর ওপর দমন নির্যাতনের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' এর স্থূল ও দারুন অপব্যবহার এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বেপরোয়া রক্ষীবাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে সরকার মূলতঃ ব্যাপকভাবে জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন।

সব ধরণের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং রক্ষীবাহিনী আইনের মধ্যেও তাদেরকে আদালতে উপস্থিত করার যে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে তা না করে তাদের উপর তারা হিংসাত্মক শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অস্বাভাবিক নির্যাতন ও তাদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টির কাহিনী বিভিন্ন সংবাদপত্রে এমনকি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের মাধ্যমেও ফাঁস হয়ে

পড়ছে। বাংলাদেশ সরকার বিরোধী দলীয় মতামতকে দমনের চেষ্টা করছেন শুধু তাদেরকে জেলে দিয়ে এবং নির্যাতন ও শারীরিকভাবে খতম করেই নয়: তারা এর জন্য ১৪৪ ধারাও দেশব্যাপী জারি করেছেন। বাহ্যতঃ এটা তারা করেছেন দুই মাস পূর্বে আরম্ভ করা তাদের তথাকথিত শুদ্ধি অভিযানের সুবিধার জন্য। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হল এ দেশে বিরোধী মতামত প্রকাশ ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে সংগঠিত হতে না দেওয়া। আর একটি বিষয়ে আমরা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই : একমাত্র সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই মত প্রকাশে যারা ইচ্ছুক তাদেরকে তা প্রকাশ করার অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে ভয়ানক রকম কড়াকড়ি করে এবং নিউজপ্রিন্টের কোটা দিতে অস্বীকার করে সরকার বর্তমানে বিরোধী দলীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোর প্রকাশনা ক্ষেত্রে নিদারুন অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন। উপরে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি কারাগারের অবস্থার উন্নতি ও রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তি দাবি করছে।

সংবাদপত্রের উপর এই ধরণের নির্যাতন চলাকালে সরকার ২৮শে জুলাই '৭৪ নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে সংবাদপত্রের উপর আরো কঠোর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেন। দেশের সাংবাদিক ইউনিয়নসমূহ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (মনি-মোজাফফর গং ছাড়া), সংবাদপত্র পরিষদ এই নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের দাবি জানান। কিন্তু কোন ফল হয়নি। নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলে সরকার এর সরবরাহ সীমিত করেন। বরাদ্দ কমিয়ে দেন এবং বই-পুস্তক এই কাগজে ছাপানো বন্ধ করে দেন। ফলে ১৯শে নভেম্বর '৭৪ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে, নিউজপ্রিন্ট মিলে ৪৬ লাখ টাকার নিউজপ্রিন্ট অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর '৭৪ এর ২০শে নভেম্বর সংসদে ছাপাখানা ও প্রকাশনা বিলে এক নতুন ধারাও যুক্ত হয়। ঐ ধারায় বলা হয় যে, যদি কোন সংবাদপত্রে এমন কিছু প্রকাশ করা হয় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের শাসন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পরিপন্থী বা কোন অপরাধ সংগঠনে কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে অথবা যে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রীতির সম্পর্ক বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, তা হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করতে পারবেন। বিলের উপর আলোচনাকালে বিরোধী সংসদ সদস্য আব্দুস সাত্তার বলেন, "এই আইনের বলে ইত্তেফাক বন্ধ হয়েছিল। দেশ হতে পাট পাচাঁর, সার কারখানায় বিষ্ফোরন, বিদেশী ব্যাংকে মন্ত্রীদের অর্থ জমানোর খবর যাতে কেউ ছাপাতে না পারে তার জন্যই এই আইন।" বিরোধী সদস্যরা এর প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেন।

২৮শে ডিসেম্বর '৭৪ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ২রা জানুয়ারী '৭৫ বিনা বিচারে গুলি করে ন্যাক্কারজনকভাবে হত্যা করা হয় রাজবন্দী সিরাজ সিকদারকে।

সরকারিভাবে বলা হয় যে, সিরাজ সিকদারকে আটক করার পর রাতে সাভার এলাকায় তার গুপ্ত ঘাঁটিতে অনুসন্ধান চালাতে পুলিশ তাকে সঙ্গে করে সাভারের দিকে যাচ্ছিল। পথে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন। পলায়নরত ব্যক্তিকে গুলি করলে গুলি লাগার কথা পেছনে কিন্তু সিরাজ সিকদারের মৃতদেহে গুলির ক্ষত পাওয়া গিয়েছিল তার বুকে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক পালাতে গেলে তাকে গুলি করা হয় বলে আইয়ূব সরকার দাবি করেছিলেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব বলেছিলেন, "সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।" সিরাজ সিকদারকে হত্যার পর সেই শেখ মুজিবই পার্লামেন্টে দম্ভ করে অতি নির্লজ্জভাবে বললেন, "কোথায় আজ সেই সিরাজ সিকদার?"

'৭৫ এর ৩রা জানুয়ারী জারি করা হয় জরুরী ক্ষমতাবিধি। তাতে পুলিশকে যে কোন লোককে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেয়া হয়। ২৪শে জানুয়ারী '৭৫ ঘোষণা করা হয় একদলীয় শাসন বাকশাল। তারপর '৭৫ সালের ১৬ই জুন জারি করা হয় সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ। সারাদেশে মাত্র চারটি দৈনিক পত্রিকা সরকারি নিয়ন্ত্রণে চালু রাখা হয়। গণতন্ত্রের কবরের উপর এভাবেই দেয়া হয় সিমেন্টের ঢালাই। সারাদেশে নেমে আসে স্বৈরতন্ত্রের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাকশালী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

- ১৮ই জানুয়ারী ১৯৭৫ শেখ মুজিব পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে বাকশাল গঠনের প্রস্তাব পেশ করলেন।
- ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমান একদলীয় শাসন ব্যবস্থা জারি করলেন।
- ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫ সংসদে কোনরকম বিতর্ক ছাড়াই গণতন্ত্রকে সমাহিত করে পাশ করানো হয় ৪র্থ সংশোধনী।
- বাকশাল গঠনের বিরোধিতা করে বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী এবং ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন সংসদ পদে ইস্তফা দেন।
- বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটি।
- কেন্দ্রিয় কমিটি।
- ৫টি অঙ্গ সংগঠন এবং তার সাধারণ সম্পাদকগণ।
- সারাদেশকে ৬১ টি জেলায় বিভক্তি এবং ৬১ জন গভর্ণর নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত।
- জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগগুলোকে নির্দেশ দেয়া হল সরকার বিরোধী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করার জন্য।
- আওয়ামী-বাকশাল বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো।
- রাজ্জাক, তোফায়েল, নাসিমসহ ৭ জন আসামী, সিরাজ সিকদার মামলা দায়ের।
- প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারাও।
- কারা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা?
- মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবিশ্বাস ও অবহেলা।
- ১৯৭২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠিত হয়।
- রাজনীতির সাদামাটা সংজ্ঞা।
- মুক্তিযুদ্ধে অস্বাভাবিক ইতি টানার সাথে সাথে ঔপনিবেশিক ছাঁচে গড়া রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোকে পুরোপুরি অক্ষুন্ন রাখার সিদ্ধান্ত।

দেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের ধুঁয়া তুলে সমাজতন্ত্র আর মুজিববাদের এক গোজামিলের ফর্মূলা জারি করে কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের কাছে। তারই প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী ঘোষণা করেন, "শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৩০% শেয়ার হবে শ্রমিকদের, ৩০% মালিকদের এবং ৪০% হবে সরকারের।" ১৩ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রলীগ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী বলেছিলেন, "স্বল্প-বেতনের শ্রমিকদেরই বেশি সুবিধা দেয়া হবে।"

আওয়ামী লীগের সার্বিক প্রতিশ্রুতি ছিল সমাজতন্ত্র আর পুজিঁবাদের মিক্সার বানিয়ে আজব মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সংবাদপত্রের পাতা ঘাটলে দেখা যাবে যে, অযোগ্য প্রশাসন, দুর্নীতি, তোষণ নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি কারণে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশঃ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। একদিকে দলীয় টাউট এবং দূর্নীতিপরায়ণ প্রশাসকরা যখন ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের রেসে ব্যস্ত, তখন 'শ্রমিকদের তিন বছর কিছু দিতে পারব না' মুজিবের এই বক্তব্য শ্রমিকদের আশ্বস্ত করতে ব্যর্থ হয়। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে এগিয়ে আসেন। তখন শিল্প এলাকায়ও বিভেদের রাজনীতির আশ্রয় নেয় আওয়ামী লীগ সরকার। ২৮শে মে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কারখানায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় সরকারি অধ্যাদেশ বলে। জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান বাওয়ানী জুট মিল সম্পর্কে বলেন, "এই মিলটির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনৈক এমসিএ, মিল ম্যানেজার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সরকারের নিয়োজিত পরিচালকের যৌথ চেষ্টায় গোপনে চোরাপথে মিলের লাখ লাখ টাকার সুতা, যন্ত্রপাতি ও কাপড় আত্মসাৎ করায় মিল শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।" ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত সামগ্রিক পরিসরে শিল্প কারখানার এটাই ছিল বাস্তব চিত্র। '৭২ এর আগষ্ট মাসে আদমজীতে দু'দল শ্রমিকের সংঘর্ষ হয়। '৭৩ এর ৭ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডে শতাধিক শ্রমিক রক্ষীবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কারখানার ভেতর ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চলতে থাকে। ১৯৭৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী এক সংবাদে জানা যায় যে, পিপলস্ জুট মিল থেকে আশি লাখ টাকার যন্ত্রপাতি উধাও হয়ে গেছে। পাটকল ও গুদামে আগুন ছিল প্রায় নিত্য-নৈমত্তিক ঘটনা। তবে এই আত্মঘাতমূলক কাজের সবচেয়ে বড় উদাহরণ সম্ভবতঃ ঘোড়াশাল সার কারখানার বিষ্ফোরন। '৭৪ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ঘোড়াশাল সার কারখানার কন্ট্রোল রুম বিধ্বস্ত হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর তদন্ত কমিটি সূত্রে বলা হয় যে, কাজটি ছিল নাশকতামূলক। ঐ বিষ্ফোরনের পর শুরু হয় বিদ্যুৎ বিভ্রাট। সার কারখানার ঐ বিষ্ফোরনে ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। প্রথম রিপোর্টের 'নাশকতামূলক' কথাটির ব্যাখ্যা আর কোনদিন দেয়া হয়নি।

১৯৭৪ সালের ২১শে জানুয়ারী সংসদে জানা যায় যে, জুট মিলগুলোতে ২৫০০০ অতিরিক্ত শ্রমিক রয়েছে। এদের নিয়োগ কি করে হল? এদের কাজ কি ছিল? কাদের স্বার্থে কাজ করতো এরা? এ সমস্ত বিষয়ে সরকার পক্ষ থেকে তদন্ত হয়নি। আসলে এরা দুর্নীতিবাজ অযোগ্য প্রশাসকের ভাড়াটে বাহিনী হিসেবে কাজ করতো। বিরোধী শ্রমিকদের শায়েস্তা করার জন্যই নিয়োগ করা হয়েছিল এদের। এদের কাজ ছিল হত্যা, গুন্ডামী আর নাশকতামূলক তৎপরতা। বহুবার প্রমাণিত হয়েছে সরকার ও অযোগ্য প্রশাসকের পেটেয়া বাহিনী হিসাবেই কাজ করেছে এই সব তথাকথিত শ্রমিক।

'৭৪ সালের ২৯শে মার্চ দৈনিক বাংলায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয় যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিপুল পরিমাণে অর্থ অপব্যয় করা হচ্ছে। শ্রমিক নেতাদের চাপে মিলে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এজেন্ট নিয়োগ করতে হচ্ছে এক শ্রেণীর শ্রমিক নেতাদের পছন্দমাফিক লোকদের। এরা নিজেরা কখনও কাজ করে না। কারা ছিল এই সমস্ত শ্রমিক নেতা? কোনদিন তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এর জের আজও টেনে চলেছে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্র।

এমনই দুর্নীতি চলে দ্রব্যমূল্য নিয়ে, লাইসেন্স-পারমিট নিয়ে। '৭৩ সালের ১১ই মে বাণিজ্যমন্ত্রী কামরুজ্জামান বলেন, "২৫০০০ আমদানিকারকের মধ্যে ১৫০০০-ই ভুঁয়া।" এদের লাইসেন্স ইস্যু করেছিল মন্ত্রণালয়। কার সুপারিশে কাদের এ সমস্ত লাইসেন্স দেয়া হত সেটা জনগণ কখনো জানতে পারেনি। তাদের বিরুদ্ধে কোন বিচার হয়েছিল সে খবরও পায়নি দেশের মানুষ। এসব দেখে মনে হয় আওয়ামী বাকশালীরা ২২ পরিবারের বদলে হয়তো বা মতিয়া চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী ২২০০ পরিবারই সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তাই দেখা যায় - যার তাঁত নাই সে সুতা পায়, যার কোন ঠিকানা নেই সে হয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ডিলার। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে চলে এমনই আজব তামাশা। পরিণতিতে '৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে ছয় লক্ষ সাধারণ বাংলাদেশী প্রাণ হারায়।

আওয়ামী লীগের মাত্র দুই বছরের শাসনে দেশবাসীর যখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা সে সময় আওয়ামী লীগের নেতা, তরুণ ও ছাত্র কর্মীদের মধ্যে অনেকের মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। ফলে আওয়ামী লীগের মধ্যে সৃষ্টি হয় আভ্যন্তরীন কোন্দল। সে কোন্দল ক্রমশঃই সংঘাতে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগের সচেতন ও জাতীয়তাবাদী অংশ আওয়ামী দুঃশাসন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে।

১৯৭৪ সালের ২৩শে মার্চ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মুজিববাদী) বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দোকার মোশতাক আহমদ ও শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলীর কাছে দু'টো স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে বাড়ি, গাড়ি দখলকারীদের নামের তালিকা প্রকাশের আবেদন জানানো হয়। ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান যেসব ব্যক্তি টিসিবি ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে কোটা পায় তাদের নামের তালিকা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাছে অর্পনের আহ্বান জানান। জনাব প্রধান অভিযোগ করেন, "ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও মন্ত্রীরা কালোবাজারী ও লাইসেন্স পারমিটধারী ভুঁয়া ব্যবসায়ীর জন্ম দিয়েছে। তারাই আজ জনসভায় নির্লজ্জভাবে গালভরা বক্তৃতা দিচ্ছেন।" তিনি আরো বলেন, "স্বাধীনতার পর কারা বাড়ি, গাড়ি ও প্রেস দখল করেছে জনগণ তাদের ভালোভাবেই চেনে। আজ ওদের অপকর্মের জন্যই দেশে ভয়াবহ সঙ্কট ও অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হয়েছে।" ৩০শে মার্চ জনাব প্রধান বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে এক গণজমায়েতে ২৩জন রাজনৈতিক নেতা, সরকারি আমলা ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বিদেশে মুদ্রা ও সম্পদ পাচার, চোরাকারবার ও কালোবাজারীর অভিযোগ উত্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের সভাপতি মনিরুল হক চৌধুরী, জনাব প্রধান, ইসমত কাদির গামা প্রমুখ। বক্তৃতায় যুবলীগের প্রতি ইঙ্গিত করে তারা বলেন, "এরা বেনামীতে লাইসেন্স পারমিট, এজেন্সী, সুতা কেলেংকারী, পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ও প্রেস দখল, ব্যাংক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার ওভার ড্রাফ্‌ট গ্রহণ, সিগারেট কেলেংকারী, রাতারাতি ধানমন্ডি-গুলশান-বনানীতে বাড়ি, গাড়ি, লঞ্চ, ট্রাক ও লাখ লাখ টাকার মালিক বনে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।"

বক্তৃতায় তারা ব্যাংক ডাকাতি, হাইজ্যাক, পাট পোড়া, গুপ্ত হত্যা, দুর্নীতিবাজ চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা জানতে চান। প্রেস দখলকারী বলতে তারা শেখ ফজলুল হক মনিকে বোঝান। জনাব প্রধান বলেন, "জনৈক মন্ত্রী এই দুর্দিনে গুলশানে বিরাট অট্টালিকা নির্মান করেছেন। ক্ষমতাসীন দলের ঢাকা শহরের সাবেক এমপি বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙ্গিয়ে বায়তুল মোকাররমে ১৪টি দোকানের মালিক বনে গেছেন। এ দেশের মানুষ যখন অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন তখন এক শ্রেণীর নেতারা ৩০ লাখ শহীদের রক্তের উপর দাড়িয়ে আপন ভাগ্য গড়ার ঘৃণ্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। এরাই আবার আজকাল নির্লজ্জের মত জনসভায় দাড়িয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছে। আদর্শের বুলি আওড়াচ্ছে অথচ এরাই দুর্নীতির প্রকৃত জন্মদাতা।"

৩১ শে মার্চ তৎকালীন যুবলীগের প্রধান শেখ ফজলুল হক মনি ঐ তালিকা প্রকাশের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, "রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে ছাত্রলীগ নেতারা যা

করেছে, তা আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফল।" তিনি অবশ্য তার প্রতি প্রেস দখল ও ব্যাংক থেকে ওভার ড্রাফট নেবার অভিযোগ সম্পর্কে কিছুই বললেন না। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ঐ তালিকা প্রকাশকারীদের বাংলার বাণী বিরোধী গোষ্ঠির এজেন্ট বলে অভিহিত করেন। জনাব মনিরুল হক চৌধুরী ও জনাব শফিউল আলম প্রধান শেখ মনির বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন, "ছাত্রলীগে কোন কোন্দল নেই।" তারা বলেন, "ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পর্ক রেখে যে সব দুর্নীতিবাজ পত্রিকা ও বিভিন্ন মাধ্যম প্রতিক্রিয়াশীলদের পৃষ্ঠপোষকতার চেষ্টা করছে তাদের কাউকেই ক্ষমা করা হবে না।" শেখ মনির বিবৃতি সম্পর্কে বলেন, "এ হচ্ছে 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাই নাই' ধরণের মন্তব্য। কলা খান কিনা তা ২৯শে এপ্রিল প্রমাণিত হবে।" ২৯শে এপ্রিল বায়তুল মোকাররমের সভায় তারা দুর্নীতিবাজদের পূর্নাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করবেন বলে ঘোষণা দেন। তারা সাবেক সিতারুল পাকিস্তান প্রেস থেকে জনৈক আওয়ামী যুবলীগ নেতার মালিকানায় ও সম্পাদনায় একটি পত্রিকা বের হচ্ছে বলে জানান। উল্লেখ্য, বাংলার বাণী পত্রিকাটি ঐ প্রেস থেকে বের করা হত। স্বাধীনতার পর শেখ মনি ঐ প্রেসটি দখল করে নেয়। মুজিববাদী ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীন এই কোন্দলের পরিণতিতে ৩রা এপ্রিল ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলে ভয়াবহ ৭জন ছাত্রের হত্যাকান্ড। ৭ই এপ্রিল প্রধান ও মনিরুল হক ছাত্রদের শোক মিছিল বের করার নির্দেশ দেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি কামরুজ্জামান বলেন, "আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো ছাড়া আর কারো কাছে অস্ত্র রাখতে দেয়া হবে না।" একই দিন জনাব প্রধান ঐ ছাত্র হত্যাকান্ডের আসামী হিসাবে গ্রেফতার হন।

প্রধানের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৮ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়। তাতে কয়েকজন ছাত্র আহত হন। ঐদিকে প্রধানের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ ধর্মঘট ডাকে। প্রধানের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ কর্মীরা আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেন। তারা বলেন, "দেশে প্রেসিডেন্ট এর অর্ডারের যদি অপপ্রয়োগ হয় তবে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে।" ১০ই এপ্রিল প্রধানের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগের ৬জন ছাত্র অনশন শুরু করেন। এ প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "শেখ মুজিব মস্কো থেকে ফিরে না এলে তাদের পক্ষে এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়।" ১২ই এপ্রিল শেখ মুজিব মস্কো থেকে ফিরে আসেন। তার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের ধর্মঘটের অবসান ঘটে। কিন্তু জনাব প্রধান আটকই রয়ে যান।

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর শেখ ফজলুল হক মনির যুবলীগ ৩দিন ব্যাপী এক বৈঠকে ছাত্রলীগ সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে ছাত্রলীগকে বর্তমান নেতৃত্ব বর্জন

করে নতুন পথ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রিয় কমিটির একটি অংশ যুবলীগের বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটনা করেছে তা ষড়যন্ত্রমূলক ও বানোয়াট। ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের নেতৃত্বের একাংশের রাজনৈতিক হঠকারী ও ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে বলে যুবলীগ মনে করে। ছাত্রলীগ সম্পর্কে গৃহিত ঐ প্রস্তাবে আরো বলা হয়, ছাত্রলীগকে একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে যুবলীগ প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের একাংশের চক্রান্ত, হঠকারীতা, অর্বাচীনতা, অদূরদর্শিতা ও ছাত্রলীগের মধ্যে অন্য আদর্শের ফ্যাসীবাদী একটি প্রভাবশালী অনুপ্রবেশকারী মহলের সন্ত্রাসমূলক ও বিভেদমূলক কার্যকলাপের দরুন তা সম্ভব হয়নি। যুবলীগ সব সময়ই মহলটির আচরণকে জাতির জন্য ক্ষতিকর, দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের পরিপন্থী এবং শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শিক্ষা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি বলে বিবেচনা করে এসেছে। ছাত্রলীগকে আজকের অবক্ষয় থেকে রক্ষা ও উদ্ধার করার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যুবলীগের সাহায্য ও সহানুভূতি। প্রতি জেলায় প্রতি কলেজে যুবলীগের সহানুভূতিশীল পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ছাত্রলীগের হারানো জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। তদলক্ষ্যে সমাদর্শী সংগঠনগুলোর মধ্যে যারা সংঘাত বাধাবার চেষ্টা করেছিল তাদের সাথে ছাত্রলীগের সকল সম্পর্ক ছেদ করতে হবে এবং যুবলীগের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। এভাবে একটি ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠনকে বাকশালী স্বৈরশাসনের ক্রীড়ানকে পরিণত করা হয়।

সদ্যমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ। অনেক আশার বাংলাদেশ। জনগণকে সোনার বাংলার যে স্বপ্ন নেতারা এতদিন দেখিয়ে এসেছেন তা বাস্তবায়িত করার সুযোগ এসেছে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে। জাতীয় পরিসরে মুক্তি সংগ্রাম শ্রেণীভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে-চুড়ে একাকার করে দিয়েছে। ফলে শ্রেণীভেদের অহ্মিকা ভুলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা : নেতারা তাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠি এবং দলীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জাতীয় স্বার্থে জনগণকে একত্রিত করে তাদের দেশপ্রেম এবং কর্মউদ্দীপনাকে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পূর্ণগঠন করে গড়ে তুলবেন এক সোনার বাংলা। সমৃদ্ধ এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভর করে বিশ্ব পরিসরে সগর্বে মাথা উচুঁ করে দাড়াবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক। অতীত ঐতিহ্য, নিজস্ব স্বতন্ত্রতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুদূরপ্রসারী বিচক্ষণতা, সঠিক দিক নির্দেশনা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, কঠিন পরিশ্রম সর্বোপরি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতিকে আত্মমর্যাদাশীল করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাংলাদেশকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে উন্নতির চরম লক্ষ্যে। সুখী সমৃদ্ধ এবং গতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলে তার সুফল প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেবার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। লাখো শহীদের রক্তের বদলে অর্জিত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে অর্থবহ। কিন্তু

জনগণের মনে অনেক সন্দেহ। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের রাজনীতিতে কাজের চেয়ে কথার ফুলঝুরি ঝরেছে বেশি, তার চেয়ে বেশি থেকেছে প্রতিশ্রুতি। 'ক্ষমতায় গেলে জনগণের সার্বিক মুক্তি এনে দেব' এ ধরণের গালভরা বক্তব্য জনগণ হামেশাই শুনে এসেছে দীর্ঘকাল থেকে। কিন্তু 'যেই গেছেন লংকা সেই হয়েছেন রাবন' অর্থাৎ ক্ষমতায় গিয়ে বক্তৃতাকারীরাই নির্মমভাবে পদদলিত করেছেন জনগণ এবং জনগণের দাবিকে। এর মূলে রয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গণবিচ্ছিন্নতা। দেশের ব্যাপক জনগণের সাথে তাদের কোন সংযোগ নেই। এখানে শাসকের সাথে শাসিতদের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। তাই শাসক গোষ্ঠির বক্তৃতা-বিবৃতি সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করে না। তারা যখন যা খুশি তাই বলেন, তাই করেন। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে তাদের নীতি ও কাজ হালাল করে নেন। জনগণ ঘুরে ফিরে একই প্রতারণার শিকারে পরিনত হয় বারবার। মোহ এবং ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ রাজনীতিকরা নির্দ্বিধায় বিসর্জন দেন সাধারণ গণমানুষের স্বার্থ।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৪৭ সাল হতে পরবর্তিকালে যত সরকার এসেছে তারা প্রত্যেকেই মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ধূঁয়া তুলেছে। ১৯৪৭ সালে সুবিধাবাদী নেতৃত্ব ধূঁয়া তুললেন ইসলামের। ধর্মপ্রাণ মানুষ অতি সহজেই মোহিত হয়েছিল সেই ধূম্রজালে। ১৯৫২ সালে তারা ভাষা আন্দোলনকে আখ্যায়িত করলেন ইসলাম বিরোধী সংগ্রাম বলে। ১৯৫৮ সালে আইয়ূব খান সামরিক অভ্যুথানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে এলান করলেন মৌলিক গণতন্ত্রের। মানুষ বারবার আশাহত হয়েছেন এসমস্ত সরকারের কাছ থেকে। তাদের বিভিন্ন সব শ্লোগান পরিণত হয়েছে শুধু ফাঁকা আওয়াজে। সাধারণ মানুষের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার বোঝা ক্রমান্বয়ে গিয়েছে বেড়ে। গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে সামাজিক সংকট। অর্থনৈতিকভাবে তারা হয়েছেন দেউলিয়া। পরিণামে জনগণ হয়েছে পশ্চাদমুখী। তাই শুনতে পাই তাদের আক্ষেপ, "পাক আমলেই ভালো ছিলাম। বৃটিশ আমলে ছিলাম আরও ভালো।" ১৯৭১ সালের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতাদের মন-মানসিকতায় কোন গুনগত পরিবর্তন আনতে পারেনি। তাই তারাও তাদের পূর্বসুরীদের মত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পন করেই পুরনো কায়দায় ধূঁয়া তুললেন মুজিববাদ কায়েম করতে হবে। কিন্তু মাত্র সাড়ে চার বছরের মাথায় যখন মুজিববাদের অসাড়তা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণিত হল তখন জনাব শেখ মুজিব আবারো একই কায়দায় সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী প্রণয়ন করে এবং জরুরী আইন ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা নিজ হাতে কুক্ষিগত করে একনায়কত্ব ও একদলীয় শাসন বাকশাল কায়েম করেন। নজীরবিহীন তার এই শাসনতান্ত্রিক ক্যু'কে তিনি তার 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। তার এই সর্বক্ষমতা হরণের ফলে বাহ্যিকভাবে

অবস্থা স্থিতিশীল মনে হলেও দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। এই অবনতির একটি প্রধান কারণ ছিল শেখ মুজিব ও তার সরকার মনে করত কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি এবং ক্ষমতাবলয়ের লোকজনের মাঝে সুখ-সুবিধা বন্টন করে তাদের খুশি রাখতে পারলেই ক্ষমতায় থাকার সমর্থন লাভ করা যায়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, আদর্শ অথবা নীতিগত বিশ্বাসের অভাব সর্বোপরি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের সমস্যাদি এবং সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামের মাধ্যমে সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের পূর্ণগঠনের সমস্যা সম্পর্কে তার জ্ঞানের অভাবের জন্যই শুধুমাত্র সুখ-সুবিধা বন্টনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। যে কোন নীতি নির্ধারনের ব্যাপারে তিনি তার অভিমতকেই প্রাধান্য দিতেন। কারো কোন যুক্তিই তার কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। তার এই সবজান্তা ভাবও তার প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। পার্টি ও রাষ্ট্র সম্পর্কের ব্যাপারেও তার যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব ছিল। ঐ ধরণের মানসিকতার জন্যই ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের সাথে শেখ মুজিবের মতবিরোধ ঘটে। জনাব খানের অভিমত ছিল প্রশাসনকে নির্দলীয় রাখতে হবে। প্রশাসনের উপর কোন প্রকার দলীয় প্রভাবের ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ বিঘ্নিত হবে। কিন্তু শেখ মুজিব তার এই মনোভাবের বিরোধিতা করে যুক্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, "পার্টির আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে হবে প্রশাসনকে তাদের নিরপেক্ষতা বর্জন করে। শুধু তাই নয় আওয়ামী লীগের দলীয় সদস্যদের কাজকে সহায়তা করাই হবে প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্ব এবং এভাবেই আওয়ামী লীগের প্রভাব বাড়তে সহযোগী হতে হবে প্রশাসনিক যন্ত্রকে।" শেখ মুজিবের দাপটের কাছে জনাব আতাউর রহমান খানকে নিশ্চুপ থাকতে হয়। ফলে ১৯৫৬-৫৭ সালে শেখ মুজিব যখন শিল্পমন্ত্রী তখন তার বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনি তার সরকারি ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে তার প্রিয়জন ও পার্টির লোকদের অনেক পারমিট, ব্যাংক লোন, ইনডেটিং লাইসেন্স, শিল্প কারখানা গড়ার পারমিশন প্রভৃতি করিয়ে দেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তিনি তার স্বভাবসুলভ প্রথায় তার পার্টির লোকজনদের নানাভাবে খুশি রাখার চেষ্টা করেন। কাউকে দেয়া হয় টাকা, কাউকে চাকুরী, কাউকে অযৌক্তিক পদোন্নতি, কাউকে বানানো হয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। এভাবেই দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই অযোগ্য ও অসৎ পরিচালকগণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মেশিনপত্র, স্পেয়ার পার্টস, কাচাঁমাল ভারতে পাচাঁর করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠেন। সব রকম দেশী ও বিদেশী আমদানিকৃত পন্য সরবরাহ করা হত লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলারদের মাধ্যমে। তাদের সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের সুপাত্রগণ!

তাদের কেউই পেশাগতভাবে ব্যবসায়ী ছিল না। তারা তাদের লাইসেন্স পারমিটগুলো মধ্যসত্ব ভোগী হিসাবে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিত। ফলে জিনিসপত্রের দাম অনেকগুন বেড়ে যেত। এছাড়া পাকিস্তানী নাগরিকদের পরিত্যাক্ত ৬০,০০০ বাড়ি আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এভাবেই শুধু নয়, আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের যোগ-সাজসে পাট, চাল, অন্যান্য কাচাঁমাল ও রিলিফের বিস্তর মালামাল ভারতে পাচাঁর করা হয়। এরই ফলে ব্যাঙের ছাতার মত দেশে একশ্রেণীর হঠাৎ করে আঙ্গুল ফুলে ভূঁইফোড় বড়লোকের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আমার সাথে শেখ মুজিবের একান্তে আলাপের সময় প্রধানমন্ত্রীর একটি মন্তব্য উল্লেখ্য।

মুজিব পরিবারের সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কারণে আমি প্রায়ই যেতাম ৩২নং ধানমন্ডিতে। কখনো তিনি ডেকে পাঠাতেন, কখনো যেতাম স্বেচ্ছায়। এমনই একদিন দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তাকে বলেছিলাম,

-দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আপনার পার্টির লোকজনদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আপনি জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন। জবাবে তিনি বলেন,

-আমার দলের লোকজন কি পাক আমলে নির্যাতন ভোগ করে নাই? তারা কি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই? তারা কি বিষয়-সম্পদ খোয়ায় নাই? আজ যদি তারা কিছুটা সুযোগ-সুবিধা পেয়েই থাকে তাইলে দোষের কি আছে? তাদেরতো আমি ফালাইয়া দিতে পারি না। এতে কেউ বেজার হইলে আমি কি করতে পারি।

এমন একটি জবাবের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মনে মনে ভেবেছিলাম, আজতো তিনি জাতীয় নেতা, রাষ্ট্রের কর্ণধার। জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শুধু দলীয় স্বার্থ বড় করে দেখা কি তার উচিত? জাতিই বা সেটা আশা করে কি? এ বিষয়ে আর আলাপে না গিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিলাম এক অবর্ণনীয় অস্বস্তি নিয়ে। শাসকদলের এই সমস্ত নব্য পুজিঁপতিরা জাতীয় অর্থনীতিতে কোন প্রকার বিনিয়োগ করেননি, তারা শুধু যা ছিল সেটাকেই লুট করে বড়লোক হয়েছেন। জাতীয় সম্পদ শুষে নিয়ে খোকলা করে দিয়েছেন অর্থনীতিকে। এভাবে পাকিস্তানের ২২ পরিবারের মত রাতারাতি বাংলাদেশ কয়েক হাজার পরিবার সৃষ্টি করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের প্রভাবে পরিচালিত দল আওয়ামী লীগের মাধ্যমে শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। জ্ঞানের অভাব নাকি জনতাকে বোকা বানাবার অতি চালাকি বোঝা মুশকিল! শুধু যে কর্মীরা অসৎ হয়ে উঠেছিল, তা নয়। মুজিব পরিবারের সদস্যগণ ও তার আত্মীয়-স্বজনও দুর্নীতি ও চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েন। শেখ মুজিবের অতি বিশ্বাসভাজন গাজী গোলাম মোস্তফা জাতীয়ভাবে 'কম্বল চোর' উপাধি পান এবং রিলিফের জিনিসপত্র নিয়ে কেলেংকারী ও চোরাচালানের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি রেডক্রসের চেয়ারম্যান ছিলেন। শেখ

মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসের শুধু খুলনায় বাড়িঘর এবং অবাঙ্গালীদের ব্যবসা-বাণিজ্য হাতিয়েই ক্ষান্ত হননি। ভারতে চোরাচালানের রিং লিডারও ছিলেন তিনি। শেখ মুজিবের প্রত্যেকটি ভাগীনা (শেখ মনি, আবুল হাসনাত, শেখ শহিদুল ইসলাম) মামুর জোরে শুধু যে রাজনৈতিক আধিপত্যই বিস্তার করে রাতারাতি নেতা বনে যান তাই নয়: অসৎ উপায়ে অর্জিত ধনদৌলতের পাহাড় গড়ে তোলেন তারা শেখ মুজিবের পুত্রদ্বয় বিশেষ করে শেখ কামালও অসৎ উপায়ে টাকা-পয়সা আয় করতে থাকে। এক ব্যাংক ডাকাতির সাথে শেখ কামালের জড়িত হয়ে পড়ার ব্যাপারে পূর্বেই বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারের আমলে দুর্নীতি সম্পর্কে বিখ্যাত সাংবাদিক জনাব লরেন্স লিফসুলজ ৩০শে আগষ্ট ১৯৭৪ সালে Far Eastern Economics-তে লিখেন, "অসৎ কাজ ও অসাধু তৎপরতা কোন আমলেই নতুন কিছু নহে। কিন্তু ঢাকাবাসীদের অনেকেই মনে করেন যেভাবে মুজিব আমলে সরকারের ছত্রছায়ায় খোলাখুলিভাবে দুর্নীতি ও জাতীয় সম্পদের লুটপাট হয়েছে তার নজির ইতিহাসে বিরল।" স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে লুটপাট ও দুর্নীতির ফলে কোনরূপ অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক সুফল লাভ করা সরকারের পক্ষে ছিল অসম্ভব। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কহীন পরগাছার মত গজিয়ে উঠা নব্য ধনীদের বিলাসবহুল জীবনধারা ও সহজ উপায়ে অর্জিত অর্থের অস্বাভাবিক অপচয় জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছিল একদিকে, অন্যদিকে তাদের নীতি বর্জিত ক্রিয়াকর্ম সরকার ও সরকারি দলের ভাবমুর্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল জনসাধারণের চোখে। আওয়ামী লীগের পক্ষে সেই হারানো মর্যাদা আর কখনো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। মানুষের আকাশচুম্বি চাহিদা এবং সীমিত জাতীয় সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছু লোককে ফায়দা দিতে পারলেও বেশিরভাগ জনগণের কাছ থেকে সরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় গড়ে তুলে সুষম সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে আওয়ামী লীগ সরকার এ ধরণের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি প্রতিষ্ঠিত করবে সমাজের প্রতি স্তরে, এটাকে জনগণ জাতীয় বেঈমানীর সমান বলেই মনে করেছিল। আওয়ামী নেতৃত্বের প্রতি তারা বীতঃশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জনগণের আস্থা হারায় আওয়ামী লীগ। শুধু তাই নয় জনগণের সাথে সাথে ক্ষমতাবলয়ের বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের আস্থা থেকেও বঞ্চিত হয় আওয়ামী সরকার। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল প্রশাসন, ছাত্র ও যুব সমাজ, মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা বাহিনী।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের ৮ কোটি লোকের অন্নের সংস্থান করা ছিল অতি দুরূহ কাজ। বৈদেশিক বন্ধুরাষ্ট্রগুলো এবং সাহায্য সংস্থাগুলো মুক্তহস্ত নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের জন্য। তাদের সহানুভূতির ফলে ১৯৭৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

বাংলাদেশ সর্বমোট ১৩৭৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ ও অনুদান লাভ করতে সমর্থ হয়। এছাড়া ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত UNROB এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণের রিলিফ সাহায্যও দান করা হয় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে। কিন্তু এরপরও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ১৯৭৩ সাল থেকেই সংকট দেখা দেয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে শৈথিল্য দেখা দেয়। এর জন্য মূলতঃ তিনটি কারণই প্রধান-

(১) ১৯৭২ সালের বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দা।

(২) বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাধীনতার পরপর অনভিজ্ঞ, দলীয় লোকদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকর্তা বনিয়ে দেবার ফলে উৎপাদন কমে যায়। প্রায় সবগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠানেই উৎপাদন হ্রাস পেয়ে নেমে আসে শতকরা ৯%-এ। এর জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান চালনার দক্ষতার অভাব, অবাধ লুণ্ঠন ও দুর্নীতি, শ্রমিকদের পরিচালনার ক্ষেত্রে অরাজকতা।

(৩) বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের সাথে বর্ডার ট্রেড চুক্তি সই করার ফলে বাংলাদেশ থেকে উৎপাদিত পাট ও চালের ১৫% চোরাচালানীদের মাধ্যমে ভারতে পাচাঁর হয়ে যেত। ১৯৭১ সালের আগ অব্দি পাকিস্তানের জাতীয় বৈদেশিক আয়ের ৮৫% আসত পাট রফতানি থেকে। চাল বাংলাদেশের মানুষের মূল খাদ্য। এভাবেই বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্যে সরকার বাজারে কাগুজে নোট ছাড়ে ফলে দেশে ১৯৬৯ সালের তুলনায় ৩০০% মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। পরিণামে দ্রব্যমূল্য হয়ে উঠে আকাশচুম্বি। ১৯৭৩ সালের শেষার্ধে UNROB বাংলাদেশ থেকে চলে যাবার পর বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। উপরন্তু সরকারের আয় আশানূরূপ না হয়ে অনেক কমে যায়। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ বলেন, "১৯৭৩-৭৪ এর সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। একই সাথে দেশের অর্থনীতিও ভেঙ্গে পড়েছে।" ১৯৭৪ সালে দ্রব্যমূল্য ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় প্রায় ৭০০-৮০০ গুণ বৃদ্ধি পায়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাধারণ জনগণের ক্রয়সীমার বাইরে চলে যায়। দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। অক্টোবরের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ লোক না খেয়ে দুর্ভিক্ষে মারা যায়। আন্তজার্তিক সাহায্য পাওয়া যায় প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার (Cash & kind) এবং আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় ১৪৪ মিলিয়ন ডলার। এ সাহায্যের ফলে সে যাত্রায় দুর্ভিক্ষ্য পীড়িত বাংলাদেশ কোন রকমে বেঁচে যায়।

পকিস্তান্নী বাহিনীর সারেন্ডারের পর ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশী সরকারের অনুরোধে বাংলাদেশে থেকে চলে যায়। বিজয়ী সেনা হিসেবে বা অন্য কোন কারণেই হোক চলে যাবার আগে তারা হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র, ভারী কামান, ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ, যুদ্ধের অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং মিল কারখানার মেশিনপত্রও খুলে নিয়ে যায়

ভারতে। তারা অধিকৃত শহর ও সেনানিবাসগুলো থেকে আসবাবপত্র, ফিটিংস ফার্নিচার, এমনকি কমোড-বেসিন পর্যন্ত খুলে নিয়ে যেতে থাকে। অনিক পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর ইস্যুতে ছাপা হয়, "ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ১০০০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনপত্র, যুদ্ধ-সরঞ্জাম ও কাচাঁমাল ভারতে নিয়ে যায়।" স্বাধীনতার পর খুলনায় ডেপুটি কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত জনাব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ভারতের কাছে সরকারিভাবে এক প্রটেষ্ট নোটের মাধ্যমে জানান যে, তার জেলা থেকে ভারতীয় বাহিনী লক্ষ লক্ষ টাকার মালসামগ্রী অন্যায়ভাবে ভারতে নিয়ে গেছে। তিনি ভারতীয় বাহিনীর এ ধরণের লুটপাটের ঘোর বিরোধিতা করেন। ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে আগেও চোরাকারবার চলতো। কিন্তু বাংলাদেশ হবার পর চোরাকারবারের মাত্রা বেড়ে যায় চরমভাবে। স্বাধীনতার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সীমান্ত সম্পূর্ণ খোলা রাখা হয়। মাওলানা ভাসানী দাবি করেন, "বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা বাহিনী কর্তৃক নিয়ে যাওয়া অস্ত্র ও যুদ্ধসম্ভার এবং চোরাচালানের মাধ্যমে সর্বমোট ৬০০০ কোটি টাকা মুল্যের জিনিসপত্র ও কাঁচামাল ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে চোরাচালানের মাধ্যমে ২০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দ্রব্য সামগ্রী ভারতে পাচাঁর হয়েছে বলে দাবি করেন বাংলা সংবাদপত্র অনিক। বাংলাদেশ সরকার দেশে ফিরেই ভারতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রফতানির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা উঠিয়ে নেয়। এর ফলে খোলা বর্ডার দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে উৎপাদিত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের একটি বৃহৎ অংশ ভারতে চলে যাওয়ার পথ আরো সুগম হয়। ১লা জানুয়ারী ১৯৭২ সরকার বাংলাদেশী টাকার মান কমিয়ে দিয়ে ভারতীয় রুপির সমপর্যায়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সরকার একই সাথে আরো ঘোষণা করে, ১৬ই ডিসেম্বরের আগে পাট ও পাটজাত সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্যের ব্যাপারে রফতানির সকল চুক্তি বাতিল বলে গন্য করা হবে। দি বাংলাদেশ অবজারভার ২/১/১৯৭২ সংখ্যায় লেখে, "ব্যবসায়ী এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে উল্লেখিত সরকারি তিনটি সিদ্ধান্তই ভারতের স্বার্থে প্রণীত হয়েছে। ভারতীয় সরকারের চাপের মুখেই এ ধরণের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।" এরপর সরকার কর্তৃক টাকার মান কমাবার পর পাটের দাম পুনঃনির্ধারণ করার ফলে সৎভাবে ব্যবসা করার চেয়ে চোরাচালান অনেক লাভজনক হয়ে দাড়ায়। ফলে বাংলাদেশের জীবন সোনালী আঁশের রপ্তানী হ্রাস পায়। এতে জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রার আয় কমে যায় এবং জাতীয় সঞ্চয়ও কমে যায়। উৎপাদনে ভাটা পড়ে। ১৯৭৪ সালে রহস্যজনকভাবে নাশকতামূলক কার্যকলাপের ফলে অনেক জায়গায় পাটের গুদাম আগুনে পুড়ে যায়। গুদামে ভরা কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য এভাবে পুড়ে যাওয়ার ফলে পাট শিল্পের-ক্ষেত্রে সরকারের প্রচন্ড ক্ষতি হয়। গুদামে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা করতে গিয়ে পাটমন্ত্রী ১৯৭৪ সালে সংসদে বলেন, "আগুন লেগে প্রায় ১৩৯২

মিলিয়ন টাকার শুধু পাটই পুড়ে যায়। পাটজাত দ্রব্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।" প্রচন্ড এই ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে BJMC এবং BJTC সরকারি ভুর্তুকির উপর চলতে থাকে। আজঅব্দি পাট শিল্পক্ষেত্রে সরকার কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে চলেছে। একদিনের সোনালী আঁশ আজ জাতির গলায় হয়ে পড়েছে ফাঁস। পক্ষান্তরে যে ভারত কখনোই পাট রফতানি করতে পারত না, এমন কি পাটের অপর্যাপ্ত উৎপাদনের ফলে অনেক জুট মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। ১৯৭৩ সালে ভারত ১ মিলিয়ন বেল পাট রফতানি করে বিদেশের মার্কেটে এবং ১৯৭৪ সালের মধ্যে শুধু যে তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলগুলোই আবার ফুল শিফটে চালু করা হয় তা নয়; তারা ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে আরো নতুন দু'টো মিল স্থাপন করে। দুই সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত বর্ডার চুক্তি বাংলাদেশের কোন উপকার না করে চোরাচালানের পথকেই প্রশস্ত করে দিয়েছিল। পরে জনগণের জোর আন্দোলন ও দাবির মুখে সরকার ঐ চুক্তি বছর শেষ না হতেই বাতিল করতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে চারটি ঋণ চুক্তি এবং একটি বাণিজ্য চুক্তি সই করে। কিন্তু চুক্তিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় দিক থেকে গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে ভারতের বিমুখিতা বাণিজ্য ঘাটতির সৃষ্টি করে। ভারত বাংলাদেশের জন্য টাকা ছাপায়। সেই কারণে নকল নোটে সারাদেশ ছেয়ে যায়। ফলে দু'দেশের সরকার বিব্রত হয় জনসম্মুখে। নকল টাকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের স্বল্পতা এবং উচ্চ মূল্য জনগণের জীবনকে যতই আঘাত করতে থাকে ততই জনগণ ভারত বিরোধী হয়ে উঠে। কালোবাজারী, মুনাফাখোররা বৈধ ব্যবসার পরিবর্তে ভারতে চোরাচালান করে বেশি ফায়দা লাভের মানসিকতা জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এভাবে একদিকে সরকার ও জনগণ এবং অপরদিকে বাংলাদেশের জনগণ ও ভারত সরকারের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন, ভারতীয় আমলাদের জাতীয় প্রশাসনে হস্তক্ষেপ, সীমান্ত দিয়ে অবাধ চোরাচালান, ভারতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ভারতে বাংলাদেশী মুদ্রা ছাপানো, রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি, বাংলাদেশের টাকার মূল্য কমানো, ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে অবস্থান এসমস্ত কারণগুলিই ক্রমান্বয়ে জনগণের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে বাংলাদেশের জনগণ। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারত সরকার শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে বলে ভুল করে যে বীজ বপন করেছিল তারই প্রতিফল 'ভারতীয় শোষণ' হিসাবে ক্রমশঃ বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মনে শিকড় গড়তে থাকে। বন্ধুবেশে

বাংলাদেশকে শোষণ করে, জাতীয় সম্পদ লুটপাট করে, বাংলাদেশকে তাদের পশ্চাদভূমি ও মার্কেটে পরিণত করে তাদের নিয়ন্ত্রণে একটি করদ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নীল নকশায় আওয়ামী লীগ তাদের সহযোগী এ ধারণাও প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীর মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠে। তাদের এ ধারণা আরো জোরদার হয় ভারত কর্তৃক সিকিম দখল করে নেয়ার পর। জনগণের এ চেতনার যথার্থ মূল্য না দিয়ে আওয়ামী সরকার এবং ভারত সরকার এ ধরণের বৈরী মনোভাব দূর করার জন্য কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। ফলে এর প্রভাব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয়ে উঠে সুদূরপ্রসারী। এভাবে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই দু'দেশের সম্পর্কে ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। সরকারি পর্যায়ে যদিও বা সম্পর্ক বন্ধুসুলভ ও অটুট বলে আখ্যায়িত করা হয় তবুও এটাই সত্যি যে বাংলাদেশের জনগণ ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠে সেই দিন থেকেই যেদিন ভারতীয় সেনা বাহিনী বাংলাদেশ থেকে সবকিছু পাঁচার করতে শুরু করল ভারতে এবং দু'দেশের সীমান্ত খোলা রাখা হল ভারতেরই স্বার্থে।

স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের ভেতর ভারতীয় সেনা বাহিনীর অবস্থান দেশে বিদেশে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশ সরকার দেশ শাসন করতে অক্ষম সে ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বাংলাদেশ সরকারকে। এতে করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ব্যাপারেও প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তান ও তার স্বপক্ষের শক্তিগুলো এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে আর্ন্তজাতিকভাবে প্রচারণা চালাতে থাকে- বাংলাদেশ ভারতীয় দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ভারত অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের একটি অংশকে জবরদখল করে রেখেছে। তাদের এ প্রচারণার ফলে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থানের বাস্তবতায় আর্ন্তজাতিকভাবে অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অসম্মত হয়। দেশে ফিরে শেখ মুজিব যদিও বা ভারতীয় বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন কিন্তু জনগণ তাদের জাতীয় সম্পদ লুন্ঠন ও অন্যান্য কার্যকলাপে তাদের ভবিষ্যত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে। মুজিব জনগণের মনোভাব বুঝতে পারেন কিন্তু তার তেমন বিশেষ কিছুই করার ছিল না। মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পর ভারত সরকারের বাংলাদেশে তাদের সামরিক বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত ও তার বিরুদ্ধে জনরোষের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার কোন যুক্তিই তখন ভারতের পক্ষেও দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। শুধু তাই নয়, 'নন এলাইনড মুভমেন্টে' এর প্রবক্তা এবং পঞ্চশীলা নীতির প্রতিষ্ঠাতা দেশগুলোর একটি হয়ে অন্য দেশে তার সেনা বাহিনী রাখার জন্য বিশ্ব পরিসরে ভারতের ভাবমুর্তিও ক্ষুন্ন হচ্ছিল এবং ভারতকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার চাপে ব্যবস্থা গৃহিত হয় যে, ভারতীয় সেনা

বাহিনী বাংলাদেশের ভূখন্ড থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়- প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তা রদবদল করে স্বাক্ষরিত হবে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি এবং দুই প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত ইশতেহার। চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ধারাও সংযুক্ত করা হবে চুক্তিতে। এ চুক্তি এবং যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় দুই প্রধানমন্ত্রীর মাঝে ১৯শে মার্চ ১৯৭২ সালে যখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের আমন্ত্রনে প্রথমবার বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সফরের সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ট্রানজিট ট্রেড এবং বর্ডার ট্রেড বজিয়ে রাখা হবে। দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়গুলোর দু'দেশের কর্মকর্তারা ছয় মাস অন্তর নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে মতবিনিময় ও কার্যপ্রনালী নির্ধারণ করবেন। ঐ সময় 'জয়েন্ট রিভার কমিশন'ও সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি, সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তির আলোকেই প্রণীত হয়েছিল। এভাবেই দেশে ফিরে এসে শেখ মুজিব বাংলাদেশকে পূর্বের সুইজ্যারল্যান্ড বানাবার ঘোষণা দিয়ে মূলতঃ ভারতের একটি করদ রাজ্যেই পরিণত করলেন সদ্যমুক্ত বাংলাদেশকে। তিনি চালনা এবং চট্টগ্রামের বন্দর পরিষ্কারের অযুহাতে সোভিয়েত ও ভারতীয় নৌ বাহিনীকেও আমন্ত্রন জানান। এভাবেই বাংলাদেশকে রুশ-ভারত অক্ষ শক্তির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তানের পরাজয়ের পর উপমহাদেশের আধিপত্যবাদী ভারত নিজেকে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে দাবি করে ঘোষণা দেয়, "দক্ষিন এশিয়া থেকে বিজাতীয় সবশক্তিকে চলে যেতে হবে।" শুধু তাই নয়; উপমহাদেশের জন্য ভারত এক নতুন 'মনরোডকট্রেন' তৈরি করে। ফলে উপমহাদেশের সব ছোট দেশগুলো ভারতীয় আধিপত্যবাদের শিকারে পরিণত হওয়ার আশংকায় ভীত হয়ে পড়ে। ভারতের জন্য এত কিছু করার পরও শেখ মুজিব পানি সমস্যা, সীমান্ত নির্ধারন, সমুদ্রসীমা এবং অর্থনৈতিক জলসীমা নির্ধারণ, সমুদ্রে জেগে ওঠা দ্বীপসমূহের দখল প্রভৃতি মূল সমস্যাগুলোর বিষয়ে ভারতের কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারেননি। শেখ মুজিব সেনা বাহিনীর মোকাবেলায় জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলেন। এর ফলে জনমনে সন্দেহ হয় শেখ মুজিব ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই ভারতের পরামর্শে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলেছেন। ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে ভারত সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে সিকিম দখল করে নেবার পর দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশের জনগণ বিশেষভাবে ভারতীয় আগ্রাসন ও আধিপত্য সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগ বাদে দেশের অন্যসব রাজনৈতিক দলগুলো ভারতের সাথে ২৫ বছরের চুক্তিকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করে অবিলম্বে ঐ চুক্তি নাকচ করে দেবার দাবি জানায়। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সাত দলীয় এ্যাকশন কমিটি সরকারের কাছে যে ১৫ দফা দাবি উত্থাপন করেন তার প্রথম দাবিই ছিল ভারতের সাথে অসম মৈত্রী চুক্তি

বাতিল করতে হবে। তারা অভিমত প্রকাশ করেন- বাংলাদেশের ভবিষ্যতের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বজিয়ে রাখার নীল নক্শা অনুযায়ী এ চুক্তি করা হয়েছে এবং সমগ্র উপমহাদেশের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণকে পাকাপোক্ত করার জন্য এই চুক্তি সহায়ক হবে। পাঠকদের অবগতির জন্য ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির কয়েকটি ধারা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে বোধ করছি।

চুক্তির ৬নং অনুচ্ছেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৮, ৯ এবং ১০নং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সমস্ত অনুচ্ছেদগুলো দুই দেশের পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে। অনুচ্ছেদ ৮-এ বলা হয়, "কোন দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক জোটে যোগ দিতে পারবে না এবং অপর দেশের বিরুদ্ধে কোন রকম সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না এবং তার সীমানাধীন স্থল, জল এবং আকাশ অপর রাষ্ট্রের সামরিক ক্ষতি অথবা অপর রাষ্ট্রের সংহতির প্রতি হুমকিস্বরূপ কোন কাজে ব্যবহার করতে দিতে পারবে না।" অনুচ্ছেদ ৯-এ বর্ণিত রয়েছে, "প্রত্যেক পার্টিই অন্য পার্টির বিপক্ষে কোন তৃতীয় পার্টিকে যে কোন সামরিক সংঘর্ষে কোন প্রকার সাহায্য দিতে পারবে না। যদি কোন পার্টি আক্রমণের শিকার হয় কিংবা আগ্রাসনের হুমকির মুখাপেক্ষি হয়, তবে অনতিবিলম্বে দুই পার্টিই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই আক্রমণ কিংবা আগ্রাসনের হুমকির মোকাবেলা করার জন্য। এভাবেই দুই দেশের শান্তি ও সংহতি বজিয়ে রাখা হবে।" অনুচ্ছেদ ১০-এ বর্ণিত আছে, "এই চুক্তির পরিপন্থী কোন প্রকার অঙ্গীকার কোন পার্টিই অন্য কোন দেশ বা একাধিক দেশের সাথে খোলাভাবে কিংবা গোপনে করতে পারবে না।" স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য এ ধরণের কোন চুক্তির কি প্রয়োজন ছিল? ভারত বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। বাংলাদেশের তিন দিকই ঘিরে রয়েছে ভারত। পূর্বদিকে সামান্য সীমান্ত রয়েছে বার্মার সাথে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। অনেকের মতে পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এ ধরণের কোন চুক্তির প্রয়োজন ছিল না। যেখানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোন বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা নেই বিধায় কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া চুক্তির ৮, ৯ এবং ১০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য সামরিক সাহায্য চাওয়ার মানে দাড়ায় বাংলাদেশ ভারতের কাছে সম্পর্কের দিক দিয়ে হীনভাবে অনুগত।

চুক্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্কে যে শর্ত ছিল তার ফলে ভারত একটি অগ্রবর্তী শিল্পে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি প্রকৌশলিক সাহায্য, ভারী এবং সাঝারি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্প ও কৃষি দুই ক্ষেত্রেই অবকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। ভারতের অর্থনীতি ও শিল্প কাঠামো বাংলাদেশের চেয়ে আকারে অনেক বড় ও উন্নত। তারা প্রায় প্রয়োজনীয়

সবকিছুই নিজেরা তৈরি করে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট ও দুর্বল। শিল্প ক্ষেত্রেও অনগ্রসর। প্রয়োজনীয় তেমন কিছুই বাংলাদেশে তৈরি হয় না। সে ক্ষেত্রে দুই দেশের মাঝে উল্লেখিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অর্থনৈতিক সহযোগিতার মানেই হচ্ছে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে সব বিষয়ে একটি বাজারে পরিণত করা। অর্থনৈতিক সহযোগিতার নামে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে ভারতের বিশাল অর্থনীতির অঙ্গীভূত করে নেয়া। চুক্তিতে ব্যক্ত ইচ্ছানুযায়ী ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং গঙ্গা অববাহিকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুব্যবস্থা করার ধারার প্রভাব হচ্ছে অনেক সুদূরপ্রসারী। সাহায্য ও সহযোগিতার যে কোন চুক্তি যদি অসম দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়, একটি বৃহৎ এবং ক্ষমতাশালী এবং অপরটি ছোট এবং দুর্বল রাষ্ট্র তাহলে সেই চুক্তির সুবিধা সাধারণভাবেই পাবে তুলনামূলকভাবে যে দেশ বড় ও শক্তিশালী। এ অকাট্য সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের অনেকেই এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তাদের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের ভেতরের ভারতপন্থীদের প্ররোচণায় শেখ মুজিব ২৫ বছরের আত্মঘাতী মৈত্রী চুক্তি সই করেছিলেন।

সার্বভৌমত্বের মত বিষয়েও ভারতের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে। স্থলসীমা ছাড়াও, ইকোনমিক জোন সম্পর্কে দু'দেশের ভিন্ন অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জলসীমা নির্ধারণ করতেও দীর্ঘ সময় লাগবে। আর্ন্তজাতিক আইন অনুযায়ী আমাদের উপকূলের সমুদ্র সীমানাও এ পর্যন্ত ঠিক করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৪ সালে বিতর্কিত কিছু জায়গার ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা ভারতের কাছ থেকে পাইনি। সমুদ্রসীমা ও ইকনোমিক জোন সর্ম্পকে ভারতের অবস্থানের ভিন্নতার কারণে যে ছয়টি তেল কোম্পানী ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। তাদের একটি কোম্পানী এ্যাসল্যান্ড অয়েল কোঃ-কে তৈলকুপ খনন করতে বাধা দেয় ভারত। ভারতীয় প্রতিবাদের মুখে ঐ তেল কোম্পানীকে খনন কার্য বন্ধ করে ফিরে চলে যেতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কয়েক জায়গায় নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও কিডন্যাপিং এর মত পদক্ষেপের মাধ্যমে কোম্পানীগুলোকে ভয়ও দেখান হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কিছুই করতে পারেনি। বঙ্গোপসাগরের মুখে জেগে ওঠা ভূ-খন্ড বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। হারিয়াভাঙ্গা নদীর মোহানায় দক্ষিণ তালপট্টি নামের এক ভূ-খন্ড জেগে উঠেছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে দুই সরকারের মাঝে সমঝোতা হয় যৌথ সার্ভের মাধ্যমেই তালপট্টির মালিকানা নির্ধারন করা হবে। কিন্তু হঠাৎ করে সমঝোতার বরখেলাপ করে ভারতীয় নৌ বাহিনী একদিন তালপট্টি দখল করে নিয়ে সেখানে ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে দেয় একতরফাভাবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পানি ভাগাভাগির সমস্যা। নদীমাতৃক

বাংলাদেশের অসংখ্য নদী-নালার পানিই হচ্ছে কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের জীবন। দেশের বেশিরভাগ নদ-নদীর উৎপত্তি হয়েছে উত্তরে হিমালয় পর্বতমালায় এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা, যমুনা, গোমতি, মুহুরী, সুরমা, খোয়াই, কুশিয়ারা, পদ্মার প্রবাহের উপরেই নির্ভরশীল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। আর্ন্তজাতিক নদী গঙ্গার উপর একতরফাভাবে ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ নির্মান করায় জনগণের উপর নেমে এসেছে এক দুর্বিষহ অভিশাপ। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ আজ মরু প্রায়। নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে: একই হারে বাড়ছে লবনাক্ততা। লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ ও প্রকৃতির পরিবর্তন আজ বাংলাদেশের জন্য এক হুমকির সৃষ্টি করেছে। গঙ্গার পানি বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের জীবনসংস্থানের জন্য অতি প্রয়োজন। ফারাক্কা বাঁধের ফলে পানির অপ্রতুলতা দু'দেশের মধ্যে তিক্ততাই বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের জনগণের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে একটি ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজে পাবার চেষ্টা না করা হলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটবে ভবিষ্যতে। ভারত তিস্তা নদীর উপরও বাঁধ দিয়েছে একতরফাভাবে। এ নদীর পানি ভাগাভাগির ব্যাপারেও তারা এখন পর্যন্ত কোন আলোচনা করছে না। বাঁধ দেয়ার ফলে নদীতে পানির প্রবাহ কমে গেছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চারটি জেলা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া ভারত খোয়াই, গোমতি এবং আরো প্রায় দশটা নদীতে বাঁধ দিচ্ছে একতরফাভাবে, কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই। এর ফলে খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে কৃষির জন্য যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন হবে কৃষকরা তা পাবে না। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং গঙ্গা অববাহিকার পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য ভারত ইতিমধ্যে আবার এক লিংক ক্যানালের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তারা চাচ্ছেন ক্যানাল খুড়ে ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি সরবরাহ করা হবে গঙ্গা ও হুগলী নদীর নাব্যতা বাড়াবার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কোন যুক্তিতেই এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মত পোষণ করেন। যদিও মৈত্রী চুক্তিতে বলা হয়েছে, "আমাদের দুই দেশের মাঝে সীমান্ত হবে শান্তি ও বন্ধুত্বের অনন্তকালের সাক্ষী।" কিন্তু সামরিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথার ভিন্ন মানেও খুঁজে পাওয়া যায়।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অংশগুলোকে একত্রিকরণের মাধ্যমে একটি অখন্ড প্রতিরোধ ব্যবস্থা কায়েম করার যে সামরিক উদ্দেশ্য ভারত অনেকদিন ধরে মনে পোষণ করে আসছে তার সাথে স্বাধীনতার পরপর আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচারণা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার 'বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র আর গরীব দেশের জন্য কোন বড় আকারের সেনা বাহিনীর প্রয়োজন নেই' এর একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। ভারতের লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই আওয়ামী সরকার এ ধরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। অনন্ত

কালের শান্তি আর বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব শুধুমাত্র দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনার সব পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমেই। রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সময় ও বাস্তবতার সাথে পরিবর্তনশীল। তাছাড়া দু'টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যেখানে রয়েছে হাজারও সমস্যা সেখানে অনন্তকালের শান্তি আর বন্ধুত্বের গ্যারান্টি পাওয়া অসম্ভবই শুধু নয় অবাস্তবও বটে। বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতি যেখানে সম্পুরক না হয়ে অনেকক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতামূলক এবং অসম অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ফলে যেখানে চোরাচালান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে দুর্বল প্রতিরক্ষা বাহিনীর তত্ত্ব কি করে জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করতে পারে? তথাকথিত অনন্তকালের শান্তিই বা কি করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক ধরণের সমস্যাই থাকতে পারে। তাই বলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলোর সমাধান করা যাবে না এটা ভাবাও যেমন ঠিক নয় তেমনি দু'দেশের মধ্যকার সব সমস্যা সংঘাতের মাধ্যমেই শুধু নিরসন করা সম্ভব এ ধারণাও সঠিক নয়। দু'দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা, পরিপক্কতা, গতিশীলতা ও মানবিক দৃষ্টিকোন দিয়ে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার আন্তরিকতাই শুধু গড়ে তুলতে পারে বন্ধুত্ব। এর জন্য পোষাকি চুক্তির প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাস, দমন নীতি, একে অপরকে ঠকাবার প্রচেষ্টা যেখানে প্রকট সেখানে স্বাক্ষরিত চুক্তিও কোন কাজে আসে না।

স্বাধীনতার প্রথমলগ্ন থেকেই দেশে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করতে থাকে মূলতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার জন্য। আওয়ামী লীগ সরকারের রাষ্ট্র ও দলকে এক করে দেখা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে দলীয় নেতাদের হস্তক্ষেপের ফলে প্রশাসনিক অবকাঠামো নিঃক্রিয় হয়ে পড়ে এবং দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। শেখ মুজিবের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে পার্টির আওতাভুক্ত করার ফলে সব জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতারা এবং প্রভাবশালী দলীয় সমর্থকরা আমলাদের উপর খবরদারী করতে থাকেন; এ ধরণের পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কাজ করতে অভ্যস্ত নন বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা নিঃক্রিয় ভূমিকাই পালন করতে থাকেন। তাদের কাজ করার স্পৃহা এবং উদ্দোম দু'টোই লোপ পায়। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি তার (PONO 9) অধ্যাদেশ জারি করেন। এ আদেশবলে যে কোন সরকারি চাকুরেকে সরকার বিনা কারণে বিনা নোটিশে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার এখতিয়ার লাভ করে এবং সরকারি এ আদেশের বিরোধিতা করে আইনের সাহায্য নেবার অধিকারও হরণ করে নেয়। ফলে সরকারি চাকুরেদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয়। তারা তাদের চাকুরির নিশ্চয়তা হারান। এ অবস্থায় বেশিরভাগ সরকারি আমলা তাদের চাকুরি বজায়ে রাখার জন্য সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকতে বাধ্য হন। এতে করে আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালনেও ব্যর্থ হয়। ফলে সমস্ত প্রশাসনে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বেড়ে যায় স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং হঠকারিতা।

এই সময় কয়েকটি ঘটনা ঘটে খুব দ্রুত। মোজাফফর ন্যাপের বিশিষ্ট কর্মী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম ১৫ই নভেম্বর ন্যাপের সাথে সব সম্পর্ক ছেদ করে বলেন, "মস্কোর পরামর্শে আজ ন্যাপ আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করছে।" ১৭ই নভেম্বর বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মনি সিং বায়তুল মোকাররমে এক জনসমাবেশে ঘোষণা করেন, "কৃষক-শ্রমিকের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করব এবং আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটালে আমরা তাতে সাহায্য করব।" ২৮শে নভেম্বর মস্কোপন্থী ন্যাপও একই কথা ঘোষণা করে এবং ১৩রা জানুয়ারী ১৯৭৫ সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। একই দিন বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয় এবং সংবিধানের কতিপয় ধারা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৬ই জানুয়ারী '৭৫ এক ঘোষণায় বলা হয় যে, সরকারি কর্মচারীরা সমবায় সমিতি ছাড়া অন্য কোন সংগঠনের সদস্য হতে পারবে না। এছাড়া ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দেয়ালের সব পোষ্টার মুছে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়।

দেশের এই দূরাবস্থায় শেখ মুজিবের ক্ষমতা লিপ্সা বেড়ে গেল। ক্ষমতার চূড়ায় অবস্থান করেও তার সন্তুষ্টি ছিল না। রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতা তার নিজ হাতে কুক্ষিগত করার জন্য তিনি একদলীয় শাসন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি মূল উপাদান ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এর জন্যই হয়তো বা শেখ মুজিব এতদিন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। তার এই মনোভাব জানতে পেরে দলীয় সুবিধাবাদী গোষ্ঠি নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্ররোচণা দিতে থাকে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই শেখ মুজিব একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পক্ষে প্রচারণা শুরু করেন। নভেম্বর ১৯৭৪-এ মস্কোপন্থী দলগুলোও সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে একদলীয় শাসন কায়েম করার জন্য আহ্বান জানায়। শেখ মুজিবের একান্ত বিশ্বস্ত তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনসুর আলীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দূতাবাসে ডেকে একদলীয় সরকার কায়েমের পরামর্শ দেয়া হয়। মনসুর আলী, শেখ মনি এবং মস্কোপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্ররোচণা এবং শেখ মুজিবের নিজের ক্ষমতাকে আরো বাড়িয়ে তোলার বাসনা ও রাষ্ট্রকে সর্বদিক দিয়ে তার এবং তার দলের অনুগত রাখার জন্য একদলীয় সরকার কায়েমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৮ই জানুয়ারী আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শেখ মুজিবর রহমান নতুন সিষ্টেম বাকশাল চালু করার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। কিন্তু তার সেই সিদ্ধান্তের সাথে অনেকেই সেদিন একমত হতে পারেননি। যারা সেদিন একদলীয় বাকশাল গঠনের বিরোধিতা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খন্দোকার মোশতাক আহমদ, বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গণী ওসমানী,

তাহের উদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়েদুর রহমান, নূরুল ইসলাম মঞ্জু, নূরে আলম সিদ্দিকী, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ। বাকশাল গঠন করার আগে শেখ মুজিব কোন পদ্ধতিই অনুসরন করেননি। সংসদীয় দলের মিটিংয়ে অনেকেই বাকশাল গঠনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী ৫৫মিনিট কাল বক্তৃতা করেন। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় শেখ মুজিব প্রমাদ গুনেছিলেন। তার কারণ, এ বক্তৃতাকে সংসদ সদস্যদের বৃহৎ অংশ ঘনঘন করতালির মাধ্যমে সমর্থন জানান। এই বক্তৃতার পর অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা করা হয়। পরদিন জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং জনাব শামছুল হকও বক্তৃতা করার অনুমতি চান। কিন্তু তাদের সে অনুমতি না দিয়ে জনাব শেখ মুজিব গম্ভীর স্বরে সবাইকে বলেন, "আর বক্তৃতা নয়। তোমরা আমারে চাও কি না সে কথাই শুনতে চাই।" সবাই তার এ ধরণের বক্তব্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, সব সদস্যকেই এ প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হবে। তিনি আবার বললেন, "বলো, আমারে চাও কিনা?" এরপর তার বিরোধিতা করার সাহস আর কারো হল না। কিন্তু বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী এরপরও তার বক্তৃতায় নির্ভয়ে বলেন, "আমরা ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে মুজিব খানকে চাই না।"

এরপর ২০শে জানুয়ারী বসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংগঠিত সেই কলঙ্কিত অধিবেশন।

২৫শে জানুয়ারী সংসদে কোন রকমের বির্তক ছাড়া গণতন্ত্রকে পুরোপুরি সমাহিত করে পাশ করানো হয় চতুর্থ সংশোধনী। মাত্র এক বেলার সেই অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন জনাব আব্দুল মালেক উকিল। এই আব্দুল মালেক উকিলই মাত্র তিন মাস আগে ১৬ই অক্টোবর সংসদ ভবনে পার্লামেন্ট সংক্রান্ত এক সেমিনারে বলেছিলেন, "আমাদের জনগণের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে।" তারই পৌরহিত্যে চালু হয়ে গেল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার। বাতিল করে দেয়া হল সকল বিরোধী দল। পাশ করিয়ে নেয়া হল একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্টকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে শপথ পড়িয়ে নিলেন সেই আব্দুল মালেক উকিলই। ঐ চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা সংসদ সদস্য না হলে ভোট দিতে পারবেন না। প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সংসদ সদস্য হবেন তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মন্ত্রী পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন, তবে রাষ্ট্রপতি তা কার্যকর করলেন কি করলেন না সে সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ঐ অধিবেশনে 'জরুরী ক্ষমতা বিল' কোন আলোচনা ছাড়াই আইনে পরিণত হয়ে যায়। ২৫শে জানুয়ারী দুপুর ১:১৫ মিনিটে এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে জারিকৃত চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়, "এই আইন প্রণয়নের পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে

অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। এই আইন প্রবর্তনের ফলে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন এমনিভাবে যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধিনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি ও একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার অধিনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে যে ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র সেই ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতিকে তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনায় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে কিংবা সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন প্রধানমন্ত্রী ও আবশ্যক মনে করলে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করতে এবং কার্যাবলীতে অংশ নিতে পারবেন তবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না হন তাহলে ভোট দান করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন অথবা তার নির্দেশে উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সংশোধিত সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে দেশে শুধু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা জাতীয় দল নামে অভিহিত হবে। সংশোধনীতে কার্যভারকালে তার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।" জাতীয় দলের ঘোষণায় বলা হয়, "কোন ব্যক্তি জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন কিংবা ভিন্ন ধারার কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।"

ঐ সংশোধনীর পক্ষে ২৯৪ জন সাংসদ ভোট দেন। কেউ বিরোধিতা করেননি। সংসদের ২ঘন্টা ৫মিনিট স্থায়ী ঐ অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন আব্দুল মালেক উকিল। বিলের বিরোধিতা করে তিনজন বিরোধী ও একজন স্বতন্ত্র সদস্য ওয়াক আউট করেন। এরা হলেন জাসদের আবদুল্লাহ সরকার, আব্দুস সাত্তার ময়নুদ্দিন আহমেদ ও স্বতন্ত্র সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আতাউর রহমান খান আগেই সংসদ অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসেন। বিলটি উত্থাপন করা হলে আওয়ামী লীগের দলীয় চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার প্রেক্ষিতে কোন প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ না দেবার আহ্বান জানান। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান খান বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনার সুযোগ

দানের জন্য স্পীকার জনাব মালেক উকিলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্পীকার তা নাকচ করে দেন। পরে কণ্ঠভোটে চীফ হুইপের প্রস্তাব গৃহিত হয়। তারপর আইনমন্ত্রী মনরঞ্জন ধর সংসদে 'জরুরী ক্ষমতা বিল ১৯৭৫' পেশ করেন। চীফ হুইপ এ ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ বিধি প্রয়োগ না করার আবেদন জানালে বিষয়টি কণ্ঠভোটে পাশ হয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষ প্রানিধানযোগ্য। যদিও বিলটি সংসদে বিনা বাধায় পাশ হয়; তবে গণতন্ত্রের বিকল্প একনায়কত্বের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যেও দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

পরে জেনারেল ওসমানী ও জনাব ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তাদের সংসদ সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ গণতন্ত্রীমনা নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের এই পদক্ষেপে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। বাকশাল গঠনের পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা ভেবে তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য অন্য কেউই দায়ী নন। স্বয়ং শেখ মুজিবই হত্যা করেছিলেন গণতন্ত্রকে। দেশে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে চাপা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। বাকশাল গঠনের দিন অনেকেই বলেছিলেন, "শেখ মুজিব নিজেই আওয়ামী লীগের নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিলেন স্বীয় স্বার্থে।" বাকশালের জগদ্দল পাথর বাংলাদেশের মানুষের বুকের উপর এভাবেই চেপে বসল। এ পাথরকে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত মানুষের নিস্তার নেই। এর পরই সরকারি আদেশ জারি করে আইন বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক স্বাধীকার ছিনিয়ে নেয়া হয়। এ সর্ম্পকে বিদেশে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বোঝাবার জন্য পাঠকদের কাছে বিদেশী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদন তুলে ধরা হল। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলী টেলিগ্রাফ এর ১৯৭৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী সংখ্যায় পিটার গিল 'মুজিব একনায়কত্ব কায়েম করেছেন' শিরোনামে লেখেন, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন। গত শনিবার ঢাকায় পার্লামেন্টের এক ঘন্টা স্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে ক্ষমতা অর্পন করেছে। অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা চলে গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। বিরোধী দল দাবি করেছিল যে, এ ধরণের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেয়া উচিত। জবাবে সরকার প্রস্তাব পাশ করল যে এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক চলবে না। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় মাস গৃহযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত কিন্তু গর্বিত স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব এমপিদের বলেছেন যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান। কিন্তু বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বৃটিশ বিশেষজ্ঞরাই সাহায্য করেছিলেন। তিনি দেশের স্বাধীন

আদালতকে ঔপনিবেশিক ও দ্রুত বিচার ব্যাহতকারী বলে অভিযুক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট খেয়ালখুশি মত বিচারক বরখাস্ত করতে পারবেন। নাগরিক অধিকার বিন্দুমাত্রও যদি প্রয়োগ করা হয় তা প্রয়োগ করবে নতুন পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল আদালত। এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে একটি জাতীয় দল প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন শাসনতন্ত্র মুজিবকে ক্ষমতা প্রদান করেছে। তার গঠিত দলই হবে দেশের একমাত্র বৈধ দল। যদি কোন এমপি যোগদান করতে নারাজ হন অথবা এর বিরুদ্ধে ভোট দেন, তবে তার সদস্যপদ নাকচ হয়ে যাবে।

এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঢাকায় সমালোচনা বোধগম্য কারণেই চাপা রয়েছে। কিন্তু ৩১৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টের ৮জন বিরোধী দলীয় সদস্যের ৫জনই এর প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের ১১জন সদস্য ভোট দিতে আসেননি। তাদের মধ্যে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ গেরিলা বাহিনীর নায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী জেনারেল এম এ জি ওসমানী। শেখ মুজিব ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে শাসন করতে পারবেন। নতুন শাসনতন্ত্র ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত জাতীয় পার্লামেন্টের মেয়াদও ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে পার্লামেন্ট বছরে মাত্র দু'বার অল্প সময়ের জন্য বসবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও কাউন্সিল অফ মিনিষ্টারস এর মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মনসুর আলীকে যথাক্রমে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট।

বাংলাদেশের ঘনায়মান আর্থিক ও সামাজিক সংকটে বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ সন্দেহ করছেন যে, দেশে একনায়কত্বের প্রয়োজন আছে কিংবা শেখ মুজিবের আরো ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে যে নিশ্চিত দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শেখ মুজিবের নতুন ম্যান্ডেট তাতে তেমন কোন তারতম্য ঘটাতে পারবে কিনা? এক মাস আগে শেখ মুজিব জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বামপন্থী গেরিলা নেতা সিরাজ সিকদারকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, জরুরী আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র সুশাসন (বর্তমানে সুশাসন বলতে কিছু নেই) পুনঃপ্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব কিনা? নতুন প্রেসিডেন্টের যে আদৌও প্রশাসনিক দক্ষতা নেই তা গত বছরেই প্রমাণিত হয়েছে। তার ষ্টাইল হচ্ছে ডিকটেটরের স্টাইল। তিনি গুরুত্বহীন বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান এবং গুটিকয়েক আমলার প্রমোশনে ও তাদের অভিমতকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রায়ই ফেলে রাখেন।

একদলীয় শাসন সৃষ্টির ফলে র্দুনীতি দূর না হয়ে বরং বাড়তে থাকবে। কেননা, উদ্ধত আওয়ামী লীগারদের চেক করতে পারবেন একমাত্র প্রেসিডেন্ট। আর তিনি থাকবেন

অতিরিক্ত কাজের চাপে সর্বদাই ব্যস্ত। সরকার বিরোধীরা যতই আত্মগোপন করতে বাধ্য হবে ততই গ্রাম-বাংলায় চরমপন্থী গেরিলা ও লুটতরাজকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকবে।"

ফার ইষ্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ-এর ১৯৭৫ সালের ১৪ই মার্চ সংখ্যায় হার্ডি ষ্টক উইল লেখেন, "আরেকটি এশীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হল। আরো একবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে গণতন্ত্রকে ঝেটিয়ে বিদায় দেয়া হয়েছে। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর এই দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের জনগণের জন্য গণতন্ত্র অনুপযোগী বিবেচিত হয়েছে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খানের বিদেহী আত্মা নিশ্চয়ই স্মিতহাস্যে মৃদুস্বরে বলছে, 'আমি তোমাদের বলেছিলাম ......।' ১৯৫৮ সালে আইয়ূব কর্তৃক ক্ষমতা জবরদখল গণতন্ত্র বিরোধী ছিল। তিনি নেতৃত্বের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন এবং জাতীয় জীবনে যোগ্যব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানিক শূন্যতা পূরণ করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৭৫ সালে সেই পটভূমি আদৌ নেই। শেখ আগেও বাংলাদেশের একমাত্র মুখ্য নেতা ছিলেন, এখনো আছেন। যে সময় তিনি আইয়ূবের রূপ পরিগ্রহ করেন তখন গণতন্ত্রে এমন কাটছাট হয়ে গিয়েছিল যে, তার ক্ষমতার অভাব ছিল এ কথা তিনি আদৌ বলতে পারতেন না। আইয়ূবের মত সেনা বাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িত না করলেও সদ্য গঠিত একমাত্র জাতীয় দলে কয়েকজন সামরিক চাইকে কোঅপ্ট করে নেয়ার কৌশল গ্রহণ করেন তিনি। দ্বিতীয় বিপ্লবের আগেও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীকে ঠেঙ্গারে বাহিনী হিসেবে প্রয়োগ করার ক্ষমতার অধিকারী ছিল শেখ মুজিব। কেননা, সামরিক বাহিনীর কায়দায় গঠিত এবং মুজিবের ব্যক্তিগত বাহিনী বলে সাধারণভাবে পরিচিত রক্ষীবাহিনীকে বরাবরই অপ্রীতিকর কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত করা হত নির্বিচারে। দাঙ্গা বিক্ষোভ দমন করা এবং সন্ত্রাসবাদী ও বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করা এগুলোও ছিল রক্ষীবাহিনীর কাজ। 'নীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমন' একচ্ছত্র ক্ষমতা গ্রহণের মামুলি অযুহাত মাত্র। আইয়ূব ও মুজিবের ক্ষমতা দখলে পার্থক্য রয়েছে। আইয়ূব ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন জাদরেল পাচাঁরকারী ও কালোবাজারীকে পাকড়াও করেছিলেন। এতে সারা পাকিস্তানে বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। গোটা দেশে চালের দামও কমে গিয়েছিল। পরে অবশ্য দুর্নীতি আবার দেখা দেয়। এমনকি আইয়ূবের আত্মীয়-স্বজনরাও এতে জড়িয়ে পড়ে। বস্তুতঃ 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া এত সামান্য যে চাউলের দাম বেড়েই চলেছে। 'শোষিতের গণতন্ত্র'-কে কোন সুযোগ না দিতে অনিচ্ছুক আইয়ূব-মুজিব চরিত্রের সাদৃশ্য সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে জনৈক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বুদ্ধিজীবির মন্তব্যে। তিনি বলেন,'আইয়ূব যে ভুল করেছিলেন শেখও ঠিক সেই ভুলই করছেন। আইয়ূব বিশ্বাস করতেন যে জনসাধারণ কেবলমাত্র অর্থেনৈতিক উন্নতিই চায়। তাই তিনি মানবাধিকারের বিনিময়ে অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনে ছুটলেন। এর ফলেই

মুজিব আন্দোলনের মওকা পেয়ে গেলেন। শেখ সে কথা ভুলে গেছেন অথবা ভাবেন তিনি তা ভুলে যেতে পারেন।' বৃটিশ আমলে প্রশাসনিক দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গ ছিল উপেক্ষিত। দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে বাঙ্গালীর সংখ্যা এক হাতের আঙ্গুলে গোনা যেত। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের আমদানি হল। বাংলাদেশীরাও আজ খোলাখুলি স্বীকার করছেন যে, স্বাধীনতার পর কয়েকটি অত্যাবশ্যক সার্ভিসের বিশেষ করে রেলওয়ে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছে। আগে প্রধানতঃ বিহারীরাই এসব সার্ভিস চালাতো। এখন ওরা আর চাকুরিতে নেই।

কোন কোন দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী শাসন পদ্ধতি অধিকতর কার্যদক্ষতা অর্জন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে তা সম্ভব হবে কি না গভীর সন্দেহ রয়েছে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের নতুন শাসন পদ্ধতি সবকিছু প্রেসিডেন্টের হাতে অতিরিক্ত মাত্রায় কেন্দ্রীভূত করে চলেছে। সুকার্নো পাশ্চাত্য সাহায্যকারী দেশগুলোকে তীব্র র্ভৎসনা করেছিলেন। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়ার সাথে এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে শেখও অনুরূপভাবে পশ্চিমা জগতের সংবাদপত্রগুলোকে ঘা মেরেছেন। 'বাংলাদেশ ধ্বসে পড়বে' বিদেশী পত্রিকার এ ধরণের ভবিষ্যতবাণী সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাইলে শেখ জবাব দেন, 'তাদের গোল্লায় যেতে বলে দিন। আমার শাসন নয়, তাদেরই বুদ্ধিমত্তা ধ্বসে পড়বে। পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রগুলি শুধু সমালোচনা করছে আর উপদেশ দিচ্ছে। ১৯৭১ সালেও তারা তাই করেছিল। এখনো আবার করছে।' এই উক্তিগুলো কৌতুহলজনক। কেননা, মুক্তি সংগ্রামের সময় বিদেশী সংবাদপত্রের ভূমিকা বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত প্রশংসাই করে এসেছে।"

২৪শে ফেব্রুয়ারী '৭৫ রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান এক আদেশবলে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা 'বাকশাল' গঠন করেন এবং নিজেকে দলীয় চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন। ঘোষণার ৩নং আদেশে বলা হয়, "রাষ্ট্রপতি অন্য কোন নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের দলীয় সকল সদস্য, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সবাই 'বাংলাদেশ-কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের' সদস্য বলে গন্য হবেন।"

এ আদেশ অমান্য করে বাকশালে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বঙ্গবীর জনাব ওসমানী ও ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন তাদের সাংসদ পদে ইস্তফা দেন। বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ ও মোজাফফর ন্যাপ শেখ মুজিবের এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নকে অভিনন্দন জানান। তথাকথিত জাতীয় দল গঠিত হওয়ার ফলে দেশের সব রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে। আওয়ামী লীগ,

মোজাফফর ন্যাপ এবং মনি সিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টি সার্মগ্রিকভাবে বাকশালে যোগদান করেন। সংসদের বিরোধী দলের ৮জন সদস্যের মধ্যে ৪জন বাকশালে যোগদান করেন। প্রবীণ নেতা জনাব আতাউর রহমান খানও বাকশালে যোগদান করে সুবিধাবাদী চরিত্র ও রাজনীতির এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ২রা জুন '৭৫ বাকশালে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের কাছে ৯জন সম্পাদক আবেদন পেশ করেন। তারা হলেন বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ওবায়েদুল হক, জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বজলুর রহমান, মর্নিং নিউজের সম্পাদক জনাব শামছুল হুদা, বাসস এর প্রধান সম্পাদক জাওয়াদুল করিম, বাংলাদেশ টাইমস ও বাংলার বাণীর নির্বাহী সম্পাদক শহীদুল হক, দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং বিপিআই সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান। ৬ই জুন '৭৫ বাকশালের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। তাতে দলের মহাসচিব মনোনীত হন মনসুর আলী। সচিব হন জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি, এবং আব্দুর রাজ্জাক। ঐ দিন বাকশালের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য হিসাবে ১১৫জনের নাম ঘোষণা করা হয়। তাতে উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনী প্রধানরা, বিডিআর এর মহাপরিচালক, রক্ষীবাহিনীর পরিচালক, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রমুখকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

দলের কার্যনির্বাহী পরিষদে থাকেন: (১) শেখ মুজিবর রহমান (২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (৩) মনসুর আলী (৪) খন্দোকার মোশতাক আহমেদ (৫) আবু হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (৬) আব্দুল মালেক উকিল (৭) অধ্যাপক ইফসুফ আলী (৮) মনরঞ্জন ধর (৯) মহিউদ্দিন আহমেদ (১০) গাজী গোলাম মোস্তফা (১১) জিল্লুর রহমান (১২) শেখ ফজলুল হক মনি (১৩) আব্দুর রাজ্জাক।

কেন্দ্রিয় কমিটিতে থাকেন: (১) শেখ মুজিবর রহমান (২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (৩) মনসুর আলী (৪) আব্দুল মালেক উকিল (৫) খন্দোকার মোশতাক আহমেদ (৬) কামরুজ্জামান (৭) মাহমুদ উল্লাহ (৮) আব্দুস সামাদ আজাদ (৯) ইউসুফ আলী (১০) ফনিভূষণ মজুমদার (১১) ডঃ কামাল হোসেন (১২) সোহরাব হোসেন (১৩) আব্দুল মান্নান (১৪) আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (১৫) মনরঞ্জন ধর (১৬) আব্দুল মতিন (১৭) আসাদুজ্জামান (১৮) কোরবান আলী (১৯) ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক (২০) ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (২১) তোফায়েল আহমেদ (২২) শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (২৩) আব্দুল মোমেন তালুকদার (২৪) দেওয়ান ফরিদ গাজী (২৫) অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী (২৬) তাহের উদ্দিন ঠাকুর (২৭) মোসলেম উদ্দিন খান (২৮) মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (২৯) একেএম ওবায়দুর রহমান (৩০) ডঃ ক্ষিতিশচন্দ্র

মন্ডল (৩১) রিয়াজুদ্দিন আহমদ (৩২) এম বায়তুল্লাহ (৩৩) রুহুল কুদ্দুস সচিব (৩৪) জিল্লুর রহমান (৩৫) মহিউদ্দিন আহমদ এমপি (৩৬) শেখ ফজলুল হক মনি (৩৭) আব্দুর রাজ্জাক (৩৮) শেখ শহীদুল ইসলাম (৩৯) আনোয়ার চৌধুরী (৪০) সাজেদা চৌধুরী (৪১) তসলিমা আবেদ (৪২) আব্দুর রহিম (৪৩) ওবায়দুল আউয়াল (৪৪) লুৎফর রহমান (৪৫) একে মুজিবর রহমান (৪৬) ডঃ মফিজ চৌধুরী (৪৭) ডঃ আলাউদ্দিন (৪৮) ডঃ আহসানুল হক (৪৯) রওশন আলী (৫০) আজিজুর রহমান আক্কাস (৫১) শেখ আবদুল আজিজ (৫২) সালাহউদ্দিন ইউসুফ (৫৩) মাইকেল সুশীল অধিকারি (৫৪) কাজী আব্দুল হাশেম (৫৫) মোল্লা জালাল উদ্দিন (৫৬) শামসুদ্দিন মোল্লা (৫৭) গৌর চন্দ্র বালা (৫৮) কাজী গোলাম মোস্তফা (৫৯) শামসুল হক (৬০) শামসুজ্জোহা (৬১) রফিকুদ্দিন ভূইয়া (৬২) সৈয়দ আহমদ (৬৩) শামসুর রহমান খান (৬৪) নূরুল হক (৬৫) এম এ ওহাব (৬৬) ক্যাপ্টেন সুজ্জাত আলী (৬৭) এম আর সিদ্দিক (৬৮) এমএ ওহাব (৬৯) চিত্ত রঞ্জন সুতার (৭০) সৈয়দা রাজিয়া বানু (৭১) আতাউর রহমান খান (৭২) খন্দোকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (৭৩) সংপ্রু সাইন (৭৪) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (৭৫) আতাউর রহমান (৭৬) পীর হাবিবুর রহমান (৭৭) সৈয়দ আলতাফ হোসেন (৭৮) মোহাম্মদ ফরহাদ (৭৯) মতিয়া চৌধুরী (৮০) হাজী দানেশ (৮১) তৌফিক ইমাম সচিব (৮২) নূরুল ইসলাম (৮৩) ফয়েজ উদ্দিন সচিব (৮৪) মাহবুবুর রহমান সচিব (৮৫) আব্দুল খালেক (৮৬) মুজিবুল হক সচিব (৮৭) আব্দুর রহিম সচিব (৮৮) মঈনুল ইসলাম সচিব (৮৯) সহিদুজ্জামান সচিব (৯০) আনিসুজ্জামান সচিব (৯১) ডঃ এ সাত্তার সচিব (৯২) এম এ সামাদ সচিব (৯৩) আবু তাহের সচিব (৯৪) আল হোসাইনী সচিব (৯৫) ডঃ তাজুল হোসেন সচিব (৯৬) মতিউর রহমান টিসিবি চেয়ারম্যান (৯৭) মেজর জেনারেল কেএম সফিউল্লাহ (৯৮) এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দোকার (৯৯) কমোডর এমএইচ খান (১০০) মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান (১০১) একে নজিরউদ্দিন (১০২) ডঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী (১০৩) ডঃ মাযহারুল ইসলাম (১০৪) ডঃ এনামুল হক (১০৫) এটিএম সৈয়দ হোসেন (১০৬) নূরুল ইসলাম আইজি পুলিশ (১০৭) ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম (১০৮) ডঃ নূরুল ইসলাম (পিজি হাসপাতাল) (১০৯) ওবায়দুল হক (সম্পাদক অবজারভার) (১১০) আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (ইত্তেফাক) (১১১) মিজানুর রহমান (বিপিআই) (১১২) মনোয়ারুল ইসলাম (১১৩) ব্রিগেডিয়ার এএমএম নূরুজ্জামান (রক্ষীবাহিনী প্রধান) (১১৪) কামরুজ্জামান শিক্ষক সমিতি (১১৫) ডঃ মাজহার আলী কাদরী।

একই ঘোষণায় বাকশালের পাচঁটি অঙ্গ সংগঠনও গঠন করা হয়। সেগুলো হচ্ছে:

জাতীয় কৃষকলীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় মহিলা লীগ, জাতীয় যুবলীগ ও জাতীয় ছাত্রলীগ। এগুলোর সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে ফনিভূষণ মজুমদার,

অধ্যাপক ইউসূফ আলী, সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ ও শেখ শহীদুল ইসলাম। এসমস্ত সংগঠনের কেন্দ্রিয় কমিটিগুলোতে মোজাফফর ন্যাপ ও মনি সিংএর কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের গ্রহণ করা হয়। বাকশালের এ সূত্র ধরেই ১৬ই জুন 'সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশ' জারি করা হয়। তার বলে পার্টি নিয়ন্ত্রণাধীন শুধুমাত্র চারটি দৈনিক ও কয়েকটি সাপ্তাহিক বাদে সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। গণতন্ত্রের হত্যাযজ্ঞ শেষে দেশ জুড়ে চলে তান্ডব উৎসব। রুদ্ধশ্বাস মানুষ জীবনের নিরাপত্তা হারিয়ে জন্মভূমিতেই বন্দী হয়ে পড়েন স্বৈরশাসনের নিস্পেষনে।

১৯৭৫ সালের আগে আইনজীবিরা সুপ্রীম কোর্ট এবং হাই কোর্টের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে রায় দেন। সরকার কর্তৃক বেআইনীভাবে আটককৃত অনেক রাজবন্দীদের তারা মুক্তিও দিয়েছিলেন সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। রক্ষীবাহিনীর অসামাজিক বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে আইনজীবিরা বিশেষভাবে সমালোচনা করতে থাকেন। কোন একটি কেসের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট রায় দানকালে বলে, "দেশের প্রচলিত সব আইন ও প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করে জাতীয় রক্ষীবাহিনী তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।" সুপ্রীম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করে, "রক্ষীবাহিনী কোন আইনের ভিত্তিতে তাদের কার্যকলাপ জারি রেখেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।" এ ব্যাপারে Far Eastern Economic Review-এর জানুয়ারীর ১০তাং ১৯৭৫-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন 'Mujib's Private Army' এর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আইনজীবিদের সরকার বিরোধী কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে শেখ মুজিব আইন বিভাগের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার জন্য আদেশ জারি করেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে তার অধ্যাদেশে বলা হয়, "দেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ দেশের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগ করা হবে। প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে যেকোন বিচারককে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে তার খারাপ ব্যবহার কিংবা অযোগ্যতার কারণে।" ফলে আইন বিভাগ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় প্রধানের ত্রিয়াণকে পরিণত করা হয়।

জনগণের ফান্ডামেন্টাল রাইটস ও মানবিক অধিকার কায়েম রাখার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সাহায্য নেবার পথও বন্ধ করে দেন শেখ মুজিবর রহমান। সংশোধিত বিধিতে বলা হয়, "এ আইনের বলে সংসদ গণতান্ত্রিক কোর্ট, ট্রাইবুনাল কিংবা কমিশন গঠন করতে পারবে। এসমস্ত গঠিত করা হবে জনগণের ফান্ডামেন্টাল এবং মানবিক অধিকারগুলো যে সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের পার্ট থ্রি-তে বর্ণিত রয়েছে সেগুলোর নিশ্চয়তা প্রধান করার স্বার্থে।" এভাবেই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং দেশের সব আইন তার মুঠোয় নিয়ে শেখ মুজিব দেশে কায়েম করলেন স্বৈরাচারী একনায়কত্ব। শ্লোগান তোলা হল, 'এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'!

এ শ্লোগান গণতান্ত্রিক শ্লোগান নয়। এটা ছিল নাৎসী জার্মানীর হিটলার কিংবা ইটালীর মুসলিনির শ্লোগান। ব্যক্তি পুজাঁ কোন নেতার ভাবমুর্তিকে উজ্জ্বল করার পরিবর্তে তার চরম ক্ষতিই সাধন করেছে। এর নজির ইতিহাসে অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে।

১৯৭৫ সালের ২১শে জুন রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সারা বাংলাদেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। ১৬ই জুলাই শেখ মুজিব ৬১ জন জেলা গভর্ণরের নাম ঘোষণা করেন। তারা ১লা সেপ্টেম্বর থেকে জেলা প্রশাসনের সর্বময় অধিকর্তা হয়ে বসবেন সেটাই ছিল সরকারি সিদ্ধান্ত। ৬১জনের মাঝে ৪৪ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতারা এবং বাকি ২৭ জন ছিলেন বাছাই করা সাংসদ। জাতীয় সংসদের মধ্য থেকে বাছাই করে নেয়া সদস্যবৃন্দ। নিয়োজিত গভর্ণরদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন প্রাক্তন CSP অফিসার, ৬ জন ছিলেন প্রাক্তন EPCS অফিসার, কাদের সিদ্দিকী, সেনা বাহিনীর একজন কর্নেল এবং পার্বত্য চট্টগাম থেকে দু'জন উপজাতীয় নেতা।

এই ৬১জন গভর্ণরদের বিশেষ রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। প্ল্যান অনুযায়ী ১৬ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালে প্রশিক্ষণ শেষে তারা যার যার জেলায় গিয়ে তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। তাদের প্রত্যেকের অধিনে দেয়া হবে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অর্ধেক ব্যাটেলিয়ন। তারা সরাসরিভাবে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের কাছেই জবাবদিহি থাকবেন। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রতি গভর্ণরের অধিনে একটি পূর্ণাঙ্গ রক্ষীবাহিনীর ব্যাটেলিয়ন নিয়োগ করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল। এসমস্ত গভর্ণরদের অধিনে রক্ষীবাহিনী নিয়োগ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের অধিনস্ত জেলায় বাকশাল বিরোধীদের সমূলে নির্মূল করে মুজিব ও তার পারিবারিক শাসন বংশানুক্রমে বাংলাদেশের মাটিতে পাকাপোক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশকে ভারতের পদানত একটি করদ রাজ্যে পরিণত করা।

জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের লিষ্ট তৈরি করায় সাহায্য করতে। অর্থনৈতিক সংকট, হতাশা, শেখ মুজিবের ভারত তোষণ নীতি এবং দুর্নীতিপরায়ন অত্যাচারী সরকার সম্পর্কে জনগণের নেতিবাচক মনোভাব, আইন-শৃঙ্খলা ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সবকিছু মিলিয়ে দেশে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে তখনকার সবকয়টি প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দল। আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অগ্রণীর ভূমিকায় এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী। দেশের সাধারণ গণমানুষের মুক্তির স্বপ্ন চিরজীবন দেখেছেন মাওলানা ভাসানী। মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের মুক্তি আসতে পারে এটা সম্পূর্ণভাবে মাওলানা ভাসানী কখনই মেনে নেননি। ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রীয় ধারণাকে তিনি অধুনাকালের

বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক রাষ্ট্রীয় চেতনায় বাস্তবায়িত করে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি এনে রাষ্ট্রীয় দুঃশাসনের অবসান করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার রাজনৈতিক চিন্তার ব্যাখ্যায় তিনি সর্বদা স্রষ্টা ও সৃষ্টির হকের কথা বলতেন। এ সমস্ত কিছু নতুন কথা নয়। ইউরোপীয় রাজনৈতিক দর্শন, ক্রিশ্চিয়ান সোস্যালিজম ও আঞ্চলিক সাম্যবাদ, ইউরো কম্যুনিজম এর মধ্যেও একই ভাবধারা বিরাজমান। ইন্দোনেশিয়ার সুকার্নো চেয়েছিলেন ধর্ম, জাতীয়তাবাদ এবং কম্যুনিজমকে একত্রিকরণের মাধ্যমে 'নাসাকম' কায়েম করতে। পরে কম্যুনিজম বাদ দিয়ে সে জায়গায় সোস্যালিজম গ্রহণ করে তিনি স্থাপন করেন 'নাসাসোস' মাওলানা ভাসানী চেয়েছিলেন ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে কায়েম করতে 'হুকুমতে রব্বানিয়া'। ১৯৭১ সালে ভারতে নজরবন্দী হিসেবে মাওলানা ভাসানীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব সাইফুল ইসলাম যখন শেষ বিদায় নিয়ে দেশে ফিরছিলেন তখন মাওলানা ভাসানী তাকে বলেছিলেন,

-চাইছিলাম লন্ডন যাব, প্রবাসী সরকার গঠন করব। কিন্তু কুটুম বাড়ি বেড়াইয়া গেলাম। অনেক বড় স্বপ্ন দেইখা দায়িত্ব কান্ধে নিয়া আমার সাথে আসছিলা। স্বপ্ন আমারও ছিল, বাংলার দুঃখী গরীব মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। সেটা পাইতে হইলে আর একটা লড়াই লড়তে হইবো। এতো রক্ত ঝরাইলো কিন্তু দ্যাশের মানুষ তো মুক্তি পাইবো না। আধা স্বাধীনতা নিয়া দ্যাশে ফিরলে আবার লাইগবো খটাখটি, তাই ভাইবতাছি----।

-হুজুর কথা ঠিক! কিন্তু সে লড়াইতো বাইরের দুশমনের সাথে সরাসরি নয়। দেশের মধ্যেই সে লড়াই ঘরে ঘরে।

-সেই জন্যই আরও কঠিন আরও হিংসার মনডা পোক্ত কইরা নিয়া যাইতে হইবো।

একাত্তরের বিচক্ষণ নেতা তার অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের যে অবস্থা দেখেছিলেন ঠিক সে অবস্থাই পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছিল মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী-বাকশালী চক্র বাংলার মাটিতে স্বৈরশাসনের একনায়কত্ব কায়েম করে। স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে জনগণকে মুক্ত করার সংগ্রামে অগ্রণীয় ভূমিকা গ্রহণ করে অকুতোভয় মাওলানা ভাসানী ১৯৭১ সালে জনাব সাইফুল ইসলামের কাছে তার ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ঠিক সেই দায়িত্বই আন্তরিকভাবে পালন করেন। দেশ ও জনগণের স্বার্থের প্রশ্নে আপোষহীন ছিলেন মাওলানা। না ভারতের প্রতি দুর্বলতা, না পাকিস্তানের পায়রবী। প্রয়োজনে চৈনীক নীতির তিরস্কার, মার্কিনীদের অবিশ্বাস, সোভিয়েতের সমালোচক - এই হল সিংহ পুরুষ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

আওয়ামী-বাকশাল বিরোধী আন্দোলনকালে বিভিন্ন বিরোধী দলগুলো সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। তাদের দলীয় অবস্থা, আন্দোলনের স্বরূপ, দলীয় নীতি ও কার্যপ্রনালী, সাফল্য, ব্যর্থতা, দলীয় দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্ন তৎপরতা প্রভৃতি বিষয় এবং তাদের প্রতি জনসমর্থন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারা যাবে এ আলোচনার মাধ্যমে। বিচ্ছিন্নভাবে তাদের দলীয় প্রতিরোধ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে কতটুকু কার্যকরী ছিল এবং তারা কি কখনও একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে পারত কিনা সে সম্পর্কেও জনগণের মনোভাব বোঝা যাবে। সে সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি কেন? ঐক্য গঠন করার পথে বাধা ছিল কোথায়? ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদৌ কোন চেষ্টা হয়েছিল কিনা? এসমস্ত বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধ সংগ্রামের মূল উৎপাটন করার ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী সরকার কি নীতি গ্রহণ করেছিল এবং তারা তাদের উদ্দেশ্যে কতটুকু সফলকাম হয়েছিল, এসমস্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক পট পরিবর্তনের যুক্তিকতা।

গোড়া থেকেই আওয়ামী-বাকশালী বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী। কিন্তু তার সেই বিরোধিতার আগুন সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে জাতিকে সংগঠিত করতে পারেনি তার দল। '৭১ এর সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভাসানী ন্যাপের দলীয় কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর ভেঙ্গে পড়া সেই দলকে আবার গড়ে তোলার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করার মত অবস্থা ছিল না মাওলানা ভাসানীর। বার্ধক্যের জড়া এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যই ছিল এর প্রধান কারণ।

আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসনের বিরোধিতা করেছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই জন্ম হয়েছিল জাসদের। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের একাংশ দাবি জানায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই কায়েম করতে হবে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ। জনাব সিরাজুল আলম খানই ছিলেন এ দাবির মূল প্রবক্তা। জনাব আসম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকেই জনগণের মধ্যে এ দাবির পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা করেন এবং এ দাবির পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই গ্রুপ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদ অধিবেশন বাতিল করে দিলে ১লা মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীন বলে দাবি তোলেন। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বরে প্রসিদ্ধ বটতলায় জনাব রব সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এর পরদিনেই এক সভায় শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে হঠাৎ করেই জনাব সিরাজ স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে এক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। রব-সিরাজ গ্রুপ মনে করেন ইয়াহিয়া সরকারের সাথে শেখ

মুজিবের আলোচনার ফলে জনগণের বিপ্লবী চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল; তাই তারা শেখ মুজিবকে সব আলোচনা বন্ধ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানান। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত ছাত্রলীগের ঘোষণাপত্র এর সাক্ষ্য দেয়। ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করেছিলেন জনাব মোহাম্মদ ইকরামুল হক, ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধকালে তারা জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী সরকারের প্রতি আস্থা প্রদর্শন না করে জনাব তাজুদ্দিনকে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করার পরামর্শ দেন ও তাদের কথা মেনে নেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। ফলে জনাব তাজুদ্দিনের সাথে তাদের মত পার্থক্য দেখা দেয়। জনাব তাজুদ্দিন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবের উপর এই গ্রুপের প্রচন্ড প্রভাব ছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে তাজুদ্দিন যখন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তখন তারা বুঝতে পারলেন প্রবাসী সরকারের অধিনে মুক্তিযুদ্ধ করলে তারা তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা দু'টোই হারাবেন। তাই তারা পরবর্তিকালে ভারতীয় সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থা র' প্রধান জেনারেল ওবান সিং এর সহায়তায় তাজুদ্দিন সরকারের আওতার বাইরে মুজিববাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনীর সার্বিক কর্তৃত্ব ছিল তাদের হাতে। ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এ বিশেষ বাহিনী গড়ে তুলতে ভারত সরকার সাহায্য প্রদান করে। যদিও মুজিবের ফিরে আসার পর তার প্রধান্যই বজায় রাখার জন্য আপাতঃ দৃষ্টিতে এ বাহিনী গঠন করা হয়েছে বলে জনগণ মনে করে। কিন্তু রব-সিরাজ গ্রুপ মুজিব পূজায় কতটুকু বিশ্বাস রাখতেন সেটা ছিল একটা বড় প্রশ্ন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালেই ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, এর মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেন সর্বদা পর্দার অন্তরালে থাকা নেপথ্যের নায়ক জনাব সিরাজুল আলম খান। বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সমন্বয়ে ৩১শে অক্টোবর ১৯৭২ সালে মেজর জলিলকে প্রেসিডেন্ট এবং জনাব রবকে সাধারণ সম্পাদক করে আত্মপ্রকাশ ঘটে নতুন রাজনৈতিক দল 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' বা জাসদ-এর। নতুন রাজনৈতিক দলের মূল তাত্ত্বিক গুরু হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব সিরাজুল আলম খান। জাসদের অভিমত ছিল- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন জাতির মুক্তি সংগ্রামের রূপ নিচ্ছিল ঠিক তখনই তাকে বন্ধ করে দেয়া হয় চক্রান্তের মাধ্যমে। স্বাধীনতা সংগ্রামকাল থেকেই জাসদ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে আসছিলেন বলে তারা দাবি করেন। তাদের সেই প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর। তারা দাবি তোলেন জনগণের ৮% সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ জাতীয় সম্পদের ৮৫% লুট করে নিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে। (জাসদের ১৯৭৩ সালের ঘোষণাপত্র দ্রষ্টব্য)। জাসদ নিজেকে সত্যিকারের সর্বহারাদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ (BCL) এর গণসংগঠক হিসাবে দাবি করে। বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট লীগ গঠন করেন জনাব

সিরাজুল আলম খান। এটি ছিল একটি গোপন সংগঠন। যুদ্ধকালীন সময় থেকে জাসদের জন্ম পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সালে সরকারি আদেশে বন্ধ করে দেয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ কতৃর্ক গণকন্ঠ নামে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। অতি পরিচিত ও বিখ্যাত প্রগতিশীল কবি আল মাহমুদ ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক।

দেশের অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলোর মতই দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলি জনগণের কাছে তুলে ধরে জাসদ। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগের ছাত্রফ্রন্ট বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলনে ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে তৎকালীন জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বসমূহের বিশ্লেষন করে জাতীয় বিপ্লবকে বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে দ্বন্দ্বগুলোর অবসান ঘটানোর জন্য বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে দলিলে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ সমাজতন্ত্রের উত্তরণে তিনটি ধাপ নির্ণয় করে বলে, "স্বাধীনতা সংগ্রামের তৃতীয় ধাপের পরিসমাপ্তি ঘটবে আওয়ামী লীগ ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের সাথে সর্বহারাদের রক্তক্ষয়ী ভবিষ্যত সংগ্রামের মাধ্যমে।" সংসদীয় রাজনীতিকে স্বার্থবাদী মহলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হাতিয়ার হিসাবে বর্ণনা করা হয়। গ্রামের সামন্তবাদীর অবশেষ, মধ্যসত্বভোগী এবং উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের সর্বহারাদের শত্রু শ্রেণী বলে অভিহিত করা হয় সেই দলিলে। তাদের দলিলে বলা হয় জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার শাসন কায়েম হওয়ার আগে জনগণ বর্হিঃশোষণের শিকারে পরিণত হবে কারণ আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদের পদানত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগের তত্ত্ব অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পরিচালিত হবে মূলতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঋন ও অনুদানের মাধ্যমে। তবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হবে রুশ ও ভারতের দ্বারাও। এজন্য প্রয়োজনীয় শোষণমূলক অর্থনৈতিক সম্পর্কের নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাদের রিপোর্টে বলা হয়- যুক্তিহীন এবং অন্যায়ভাবে ঢাকার পরিবর্তে দিল্লীতে ইন্দো-বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ মনে করে কোন এক পর্যায়ে গণচীন বাঙ্গালীদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে। এই প্রেক্ষিতে যদিও কম্যুনিষ্ট লীগ আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের দ্বন্দ্বের বাইরে নিজেদের রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল; তথাপি চীনপন্থী অন্যান্য সাম্যবাদী লেনিনবাদী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে বন্ধুসুলভ মনোভাব পোষণ করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছিল রিপোর্টে। জাসদ মুক্তি বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের মাঝ থেকে দলীয় সদস্য রিক্রুট করতে থাকে। সেনা বাহিনীর মধ্যেও তাদের প্রকাশনী লাল ইশতেহার এর মাধ্যমে গোপন সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে জাসদ।

২০শে জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে জাসদ, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ এবং জাতীয় শ্রমিক লীগ (জাসদপন্থী) যুক্তভাবে বাংলাদেশের উপর মার্কিন, রুশ এবং ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরোধিতা করে এক হরতালের ডাক দেয়। হরতালের সময় নেতারা শিক্ষক এবং শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানান। তারা বাংলাদেশের সর্বোপরিসরে দুর্নীতি, বিশেষ জরুরী আইন, সরকারের স্বজনপ্রীতি এবং বিশেষভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে পারমিট লাইসেন্স বিতরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দেশব্যাপী সেদিন পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১৭ই মার্চের মধ্যে সরকার তাদের দাবি না মানলে তারা ঘেরাও এর হুমকি দেন। ১৭ই মার্চ জাসদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ ঘেরাও ভঙ্গ করে। পুলিশের গুলিতে ৩জন নিহত ও ১৪ জন গুরুতরভাবে আহত হন। মেজর জলিল, জনাব রব এবং আরো ৪০জন জাসদ কর্মী আহত অবস্থায় বন্দী হন। গোপন সংগঠনের অন্যান্য নেতাদের সাথে জনাব সিরাজুল আলম খান সেদিন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে তারা গ্রামাঞ্চলে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। সেদিনের ঘটনাকে অনেকে চরম হঠকারী প্ররোচণা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জাসদ সম্পর্কে তার 'স্বাধীনতার স্পৃহা সাম্যের ভয়' গ্রন্থে লেখেন, "মুসলিম লীগের ঘর ভেঙ্গে একদা আওয়ামী লীগ বের হয়ে এসেছিল। অনেকটা সেই পদ্ধতিতেই আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে বের হয়ে এসেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। এরা নিজেদেরকে বলছে র‍্যাডিকেল-চরমপন্থী। তাদের তরুণ ও বিরাট কর্মী বাহিনী যে সমাজতন্ত্রের ডাকেই এই দলে এসে যোগ দিয়েছিল তাতে সন্দেহের কোনই কারণ নেই। কিন্তু নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা মনে হয় সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। আওয়ামী লীগারই ছিলেন আসলে। তাদের ইচ্ছা ছিল শেখ মুজিবকে নিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠন করবেন। কিন্তু শেখ মুজিব তার অবস্থান ছেড়ে বিপ্লবী হতে রাজি হননি ফলে এরা এগিয়ে গেছেন নিজেদের পথ ধরে। এদের দলের নামের সঙ্গে 'জাতীয়' এর যোগাযোগ আপতিক ঘটনা বলে মনে হয় না। এরাও জাতীয়তাবাদীই ছিলেন। নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থই দেখছিলেন (যার সঙ্গে তাদের নিজেদের ভবিষ্যত ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের আওয়াজ দিয়েছেন যাতে লোক জড়ো করা যায়, নায়ক হওয়া যায় নতুন প্রজন্মের ও নতুন বাংলাদেশের। শেখ মুজিব যদি আর না ফেরেন তাহলে বামপন্থীদের কি করে মোকাবেলা করা যাবে তার আগাম ব্যবস্থা হিসেবে এরা একান্তরে মুজিববাহিনী গড়েছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের রাজনীতি ছিল বুর্জুয়াদের রাজনীতিই। যদিও তাদের আওয়াজগুলো ছিল 'বিপ্লবী'; ফলে তাদের নেতারা জাতীয় পুর্নগঠনের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকেই সমর্থন দান করে যাচ্ছিলেন এতে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই।"

তার এই বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার ভার রইলো পাঠকদের উপর। জাসদের এবং মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি প্রক্রিয়া থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠে। ভারতীয়

সরকার চার খলিফার মাধ্যমে প্রথমে মুজিববাহিনী, পরে খলিফাদের মূল ব্যক্তিত্ব জনাব সিরাজুল আলম খানের প্রচেষ্টায় জাসদ সৃষ্টি হওয়ায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়। শুধু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং 'র' প্রধান জেনারেল ওবান সিং এর সাথেই জনাব সিরাজুল আলম খানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল তা নয়; সংগ্রামকালে ১৯৭১ সালে ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের সাথেও জনাব সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ১৯৭১ সালে জনাব সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রনেতারা দিল্লী গিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তা'জুদ্দিনের বিরোধিতা করে তাদের নেতৃত্বে মুজিববাহিনী গঠন করার প্রস্তাব পেশ করলে ভারত সরকার প্রধান শ্রীমতি ইন্দীরা গান্ধী ও 'র' প্রধান জেনারেল ওবান সিং তাদের সেই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন মূলতঃ দু'টো সুদূরপ্রসারী কারণে।

প্রথমত: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে এদের গুটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে।

দ্বিতীয়ত: এ বাহিনীর মাধ্যমে মুজিব ও তার সরকারকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল করে তুলে শেখ মুজিবকে নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে। অনেকের মতে জাসদকে আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল ভারতের ক্ষমতা বলয়ের একাংশের সমর্থন ও মদদেই। জাসদের মূল্যায়ন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে যেভাবেই করা হোক না কেন একটি সত্যকে কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করতে পারবেন না- স্বৈরাচারী নির্যাতনের হাত থেকে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন করার জন্য জাসদের ডাকে হাজার হাজার নিবেদিত প্রাণ কর্মী আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। নেতারা কে কি ভেবেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই গবেষণার বিষয়, তবে কর্মীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মধ্যে ছিল না কোন খাঁদ কোন কলুশতা। মুজিবের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তাদের বীরোচিত সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিটি প্রজন্ম। তাদের রক্ত প্রেরণা যোগাবে প্রতিটি বাংলাদেশী দেশপ্রেমিককে তাদের ভবিষ্যত সংগ্রামে। তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার সঠিক মূল্যায়নের মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের সঠিক দিক নির্দেশনা। আওয়ামী-বাকশালী শাসনের বিরোধিতা করেছিল বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী (BCPL)। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পিকিংপন্থী ৫টি কম্যুনিষ্ট গ্রুপ একত্রিত হয়ে যে বিপ্লবী সমন্বয় কমিটি কোলকাতায় গঠন করেছিল তাদেরই চারটি গ্রুপের ঐক্যের মাধ্যমে স্বাধীনতার পর সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী। এ পার্টিতে যোগ দেয় (১) কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি (২) পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী, লেনিনবাদী (৩) খুলনার কিছু কম্যুনিষ্ট কর্মী জনাব মারুফ হোসেন ও ডঃ সাইদুর দাহারের নেতৃত্বে। (৪) জনাব নাসিম খানের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক কম্যুনিষ্ট। এই দলের নেতারা মনে করেন পূর্ব বাংলায়

কম্যুনিষ্টরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকায় স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিষ্টদের পক্ষে নেতৃত্ব দান করা সম্ভব হয়নি। তাই তারা কম্যুনিষ্ট ঐক্য গঠন করে অসম্পূর্ণ বিপ্লব সম্পুর্ণ করার আহ্বান জানান। 'একটি ঐক্যবদ্ধ কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে তুলুন' শিরোনামের একটি ইশতেহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট সংহতি কেন্দ্র এ আহ্বান ঘোষণা করে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এরই ফলে গঠন করা হয় বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী (BCPL)। এই পার্টি প্রকাশ্য এবং একই সাথে গোপন কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। BCPL বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নামে একটি ছাত্রফ্রন্টও গঠন করেন। শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য গঠন করা হয় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন। পরবর্তিকালে বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী দল তাদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (UPP) গঠন করেন। ১৯৭৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জনাব নাসিম আলী খান এই রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করেন। BCL এর রাজনৈতিক দর্শনের সাথে BCPL এর দর্শনের মিল পাওয়া যায়। দু'টো দলের মতেই বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায় ১৯৭১ সালে, যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল বুর্জুয়াদের হাতে। দু'দলই অভিমত পোষণ করে সোভিয়েত রাশিয়া একটি সংশোধনবাদী দেশ এবং রাশিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ করা। ভারতকে ও দু'টো দলই সম্প্রসারণবাদী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু দু'টো দলই ভারতের নকশাল আন্দোলনের সমালোচনা করে এবং আন্দোলনকে শৃঙ্খলাহীন হঠকারীতা বলে আখ্যায়িত করে। (দ্রষ্টব্য: বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমল সেনের ১৯৭২ সালের ঘোষণাপত্র।) BCL এর তুলনায় তাদের গণসংগঠন শ্রমিক এবং ছাত্রসংগঠন অনেক দুর্বল ছিল ফলে দেশব্যাপী তাদের আবেদনও ছিল কম এবং অঞ্চলভিত্তিক। যদিও BCPL এর বেশিরভাগ নীতি আদর্শের সাথে মিল ছিল দেবেন সিকদার ও আবুল বাশারের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) মূল সমন্বয় কমিটির অপর একটি দলের তবুও সামান্য কয়েকটি বিষয়ে মত পার্থক্যের ফলে এ দলটি BCPL এর সাথে ঐক্য স্থাপন করা থেকে বিরত থাকে। এই দলটি বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানী নির্যাতনকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কারণ বলে আখ্যায়িত করে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের উপর ভারতের আধিপত্যকেই মূল দ্বন্দ্ব বলে নির্ধারণ করে। এ দলের নেতৃবৃন্দ অভিমত পোষণ করেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তি সংগ্রামে গণচীনের কম্যুনিষ্ট পার্টিই মুখ্য ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে BCPL নেতৃবৃন্দের অভিমত ছিল কিছুটা নমনীয়। এ ব্যাপারে বিশদভাবে জানতে হলে পাঠকদের ১৯৭২ সালে 'পূর্ববাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির আবেদন' নামে সলিডারিটি সেন্টার অফ বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহারটি এবং 'বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলুন' BCPL কর্তৃক

প্রকাশিত ইশতেহার দু'টি পড়ে দেখতে হবে। সিকদার-বাশার গ্রুপের পার্টিকে পরে বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি বলা হয়। এই দলও প্রকাশ্য এবং গোপন রাজনীতি পাশাপাশি চালিয়ে যাবার পক্ষে ঘোষণা দেয়। এ দলেরও নিজস্ব ছাত্র, শ্রমিক সংগঠন গঠন করেন নেতৃবৃন্দ। কৌশলগত কারণে এ দলটি সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের পক্ষে মত দেয়। BCPL এবং BCP দু'টো দলই প্রকাশ্য গণসংগঠন এবং পার্টি সেল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এদের ছাড়া আরো চারটি রাজনৈতিক সংগঠন শুধুমাত্র তাদের গোপন পার্টি সেল এবং গোপন সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে তাদের তৎপরতা চালাতে থাকে। এই চারটি দলের দু'টো দল ছিল EPCP(ML) থেকে বেরিয়ে আসা কম্যুনিষ্টদের নিয়ে গঠিত। তৃতীয় দলটি ছিল পূর্ববাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা একটি অংশ। পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে সিকদার-বাশারও গঠন করেছিল BCP (বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি)। চতুর্থ দলটি ছিল এসমস্ত দলগুলোর উৎস থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে গড়ে ওঠা সর্বহারা পার্টি (পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি)। বিপ্লবী নেতা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন। এ আন্দোলন থেকেই পরে গড়ে উঠে সর্বহারা পার্টি। ১৯৭৫ সালে মুজিব সরকারের হাতে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এই পার্টির নেতৃত্ব দেন। এ দলের নেতৃত্বে মূলতঃ ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ। যার ফলে তাদের বিপ্লব সম্পর্কীয় গবেষণা এবং প্রচারণা অন্যান্য পার্টিগুলোর চেয়ে ছিল ভিন্নতর এবং অধিক কার্যকরী। লাল ঝানডা এবং সংবাদ বুলেটিন ছাড়াও এ পার্টি নিয়মিতভাবে তাদের কেন্দ্রিয় কমিটির বৈঠক সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর লিখিত দলিল প্রকাশ করতো। বেশিরভাগ দলিলগুলো জীবিত অবস্থায় ছিল সিরাজ সিকদারের নিজ হাতে লেখা। তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সুবিন্যাস্ত এবং প্রচার মাধ্যম ছিল অতি উত্তম। দেশের যে কোন প্রান্তে তাদের প্রকাশিত দলিলপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। সর্বহারা পার্টি অন্যান্য প্রগতিশীল ও বিপ্লবী পার্টিগুলোর সাথে একমত হয়ে মত প্রকাশ করে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে তড়িঘড়ি করে শেষ করে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় বাংলাদেশের বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আওয়ামী লীগ সরকারকে তারা ভারতের পুতুল সরকার বলে অভিহিত করেন। পার্টির প্রকাশনায় প্রচারিত হয় স্বাধীনতার পর ভারতের সহায়তায় ক্ষমতায় বসে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে লুটপাট করে ভারতীয় নীল নক্শা বাস্তবায়নের পরিল্পনাকেই সহায়তা করতে থাকে। সর্বহারা পার্টি মনে করে রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত বিকল্প প্রথায় বাংলাদেশে তাদের স্বার্থ বজিয়ে রাখার উদ্দেশ্য তাদের সামরিক অবস্থানকেই অটুট রাখে। বাংলাদেশ আওয়ামী সরকারের অধিন মার্কিন ও রুশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের হুমকির সম্মুখীন বলেও সর্বহারা পার্টি জনগণকে হুশিঁয়ার করে দেয়। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের আহ্বানকে সর্বহারা পার্টি ট্রটস্কাইড পন্থী হঠকারীতা বলে আখ্যায়িত করে। কারণ জাতীয় বিপ্লব

সম্পন্ন করার আগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয় বলে পার্টির তাত্ত্বিকরা অভিমত প্রকাশ করেন। তারা আরো বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে জাতীয় বিপ্লব সম্পূর্ণ করা অসম্ভব কারণ তারা চারিত্রিকভাবে জাতীয় বুর্জুয়াদের প্রতিনিধি নয়, তারা হল সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের দালাল এবং মুৎসুদ্দি শ্রেণীর প্রতিনিধি। সর্বহারা পার্টির মতে বাংলাদেশের অসম্পূর্ণ বিপ্লবকে ধাপে ধাপে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের। বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার জন্য সর্বহারা পার্টি কৃষক, শ্রমিক, নিপীড়িত জনতা, বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গোষ্ঠির সমন্বয়ে গড়ে তোলে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নামে একটি গণসংগঠন। সর্বহারা পার্টির তাত্ত্বিকরা মনে করেন যেহেতু বাংলাদেশ তিন দিক দিয়েই ভারত বেষ্টিত, সেক্ষেত্রে বিপ্লবের জন্য বাইরের কোন সাহায্য পাওয়া হবে অতি দুঃষ্কর; তাই বিপ্লবীদের নিজস্ব শক্তির উপরই মূলতঃ নির্ভরশীল থাকতে হবে। সিরাজ সিকদারের গতিশীল নেতৃত্বে এবং সর্বহারা পার্টির বিপ্লবী কার্যক্রমে মুজিব সরকারের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। অসীম সাহসিকতার সাথে সর্বহারা পার্টির সদস্যরা একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে সরকার ও তার বিভিন্ন বাহিনীকে নাজেহাল করে তুলতে সমর্থ হয় অতি অল্প সময়ে। তাদের সাফল্যে দেশজুড়ে সাড়া পড়ে যায়। তরুণ সমাজের কাছে পার্টির ভাবমূর্তি বেড়ে যায়। ফলে তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দলে দলে জনগণের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিতে শুরু করে এবং পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে। এত অল্প সময়ে এ ধরণের জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব হয়নি। জাসদের চেয়েও ক্রমান্বয়ে সর্বহারা পার্টি বেশি জনসমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়। ১৯৭৩ সালের ২রা ডিসেম্বর এক বিবৃতির মাধ্যমে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী সর্বহারা পার্টিকে সমর্থন জানান এবং সিরাজ সিকদারকে অভিনন্দন জানান। ১৯৭৫ সালের ২রা জানুয়ারী শেখ মুজিবের নির্দেশে রক্ষীবাহিনীর শেরেবাংলা নগরের ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় অকথ্য নির্যাতনের পর বীর মুক্তিযোদ্ধা সর্বহারা পার্টির শীর্ষ নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস হত্যাকান্ড সম্পর্কে দৈনিক সংগ্রামে ৫ই জুন ১৯৯২ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হল। এ থেকে সিরাজ সিকদারের হত্যার নেপথ্যে কাহিনী সর্ম্পকেই জানা যায় তা নয়; সর্বহারা পার্টির তৎকালীন কার্যকলাপ ও মুজিবের স্বৈরশাসন আমলের সার্বিক জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল:

রাজ্জাক, তোফায়েল, নাসিমসহ ৭জন আসামী। সিরাজ সিকদার হত্যা মামলা দায়ের।

স্টাফ রিপোর্টার: - পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে হত্যার দায়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল ও মোহাম্মদ নাসিমসহ

৭জনকে আসামী করে গতকাল বৃহঃস্পতিবার ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের (সিএমএম) আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিরাজ সিকদার পরিষদের সভাপতি শেখ মহিউদ্দিন আহমদ বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামীরা হলেন: (১) সাবেক পুলিশ সুপার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (২) আব্দুর রাজ্জাক এমপি (৩) তোফায়েল আহমদ এমপি (৪) সাবেক আইজি পুলিশ ইএচৌধুরী (৫) সাবেক রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক বর্তমানে সুইডেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কর্নেল (অবঃ) নূরুজ্জামান (৭) মোহাম্মদ নাসিম এমপি গং।

আসামীদের বিরুদ্ধে ৩০২ ও ১০৯ নং ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার আর্জিতে বলা হয়, বিশিষ্ট প্রকৌশলী নিহত সিরাজ সিকদার ছিলেন একজন আজাদী পাগল মুক্ত বিবেকের অধিকারী ও স্বাধীনচেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি তার জীবদ্দশায় নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রথমে শ্রমিক সংগঠন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং পরবর্তীতে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে কাজ করতে থাকেন। সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বের প্রতি জনসমর্থন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তৎকালীন সরকার প্রধান মরহুম শেখ মুজিবর রহমান ঈর্ষান্বিত হয়ে জনসমর্থন হারানোর কারণে, ক্ষমতাচ্যুতির ভয়ে ভীত হয়ে সর্বহারা পার্টির কর্মীদের ওপর দমন নীতি চালাতে থাকেন। এমনকি পার্টি প্রধান সিরাজ সিকদারকে হত্যার জন্য বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

আর্জিতে বলা হয় আসামীরা মরহুম শেখ মুজিবের সহচর ও অধিনস্থ কর্মী থেকে শেখ মুজিবের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও গোপন শলা-পরামর্শে অংশগ্রহণ করতেন এবং ১নং থেকে ৬নং আসামী তৎকালীন সময়ে সরকারের উচ্চপদে থেকে অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সহচরদের সাথে শেখ মুজিবের সিরাজ সিকদার হত্যার নীল নকশায় অংশগ্রহণ করেন। তারা এ লক্ষ্যে সর্বহারা পার্টির বিভিন্ন কর্মীকে হত্যা, গুম, গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানি করতে থাকেন। সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার ও হত্যার বিবরণ দিয়ে আর্জিতে বলা হয়, মরহুম শেখ মুজিব ও উল্লেখিত আসামীরা তাদের অন্য সহযোগীদের সাহচর্যে সর্বহারা পার্টির মধ্যে সরকারের চর নিয়োগ করেন। এদের মধ্যে ইএচৌধুরীর একজন নিকট আত্মীয়কেও চর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এভাবে ১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারী চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকা থেকে অন্য একজনসহ সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করে ঐদিনই বিমানে করে ঢাকায় আনা হয়। ঢাকার পুরাতন বিমান বন্দরে নামিয়ে বিশেষ গাড়িতে করে বন্দীদের পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মালিবাগস্থ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সিরাজ সিকদারকে আলাদা করে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ২রা জানুয়ারী সন্ধ্যায় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর বিশেষ স্কোয়াডের অনুগত সদস্যরা বঙ্গভবনে মরহুম শেখ মুজিবের

কাছে সিরাজ সিকদারকে হাত ও চোখ বাধাঁ অবস্থায় নিয়ে যায়। সেখানে শেখ মুজিবের সাথে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলীসহ আসামীরা, শেখ মুজিবের পুত্র মরহুম শেখ কামাল এবং ভাগ্নে মরহুম শেখ মনি উপস্থিত ছিলেন।

আর্জিতে আরো বলা হয়, প্রথম দর্শনেই শেখ মুজিব সিরাজ সিকদারকে গালিগালাজ শুরু করেন। সিরাজ এর প্রতিবাদ করলে শেখ মুজিবসহ উপস্থিত সকলে তার উপর ঝাপিঁয়ে পড়েন। সিরাজ সে অবস্থায়ও শেখ মুজিবের পুত্র কর্তৃক সাধিত ব্যাংক ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্ম, ভারতীয় সেবাদাসত্ব না করার, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শেখ মুজিবের কাছে দাবি জানালে শেখ মুজিব আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেন। সে সময় ১নং আসামী মাহবুব উদ্দিন তার রিভলবারের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করলে সিরাজ সিকদার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শেখ কামাল রাগের মাথায় গুলি করলে সিরাজ সিকদারের হাতে লাগে। ঐ সময় সকল আসামী শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই তার উপর ঝাপিঁয়ে পড়ে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে মারতে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। এরপর শেখ মুজিব, মনসুর আলী এবং দুই থেকে সাত নং আসামী সিরাজ সিকদারকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১নং আসামীকে নির্দেশ দেন। ১নং আসামী মাহবুব উদ্দিন আহমদ আসামীদের সাথে বন্দী সিরাজ সিকদারকে শেরেবাংলা নগর রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে নিয়ে যায়। এরপর তার উপর আরো নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে ২রা জানুয়ারী আসামীদের উপস্থিতিতে রাত ১১টার দিকে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরেই সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে ১নং আসামীর সাথে বিশেষ স্কোয়াডের সদস্যগণ পূর্ব পরিকল্পনা মত বন্দী অবস্থায় নিহত সিরাজ সিকদারের লাশ সাভারের তালবাগ এলাকা হয়ে সাভার থানায় নিয়ে যায় এবং সাভার থানা পুলিশ পরের দিন ময়না তদন্তের জন্য লাশ মর্গে প্রেরণ করে। কিন্তু সরকারি ঘোষণায় বলা হয়, বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করায় পুলিশ এনকাউন্টারে সিরাজ সিকদার নিহত হন। আর্জিতে উল্লেখ করা হয় যে, সিরাজ সিকদারকে হত্যার পর তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় সংসদে ভাষণ দেয়ার সময় 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?' এই দম্ভোক্তি উচ্চারণের মাধ্যমে তার জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। বিলম্বে মামলা দায়ের করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, ঘটনার সাথে সাথে সিরাজের পিতা মরহুম আব্দুর রাজ্জাক মামলা দায়ের করতে যান। কিন্তু তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসন ও রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাসের ভয়ে পুলিশ মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। শাসকদের সন্ত্রাসের মুখে মোকদ্দমা দায়ের করা যায়নি। দেশে অস্থির অগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রী পরিবেশের কারণে আইন-শৃঙ্খলার অস্বাভাবিক অবনতি, ক্ষমতায় থাকা একনায়কত্ব ফ্যাসিবাদী দলের ক্ষমতার দাপটে ভয়ভীতি ও সন্ত্রস্ততায় দীর্ঘ ১৭বছর এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতার বিচার নীরবে কেঁদে ফিরেছে। ঐ অবস্থায় মরহুমের পরিবার ও সহকর্মীদের পক্ষ থেকে এজাহার ও

মামলা দায়েরের ক্ষুদ্রতম সাহসও কারো ছিল না এবং এখনও নেই। বাদী নিজে সিরাজ সিকদারের আদর্শের এক তরুণ, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই আর্জি পেশ করছে।"

এ আর্জির প্রেক্ষিতে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম দরখাস্তখানা তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ জারি করেন। বাদী পক্ষে মামলা পেশ করেন এডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান। তাকে সহায়তা করেন জনাব মোঃ আফজাল হোসেইন। এভাবে চরম নিষ্ঠুরতায় পার্টি নেতা সিরাজ সিকদারের হত্যার পর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে এবং সরকারি নিষ্পেষণে সর্বহারা পার্টির সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। জাতীয় পরিসরে পার্টির প্রভাব ও কর্মকান্ড এবং শক্তি ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে। নেতৃত্বের দুর্বলতায় কর্মীরা উদ্দামহীন হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। ফলে জনগণও হতাশ হয়ে সন্দিহান হয়ে উঠে সর্বহারা পার্টির ভবিষ্যত সম্পর্কে। এভাবেই সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর সাথে সাথে হঠাৎ করে জেগে উঠা গণমানুষের মুক্তির এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় স্বৈরশাসনের আগ্রাসী জিঘাংসায়।

জনাব তোহা ও শরদীন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল গোপন সংগঠন হিসেবে মুজিব বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করছিল। মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে ১৯৬৮ সালে পিকিংপন্থী হিসাবে এ দলের উৎপত্তি ঘটে। স্বাধীনতার পর এই দল তাদের মুখপত্র গণশক্তির মাধ্যমে দাবি জানায়, "বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করেনি। রুশ-ভারত চক্র মুলতঃ বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের প্রতিষ্ঠিত মুজিবের পুতুল সরকারের মাধ্যমে।" সর্বহারা পার্টির মতই সাম্যবাদী দল বাংলাদেশের রক্ষীবাহিনীকে পরোক্ষভাবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর উপস্থিতি বলেই মনে করে। কারণ এই রক্ষীবাহিনী সর্বোতভাবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সাহায্যেই গঠন করা হয়েছিল। সাম্যবাদী দল অভিমত প্রকাশ করে যে, রক্ষীবাহিনী তৈরি করে তাদের সাথে যৌথভাবে ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় সরকার বিরোধী আন্দোলনগুলোকে দমন করার চেষ্টা করছে। মুজিব তার সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্যই রক্ষীবাহিনী তৈরি করার ভারতীয় প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। সর্বহারা পার্টির মতই সাম্যবাদী দল একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করে এবং একই সাথে গোপনে গণবাহিনী সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রধানত: ঢাকা, রাজশাহী, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর জেলাতেই সাম্যবাদী দল তাদের ঘাটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে ঐ জেলাগুলোতেই তাদের সরকার বিরোধী সংগ্রাম তীব্রতা লাভ করে। প্রগতিশীল এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো স্বৈরাচারী সরকার বিরোধী ভূমিকায়

মূল্যবান অবদান রাখলেও দলীয় মতবিরোধ ও পার্থক্য নিয়ে দলগুলো একে অপরের প্রকাশ্য সমালোচনা ও নিন্দা করতে থাকে।

সাম্যবাদী দল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে BCPL এবং BCP এর অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করে। BCPL এবং BCP আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের উপর নির্ভরশীল বলে দাবি করলে সাম্যবাদী দল এ বক্তব্যের সমালোচনা করে বলে, "আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের পুতুল সরকার। তাকে ভারতের উপর নির্ভরশীল বলা মানেই হচ্ছে তাদের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখা।" সর্বহারা পার্টির সমালোচনা করে সাম্যবাদী দল বক্তব্য দেয়, "সাম্যবাদী দল সর্বহারা পার্টিকে একটি হঠকারী গ্রুপ বলেই মনে করে। এ গ্রুপ আত্মম্ভর সিরাজ সিকদারের ভুল প্ররোচণায় পরিচালিত হচ্ছে।" সর্বহারা পার্টি বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বন্দ্বকে প্রধান্য দেওয়ায় সাম্যবাদী দল সর্বহারা পাটির্কে তাত্ত্বিক দিক দিয়েও ভুল এবং দুর্বল বলে দাবি তোলে। সাম্যবাদী দলের তত্ত্ব অনুযায়ী, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের পক্ষ এবং বিপক্ষ শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বই মূল দ্বন্দ্ব। (দ্রষ্টব্যঃ সাম্যবাদী দলের প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দলিল- 'বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল', ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ- 'এক ভূইফোঁড় বিপ্লবী সম্পর্কে') একইভাবে জাসদ সম্পর্কে সাম্যবাদী দলের অভিমত ছিল, আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা তরুণ নেতাদের সমন্বয়ে ভারতই এই সংগঠন গড়ে তোলায় সাহায্য করে। মুজিব ও তার অনুগতদের নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যেই ভারত জাসদ গঠনে মদদ যোগায়। (দ্রষ্টব্যঃ এপ্রিল-মে ১৯৭৩ সালে গণশক্তিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় 'ইস্পাত কঠিন শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে গড়ে তুলুন') জনযুদ্ধ EPCP (ML)-এর মুখপাত্র হিসেবে সেই সময় আব্দুল হকের সম্পাদনায় বের হত। পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) থেকে বেশিরভাগ কর্মীকে বের করে এনে জনাব তোহা এবং শরদীন্দু দস্তিদার সাম্যবাদী দল গঠন করলেও জনাব আব্দুল হক পার্টির নাম পরিবর্তন না করার প্রশ্নে অটল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম.এল) বা EPCP (ML) নামে একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এই গ্রুপটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অস্বীকার করে। স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারতীয় আগ্রাসন বলে EPCP (ML) আখ্যায়িত করে। জনযুদ্ধের মাধ্যমে আগ্রাসী শক্তির কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করার লাইন গ্রহণ করে EPCP (ML)। এই দল তাদের নাম না বদলানোয় সরকারি নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। গ্রুপের বেশিরভাগ সদস্যই মারা যায় নতুবা কারাবন্দী হয়। জনাব আব্দুল হককে বন্দী অথবা হত্যা করার সরকারি সব প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়।

পূর্ব বাংলা কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) EBCP (ML) এবং সাম্যবাদী দলের মধ্যে তত্ত্বগতভাবে খুব একটা ব্যবধান দেখা যায় না। তবে EBCP (ML) কৃষক ও সামন্তবাদের অবশেষের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বকে বেশি প্রধান্য দেয়। এ দল ভারতের বিপ্লবীদের সাথে একত্রিতভাবে বিশেষ করে নকশালীদের সাথে সম্পর্ক রেখে বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার ঘোষণা ব্যক্ত করে। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য প্রায় বিপ্লবী সব দলগুলোর কাছে নকশাল আন্দোলন একটি চরমপন্থী হঠকারীতা বলেই গৃহিত হয়। নকশালীদের দলগুলো বিশ্বাস করতেও রাজি ছিল না। আত্রাই, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে EBCP (ML) বিশেষভাবে তৎপরতা চালায়। প্রগতিশীল ও বামপন্থী তৎকালীন প্রায় সবগুলো দলই একমত প্রকাশ করে যে, বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লব ১৯৭১ সালে অসমাপ্ত থেকে যায়। মুজিব সরকার বাংলাদেশের উপর রুশ-ভারতের আধিপত্য কায়েমে সহযোগিতা করে। মুজিব সরকার মূলতঃ ভারতের একটি পুতুল সরকার।

উপরের পর্যালোচনা থেকে একটা জিনিসই পরিষ্কার হয়ে উঠে। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রবীণ নেতৃত্বের চেয়ে নবীনরাই সংগ্রামে অভূতপূর্ব গতিশীলতার সৃষ্টি করে। তারা যখন জনসমর্থন পেয়ে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত তখন পুরনো নেতৃত্ব তাত্ত্বিক কচকচানি নিয়েই ব্যস্ত থেকে নিজেদের দেউলিয়াপনা প্রকাশ করে গণবিছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের দেউলিয়াপনা, নেতৃত্বের লোভ, ভাববাদী তাত্ত্বিক চর্চা, সন্দেহপ্রবণতা, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা উল্লেখযোগ্য বা আশানূরূপ অবদান রাখতে ব্যর্থ হন। ফলে ক্রমশঃ তারা জনগণ থেকে সম্পূর্ণভবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। নবীন প্রজন্ম তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। নেতাদের অনেকের ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকলেও এটাই বাস্তব সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের ব্যর্থতা সাফল্যের চেয়ে অনেক বেশি সেটাও আজ প্রমাণিত। অতীতে বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ যখন সত্যিকারের মুক্তির জন্য পরিস্থিতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তখন নেতাদের ভ্রান্ত ও নেতিবাচক ভূমিকার ফলেই ইপ্সিত লক্ষ্য জনগণ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ সর্বদা চলেছে আগে আর নেতারা চলেছেন পেছনে। আমাদের দেশের জনগণের সংগ্রামের ঐতিহ্যে এটাই বড় সত্য। লজ্জাকর হলেও এ সত্যকে খন্ডাবার উপায় নেই। সত্যকে মিথ্যা করার প্রচেষ্টা থেকেছে সর্বকালে। কিন্তু সত্যকে মেনে নিয়ে এগুলেই আশানূরূপ ফল পাওয়া যায়। মিথ্যার আবর্তে পাওয়া যায় শুধু বঞ্চনা ও প্রতারণা। ব্যর্থতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে না চাইলে নতুন প্রজন্মকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতে হবে ভবিষ্যতপানে। তারুণ্যের উদ্দাম ও গতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে প্রবীণরা নবীনদের পথ থেকে সরে দাড়ালেই অক্ষুন্ন থাকবে তাদের সম্মান। আর যদি তারা স্বার্থপরের মতো নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে

রাখার চেষ্টা করেন তবে তারুণ্যের প্লাবনের দুর্বার স্রোত তাদের টেনে নিয়ে ফেলবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। সময়কে হাতের মুঠোয় পুরে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে সময়ের দাবিকে মেনে নেয়াটাই হবে নেতাদের জন্য কল্যাণকর। আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন সচেতন মুক্তিযোদ্ধারা। সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলো অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার এবং লুটপাটের বিরোধিতার সংগ্রামে উজ্জ্বল প্রতীক। তারা লড়েছেন বিভিন্ন অবস্থানে থেকে। কেউ তাদের নিজস্ব এলাকায় জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেউ সংগ্রাম করেছেন রাজনৈতিক বিরোধী দলের ছত্রছায়ায়। কেউ বা লড়েছেন সেনা বাহিনীর সদস্য হিসেবে। তাদের এ বহুমুখী ধারার সচেতনাকে সাংগঠনিক রূপ দেবার প্রচেষ্টা না থাকায় প্রতিরোধ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। যারা রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন দলীয় গন্ডির মাঝেই তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের মাঝে যে দেশপ্রেম জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে সুষ্ঠ নেতৃত্বের অধিনে সুসংহত করতে পারলে বাংলাদেশের বর্তমান অনেক সংকটের অবসান হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদিও তৎকালীন সরকার তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে বাড়তি সুবিধাদী দিয়ে হাত করার চেষ্টা করেছিলেন তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা তাদের সততা, দেশপ্রেম সামান্য প্রলোভনে কারো কাছে বিক্রি করে দেননি। তারা যে আশা-আকাংখা এবং স্বপ্ন নিয়ে জানবাজী রেখে একদিন দেশের স্বাধীনতার জন্য ঝাপিঁয়ে পড়েছিলেন সে স্বপ্ন আজো বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার বুকে তুষের আগুনের মতই জ্বলছে। দেশের মঙ্গলের জন্য সুযোগ পেলে আজো তারা বিশেষ অবদান রাখতে উদগ্রীব। তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আবার জনগণের সাথে সঙ্গবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন তারা। স্বাধীনতার মত সার্বিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেন স্বার্থপর জাতীয় বেঈমানদের পরাজিত করে। গড়ে তুলতে পারেন সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ। জাতিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন তাদের হারানো মর্যাদা ও গৌরব।

কারা এই মুক্তিযোদ্ধা? কি ছিল তাদের স্বপ্ন? কি হল তাদের পরিণাম? তাদের বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করা হয়েছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাঠকদের কাছে তুলে ধরবার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১৯৭১ সালে যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধ করেছিল তারা সবাই ছিলেন বাংলাদেশের খেটে খাওয়া জনগণের সন্তান। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের ছেলে-মেয়েরাই সেদিন দেশকে স্বাধীন

করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। এর পেছনে তাদের কোন হীন স্বার্থ ছিল না। ছিল একটি মাত্র স্বপ্ন। হানাদারদের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শোষণহীন আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ। তাদের এ গভীর দেশপ্রেমই ছিল তাদের ত্যাগের উৎস। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ তাদের সেই নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও প্রচন্ড সাহসের ইতিহাস। তাদের সেই বীরত্ব ও ত্যাগের ফলেই স্বাধীন হল বাংলাদেশ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী মানুষের ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাঙ্খিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল না স্বাধীন বাংলাদেশে। অথচ তখনকার নেতৃত্ব যদি তাদের বিশ্বাস করে তাদের দুর্বার কর্মক্ষমতা ও আত্মত্যাগের অঙ্গীকারকে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে কাজে লাগাতে চাইতেন তবে তারা নিশ্চয়ই অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারতেন। কিন্তু তেমনটি হয়নি। তখনকার সরকার যে শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের অবিশ্বাসই করেছিল তা নয়; তাদের উপর চালানো হল নির্যাতনের ষ্টিমরোলার। একটি সশস্ত্র সংগ্রামের বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল বাংলাদেশ, নব চেতনায় জন্ম নিল একটি জাতি। কিন্তু মাত্র স্বল্প সময়ের ব্যবধানে জাতির ভাগ্যে নেমে এল চরম বিপর্যয়। দারিদ্র, হতাশা, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, নীতিহীনতা, আদর্শের পরাজয় এবং মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অবজ্ঞা এবং লাঞ্ছনা। পৃথিবীর ইতিহাসে মুক্তিকামী মানুষের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও রক্তদানের প্রতি এমন অবমাননা এবং অসম্মান বোধ হয় অন্য কোথাও দেখানো হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সর্বস্তরের জনগণ যুদ্ধ করল তবুও ঘৃণ্য অতীতই আবার ফিরে এল। মানুষের কাম্য জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হল না। জাতীয় পর্যায়ে বেঈমান ও শোষকের দলই ক্রমে দেশের কর্ণধার হয়ে বসল।

মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ করে তাকেই বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তি বলতে শুধুমাত্র ভৌগলিক স্বাধীনতা বোঝায় না। মুক্তি বলতে বোঝায়- সেই সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ তার সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে আপন গর্বে, দাস বা ভিক্ষুকের মত নয়। মানুষ তখনই প্রকৃত অর্থে মুক্ত হয় যখন সে তার মেধা, প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতা প্রকাশের সমান অধিকার লাভ করে। সুযোগ পায় তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা প্রকাশের এবং নিজ প্রজ্ঞা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তার ভাগ্যের উন্নতি করার। আর্থিক ও সামাজিক অধিকারে বৈষম্য থাকলে মানুষ মুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। যে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে, দু'বেলা ভাত পায় না, সে দেশের মানুষ মুক্ত কিংবা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে এ ধরণের উচ্চবাচ্য করা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেকেই বলেন, '৭১ এর যুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। আমি বলি ভারতীয় বাহিনী কেন তার সাথে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীও যদি যোগ দিত তাহলেও '৭১ এর যুদ্ধে তাদের পক্ষে পাকিস্তানকে পরাজিত করা সম্ভব হত না। কারণ জয় পরাজয়

নির্ভর করে জনগণের সমর্থনের উপর। অল্প কিছু লোক এবং গোষ্ঠি ব্যতিত পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণ মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছিল বলেই দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু এই জনগণকেই তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ সরকার।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করার হুকুম মোতাবেক সমস্ত অস্ত্র জমা নেবার পর দু/তিন দিনের নোটিশে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার হাতে ৫০ টাকা করে পথ খরচা দিয়ে খোদা হাফেজ জানায় আওয়ামী লীগ সরকার। সরকার অঙ্গীকার করল মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যারা এ সার্টিফিকেট পাবে তাদের পূর্ণবাসনের জন্য চেষ্টা করবে সরকার। পরবর্তিকালে এই সার্টিফিকেট সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ না করে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগের এমপি ও নেতাদের মাধ্যমে বিলি করা হয় তাদের পছন্দের লোকদের মাঝে। যদিও এদের অধিকাংশের সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক ছিল না। যুদ্ধাপরাধী এবং দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে মাফ করে দেয় আওয়ামী লীগ সরকার। ফলে অনেক রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনীর সদস্যরা নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে সার্টিফিকেট দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বনে ঘুরে বেড়াতে থাকে সমাজের সর্বত্র। দেশদ্রোহী এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের আওয়ামী সরকার ক্ষমা করেছিল মহত্ত্বের করণে নয় বরং অভিন্ন শ্রেণী স্বার্থে এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তাদের মদদ হাসিল করে নিজেদের হাত শক্তিশালী করতে। যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লাখ। কিন্তু ১২ থেকে ২০ লাখ সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ডজন মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে ১১জনই ভুয়াঁ। অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবমুর্তি নষ্ট করার জন্য এবং স্বাধীনতা বিরোধী দালাল চক্রকে পূনর্ঃবাসিত করার জন্যই এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। দেশে ভুয়াঁ মুক্তিযোদ্ধাদের ভীড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রাপ্য কৃতিত্ব ও স্বীকৃতি পাবার আগেই হারিয়ে যায়।

যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে হাতিয়ার নিয়ে নিলেও সরকার যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল তাদের নিরস্ত্র করা থেকে বিরত থাকে। উপরন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের ছত্রছায়ায় ঐ বাহিনীর সদস্যরা স্বাধীনতার পরমুহূর্ত থেকেই লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাজানী, হত্যা, লাইসেন্স পারমিটবাজীতে মেতে উঠে। ভারতীয় মারোয়াড়ীদের সাথে হাত মিলিয়ে চোরাচালানেও তারাই লিপ্ত হয়। কালোবাজারী এবং মজুতদারীদের এরাই প্রটেকশন দিয়ে রাখে। পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দলীয় লুটপাটও

করা হয় এই বিশেষ বাহিনীর যোগসাজসে। মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ভাঙ্গিয়ে ক্ষমতাসীন দলের সহযোগিতায় যারা সর্বপ্রকার অসামাজিক কাজ ও লুটপাট করেছিল তাদের পাপের বোঝা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের আজও টানতে হচ্ছে। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে বিনা কারণে প্রাণ দিতে হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে এখনো বিনা বিচারে কারাবন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে। সরকারের ক্ষমা প্রাপ্ত লেলিয়ে দেয়া দালালরা ছাড়া পাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে লাগে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। দালালরা সবাই ছিল যার যার নিজ এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি। স্থানীয় প্রশাসন, থানা ইত্যাদির উপর এদের প্রভাব ছিল অসীম। স্বাধীন দেশের নতুন সরকার প্রশাসনিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন না করায় তাদের প্রভাবেও কোন তারতম্য ঘটেনি ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন হয়ে উঠে সঙ্গীন ও দুঃর্বিষহ।

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে দেখা যায়, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে যে সমস্ত দেশ এবং জাতি স্বাধীন হয়েছে ঐ সমস্ত সদ্য স্বাধীন দেশে জাতীয় পুর্নঃগঠন প্রক্রিয়ায় মুক্তিযোদ্ধারাই অগ্রণী ভূমিকায় থেকেছেন। নীতি নির্ধারণ করা থেকে নীতি বাস্তবায়ন করার প্রতিটি ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ অবদান রেখেছেন জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। কিন্তু আমাদের বেলায় হল ঠিক তার বিপরীত। যে চেতনা ও সংকল্প একটা মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তুলে আমাদের ক্ষেত্রে তার অভাব ছিল গোড়া থেকেই। যুদ্ধের জন্য আমরা মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। যুদ্ধটা ছিল আমাদের উপর আরোপিত। '৭১ এর ২৫শে মার্চ রাতে পাক বাহিনীর আচমকা আক্রমণের আগ পর্যন্ত বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো এবং নেতারা সবাই রাজনৈতিক সমাধানের রাস্তাই খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিলেন। এর ফলে যে কোন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যথা:- সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত নীতি আদর্শ, সংগঠন, সামরিক প্রস্তুতি এবং বিচক্ষণ নেতৃত্ব এর প্রায় সবকয়টিই ছিল অনুপস্থিত। ফলে যে নেতার নামে সংগ্রাম তিনি শুরুতেই ধরা দেন শত্রুর হাতে। আর তার সহযোগিরা নিরস্ত্র জাতিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে আশ্রয় নেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও যে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল সেটা ছিল প্রধানত: আত্মরক্ষার তাগিদে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে। তবে যারা এ ধরণের প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের সাহস ও সংকল্প ছিল অকৃত্রিম। কিন্তু যুদ্ধটা যে আকস্মিক ছিল এবং সমগ্র জাতিকে সে আকস্মিক ঘটনার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে জড়িত হয়ে পড়তে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সূত্রহীন এই আকস্মিকতার একটা মহান যুদ্ধকে সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে নেবার জন্য যে রাজনৈতিক আদর্শের প্রয়োজন সে আদর্শ গড়ে উঠার সুযোগ আমরা পাইনি। যুদ্ধের নেতৃত্ব যারা কব্জা করে নেয় তাদেরও এটা কাম্য ছিল না। দেশের আপামর জনসাধারণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরোধিতা করার জন্যই আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ

হয়েছিল কিন্তু জনগণের সে আশা পূরণ করা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সেটা হত তাদের শ্রেণী স্বার্থের পরিপন্থী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতারণার শিকারে পরিণত হয় মূলতঃ একারণেই। কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধে সহায়তা করেছেন তারা লক্ষ্যহীন ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছেন তাদের বিপুল অংশই ছিলেন অরাজনৈতিক ব্যক্তি। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, মা-বোন ও দেশবাসীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধের আকাঙ্খাই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল যুদ্ধে যোগ দিতে। অবশ্য আত্মরক্ষার তাগিদেও অনেকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে বেশিরভাগ লোকই স্বেচ্ছায়, আত্মত্যাগের মহৎ মনোভাব নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন করা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার কিশোর-যুবক বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধ করে বিভিন্ন সেক্টরে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা তাদের কর্মীদের নিয়ে ভারতের সহায়তায় নিজেদের নিজস্ব বাহিনী গঠন করে তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে না পাঠিয়ে তাদের অতি সযত্নে সংরক্ষিত করে রাখে স্বাধীনতা উত্তরকালে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। প্রকৃতপক্ষে ন'মাসের আগাগোড়া যারা যুদ্ধ করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল অরাজনৈতিক সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়ে। তারা ছিল সরলমনা। তাই যুদ্ধ শেষে বিনা দ্বিধায় তারা তাদের অস্ত্র জমা দিয়ে দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশে অস্ত্রের দাপট, পারমিটবাজী, লুটতরাজ, হাইজ্যাক, গুম, খুন, ধর্ষণ ও অন্যান্য দুঃষ্কর্মে এসব নিবেদিত প্রাণ ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সামান্য। রাজনৈতিক চেতনার অভাবে শক্তি থাকা সত্ত্বেও এরা সংগঠিত হতে পারেননি। বাংলাদেশের বিশাল জনসমুদ্র থেকে এসে তারা আবার জনসমুদ্রেই মিশে যান। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে সুষম আর্থসামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করার মত শক্তি তাদের ছিল। এটা আঁচ করতে পেরেই আওয়ামী লীগ সরকার শংকিত হয়ে পড়ে এবং দেশে ফিরে প্রথমেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। একই সাথে সুখী ভবিষ্যতের কথা বলে তাদেরকে ভাওতা দেয়। এভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ের পর যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পুর্নগঠনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং সেই সঙ্গে সূর্য্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সমাজে সসম্মানে পূর্ণবাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ইস্কাটন লেডিস ক্লাবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংসদের আহ্বানে দ্রুত দেশের প্রতিটি থানায় এবং ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অঙ্গ সংগঠন গড়ে উঠে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে এই সংগঠনের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন হয় এবং ঐ অধিবেশনে একটি গঠনতন্ত্র এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হয়। এই কমিটির লক্ষ্য অর্জনের পথে

বাংলাদেশের তৎকালীন গণবিরোধী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন সরকার এবং ধোকাবাজীর রাজনীতির হাতছানি মারাত্মক অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। সরকারের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে কয়েকজন কাউন্সিল সদস্য সরকারি প্ররোচণায় সংসদের গঠনতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সংসদকে আওয়ামী সরকারের লেজুড়ে পরিণত করার উদ্যোগ নেন। জাতীয় নির্বাহী পরিষদের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া সত্ত্বেও নতুন নির্বাচনের বিধানকে আমল না দিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঐ চক্র এক কোরাম সভায় গঠনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে বৈধ জাতীয় নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি পরে ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের এক সভায় জনধিকৃত বাকশালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের যোগদানের কথা ঘোষণা করে। সংসদের আদর্শ জলাঞ্জলী দিয়ে সংসদের গঠনতন্ত্রের অবমাননার দায়ে জনাব নঈম জাহাঙ্গীর ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পচাঁত্তরের মার্চ মাসেই ঢাকা মুন্সেফ কোর্টে ঐ অবৈধ পরিষদ গঠনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। কোর্ট ইনজাংশন জারি করে অবৈধ পরিষদের গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। ফলে সংসদ বাকশালের রাহুগ্রাস থেকে সাময়িকভাবে বেঁচে যায়। ইনজাংশন জারি করলেও কোর্ট সরকারের রোষ এড়াবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মামলার রায় প্রদান স্থগিত রাখে।

পচাঁত্তরের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর পরিবর্তনকারী নেতৃত্বকে জনাব মাহ্ফুজুর রহমান (মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তৎকালীন সহ-সভাপতি) দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ হতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। বিপ্লবীদের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধারা আবার নতুন উদ্দামে সংসদকে পুর্নঃগঠন করার কাজ শুরু করেন। সেপ্টেম্বরে কোর্ট সেই মামলার রায় নিরঙ্কুশভাবে বাদীপক্ষের স্বপক্ষে দান করে। গঠনতন্ত্র অবমাননাকারীরা পরাস্ত হয়। দেশের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ৪ঠা অক্টোবর ঢাকায় পুরনো বৈধ জাতীয় নির্বাহী পরিষদের এক পূর্ণাঙ্গ সভা লেখকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভার বিবরণী লিখতে গিয়ে জনাব নঈম জাহাঙ্গীর বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ, সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি (এডহক) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তার প্রতিবেদন 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-এ লেখেন, "পচাঁত্তরের ১৫ই আগষ্ট সেনা বাহিনী সরকারকে উৎখাত করে। জনাব মাহ্ফুজুর রহমান (তৎকালীন সহ-সভাপতি এবং আহ্বায়ক) দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ হতে সেনা বাহিনীকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। আমরা উদ্যোগী হয়ে উঠি সংসদকে পুনর্গঠিত করতে। কোর্ট সেপ্টেম্বরে নিরঙ্কুশভাবে আমাদের পক্ষে রায় দেয়। গঠনতন্ত্র অবমাননার অভিযোগে ওরা অভিযুক্ত হয়। ১৫ই আগষ্টে দেশের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে ৪ঠা অক্টোবর ঢাকায় পূর্বতন বৈধ জাতীয় নির্বাহী পরিষদের এক পূর্ণাঙ্গ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিগত আড়াই বৎসরেরও অধিক সময়ের কুকীর্তি ও ধোকাবাজীর

বিস্তারিত ফিরিস্তি তুলে ধরে অবৈধ পরিষদের ১২০জন সাংসদের প্রাথমিক সদস্যপদ বাতিল করার আহ্বান জানিয়ে অবৈধ পরিষদের বিরুদ্ধে জনাব মাহ্ফুজুর রহমান এক অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার সেই প্রস্তাব উপস্থিত সকল সদস্যের একচেটিয়া সমর্থনে পাশ হয়। ঐ একই সভায় অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংসদদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ১১সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় নির্বাহী পরিষদ (এডহক) নিবার্চিত করা হয়। জাতীয় নির্বাহী পরিষদ (এডহক) কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে :-

১। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন করে সরকারি গেজেটে তালিকা প্রকাশ করা।

২। স্বাধীনতা যুদ্ধে আহত পঙ্গু যোদ্ধাদের নামের তালিকা প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে তাদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

৩। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৃত শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা।

৪। দেশের বিভিন্ন জেলে আটককৃত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং হুলিয়া বা গ্রেফতারী পরোয়ানাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা প্রণয়ন করে যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে নির্দোষ মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তির এবং হুলিয়া বা গ্রেফতারী পরোয়ানা উঠিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা।

৫। পঙ্গু ও বেকার মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীয় যোগ্যতানুসারে সমাজে সসম্মানে পূর্ণবাসনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শহীদ পরিবারের পূর্ণবাসনের নিশ্চয়তা বিধান করা।

৬। স্বাধীনতার কৃতি সন্তান হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ জাতীয় মানের পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭। মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় তথ্যাবলী, স্মৃতিচিহ্ন, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

জনাব ফতেহ আলী চৌধুরী তার লেখা 'মুক্তিযোদ্ধা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে লেখেন, "নয় মাস জীবনপণ যুদ্ধের পর যখন একজন যোদ্ধা চারিদিকে তাকালো, দেখলো নয় মাসের স্বপ্নের সঙ্গে মিলছে না। সবাই নিজের পদ নিয়ে ব্যস্ত। দেশপ্রেমের প্রতিযোগিতা চলছে! পদ নির্ধারিত হচ্ছে! আর একজন যোদ্ধার জন্য লিখিত প্রথম সরকারি ঘোষণা- 'তোমার অস্ত্র জমা দাও। অস্ত্র জমা যে না দিবে সে দেশের শত্রু।' দেশের মাটিতে তখন রয়েছে বিদেশী সৈন্য। বিদেশী সৈনিকদের তত্ত্বাবধানে অস্ত্র জমা নেয়া হল। বিদেশী মটরবহর দেশী সহযোগিদের সহায়তায় সীমান্ত পার করল এদেশের সম্পদ।

নারায়ণগঞ্জ রোডে সম্পদ হরণকারী বহরের উপর আক্রমণ চালায় কয়েকজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল দেশের অন্যান্য জায়গাতেও। পরে তাদের বলা হয় উস্কানিদাতা। দেশমাতৃকার জন্য আত্ম উৎসর্গকারী বীর সন্তানদের অস্ত্রহীন করে ওরা নিয়ে গিয়েছে যা নেয়া সম্ভব। আর তৈরি করে রেখে গিয়েছিল কিছু প্রাইভেট বাহিনী; যারা খোলাখুলিভাবে অস্ত্র নিয়ে ঘুরতো লুটতরাজ করতো; কাঁরো কিছু বলার ছিল না। তারা ধর্ষণ করে ছাড়া পেতো, ব্যাংক ডাকাতি করে ছাড়া পেতো। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চাকুরীর ৩০% নির্ধারণ করে জনগণের বৃহৎ অংশ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করা হল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি সামরিক বাহিনীতেও একইভাবে দেয়া হল দুই বৎসরের সিনিয়রিটি। উদ্দেশ্য সরকারি কাঠামোর বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টি করে জাতিকে দুর্বল করে তোলা। যুদ্ধ শেষে দালালরা যোগ দেয় ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে আজও, অথবা রয়েছে জেলে বন্দী।"

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি লেখেন, "দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। জনগণ এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে। বার বার আমাদের সীমান্তের ঘাটিগুলোতে আঘাত হানছে বিদেশী সৈন্যরা। দেশের ভেতর পাঠানো হচ্ছে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের। দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে তারা নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। আমাদের সেনা বাহিনীর বীর জোয়ানরা শত্রুর প্রতিটি হামলাকে পর্যদুস্ত করে দিচ্ছেন। তারা আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে চলেছেন গভীর দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে। '৭১ এর দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ ও জাতির এই সংকট মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। সাড়ে তিন বছরের বঞ্চনা, শোষণ ও হতাশার দিনগুলোকে চিরদিনের মত কবর দেয়ার জন্য গড়ে তুলতে হবে দুর্বার জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় প্রতিরোধ। সংগ্রাম করতে হবে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে বজায় রেখে বৃহৎ জনগোষ্ঠির কল্যাণ সম্ভব নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। এখনও প্রতিনিয়ত শোষক আর শোষিতের ব্যবধান বাড়ছে। সমস্ত দেশে লুটপাট করে যাচ্ছে অল্প কিছু মাস্তান, টাউট, ফড়িয়া এবং ক্ষমতাসীন শোষক শ্রেণী। অন্যদিকে মেহনতী সাধারণ জনগণ দিন দিন দুর্ভোগের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। দুর্বিষহ হয়ে উঠছে তাদের জীবন। ঐতিহাসিকভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের আজ রাজনৈতিকভাবে সঙ্গবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ যে স্বপ্ন-আকাঙ্খা নিয়ে তারা একদিন অস্ত্র ধরেছিল তার সাথে রাজনীতি জড়িত। রাজনৈতিক কারণেই স্বাধীনতা লাভ করেছে বাংলাদেশ।"

সাদামাটা ভাবে বলতে গেলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাচাঁর সংগ্রাম, সামাজিক অধিকার, জীবিকার প্রশ্ন, অর্থনৈতিক মুক্তি, ব্যক্তি হিসেবে নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব এসমস্ত কিছুর হিসাব-নিকাশই রাজনীতি। তাই জন্মের পর থেকেই প্রতিটি মানুষই রাজনৈতিক চেতনায় পরিচালিত। এ অবস্থায় নিজেকে অরাজনৈতিক বলে দাবি করা নিজেকে অজান্তে প্রতারণা করারই সামিল।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক চিন্তা-চেতনা তাকে অবশ্যই করতে হয়। এবং রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সমাজ সর্ম্পকে কোন চিন্তা চেতনাই ফলপ্রসু নয়। দেশপ্রেমিক সচেতন মুক্তিযোদ্ধাদের আজ দেশ ও দেশবাসীর শত্রু মিত্রকে চিনতে হবে। অধিকারহারা বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে যেতে হবে অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে। '৭১ এর মত এ সংগ্রামেও জিতবে জনগণ। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ সে বিজয়কে ত্বরান্বিত করবে। নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, কর্মউদ্দোম, প্রজ্ঞাকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন শেখ মুজিব। তাদের শক্তি এবং উদ্দোমকে দেশ পুর্নগঠনের কাজে না লাগিয়ে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেন তিনি। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের ভারত তোষণ নীতি, ২৫ বছর মেয়াদের মৈত্রী চুক্তির নামে দাসখত লিখে দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অবমাননা, আওয়ামী লীগ নেতা, পাতি নেতাদের দুর্নীতি, অবাধ চোরাচালান, রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি বিভিন্ন বাহিনীর অত্যাচার নিপীড়ন, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের নামে জাতীয়করণ নীতির ফলে সৃষ্ট চরম নৈরাজ্য, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়া এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের বৃহৎ অংশ যখন সরকার বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠে তখন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ সরকারের দুঃশাসনের হাতিয়ার না হয়ে জনগণের সংগ্রামের প্রতিই সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেন। কেন এই ব্যতিক্রম? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আধুনিক কালে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে সামরিক বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তার বিশ্লেষন প্রয়োজন।

এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশের প্রায় সব দেশই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো অস্ত্রবলে দখল করে নেয়। দখল করে নেবার পর ঔপনিবেশিক প্রভুরা প্রতিটি দেশে জাতীয় শোষক শ্রেণীর যোগসাজসে গড়ে তোলে দু'টো প্রশাসনিক হাতিয়ার, সেনা বাহিনী এবং আমলাতন্ত্র। নিজেদেরকে জনগণের প্রত্যক্ষ শোষক হিসেবে প্রতিপন্ন না করার এক অপূর্ব ব্যবস্থা। 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা' তোলার এ কৌশল

গ্রহণ করে জাতীয় শোষক শ্রেণীকে যৎসামান্য সুখ-সুবিধা দিয়ে জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ তারা নিয়ে যায় নিজেদের দেশে। জাতীয় শোষক শ্রেণীকে বশীভূত করে তাদের বিদেশী ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের আকৃষ্ট করতেও সমর্থ হয় ঔপনিবেশিক প্রভুরা প্রগতি ও মানবতাবাদের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। বিজাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে জনগণের মাঝে। তারা মনে করে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেই তাদের দাসত্ব ঘুচে যাবে। দেশের উন্নতি হবে এবং জীবনের মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। তারই ফলে শুরু হয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। সংগ্রামের প্রচন্ডতার মুখে এক পর্যায়ে প্রত্যক্ষ শোষণ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লে ঔপনিবেশিক শাসকরা পরোক্ষ শোষণের বন্দোবস্ত করে। জাতীয় উচ্চবিত্ত ও তাদের দোসরদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দান করে প্রতিটি দেশের উপর পরোক্ষভাবে তাদের শোষণ কায়েম রাখে। বিদেশী প্রভুদের জায়গায় নতুন দেশী প্রভুরা ক্ষমতায় আসীন হয়ে তাদের প্রভুদের শিক্ষা অনুযায়ী এবং প্রভুদের প্রতিষ্ঠিত সামরিক বাহিনী, শাসন ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রকে অটুট রেখে নিজেদের স্বার্থে জনগণের বিরুদ্ধে তাদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে থাকে। জাতীয় শোষক শ্রেণীর এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শুরু হয় জাতীয় শোষণ ও শাসন। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। দেশগুলো আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক সূত্রে অর্থনৈতিকভাবে জরাজীর্ণ এসমস্ত দেশগুলোর শাসনভার যারা গ্রহণ করে তাদের অযোগ্যতা, প্রশাসন চালানোর অনভিজ্ঞতা, লোভ-লালসা, কোন্দল এবং ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ায় পালাক্রমে ক্ষমতা হাতবদল হতে থাকে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত দলগুলোর মধ্যে। এই 'মেরি গো রাউন্ড' এর গোলক ধাধাঁয় আজও তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ ঘুরপাক খাচ্ছে। সামরিক বাহিনীই ক্ষমতায় থাকুক আর বেসামরিক রাজনৈতিক নেতারাই ক্ষমতায় থাকুক তাদের শিকড় একই শ্রেণীতে। তাই তাদের মধ্যে থাকে এক অটুট বন্ধন। তাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইকে রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে জাহির করার প্রচেষ্টা একটা প্রহসন মাত্র। জনগণকে বোকা বানানোর আরেকটি কায়দা। তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব যতই তীব্র হোক না কেন জনগণের বিরুদ্ধে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা নিজেদের বিবাদ ভুলে সব এক হয়ে যায়। এর ফলেই সম্ভব হয় সমঝোতার মাধ্যমে লোক দেখানো গণতন্ত্রের খেলা, দলবদলের ভেলকিবাজী। এই উদ্দেশ্যেই মুক্তিযুদ্ধের অস্বাভাবিক ইতি টানার সাথে সাথে ঔপনিবেশিক ছাচেঁ গড়া রাষ্ট্রযন্ত্রগুলো পুরোপুরি অক্ষুন্ন রাখার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্য

- বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সৃষ্টি ইতিহাস এবং চরিত্র ব্যতিক্রমধর্মী ছিল।
- পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সাথে করা হয় অবিচার।
- মুক্তিযোদ্ধাদের ২ বছরের সিনিয়রিটি দিয়ে সেনা বাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' নীতির প্রবর্তন করা হয় জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল করে রাখার অভিপ্রায়ে।
- শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি জনাব সাইদ হোসেনকে বানানো হল বেসামরিক প্রশাসনের একচ্ছত্র অধিপতি।
- সেনা বাহিনীর বিকল্প হিসাবেই গড়ে তোলা হয়েছিল রক্ষীবাহিনী।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত সবাইকে সামরিক বাহিনীতে পুনর্নিয়োগ করা হয়।
- জিয়াকে ডিঙ্গিয়ে শফিউল্লাকে বানানো হল আর্মি চীফ অফ ষ্টাফ।
- সরকারের এই সিদ্ধান্ত সেনা বাহিনীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- শেখ মুজিব আমাকে ডেকে পাঠালেন।
- কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে নিজেদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এলাকাধীন উদ্বাস্তু জনগণের পুর্ণবাসনে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আমরা।
- শেখ মুজিব জেনারেল শফিউল্লার মাধ্যমে এক আদেশ জারি করে আমাদের গণমুখী সব তৎপরতা বন্ধ করে দেন।

কিন্তু বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সৃষ্টি, ইতিহাস ও চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পাকিস্তান স্বাধীন করার সংগ্রামে পূর্ব বাংলার জনগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশ সৃষ্ট শাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণের যাতাকলে পিষতে থাকে। এরই ফলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। স্বৈরতন্ত্র বিরোধী জাতীয়তাবাদী এ সংগ্রামে গণতান্ত্রিক চেতনাও গড়ে উঠতে থাকে। সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল দেশ স্বাধীন করে গণতান্ত্রিক, জনগণের মৌলিক এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে স্বনির্ভর সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠিদের নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল তৎকালীন সেনা বাহিনী এবং প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বাঙ্গালী সদস্যদেরও। তাদের উপরও করা হয়েছিল অন্যায়-অবিচার। ফলে গোড়া থেকেই তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়ে এসেছেন জাতীয় সংগ্রামে। জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক সংগ্রামের চরম স্তরই ছিল '৭১ এর স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম। হানাদার বাহিনীর আচমকা হামলার মুখে যখন রাজনৈতিক নেতারা জাতিকে লক্ষ্যহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যান তখন ঔপনিবেশিক ছাঁচে গড়া সেনা বাহিনীরই এক জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সেনা অফিসার মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেনা বাহিনী, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও পুলিশ বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যরাই প্রথম বিদ্রোহ করেন এবং কৃষক, শ্রমিক, যুবক, ছাত্র, প্রশাসনিক আমলাদের একাংশ এবং জনগণের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয় দেশব্যাপী প্রতিরোধ সংগ্রাম। জনগণের সাথে সৈনিকদের চেতনা, আশা-আকাংখা এক হয়ে মিলে গিয়েছিল বলেই গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। পরবর্তিকালে নয় মাস জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তারা। শ্রেণী বিন্যাসের সব বাধাঁ ভেঙ্গে তারা নিজেদের পরিচয় কায়েম করেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন জনগণের সাথে এক হয়ে গিয়ে যুদ্ধ সংগঠিত করছিলেন তখন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের বেশিরভাগ সদস্য ভারতে পালিয়ে গিয়ে ভারতীয় সরকারের সহায়তায় তথাকথিত মুজিবনগর প্রবাসী সরকার গঠন করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একক নেতৃত্বের দাবিদার হয়ে বসেন। যুদ্ধক্ষেত্রে না যেয়ে অবস্থান নেন কোলকাতার ৫৮নং বালিগঞ্জ, ৮নং থিয়েটার রোড এবং ১৯নং সার্কাস এ্যাভেনিউতে। এভাবেই তারা নিজেদের ভারতীয় চক্রান্তের ক্রীড়ানকে পরিণত করেন। মুক্তিযোদ্ধারা চেয়েছিলেন তাদের আত্মত্যাগ, তিতিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তাদের সংগ্রাম আর তারই ফলে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে পরীক্ষিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব; যারা পরিচালিত করবে মুক্তি সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর তারা গড়ে তুলবে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ। কিন্তু ভারতীয় সেনা বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে মুক্তিযুদ্ধ সেই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারেনি। ফলে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন তাদের বদলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে গেল আওয়ামী লীগ সরকারের

হাতে। কিন্তু কোলকাতা নিবাসী প্রবাসী সরকার ভারতীয় ছত্রছায়ায় নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের সোলএজেন্ট বলে ঘোষণা করলেও তাদের চিন্তা-চেতনার সাথে মুক্তিযোদ্ধা এবং আপামর মুক্তিপাগল জনগণের চিন্তা-ভাবনার সাথে কোন মিল ছিল না। তাদের মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে কোন উপায়ে বাংলাদেশের ভৌগলিক স্বাধীনতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। এভাবেই গণবিচ্ছিন্ন এই সুযোগ সন্ধানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের এবং জনগণের মাঝে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সংগ্রামের প্রথমলগ্ন থেকেই। পরগাছা, স্বর্ণলতার মত অন্যের উপর নির্ভরশীল এ নেতৃত্বের দেউলিয়াপনার সুযোগ গ্রহণ করে দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহল নানাভাবে ইন্ধন যুগিয়ে এই দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রবাসী আওয়ামী সরকারের মাঝে সন্দেহ এবং ব্যবধান সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। এ সর্ম্পকে মেজর রফিকুল ইসলাম তার বই 'বাংলাদেশঃ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট' - এ লিখেছেন, "এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রথিতযশা রাজনীতিকরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শিক পটভূমি, চেতনা ও সংকল্প মুক্তিযুদ্ধকে অবধারিত করে তুলেছিল - সেই চেতনাকে সংগ্রামী জনতার মধ্যে সঞ্চারের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। এমনকি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে কোন প্রচারণাও ছিল না। এসব কারণেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পরাজয় হয়তো আজকে ইতিহাস সম্মত বলে প্রমাণিত হতে চলেছে।" তিনি আরো লেখেন, "একাত্তরের সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনগণের মহান সংগ্রাম প্রলম্বিত হলে নেতৃত্ব প্রগতিশীল মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে; যারা সচেতন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে যুদ্ধ শেষে তাদের ক্ষমতাবলে স্বাধীন বাংলাদেশের পরীক্ষিত জাতীয় নেতৃত্ব হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে; এই ভেবে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার আতংকিত হয়ে উঠে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙ্গালী সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশের পথে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে গণমুখী সেনা বাহিনী গড়ে তোলার বদলে তারা ভারতীয় নীল নকশায় সমর্থন দান করে, ফলে মুক্তিযুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি বাধাগ্রস্থ হয়।"

ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে চলে যাবার পর আমাদের তরফ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের জোর দাবি জানানো হয়েছিল সরকারের কাছে। এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সরকারি মহল থেকে জোর প্রচারণা চালানো হয়, "বাংলাদেশের মত শান্তিপ্রিয় দরিদ্র একটি দেশের জন্য সেনা বাহিনীর কি প্রয়োজন? বাংলাদেশের তিন দিক ঘিরে রয়েছে ভারত। বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সাথে রয়েছে মৈত্রী চুক্তি। সেখানে যুদ্ধ হবে কার সাথে? অন্য কোন তৃতীয় শক্তির পক্ষ থেকে আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর কোন হুমকি এলে চুক্তি অনুযায়ী বন্ধুরাষ্ট্রই আমাদের রক্ষা

করবে।" কি উদ্ভট যুক্তি!! আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী মিত্র বা শত্রু বলে কিছু নেই। সব সম্পর্কই পরিবর্তনশীল। তাছাড়া জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সুস্পষ্ট জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির অধিনে সম্পদের সংকুলান অনুযায়ী ধাপে ধাপে একটি সুসংগঠিত সামরিক বাহিনী আমাদের গড়ে তুলতে হবে নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই। সেই বাহিনীর দায়িত্ব হবে সমর্থ ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা। অনেক দর কষাকষির পর সরকার অনুমতি দিল সেনা বাহিনী গঠন করার। সিদ্ধান্ত নেয়া হল- মুক্তি বাহিনীর নিয়মিত বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হবে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর এবং যশোর সেনা নিবাসের পাচঁটি ব্রিগেড। এই ব্রিগেডগুলোকে পর্যায়ক্রমে গড়ে তোলা হবে পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন রূপে। একই সাথে নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর অবকাঠামোও গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

যেসব বাঙ্গালী সৈনিকরা ঔপনিবেশিক ধাচেঁ গড়া সেনা বাহিনীর কাঠামো ভেঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের আবার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হল। গড়ে তোলা হল পুরনো ধাচেঁর সশস্ত্র বাহিনী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে। কিন্তু বাংলাদেশের সেনা বাহিনীর সদস্যদের বেশিরভাগই তখন হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন। এই সচেনতার বিকাশ ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। তাই বিশ্বের অন্যান্য গতানুগতিকভাবে সৃষ্ট সেনা বাহিনীগুলোর ধাঁচে তাদের আবার সংগঠিত করলেও চারিত্রিকভাবে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মুক্তিযোদ্ধাদের বৃহৎ অংশই ছিলেন নিঃস্বার্থ অকুতোভয়, দেশপ্রেমিক। কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, স্পষ্ট বক্তা মুক্তিযোদ্ধারা কোন অন্যায়কে মেনে নেননি যুদ্ধের সময় থেকেই। সীমিত গন্ডির ভেতরে থেকেও তারা সব অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন: সুযোগ মত অন্যায়কে প্রতিহত করার চেষ্টাও করেছেন সাধ্যমত। তাই ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণায় এ ধরণের চরিত্রের সেনা বাহিনীকে জাতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ব্যারাকে আবদ্ধ রাখার চিন্তা-ভাবনা ছিল নেহায়েতই অবাস্তব। সেনা বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা সমাজ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতি জনগণের মত তারাও স্বাভাবিকভাবে ছিলেন সদা সচেতন। সেই কারণেই ঔপনিবেশিক ধ্যান ধারণায় সেনা সদস্যদের জাতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ব্যারাকে আবদ্ধ করে রাখার সরকারি প্রচেষ্টা ফলদায়ক হয়নি বাংলাদেশের সেনা বাহিনীর ক্ষেত্রে। জনগণ ও সেনা সদস্যদের মাঝে গড়ে উঠা দেশপ্রেমের অটুট বন্ধনের গভীরতা অনুধাবন করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন আওয়ামী-বাকশালী শাসকগোষ্ঠি। সৈনিকদের ব্যারাকে আবদ্ধ করে রাখলেও তাদের সিংহভাগই দেশের রাজনৈতিক গতিধারার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখে চলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কারণেই। শুধু বাইরেই তার প্রকাশ ছিল না। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পুরনো

ধাঁচের রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে পশ্চিমা শাসকদের স্থলাভিষিক্ত আওয়ামী লীগ সরকার দেশ শাসন করতে গিয়েও চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত সেনা বাহিনীর মধ্যেও বিক্ষোভ ধুঁমায়িত হয়ে উঠতে থাকে।

প্রশ্ন দেখা দিল পাকিস্তানে আটক অবস্থায় থাকা ৩০,০০০ বাঙ্গালী সৈনিকদের কি করা হবে। যদিও তারা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তবুও তাদের বেশিরভাগই ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং বাংলাদেশের প্রতি অনুগত এবং সমর্থক। তাই তাদের দেশে ফিরে আসার পর পূর্ণমর্যাদায় নিয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত হবে ফলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বললেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের সেনা বাহিনীতে থাকবে শুধু মুক্তিযোদ্ধারাই। যুদ্ধবন্দীরা দেশে ফিরে এলে সামরিক বাহিনীর বিধান অনুযায়ী তাদের সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে বেসামরিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করা উচিত।" সরকার সিদ্ধান্ত নিল, "পাকিস্তান প্রত্যাগতদের সামরিক বাহিনীতেই নিয়োগ করা হবে।" একই সাথে সরকারি সিদ্ধান্তে বলা হল, "মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের সিনিয়রিটি দেয়া হবে পাকিস্তান প্রত্যাগতদের উপর।" এভাবেই সেনা বাহিনীর মধ্যে সুস্পষ্ট ফাটল সৃষ্টি করল আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের এ সুদূরপ্রসারী চক্রান্তে সমর্থন জানিয়েছিলেন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক উচ্চাভিলাষী এবং সুযোগ সন্ধানী সিনিয়র অফিসার। বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির প্রয়োগ করে যে চরম সর্বনাশা খেলা শুরু করেছিলেন শেখ মুজিবর রহমান তার খেসারত জাতি এবং সেনা বাহিনীকে চরমভাবে দিতে হয়েছে পরবর্তিকালে।

এছাড়া অন্যায়ভাবে কোন কারণ ছাড়াই মেজর জিয়াউর রহমানকে সুপারসিড করে মেজর শফিউল্লাহকে সেনা বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করে শেখ মুজিব সেনা বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেন। এভাবেই সেনা বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে জাতির মেরুদন্ড সেনা বাহিনীকে দুর্বল করে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন শেখ মুজিব। সামরিক বাহিনীতে বিভেদ নীতি প্রণয়ন করার সাথে সাথে বিএলএফ পরবর্তিকালে মুজিব বাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে সেনা বাহিনীর মোকাবেলায় তৈরি করা হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী। সেনা বাহিনী গঠন করার অনুমতি সরকার দিলেও সেনা বাহিনীকে গড়ে তোলার তেমন কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা সরকারিভাবে নেয়া হয়নি মুজিব আমলে। পক্ষান্তরে রক্ষীবাহিনীকে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ভারতীয় সহযোগিতায়। রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছিল ভারতীয় সেনা বাহিনীর উপর। তাদের পোষাকও ছিল ভারতীয় সেনা বাহিনীর পোষাকের মতো। ভারত সরবরাহ

করে তাদের গাড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, রসদপত্র এবং আনুসাঙ্গিক সমস্ত কিছু। এদের অফিসারদের প্রশিক্ষণ হত দেড়াদুনের ভারতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সৈনিকদের ভারতীয় বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ দিত ঢাকার অদূরে সাভারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত রক্ষীবাহিনী। সামরিক অধিনায়ক ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সদস্য কর্নেল নূরুজ্জামান। রক্ষীবাহিনী সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। জনসাধারণ ক্রমশঃ রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের যে কাউকে বিনা বিচারে বন্দী এবং হত্যা করার ক্ষমতা প্রদান: অপরাধীদের দেশের প্রচলিত আইনে বিচার না করে গোপনে হত্যা করার প্রচলন এবং আওয়ামী লীগ বিরোধীদের নির্বিচারে অত্যাচার নিপীড়নের ফলে আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের ভাবমুর্তি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া ভারতীয় বাহিনীর অনূরূপ জলপাই রং-এর পোষাক জনগণের মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। তাদের মনে ধারণা জন্মে, প্রয়োজনে মৈত্রী চুক্তির আওতায় আওয়ামী সরকার মতলব হাসিল করার জন্য যে কোন সময় রক্ষীবাহিনীর আবরণে ভারতীয় বাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরেও ডেকে নিয়ে আসতে পারে। উপযুক্ত কোন এক সময় বাংলাদেশ সেনা বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে সরকার রক্ষীবাহিনীকেই সেনা বাহিনী হিসেবে অধিষ্ঠিত করবে: এ ধরণের কথাও শোনা যাচ্ছিল সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ ধরণের বৈরী মনোভাবে এবং অবহেলায় সেনা বাহিনীর সদস্যরা মনঃক্ষুন্ন হন।

একইভাবে দেশের বেসামরিক প্রশাসনিক অবকাঠামোকে দুর্বল করে তোলার জন্য সেখানেও বিভেদ নীতির প্রবর্তন করা হয়। তাজুদ্দিন সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ভারতীয় আমলাদের সাহায্যে ঢেলে সাজাতে। কিন্তু তার সে প্রচেষ্টা বাঙ্গালী আমলাদের তীব্র বিরোধিতার ফলে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। পরিণামে বাংলাদেশের বেসামরিক আমলারাও মুজিব সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাননি। সেনা বাহিনীর সদস্যদের মত তাদেরও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে মুজিব সরকার। এভাবে জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দেশপ্রেমের যথার্থ মূল্যায়ন না করে তাদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। বেসামরিক প্রশাসনকে সর্ম্পূনরূপে দলীয় নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য আওয়ামী সরকার অভিজ্ঞ আমলাদের বাদ দিয়ে সে সমস্ত পদে দলীয় লোক নিয়োগের এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের দলীয় সমর্থকদের মাঝ থেকে প্রায় ৩০০ তরুণ যুবককে পাঠানো হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফেরার পর তাদের প্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ করা হয়।

এদের বলা হয় ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আইএমসস) ক্যাডার। এছাড়া পুরো বেসামরিক প্রশাসনের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেন শেখ মুজিবের বোনের জামাই জনাব সাইদ হোসেন। জনাব হোসেন ছিলেন একজন সেকশন অফিসার। রাতারাতি পদোন্নতি দিয়ে প্রশাসন পরিচালনার সব ক্ষমতাই অলিখিতভাবে তার হাতে সঁপে দেন শেখ মুজিব। শেখ মুজিবের সমর্থনপুষ্ট জনাব সাইদ হোসেন সমস্ত বেসমারিক প্রশাসন চালাতে থাকেন অঙ্গুলী হেলনে। ফলে আমলাতন্ত্রের মধ্যেও অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। এটাও ছিল নীল নকশা বাস্তবায়নেরই একটি সূক্ষ্ম চাল।

বাংলাদেশ সেনা বাহিনী গঠন পর্বের শুরুতে আমি কুমিল্লাতে পোষ্টেড হই। কর্নেল জিয়াউর রহমান ছিলেন আমাদের প্রথম ব্রিগেড কমান্ডার। কুমিল্লাতে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নতি লাভ করেন। জেনারেল ওসমানী তখনও আমাদের কমান্ডার-ইন-চীফ। তার হেডকোয়র্টার্স তখন ২৭নং মিন্টু রোডে। অল্প কিছুদিন পর সেনা বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। সাধারণ নিয়মে জেনারেল ওসমানীর পর ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকেই আর্মির সিনিয়র মোষ্ট অফিসার হিসেবে চীফ অফ আর্মি ষ্টাফ বানানো উচিত ছিল। কিন্তু অত্যান্ত অন্যায়ভাবে জিয়াউর রহমানকে তার ন্যায্য পদ থেকে বঞ্চিত করা হল। স্বাধীনতার ঘোষক হওয়ার ফলেই আওয়ামী লীগ সরকার তার প্রতি এ ধরণের অবমাননাকর আচরণ করে তার জুনিয়র ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহকে আর্মি চীফ অফ ষ্টাফ পদে নিযুক্ত করে। অস্বাভাবিক এ পদোন্নতির ফলে শফিউল্লাহ শেখ মুজিব ও তার সরকারের একান্ত বিশ্বস্ত এবং অনুগত তাবেদার হয়ে তাদের খেদমত করতে শুরু করে। আর্মির স্বার্থ ও নিয়ম জলাঞ্জলী দিয়ে শফিউল্লাহ শেখ মুজিব ও তার সরকারের ইচ্ছা ও স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। এর ফলেই মুজিব ভক্ত কয়েকজন অফিসারকে উত্তরোত্তর পদোন্নতি দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণ করা হল নিয়ম বর্হিভূতভাবে। মুজিব সরকারের এ সমস্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আর্মির তরুণ দেশপ্রেমিক অংশ সোচ্চার হয়ে উঠেন। আর্মির মধ্যে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে জানতে পেরে শেখ মুজিবর রহমান একদিন আমাকে ডেকে পাঠান।

পারিবারিক সূত্রে ঘনিষ্টতার কারণে তিনি খবরা-খবর নেয়ার জন্য প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন। বিশেষ প্রয়োজনে আমিও অবাধে ৩২নং ধানমন্ডিতে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম। যখনই আমি ও বাড়িতে গিয়েছি, সবসময় দেখেছি লোকের ভীড়; সবাই তাকে ঘিরে রাখছে। কিন্তু কম লোকজনকেই দেখেছি তার সামনে কোন প্রশ্নের সঠিক এবং সত্য জবাব দিতে। বেশিরভাগ লোকই তোষামোদ করে যা বললে তিনি খুশি হন সেটাই বলত। আশ্চর্য হতাম তাদের চাটুকারিতা এবং মোশায়েবীপনায়। দর্শনার্থীরা একথা সেকথার পর সুবিধামত নিজের ব্যক্তিগত কাজটি

বাগিয়ে নিয়ে কেটে পড়তেন। এটাই ছিল নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। তিনি আমাকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। মুজিব পরিবারের অন্য সবাইও আমাকে এবং আমার স্ত্রী নিম্মীকে খুবই ভালোবাসতো। পাকিস্তান থেকে ফেরার পর ১৯৭২ সালে আমাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে তিনি স্বপরিবারে উপস্থিত হয়ে আমাদের আর্শীবাদ করেছিলেন। সে অনুষ্ঠানই ছিল তার বাংলাদেশে আসার পর প্রথম কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি। পুরো মন্ত্রী পরিষদও উপস্থিত ছিলেন সে অনুষ্ঠানে। আমি ও আমার পরিবারবর্গ রাজনৈতিকভাবে তার দল ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার নীতিকে সমর্থন না করলেও তাকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। নিজের কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য আমি তার কাছে কখনোই যাইনি। যেতাম সত্যকে তার কাছে তুলে ধরার জন্য। ভাবতাম, সবাই যেখানে চামচাগিরী করছে সেখানে সাহস করে সত্যকে তার সামনে তুলে ধরলে তিনি নিশ্চয়ই তা অনুধাবন করতে পারবেন এবং এতে করে তার দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করতে তার সুবিধা হবে। তার রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটবে।

৩২নং ধানমন্ডিতে গিয়েই তার সাথে দেখা করলাম। তিনি জানতে চাইলেন শফিউল্লাহকে সেনা প্রধান বানানোর সিদ্ধান্তের ফলে সেনা বাহিনীতে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে? আমি পরিষ্কারভাবে তাকে জানালাম- তার এ সিদ্ধান্ত সেনা বাহিনীতে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আমি তাকে বলেছিলাম অন্যায়ভাবে ব্রিগেডিয়ার জিয়াকে তার ন্যায্য পদে নিয়োগ না করে শেখ মুজিব অত্যন্ত ভুল করেছেন। কারণ এ সিদ্ধান্তে শুধু যে প্রচন্ড বিক্ষোভই সেনা বাহিনীতে সৃষ্টি হয়েছে তা নয়; সরকার এবং সেনা বাহিনীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝিরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সবাই তাকেই একান্তভাবে দায়ী করেছে জিয়াউর রহমানের প্রতি এ অবিচার করার জন্য। ফলে তারই ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে সেনা বাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যদের কাছে। অবিলম্বে এ ভুলের সংশোধন হওয়া উচিত। আমার বক্তব্য শুনে শেখ মুজিব সেদিন বলেছিলেন, কর্নেল ওসমানীর পরামর্শ অনুযায়ীই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি। সিদ্ধান্ত বদলিয়ে এই মূহুর্তে শফিউল্লাহকে সরিয়ে জিয়াউর রহমানকে চীফ বানানো তার জন্য বিব্রতকর হয়ে দাড়াবে। তিনি এ জবাব দিয়েছিলেন তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে। তবে তিনি কথা দিয়েছিলেন কিছুদিন পর জিয়াউর রহমানকে চীফ-অফ-ষ্টাফ বানানোর কথা তিনি পুনর্বিবেচনা করবেন। তার এ বক্তব্য অনেক কারণেই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবুও আমি তার প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যতদিন শফিউল্লাহ চীফ থাকেন ততদিন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে সাধারণ ব্রিগেড কমান্ডার কিংবা চীফ-অফ-ষ্টাফের পিএসও হিসাবে না রেখে উপপ্রধান হিসাবে নিয়োগ করলে সেনা বাহিনীতে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে সেটা অনেকাংশে কমে যাবে। জনাব মুজিব আমাকে কথা দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে তিনি চিন্ত

।-ভাবনা করে দেখবেন। তিনি আমাকে একইসাথে অনুরোধ করেছিলেন, তার এই অভিমত ব্যক্তিগতভাবে ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে জানাতে এবং সেনা বাহিনীর মধ্যে প্রচার করতে। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবের নির্দেশে আর্মিতে DCOS (ডেপুটি চীফ-অফ-ষ্টাফ) পদ সৃষ্টি করা হয় এবং মেজর জেনারেল হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে জিয়াউর রহমানকে সে পদে নিয়োগ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, যোগ্য চীফ-অফ-ষ্টাফ হিসাবে জনাব শফিউল্লাহর পদমর্যাদাও ছিল মেজর জেনারেল। আমাদের সবার প্রিয় জেনারেল জিয়াউর রহমানের চীফ-অফ-ষ্টাফ পদে উন্নতির যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন তার বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রইলাম আমরা। জিয়াউর রহমানের জায়গায় ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে পোষ্টেড হলেন আমার পূর্ব পরিচিত এবং সুহৃদ কর্নেল তাহের।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত সেনা বাহিনীতে অবকাঠামো গড়ে তোলা ছিল অত্যন্ত দূরূহ কাজ। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় কিছুই নেই তখন। নেই পর্যাপ্ত হাতিয়ার, ইকুইপ্টমেন্ট, পোশাক-পরিচ্ছদ, নেই টুপি, বুট, প্রয়োজনীয় রশদপত্র এবং প্রশিক্ষণের সরঞ্জাম। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে কুমিল্লায় সিদ্ধান্ত নিলাম যুদ্ধ বিদ্ধস্ত ক্যান্টনমেন্টকে বাসপযোগী করে গড়ে তোলার সাথে সাথে আমাদের অপারেশন এরিয়াতে গিয়ে পুর্নঃগঠন কাজে জনগণকে আমরা সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করব। রাস্তাঘাট মেরামত, ব্রিজ কালভার্ট ঠিক করা, বাড়ি-ঘর তৈরির কাজে সাহায্য করা হবে। হেলথ সার্ভিস, ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল কলেজগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি কাজে আমরা স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টায় সাহায্য করব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই আমাদের উদ্ধুদ্ধ করেছিল এ ধরণের উদ্যোগ নিতে। আমাদের এ উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিল জনগণ। এই ধরণের কর্মতৎপরতায় আমরা জনগণের মনে এই ধারণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, শোষণমূলক পাক বাহিনী এবং বাংলাদেশের সেনা বাহিনীর মধ্যে মূল্যবোধ ও চারিত্রিক ব্যাতিক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের সেনা বাহিনী জনগণের সেবায় নিবেদিত প্রাণ এবং দেশপ্রেমিক। জনগণকে শোষণ এবং নির্যাতন করার জন্য এ সেনা বাহিনীকে ব্যবহার করা যাবে না। সেনা বাহিনীর জনপ্রিয়তাই শুধু যে বেড়ে গিয়েছিল আমাদের তৎপরতায় তাই নয়; আমাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরশীলতা। আমাদের এ ধরণের গঠনমূলক তৎপরতার সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র। আমাদের সাফল্য এবং ইতিবাচক দিকগুলো অন্যান্য ফরমেশনের দেশপ্রেমিক সচেতন অংশের মাঝে অভূতপুর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। যার ফলে অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরাও এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ ধরণের গণমুখী ভূমিকা পালনের জন্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শাসকমহল এমনকি সেনা বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিও আতংকিত হয়ে উঠে। জনগণের সাথে সেনা বাহিনীর এ ধরণের সুসম্পর্ক এবং

বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে উঠাকে তারা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করে। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশ জুড়ে তখন ব্যাপক রিলিফ তৎপরতা চলছিল। রিলিফ বিতরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং কেন্দ্রিয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অসাধুতার কারণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনেরা রিলিফ পাচ্ছিলেন না। আমরা আমাদের অধিনস্ত এলাকায় রিলিফ বিতরণের ব্যাপারে সবরকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা ঠিকমত রিলিফ সামগ্রী পান। এতে বিশেষভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের স্বার্থে আঘাত লাগে ফলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে চটে যান। এরই ফলে পার্টি প্রধান শেখ মুজিব জেনারেল শফিউল্লাহর মাধ্যমে এক আদেশ জারি করে আমাদের গণমুখী সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করে দেন। আদেশের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে প্রচার চালানো হয়- সেনা বাহিনী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

সেনা পরিষদ এবং সেনা বাহিনীর স্বৈরশাসনের বিরোধিতা

- সেনা পরিষদ গঠিত হল।
- জনগণের প্রত্যাশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার সিদ্ধান্ত নেয় আওয়ামী লীগ সরকার।
- কুখ্যাত আত্রাই অপারেশন।
- এ্যান্টিস্মাগলিং অপারেশনকালে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সরকারি দলের আসল চরিত্র অনুধাবন করতে পারেন।
- সেনা বাহিনীর সফলতায় চোরাচালনের মাত্রা যখন কমে আসছিল তখন দলীয় চাপের মুখে শেখ মুজিব সেনা বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন।
- জনগণ এবং সেনা বাহিনী ঐ আদেশে হতাশ হয়ে পড়ে।
- কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ ছাপালেন।
- শেখ মুজিবের ক্ষমা প্রস্তাব প্রত্যাখান করে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সর্বহারা পার্টিতে তিনি যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন।
- কর্নেল তাহেরকে সেনা বাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে ড্রেজার অর্গানাইজেসনে নিয়োগ করা হল।
- গণবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন কর্নেল তাহের।
- স্বৈরাচার যখন খোলা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সব পথ বন্ধ করে দেয় তখনই রাজনীতিতে বেজে উঠে অস্ত্রের ঝনঝনানি।
- ১৯৭৩ এর এপ্রিল মাসে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং দুঃস্কৃতিকারী দমন অভিযানের জন্য সামরিক বাহিনীকে আবার তলব করতে বাধ্য হয় মুজিব সরকার।
- অপারেশনে ধরা পড়ল সরকারি দলের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা ও রুই-কাতলা।
- ক্রোধে ফেটে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দল।
- প্রধানমন্ত্রীর হুকুম তামিল করে আটককৃত দুঃস্কৃতিকারীদের প্রায় সবাইকেই ছেড়ে দিতে হল স্বয়ং জেনারেল শফিউল্লাকেই।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত সব অফিসারদের ইতিমধ্যে সেনা বাহিনীতে পুনর্বাসন করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানের বিশেষ আস্থাভাজন এ সমস্ত অফিসারদের একটি অংশ শেখ সাহেবের চোখ ও কান হিসাবে সেনা বাহিনীর উপর নজর রাখছিল। প্রভাবশালী এই মহলটির করুণা পেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ এগিয়ে নেবার জন্য তাদের দালালি করতে তখন অনেকেই নীতি বিসর্জন দিয়ে তাদের এজেন্ট হয়ে যান। এদের মাধ্যমে সেনা বাহিনীর সব খবরা-খবর শেখ মুজিবের কান অব্দি পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল।

সেই সময় এদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা কিছু তরুণ অফিসার উদ্যোগ নেই ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে সচেতন দেশপ্রেমিক ও সমমনা ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি অঘোষিত সংগঠন গড়ে তোলার। প্রতিষ্ঠিত হয় সেনা পরিষদ। সেনা পরিষদ সরকারের প্রতিটি নীতিও পদক্ষেপ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকত। প্রতিটি পদক্ষেপ এবং ইস্যুর চুলচেরা বিশ্লেষন করে জাতীয় পরিসরে এবং সামরিক বাহিনীর উপর এসমস্ত নীতি পদক্ষেপের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া কি হবে অথবা হতে পারে সে বিষয়ে অধিনস্ত সৈনিকদের বুঝিয়ে বলা হত সেনা পরিষদের তরফ থেকে। সৈনিকদের সচেতনতার মান বাড়িয়ে তোলার জন্যই এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম আমরা। সরকারি নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে দৃষ্টি রাখা ছাড়া দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করত সেনা পরিষদ। কি হচ্ছে, কি হওয়া উচিত, কি উচিত নয় বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করা হত সেনা পরিষদের ষ্টাডি সার্কেলগুলোতে। সবকিছুই করা হত অতি সর্তকতার সাথে, গোপনে। বেসামরিক আমলা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি মহলের দেশপ্রেমিক সচেতন সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন সূত্রে যোগাযোগ রক্ষা করে মত বিনিময় করতেন সেনা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরা। এমনকি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরের অনেকের সাথেও যোগাযোগ ছিল সেনা পরিষদের। আন্তরিকভাবে নিয়মিতভাবে খবরা-খবর আদান-প্রদান এবং খোলামেলা মত বিনিময়ের ফলে ক্ষেত্র বিশেষে অনেকের সাথে সেনা পরিষদের সদস্যদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে। সেনা বাহিনীর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সেনা পরিষদের সদস্যরা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। অনেকের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও গড়ে উঠে। আলোচনাকালে অনেকেই মত পোষণ করেন- জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জনগণকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে বাঁচাবার সংগ্রামে সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশকে অগ্রণী হয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব নিতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

তাদের এ ধরণের বক্তব্যের জবাবে সেনা পরিষদের তরফ থেকে বলা হত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য কিছু করণীয় থাকলে সে দায়িত্ব যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে পালন করতে প্রস্তুত রয়েছে সেনা পরিষদ তবে সেনা পরিষদের যে কোন ভূমিকাই হবে সহায়ক শক্তি হিসেবে সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে; নিজেদের ক্ষমতা দখলের জন্য নয়। তৃতীয় বিশ্বে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা কিংবা সামাজিক অস্থিরতার সুযোগে সেনা বাহিনীর ক্ষমতা দখল এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে কোন দেশেই গণতান্ত্রিক সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি; প্রতিষ্ঠিত হয়নি মানবিক অধিকার। একমাত্র সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব সার্বিক আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জন আর এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের। এটাই ছিল সেনা পরিষদের দৃঢ় বিশ্বাস।

১৯৭২ সালের শেষের দিকে হঠাৎ করে কর্নেল তাহেরকে কমান্ড থেকে সরিয়ে ঢাকায় হেডকোয়ার্টার্স এ বদলি করা হয়। কর্নেল তাহেরকে কমান্ড থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রধান কারণ ছিল তার নিখাদ দেশপ্রেম এবং গণমুখী চিন্তা-চেতনা। আমাদের উপরও নজর রাখা হচ্ছিল; সেই বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে গেল কর্নেল তাহেরের বদলির মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধে কর্নেল তাহের তার একটি পা হারান। বদলির কারণ হিসেবে খোঁড়া যুক্তি দেয়া হল তিনি পঙ্গু তাই ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে তাকে রাখা যায় না; তার জন্য ষ্টাফ পদই উপযুক্ত। মেজর জলিল ইতিমধ্যে বেকসুর খালাস পাবার পর সেনা বাহিনীর চাকুরী থেকে পদত্যাগ করে জাসদ গঠন করেছেন। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আওয়ামী লীগ সরকারের গণবিরোধী রূপ ক্রমশঃ প্রকাশ হয়ে পড়ছে তাদের বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রমে। অপশাসন ও শোষণের সীমাহীন নিষ্পেষনে জনগণের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির ফলে জীবনের নিরাপত্তার অভাব সমাজকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও অবাধ লুটপাট এবং চোরাচালানের ফলে বেঁচে থাকা হয়ে উঠছে দুঃর্বিষহ। সবকিছু মিলিয়ে দেশ এক চরম নৈরাজ্যে পরিণত হয়েছে আওয়ামী সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ব্যর্থতায়। সরকারি শোষণের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী ভারত থেকে ফিরেই সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। তার নেতৃত্বে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোও সরকার বিরোধী আন্দোলনে তৎপর হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিরোধী দলগুলো বলে যে, দেশ স্বাধীন হয়নি। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ভারতের প্রতি বিদ্বেষ জনগণের মনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী বাংলাদেশীদের আশা-আকাংখায় ভাটা পড়তে শুরু করে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ভারতের স্বার্থেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। দালাল আইন প্রত্যাহার এবং হাজার হাজার রাজাকার, আলবদর ও শান্তি কমিটির সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন শেখ মুজিবের মহানুভবতা বলে প্রচার করা হলেও আসলে দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ শক্তি হিসাবে এদের দাঁড় করানোর জন্যই এ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছিল। পরবর্তিকালে ধর্ম ব্যবসায়ীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন এবং সরকারি গুরুত্বপুর্ণ পদে তাদের বহাল করার জন্য শেখ মুজিবর রহমানই দায়ী। দেশদ্রোহিতায় অভিযুক্ত, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও বুদ্ধিজীবি নিধনের সাথে জড়িত অপরাধীদের দেশের প্রচলিত আইনে বিচার না করে তাদের ক্ষমা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন শেখ মুজিবর রহমান; জনগণের প্রত্যাশা জলাঞ্জলী দিয়ে।

দেশের সার্বিক অবস্থার দ্রুত অবনতির সাথে সাথে যেখানেই বিরোধী দলগুলো সরকার বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন সেখানেই চরম হিংস্রতায় হায়নার মত আওয়ামী সরকার তাদের উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিঁয়ে পড়ে তাদের সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা চালায়। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি জনাব ওহিদুর রহমান ও টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা আত্রাই, পাবনা, রাজবাড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় বেশ তৎপর হয়ে উঠে। শেখ মুজিব তাদের দমন করার জন্য তার বিশেষ প্রিয়ভাজন কর্নেল শাফায়াত জামিলকে (তৎকালীন রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার) হুকুম দিলেন তাদের নির্মূল করার জন্য। নেতার ব্যক্তিগত অনুকম্পা লাভের জন্য কর্নেল শাফায়াত জামিল অন্ধের মত আত্রাই অপারেশনে ঝাপিঁয়ে পড়লেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ঐ সমস্ত এলাকা থেকে সমর্থ ছেলে মেয়েদের ধরে এনে কোন রকম তদন্ত এবং বিচার ছাড়াই তাদের মেরে ফেলার এক জঘণ্য খেলায় মেতে উঠলেন তিনি। তার এই অন্যায় তৎপরতার বিরোধিতা করে তারই ব্রিগেড মেজর ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী। শাফায়াত জামিলকে ষ্টাফ অফিসার হিসাবে নূর বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, শেখ সাহেবের প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য থাকলেও এভাবে ব্যক্তি স্বার্থে নিষ্ঠুরের মত ছেলে মেয়েদের মেরে ফেলা অন্যায় এবং অযৌক্তিক। এ ধরণের পাশবিকতার জন্য নিজের বিবেকের কাছেই তিনি একদিন দায়ী হয়ে পড়বেন। অযুক্তিক এই হত্যাযজ্ঞের ভাগীদার হওয়া ক্যাপ্টেন নূরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্যাপ্টেন নূরের এ পরামর্শ সেদিন কর্নেল শাফায়াত জামিল গ্রহণ করেননি। ফলে ক্যাপ্টেন নূর বাধ্য হয়ে নিজের উদ্যোগেই হেডকোয়াটার্সে পোষ্টিং নিয়ে ঢাকায় চলে আসে। আত্রাই অপারেশনের সাফল্যের জন্য শেখ মুজিব পুরষ্কার স্বরূপ কর্নেল শাফায়াতকে পরে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেন। সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের বদলি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের অনুগত রাখার নীতি গ্রহণ করে মুজিব সরকার। এমনকি কৃতি ও জনপ্রিয় অনেক সামরিক অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এবং বিদেশের

দূতাবাসে নিয়োগ করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল আওয়ামী সরকার। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের আগে অবৈধ চোরাচালানের ফলে রিলিফ বিতরণের ক্ষেত্রে চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে সরকার চোরাচালান দমন করার জন্য সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করে। সেনা বাহিনীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এবং সদস্যরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চোরাচালান বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের আন্তরিকতা অল্পসময়ের মধ্যেই জনগণের মনে আশার সঞ্চার করে। এই অপারেশনের নাম ছিল 'অ্যান্টি স্ম্যাগলিং অপারেশন'। আমরা সমমনা সবাই সিদ্ধান্ত নেই যদিও তখনো আমরা সুগঠিত নই তবুও যেকোন ত্যাগের বিনিময়েই আমাদের দায়িত্ব পালন করে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাব। এ সুযোগের পূর্ণ সদ্বব্যবহার করতে হবে আমাদের। এই অপারেশন করার সময়ই তরুণ অফিসার এবং সৈনিকগণ ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ও টাউট বাটপারদের অসৎ চরিত্র এবং সম্পদ গড়ে তোলার লোভ-লালসার অভিলাষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সমর্থ হন। রাজনৈতিক নেতাও টাউটদের সঙ্গে তারা মুখোমুখি দ্বন্দ্বে আসার সুযোগ পান। আমরা অপারেশন কমান্ডার হিসাবে প্রতিজ্ঞা করি পেটের ক্ষুধার তাড়নায় যে ট্রাক ড্রাইভার কিংবা পোর্টার বোঝা বয়ে চোরাচালানের সামগ্রী বর্ডারের ওপারে নিয়ে যাচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের ধরেই ক্ষান্ত হব না, আমাদের প্রচেষ্টা হবে চোরাচালানের মূল ব্যক্তিদের জনসম্মুখে প্রকাশ করা। ক্ষমতাবলয়ের ঐ সমস্ত অসাধু রুই-কাতলাদের উম্মোচন করা: যারা পর্দার অন্তরালে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাতীয় সম্পদের চোরাচালানের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে জনগণের লাশের উপরে। অল্প সময়েই জানা গেল সব সীমান্তে চোরাচালানের মূলে রয়েছে ভারতের একটি প্রভাবশালী মারোয়াড়ী গোষ্ঠি এবং সরকারি দলের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী ও নেতারা। শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, স্বরাষ্টমন্ত্রী মনসুর আলী তদীয় পুত্র নাসিম, বন ও মৎস্য মন্ত্রী সেরনিয়াবাত তদীয় পুত্র হাসনাত। গাজী গোলাম মোস্তফা সরাসরিভাবে ঐ মারোয়াড়ী চক্রের সাথে জড়িত বলেও তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রে এবং সরেজমিনে তদন্তের ফলে। সব ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে আমরা তাদের চরিত্র এবং দুঃষ্কর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরতে থাকি জনগণের কাছে। অফিসার এবং সৈনিকরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এবং নেতারাই হচ্ছে দেশের দুর্গতির মূল উৎস। তাদেরই যোগসাজসে লুটেরারা দেশ ও জাতিকে দেউলিয়া করে তুলছে। সেনা পরিষদের প্রচারণা এবং সরকার সম্পর্কে সংগঠনের মূল্যায়নের সত্যতা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করার সুযোগ পান সেনা সদস্যরা। তারা বুঝতে পারেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই চাকুরী ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেনা পরিষদের নেতৃত্ব এবং সদস্যরা তাদের সচেতনতা বাড়াবার জন্য নির্বেদিত প্রাণ হয়েই সবকিছু করছিলেন। এর ফলে সেনা পরিষদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিল। এভাবেই সেনা বাহিনীতে সেনা পরিষদের ভাবমুর্তি এবং

জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অ্যান্টি স্ম্যাগলিং অপারেশন সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। এ থেকেই তৎকালীন সরকারের চরিত্র সম্পর্কে তারা ধারণা করতে পারবেন। দিনাজপুরের অপারেশন কমান্ডার একদিন ঢাকায় কন্ট্রোল রুমে খবর পাঠাল, চারজন মারোয়াড়ী স্ম্যাগলার আর্মির ভয়ে ঢাকায় গিয়ে জনাব মনসুর আলীর ছেলে নাসিমের সাহচর্যে তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মগোপন করে আছে। ঢাকায় সিদ্ধান্ত নেয়া হল, জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করে মারোয়াড়ীদের গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের হস্তক্ষেপে ঢাকার এরিয়া কমান্ডার জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত বাদ দিতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চাপের মুখেই আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে এ ধরণের হস্তক্ষেপ হয়েছিল। ঐ ঘটনার পর সরকার আর্মির তৎপরতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। অপারেশনের ফলে একদিকে সেনা বাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে সরকার ও তার দলের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ায় ক্ষমতাসীনরা বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই অবস্থায় কি করা উচিত সেটা ভেবে উভয় সংকটে পড়ল সরকার ও সরকারি দল। এই অবস্থাতেও দাতাগোষ্ঠির চাপে সরকার বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিল খাদ্যসামগ্রী দেশের সকল অঞ্চলে সময়মত পৌঁছে দেবার। সেনা বাহিনী শুরু করল 'অপারেশন ফুড'। এই অপারেশনেও অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে সেনা বাহিনী তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমে। এই অপারেশন আর্মির হাতে দেয়ায় ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয় সরকারি দলের মাঝে। কারণ তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিল প্রতিক্ষেত্রে। সব পর্যায়ে দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী এই সমস্ত অপারেশন বন্ধের জন্য প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হল প্রধানমন্ত্রীর উপর। তিনি দলীয় স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। এতে জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সেনা বাহিনী বাধ্য হয়ে ব্যারাকে ফিরে আসে। সরকার প্রধানের এ ধরণের পক্ষপাতিত্বের ফলে সেনা বাহিনীর সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে কর্নেল জিয়াউদ্দিন (ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার) অভিমত প্রকাশ করেন, "বর্তমান সরকারের অধিনে সামরিক বাহিনীতে থেকে জনগণের স্বার্থে কাজ করা সম্ভব নয়। সরাসরিভাবে সরকারের বিরোধিতা করাও সম্ভব নয়। তাই সরকারি অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের মাঝ থেকেই গড়ে তুলতে হবে দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম।" তার অভিব্যক্তিতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেলাম। তিনি সক্রিয় রাজনীতির কথা ভাবছেন। তার অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেনা পরিষদের মনোভাব ছিল তার বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিসম্পন্ন। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নেয়া সম্ভব জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে গতিশীলতা সৃষ্টি করেই। মূলতঃ এ দায়িত্ব পালনের ভার দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী দল ও নেতৃত্বের উপর। তবে আমরাও সেনা বাহিনীর ভেতরে অবস্থান

করেও জনগণের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারব যদি নিজেদের সংগঠিত করতে পারি।

১৯৭২ সালের গ্রীষ্মকালে সাপ্তাহিক হলিডে-তে কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এ নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি সরাসরি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। তিনি তার নিবন্ধে লেখেন, "Independence has become an agony for the people of this country. Stand on the street and you see purposeless, spiritless, lifeless faces going through the mechanics of life. Generally, after a liberation war, the new spirit carries through and the country builds itself out of nothing. In Bangladesh, the story is simply other way round. The whole of Bangladesh is either begging or singing sad songs or shouting without awareness. The hungry and poor are totally lost. The country is on the verge of falling into the abyss."

নির্ভিক এই মুক্তিযোদ্ধা এই নিবন্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পচিঁশ বছরের গোপন চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "We fought without him and won. If need be we will fight again without him."

শেখ মুজিবর রহমান সে সময় লন্ডনে গলব্লাডার অপারেশনের পর সুইজ্যারল্যান্ডের এক স্বাস্থ্যনিবাসে অবস্থান করছিলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে জানতে পেরে তড়িঘড়ি করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কষ্টের এবং ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করতে আবার প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে দ্বিধাবোধ করবেন না তারা। তার এই লেখা থেকে দেশবাসী প্রথম পরিষ্কারভাবে জানতে পারেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। প্রমাদ গুনলেন আর্মি চীফ শফিউল্লাহ। তিনি জিয়াউদ্দিনকে হাতে-পায়ে ধরে অনেক মিনতি করেছিলেন যেন শেখ সাহেব ফিরে এলে ছাপানো নিবন্ধের জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। কারণ শফিউল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ করে তরুণ ও ছাত্রসমাজ এবং সেনা বাহিনীতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেনা বাহিনীতে কোন প্রকার বিষ্ফোরন যাতে না ঘটে তার জন্যই মিনতি জ্যানিয়েছিলেন তিনি। শেখ মুজিব দেশে ফিরে বিষ্ফোরম্মুখ অবস্থার

গুরুত্ব উপলব্দি করতে পেরে জেনারেল শফিউল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন কি করে অবস্থার সামাল দেয়া যায়? শফিউল্লাহ শেখ সাহেবকে জানালেন, নিবন্ধ ছাপানোর পর কর্নেল জিয়াউদ্দিনের ভাবমুর্তি তরুণ অফিসার এবং জোয়ানদের মধ্যে আরো বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কর্নেল জিয়াউদ্দিনের প্রতি কোন কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হলে আর্মির মধ্যে আকষ্মিক বিষ্ফোরন ঘটে যেতে পারে। শেখ মুজিব তার মোড়লী বুদ্ধি দিয়ে ঠিক করলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে ডেকে কিছু বকাবকি করে তাকে দিয়ে কৌশলে মাফ চাইয়ে নেবেন। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলা হল জেনারেল সফিউল্লাহকে। গণভবনে জিয়াউদ্দিনকে নিয়ে এলেন শফিউল্লাহ। প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে স্যালুট করে দাড়াতেই গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব, "তুমি কোন সাহসে এ ধরণের নিবন্ধ ছাপালে? জানো, তোমার অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান? সামরিক বাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় এ ধরণের লেখা ছাপানো বেআইনী। আমি তোমাকে এ ধরণের গুরুতর অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তোমার বিশেষ অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের মত তোমাকে আমি মাফ করব যদি তুমি শফিউল্লাহকে লিখিতভাবে দাও যে, তুমি অন্যায় করেছ।" একনাগাড়ে বলে গেলেন শেখ মুজিব। সবকিছুই চুপ করে শুনলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিন। তিনি জবাব দিলেন, "শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী। আপনার দয়া-দাক্ষিণ্য আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি যা লিখেছি সেটা আমার বিশ্বাস। অতএব, ক্ষমা চাওয়ার কিংবা ক্ষমা পাওয়ার কোন অবকাশ নেই এখানে। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, চাকুরীতে থাকাকালীন অবস্থায় এ ধরণের লেখা ছাপানো অন্যায়। তাই আমি আমার কমিশনে ইস্তফা দিয়েই আমার নিবন্ধ ছেপেছি।" এভাবেই সেদিন শার্দুল সন্তান কর্নেল জিয়াউদ্দিন শেখ মুজিবকে স্তম্ভিত করে দিয়ে গণভবন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার বেরিয়ে আসার পর শফিউল্লাহকে শেখ মুজিব অনুরোধ করেছিলেন জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার জন্য। হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে এসে জেনারেল শফিউল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রমুখ অনেকেই কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। জিয়াউদ্দিন তাদের চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন তার শাণিত জবাব দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, নিজের আত্মার সাথে বেঈমানী করতে পারবেন না সামান্য চাকুরীর লোভে। তাছাড়া তাদের মত মেরুদন্ডহীন কমান্ডারদের অধিনে একই সংগঠনে তাদের অধিনস্ত হয়ে চাকুরী করে তিনি তার আত্মসম্মান খোয়াতে রাজি নন। এভাবেই সেনা বাহিনীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি পরে সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর অন্যায়ভাবে কর্নেল তাহেরকে সেনা বাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে ড্রেজার অর্গানাইজেশনের পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। এই নতুন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কর্নেল তাহের জাসদের সশস্ত্র গোপন সংগঠন 'গণবাহিনী' গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেনা বাহিনী থেকে তাকে বের করে দেবার পরও আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি কখনো। আমরা আমাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে একই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে থাকি। লক্ষ্য

একটাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন। গণতান্ত্রিক সুষম সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী এবং মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করা। আমাদের মাঝে আদর্শগত বন্ধন এত সুদৃঢ় ছিল যে, আমরা বিশ্বাস করতাম জাতীয় মুক্তির বৃহৎ স্বার্থে যেকোন ক্রান্তিলগ্নে আমরা সবাই এক হয়ে লড়তে পারব নির্দ্বিধায়।

১৯৭৩ সালে জাতীয় নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হল আওয়ামী লীগ। কিন্তু দেশের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। সার্বিক অবস্থার অবনতির গতি দ্রুততর হল মাত্র। মরিয়া হয়ে উঠলেন সরকার; রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার প্রচেষ্টায়। সরকারি দলের লক্ষ্যহীনতা ও নৈরাজ্যিক কার্যকলাপের মুখে বাংলাদেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করে বিরোধী দলগুলি এবং সামগ্রিকভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি নিক্ষিপ্ত হল এক সংকটময় পরিস্থতির মধ্যে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি শাসিত যে কোন দেশেই কোন বিশেষ একটি দল দেশের শাসনতন্ত্রকে দলীয় সম্পদ মনে করে না। সেখানে শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুগত দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল থাকে। ক্ষমতার হাত বদল হয় সে সমস্ত দলগুলোর মধ্যেই! জাতীয় স্বার্থের মৌলিক বিষয়ের প্রশ্নে তারা একে অপরের সহযোগিতা করে থাকে। এই সহযোগিতার ভিত্তিতেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে যেখানে সরকার নিজের স্বার্থের সাথে রাষ্ট্রের স্বার্থকে এক করে দেখেছে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশ মোটেই সম্ভব নয়। বিরোধী দলগুলো অনৈক্য এবং অন্যান্য কারণে আওয়ামী লীগের বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। তাদের উপর নিষ্পেষন চালিয়ে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে সেখানে বিরোধী দলগুলো ভবিষ্যতে কখনো পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগকেও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। যেভাবে সরকারি দল আইনের শাসনের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সব নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে উঠে-পড়ে লেগেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতেই দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বৈরাচার। স্বৈরাচার যখন খোলা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশের সব দরজা বন্ধ করে দেয় তখনই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে উঠে রাজনৈতিক গোপন তৎপরতা। রাজনীতিতে বেজে উঠে অস্ত্রের ঝনঝনানি। রাজনৈতিক বিরোধিতা রূপ নেয় সশস্ত্র সংগ্রামের।

১৯৭৩ সালের ১১ই নভেম্বর বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের ভাষণই এর বড় প্রমাণ। তিনি ঐ ভাষণে বলেন, "যারা রাতের বেলায় গোপনে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তাদের সঙ্গে ডাকাতদের

কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করতে পারে তাহলে আমাদেরও তাদের গুলি করে হত্যা করার অধিকার আছে।" (বঙ্গবার্তা ১২ই নভেম্বর ১৯৭৩) ইতিহাসের লিখন যে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অস্ত্রের জোরে বিরোধীদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেছেন তার পতনও ঘটেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্ত্রের মুখেই।

ঐ একই দিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মাওলানা ভাসানী রাজশাহীর এক জনসভায় বলেন, "সরকার যেভাবে বিরোধী দলীয় কর্মী হত্যা করা শুরু করেছে তার ফলে এ দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ বন্ধ হতে চলেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে কোন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। দমন নীতি এবং মানুষকে হত্যা করে দেশ শাসন করা যায় না। আইয়ূব খান-ইয়াহিয়া খানের পতন হয়েছে অতীতে: এ ধরণের দমন নীতি চলতে থাকলে এ সরকারের পতনও অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এবং বিরোধী দল ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক সরকার বেচে থাকতে পারে না।" (১২ই নভেম্বর ১৯৭৩) রাজনৈতিক কর্মী নিধনের ব্যাপারে জাসদের বক্তব্য ছিল একই রকম। সরকার এবং বিরোধী পক্ষের বক্তব্য থেকে যে জিনিষটা স্পষ্ট হয় তাহল আজকের বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পরিবেশ আছে সেটা কেউই স্বীকার করছেন না। উভয় পক্ষই একমত যে, দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে।

বাংলাদেশের শান্তি-শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে রক্ষা ও পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর বক্ত্যবের দু'টি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। প্রথমত: তিনি বিরোধী দলীয় কর্মীদের 'ডাকাত' বলে অভিহিত করছেন। দ্বিতীয়ত: সে সমস্ত ডাকাতদের গুলি করে হত্যা করার অধিকারও তার রয়েছে বলে দাবি করছেন। বিরোধী কর্মীদের চোর, ডাকাত, দেশদ্রোহী, ক্রিমিনাল আখ্যা দেয়ার রেওয়াজ সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৫০ সালে নূরুল আমীন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে 'ডাকাত দলের সরদার' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। রাজশাহীর 'ছাপড়া-ওয়ার্ডে' নাচল বিদ্রোহের রাজবন্দীদের গুলি করে মারা এবং ইলা মিত্রকে পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণকেও সরকার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে দাবি করেছিলেন। ১৯৭০ সালে যখন রাজবন্দীদের মুক্তির জোর দাবি উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানে তখন স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া খানও পূর্ব পাকিস্তানের সব রাজনীতিবিদদের 'ক্রিমিনাল' আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তাদের মুক্তির দাবি নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছিল নূরুল আমীন এবং ইয়াহিয়া খানের দোসররাই ছিল প্রকৃত ক্রিমিনাল। বিরোধী পক্ষকে চোর ,ডাকাত ইত্যাদি বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টার ফল কি দাড়ায় সেটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অজানা থাকার কথা

নয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে প্রচুর। কিন্তু দীর্ঘদিনের সেই শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমানের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে চোর-ডাকাত আখ্যা দিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ যে সুগম করছেন না সেটা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে দেশে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি বিরাজমান সে অবস্থায় সরকার এবং বিরোধী দলসমূহ যে দাবি করছে তাতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অবক্ষয় অবধারিত।

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে দেশের এক নাজুক পরিস্থিতিতে দিশেহারা মুজিব সরকার নেহায়েত অনোন্যপায় হয়ে আবার সেনা বাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং দুষ্কৃতিকারী দমন করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের জন্য তলব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কুমিল্লা সেনা নিবাসের ব্রিগেড কমান্ডার তখন কর্নেল নাজমুল হুদা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত ছিলেন কর্নেল হুদা। সেই সুবাদে কিংবা অন্য যেকোন কারণেই হোক শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ ভক্তি ছিল তার। তবে এ বিষয়ে সুশিক্ষিত কর্নেল হুদার মনে দ্বন্দ্বও ছিল যথেষ্ট। একই সাথে যুদ্ধ করেছি আমরা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাকে ভীষণ আপন করে নিয়েছিলেন। আমাদের সম্পর্ক এত নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে আমরা রাজনীতি নিয়ে অবাধে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করতাম। আমার স্পষ্টবাদিতায় অনেক সময় তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় বড় ভাইয়ের মত উপদেশ দিতেন বেফাঁস কথাবার্তা বলে আমি যাতে নিজেকে বিপদে না ফেলি। তার আন্তরিকতায় আমি তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতাম। অপারেশন অর্ডার আসার পর আমি হুদা ভাইকে একদিন বলেছিলাম '৭২ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তিনি নিজেও সে বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ঠিক করা হল চীফ অফ স্টাফকে অনুরোধ জানানো হবে যাতে তিনি সশরীরে কুমিল্লায় এসে অপারেশন সম্পর্কে সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বলেন। এতে করে আমরাও জানার সুযোগ পাবো এবার সরকারের উদ্দেশ্য কি? প্রধনমন্ত্রী কি এবার সত্যিই তার 'চাটার দল' ছেড়ে জনগণের কল্যাণ চান? এর জন্যই কি তিনি আমাদের সাহায্য চাইছেন? সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল শফিউল্লাহকে কর্নেল হুদা কুমিল্লায় আসার অনুরোধ জানালেন। এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কনফারেন্সে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "৭২ সালের মত সেনা বাহিনীকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে নাতো এবারও?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "This time 'BangaBandhu' means business. If even his dead father is found to be implicated in any crime then his body could be exhumed for trial. No exception this time whatsoever. This is what he told me personally and I have no reason to disbelieve him." খুবই ভালো কথা। শেখ মুজিব এবার সত্যিই চিনতে পেরেছেন তার সরকার ও দলকে। তিনি তাদের অন্যায়ের প্রতিকার

চান। এদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত অর্থে জননেতা হবার জন্য দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনীর সাহায্য চাইছেন তিনি। তার এই প্রচেষ্টায় অবশ্যই আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য করব সব ঝুঁকি হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে; সে কথাই দেয়া হয়েছিল জেনারেল শফিউল্লাকে। অপারেশনকে যেকোন মূল্যে সফল করে তুলবো আমরা। খুশি মনেই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। কুমিল্লা ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেয়া হল কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং সিলেটে অপারেশন পরিচালনার। আমাকে কর্নেল হুদা (হুদা ভাই) কুমিল্লা অপারেশনের দায়িত্ব দিলেন। সিলেট এবং নোয়াখালীর দায়িত্ব দেয়া হল মেজর হায়দার এবং মেজর রশিদকে। Combing Operation শুরু হল। সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্ট থেকে জানা গেল সব সেক্টরে আওয়ামী লীগ এবং দলের অঙ্গ সংগঠনগুলোর কাছেই রয়েছে বেশিরভাগ অবৈধ অস্ত্র। প্রভাবশালী নেতাদের ছত্রছায়াতেই নিরাপদে রয়েছে ঐসব অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা। তাতে কি? এবার মুজিব তার মরা বাপকেও ছাড়তে রাজি নন। আমরা যার যার এলাকায় সব প্রস্তুতি শেষে অপারেশন শুরু করলাম। সব জায়গায়ই খবর পাওয়া যাচ্ছিল এলাকার যত দাগী লোক, অবৈধ অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, খুনী, লুটেরাদের মাথা হল আওয়ামী লীগের নেতারা কিংবা নেতাদের পোষ্য মাস্তানরা। সব জায়গাতেই আবার আমাদের সরকারি দলের নেতারাও তাদের তৈরি সন্ত্রাসীদের নামের তালিকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তদন্তের ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাদের দেওয়া তালিকাভুক্ত লোকেরা প্রায়ই এলাকায় সৎ এবং নীতিবান বলে পরিচিত। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই সরকার বিরোধী রাজনীতির সাথে জড়িত কিংবা সমর্থক ছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হল দুঃস্কৃতিকারীদের ধরা সে যেই হোক না কেন; দল বিশেষের প্রতি আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। ধর-পাকড় করা হল অপরাধীদের স্থানীয় বেসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এবং প্রশাসনের সহায়তায়। যারা ধরা পড়েছিল তাদের বেশিরভাগই হোমরা-চোমরা চাঁই এবং নেতা-নেত্রীরা। সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগম থেকে কুমিল্লার জহিরুল কাইউম কেউই বাদ পড়লেন না। সিলেট, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল এবং দেশের অন্যান্য জায়গাতে আর্মির হাতে ধরা পড়ল শেখ নাছের, হাসনাত প্রমুখ অনেক নামী-দামী নেতারা। সব জায়গায় একই উপাখ্যান। এলাকার দুস্কৃতিকারীদের বেশিরভাগই সরকার ও সরকারি দলের লোকজন। এই অপারেশনের সময় সেনা বাহিনীর সদস্যরা সরাসরিভাবে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-পাতি নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। আর্মি অপারেশনের ফলে সারাদেশে চমক সৃষ্টি হল। লোকজন ভাবল শেখ মুজিব আর্মির সাহায্যে 'চাটার-দল' এর সন্ত্রাস ও দুর্নীতির হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। ফলে সবখানেই জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন আর্মি অপারেশনে সাহায্য করতে। কয়েকদিনের দেশব্যাপী অভিযানের ফলে সন্ত্রাস কমে

গেল অস্বাভাবিকভাবে। জনগণের মনে আশা ফিরে এল। দুঃশাসনের ফলে নির্জীব হয়ে পড়া জাতির মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হল। ধরা পড়া সবার বিরুদ্ধেই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হল। কারো ব্যাপারেই কোন ব্যতিক্রম করা হল না। যদিও বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল থেকে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকেও অনেকের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল অনবরত। কিন্তু আমরা আমাদের নীতিতে সবাই অটল। কারো ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার করা হবে না। আইন সবার জন্যই সমান। হঠাৎ সেনা সদর থেকে কয়েকজন আটক অপরাধীকে ছেড়ে দেবার জন্য নির্দেশ পাঠালেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কর্নেল হুদা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন কাউকে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ শুধুমাত্র আইনই এখন তাদের ভাগ্য নির্ধারন করতে পারে। আইনকে নিজের হাতে নেবার কোন অধিকার তার নেই। ব্রিগেড কমান্ডারের এই জবাব জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। কর্নেল হুদার কাছে ফোন এল প্রধানমন্ত্রীর। কর্নেল হুদা বিনীতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন প্রধানমন্ত্রী যেন তার রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েলকে পাঠিয়ে দেন চীফের সাথে সরেজমিনে অবস্থার তদন্ত করার জন্য। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে আর্মি কারো প্রতি কোন অবিচার কিংবা অন্যায় আচরণ করেছে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর যেকোন শাস্তিই তিনি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন Area Commander হিসাবে। প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন যখন আসে তখন দৈবক্রমে আমিও Control Room এ উপস্থিত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর ফোন তাই আমি রুম থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু কর্নেল হুদার নির্দেশেই রুমে থেকে যেতে হয়েছিল আমাকে। কর্নেল হুদার চারিত্রিক দৃঢ়তা সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। নেতার প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য এবং শেখ মুজিবের অতি বিশ্বাসভাজনদের একজন হয়েও কর্নেল হুদা (গুড্ডু ভাই) এ ধরণের জবাব প্রধানমন্ত্রীকে দেবেন সেটা সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন অতিসত্ত্বর তিনি লোক পাঠাচ্ছেন তদন্তের জন্য। সেদিনই হেলিকপ্টারে করে এসে পৌঁছালেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। জনাব তোফায়েলকে কিছুতেই তিনি সঙ্গে আনতে রাজি করাতে পারেননি। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ জনাব তোফায়েল কুমিল্লায় এলে সবকিছু বিস্তারিত জানার পর মাথা হেট করে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর থাকত না তার। জেনারেল জিয়ার আগমণের পর কুমিল্লাসহ অন্য সব জেলার শীর্ষ নেতাদের যারা তখনও বাইরে ছিলেন তাদের সবাইকে সেনা নিবাসে আমন্ত্রণ জানানো হল এক মধ্যাহ্ন ভোজে। ভোজপর্ব শেষে একে একে সব ধৃত ব্যক্তিদের কেন এবং কোন চার্জে ধরা হয়েছে; প্রমাণাদিসহ তার বিশদ বিবরণ দিলেন Operation Commander-রা। কেউ কোনকিছুর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। জেনারেল জিয়া কর্নেল হুদা এবং আমাকে সঙ্গে করে একই হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় সেনা সদরে ফিরে এলেন। সেখান থেকে জেনারেল শফিউল্লাহকে সঙ্গে করে আমরা গেলাম ৩২নং ধানমন্ডিতে শেখ সাহেবের সাথে দেখা

করতে। সেখানে পৌঁছে দেখি প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব তোফায়েল আহমদ আমাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকতেই কর্নেল হুদা এবং আমাকে দেখা মাত্র শেখ মুজিব গর্জে উঠলেন,

-কি পাইছস তোরা? আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশে আর কোন দুস্কৃতিকারী নাই? জাসদ, সর্বহারা পার্টির লোকজন তোদের চোখে পড়ে না? অবাক হয়ে গেলাম কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী! কর্নেল হুদা জবাব দিলেন,

-স্যার আমরা আপনার নির্দেশে অপারেশন করছি প্রকৃত দুস্কৃতিকারীদের ধরার জন্য। আমরা র্নিদলীয়। আমাদের কাছে সবাই সমান। বিভিন্ন এজেন্সীর দেয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং আমাদের নিজস্ব এজেন্সী দিয়ে ঐ সমস্ত রিপোর্ট ভেরিফাই করার পরই আমরা এ্যাকশন নিয়েছি। ধৃত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই যদি আওয়ামী লীগার হয় তাতে আমাদের দোষ কোথায়? কথা বাড়তে না দিয়ে জনাব তোফায়েল কয়েকজনের নাম করে তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিতে বললেন। তাকে সমর্থন করে আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বললেন,

-যা হবার তা হইছে। এখন এদের ছাড়ার বন্দোবস্ত কর। জবাবে আমি বললাম,

-ধরার বা ছাড়ার মালিক আমরা নই স্যার। চীফের মাধ্যমে আপনার নির্দেশই কার্যকরী করেছি আমরা। ধরার হুকুম দিয়েছিলেন আপনি; ছাড়ার মালিকও আপনি; তবে এ বিষয়ে আইন কি বলে সেটা আমার জানা নেই। ছেড়ে দেয়াটা যদি আইনসম্মত মনে করেন তবে হুকুম জারি করে আইন সংস্থাকে বলেন তাদের ছেড়ে দিতে। আমরা তাদের ছাড়বো কিভাবে? তারাতো এখন আমাদের অধিন নয়। সবাই এখন রয়েছে আইনের অধিনে। আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। আমার জবাব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেনারেল শফিউল্লাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন,

-বাজান! কিছু একটা কর নাইলে দেশে আওয়ামী লীগ একদম শ্যেষ হইয়া যাইবো। জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর 'বাজান' সম্বোধনে বিগলিত হয়ে দাড়িয়ে পড়ে প্রায় হাতজোড় করে বললেন,

-স্যার। আপনি অস্থির হবেন না। আমি অবশ্যই একটা কিছু করব। আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। কথাগুলো শেষ করে বসতেও ভুলে গিয়েছিলেন সেনা প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর ইশারায় আবার নিজের আসনে বসলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। আমরা সবাই নিশ্চুপ বসে থেকে তার মোসাহেবীপনার কৌতুক উপভোগ করছিলাম কিছুটা বিব্রত হয়ে। After all he is our Chief! ইতিমধ্যে জনাব তোফায়েল শেখ সাহেবের কানে কানে নীচুস্বরে কিছু বললেন। তার কান পড়ায় হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন,

-কুমিল্লার ক্যাপ্টেন হাই, ক্যাপ্টেন হুদা, লেফটেন্যান্ট তৈয়ব, সিলেটের লেফটেন্যান্ট জহির এর বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে হইবো। তারা বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। হুদা ভাইকে উদ্দেশ্য করেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন শেখ মুজিব।

-স্যার ওরা সব জুনিয়র Subordinate officer. ওরা যা করেছে সেটা আমার হুকুমেই করেছে। অত্যাচারের অভিযোগ সত্যি নয়। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তার পরেও যদি ওদের শাস্তি দিতে চান তবে সেটা সবার আগে আমারই প্রাপ্য। আমাকে ডিঙ্গিয়ে জুনিয়র অফিসারদের শাস্তি দিলে সেটা আমার জন্য অপমানকর হবে সেক্ষেত্রে কমান্ডার হিসাবে অধিনস্থ সব অফিসার এবং সৈনিকদের কাছে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। কর্নেল হুদার জবাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রস্তে উঠে দাড়ালেন তিনি এবং বললেন,

-ঠিক আছে। আইজ তোরা যা, ডালিম তুই রাইতে খাইয়া যাইস। আমাকে রেখে বাকি সবাই চলে গেলেন। শেখ সাহেব ও আমি বাড়ির অন্দর মহলে ঢুকলাম। রাত তখন প্রায় ১১টা। যথাযথ নিয়মে বারান্দায় খাওয়া পরিবেশন করা হল। খেতে খেতে শেখ সাহেব বললেন,

-তুই থাকতে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের এই দশা অইলো ক্যান?

-চাচা বিশ্বাস করেন: আমরা কোন দল দেখে অপারেশন করিনি। চীফ কুমিল্লায় এসে আমাদের বলেছিলেন এবার নাকি আপনি আপনার মরা বাপকেও ছাড়বেন না। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আপনি একবার কুমিল্লায় গিয়ে দেখেন লোকজন কি খুশী। সবাই মনে করছে এবার আপনি সত্যিই চাটার দল এবং টাউট বাটপারদের শায়েস্তা করতে চাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে নেতা হিসাবে জনগণের মনোভাবকেই তো আপনার প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমিতো মনে করি আমাদের এই অপারেশনের পর আপনার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এখন যেকোন কারণেই আপনি যদি এদের ছেড়ে দেন তবে কি আপনার লাভ হবে? আমারতো মনে হয় ক্ষতিই হবে আপনার। আপনার পরামর্শদাতারা যে যাই বলুক না কেন আমার মনে হয় বিনা বিচারে কাউকেই ছাড়া আপনার উচিত হবে না। এতে ব্যক্তিগতভাবে আপনিই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন সবচেয়ে বেশি।

-কিন্তু পার্টি ছাড়া আমি চলমু কেমনে ? প্রশ্ন করলেন শেখ সাহেব।

-পার্টি আপনার অবশ্যই প্রয়োজন। মনে করেন না কেন এটা একটা শুদ্ধি অভিযান। খারাপদের বাদ দিয়ে সৎ এবং ভালো মানুষদের নিয়েওতো পার্টি চালানো যায়। কিছু মনে করবেন না চাচা: চোর, বদমাইশ, সন্ত্রাসী, লুটেরা, টাউট-বাটপারদের নেতা হিসাবে পরিচিত হওয়াটাকি আপনার শোভা পায়? যারাই ধরা পড়ছে তাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগার। তার মানে বর্তমানে আপনার দলে ভালো লোকের

চেয়ে খারাপ লোকজনই বেশি। এদের বাদ দেন। দেখেন লোকজন কিভাবে আপনাকে সমর্থন জানায়। চুপ করে শুনছিলেন আমার কথা। মুখটা ছিল থমথমে। খাওয়ার পর পাইপ টানার অভ্যাস তার, পাইপটা টেবিলের উপর পরে থাকলেও আজ তিনি সেটা ধরাননি। চিন্তিত অবস্থায় হঠাৎ করে বলে উঠলেন,

-বাঙ্গালী জনগণরে খুব ভালো কইরা চিনি আমি।

বুঝলাম না তিনি এই উক্তিতে কি বোঝাতে চাইলেন। কিছুক্ষণ পর শোবার ঘরে উঠে চলে গেলেন শেখ সাহেব। ওখানে তার কোন আত্মীয় অপেক্ষা করছিলেন। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ কামাল এসে উপস্থিত।

-বস দিলেনতো আওয়ামী লীগ শেষ কইরা। কাজটা ভালো করেন নাই। উত্তর দিলাম,

-সব criminals and badelements যদি আওয়ামী লীগার হয় তার জন্য আমরা দায়ী না। সারা দিনের ধকলে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিলাম ৩২নম্বর থেকে। বাসায় ফিরে দেখি আব্বা আমার ফেরার অপেক্ষায় তখনও জেগে বসে আছেন। বুঝতে পারলাম কুমিল্লা থেকে নিম্মী ফোন করে আমার ঢাকায় আসার খবর বাসায় জানিয়েছে।

আব্বা জিজ্ঞেস করলেন কি হল? সবকিছুই খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বললেন, "তোরা কি ভেবেছিলি? শেখ মুজিব সত্যিই অপরাধীদের ধরার জন্য তোদের মাঠে নামিয়েছে? আমি ওকে ভালো করে চিনি। যখন এসএম হলে জিএস ছিলাম তখন একসাথে মুসলীম লীগের রাজনীতিও করেছি। ওর নীতি বলে কিছু নেই। সারাজীবন ক্লিকবাজী আর লাঠিবাজীর মাধ্যমে নিজের সুবিধা আদায় করে নিয়েছে সে। চরম সুবিধাবাদী চরিত্রের ধুরন্দর শেখ মুজিব। তোদের মাঠে নামিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চেয়েছিল শেখ মুজিব। একদিকে বর্তমানের তীব্র সরকার বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিশেষ করে জাসদ, সর্বহারা পার্টির সদস্যদের খতম করা অন্যদিকে সেনা বাহিনী এবং জনগণের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী অংশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে সেনা বাহিনীকে তার দলের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত করার জন্যই সে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তার চালকে বানচাল করে দিয়েছিস তোরা। দেখ এখন সে কি করে। তাদের নিয়েই আমার চিন্তা। I hope you and your other colleauges don't get victimised. আব্বার কথাগুলো শুনে জবাবে আমার কিছু বলার ছিল না। তার বক্তব্যের সত্যতা ভবিষ্যতেই প্রমাণ হতে পারে। আব্বা বুঝতে পেরেছিলেন আমি ভীষণ ক্লান্ত। তাই কথা না বাড়িয়ে বললেন, "কুমিল্লাতে একটা ফোন করে শুয়ে পড়। Don't over estimate Mujib, he is just an average man." আব্বার কথায় কিছুটা

চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে জেনারেল শফিউল্লাহ সেনা সদরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল হুদাকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। হুদা ভাই আমাকে বললেন, "Chief will go with us to Comilla to release all those people." ভীষণভাবে দমে গিয়েছিলাম এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে। হুদা ভাই ও ভীষণ Upset. ক্যাপ্টেন নূর জেনারেল জিয়ার ADC. তার কামরায় গিয়ে বললাম, বসের সাথে দেখা করতে চাই। নূরের মাধ্যমে খবরটা পেয়েই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনিও গম্ভীর। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, "Well I know every thing. Don't loose heart. Allah is there. You have done your duty sincerely so forget about the rest and be at ease." চীফের সাথে একই হেলিকপ্টারে ফিরে এলাম কুমিল্লায়। চীফ নিজে গিয়ে বন্দীদের মুক্তি দিলেন। আমাদের সামনেই ফুলের মালা গলায় পরিয়ে সমবেত আওয়ামী লীগাররা সদর্পে মিছিল করে চলে গেল শেখ মুজিবের জয়ধ্বনি করতে করতে। বিব্রতকর অবস্থায় intolerable humiliation সহ্য করে নিতে হয়েছিল আমাদের সকলকে। ঢাকায় ফেরার আগে জেনারেল শফিউল্লাহ আমাদের সারমন দিলেন, "Prime minister's desire is an order." এ ঘটনার ফলে সারাদেশে deployed আর্মির morale একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল শেখ মুজিব শীঘ্রই আর্মি অপারেশন বন্ধ করে দিচ্ছেন। এরপর আমরা নামে মাত্র অপারেশনে Deployed ছিলাম। আরোপিত দায়িত্ব পালনে কোন উৎসাহ ছিল না কারোই। কোনরকমে সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সামরিক বাহিনীকে দলীয়করণের প্রচেষ্টা

- জেনারেল জিয়াকে সেনা বাহিনী থেকে অপসারণের চক্রান্ত।
- চক্রান্ত সফল হল না।
- শেখ কামাল গর্বের সাথে দাবি করল সেই হবে বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী।
- লেডিস ক্লাবের বিয়ের আসর থেকে গাজি গোলাম মোস্তফা আমাদের গানপয়েন্টে কিড্‌ন্যাপ করে।
- সেনা সদরে চরম উত্তেজনা।
- প্রধানমন্ত্রীকে সেনা বাহিনীর তরফ থেকে ৩টি দাবি মেনে নেয়ার আলটিমেটাম দেবার জন্য বাধ্য করা হয় জেনারেল শফিউল্লাহ্‌কে।
- সময় চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।
- কোর্ট অফ ইনকোয়্যারির আদেশ জারি করলেন চীফ। ইনকোয়্যারি শেষে ফিরে এলাম কুমিল্লায়।
- পরিণামে ৮ জন সেনা অফিসারকে চাকুরি থেকে অবসর দেয়া হল PO-9 প্রয়োগের মাধ্যমে। মেজর নূর ও আমার নাম ছিল তালিকার শীর্ষে।
- এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে কর্নেল হুদা আমাকে নিয়ে ঢাকায় এলেন শেখ সাহেবের সাথে দেখা করতে।
- আমাকে আর কুমিল্লায় ফিরতে দেয়া হল না।

একদিন নূর ফোন করে জানাল- জেনারেল জিয়া অতি জরুরী প্রয়োজনে আমার সাথে দেখা করতে চান। ফোন পেয়েই এলাম ঢাকায়। নূর জানাল বস আমাকে বাসায় দেখা করতে বলেছেন। বুঝলাম বিশেষ জরুরী বিষয়ে আলাপ করতে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। জরুরী এবং গোপন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা সাধারণতঃ তার বাসাতেই হত। বাসায় গিয়েই দেখা করলাম। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে অনেক আলোচনার পর তিনি আসল কথাটা বললেন,

-I hear that I am going to be sent out from the army as Defence Attache to Burma soon, do you know anything about it?

-আকাশ থেকে পড়লাম! কি বলছেন জেনারেল জিয়া? শেখ মুজিবতো কথা দিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাকে চীফ বানাবেন: তাহলে? জবাব দিলাম,

-আমি কিছুই জানি না স্যার। তবে আপনার যাওয়া চলবে না। আপনাকে হারাতে চাই না আমরা।

-Well then try to do something. তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি চাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে আমি আলাপ করি।-অবশ্যই আমার সাধ্যমত যা করার সেটা আমি করব। প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করব আজই। বললাম আমি।

-I shall appreciate that. Do let me know the outcome of your meetting. I shall be waiting for your return.

-ঠিক আছে স্যার। বলে বেরিয়ে এসেছিলাম তার বাসা থেকে।

সেদিন রাতেই গিয়ে উপস্থিত হলাম ৩২নং ধানমন্ডিতে। নেতা তখনো বাড়ি ফেরেননি। রেহানা ও জামালের সাথে বসে গল্প-গুজব করছিলাম। জামাল জানাল সে স্যান্ডহার্টস না হয় যুগোস্লাভিয়ায় যাচ্ছে Army officer's course করার জন্য। শুনে বললাম, " ভালইতো; ক্যারিয়ার হিসাবে আর্মিকে যদি তোমার পছন্দ হয় তবে তো তোমার যাওয়াই উচিত।" আমরা যখন কথা বলছিলাম কামাল যেন কোথা থেকে বাসায় ফিরে এল। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল,

-বস কি ব্যাপার ?

-কোন ব্যাপার ছাড়া ৩২নং এ বুঝি কেউ আসে না? আমার পাল্টা প্রশ্নে ও একটু লজ্জা পেলো। তাড়াতাড়ি পরিবেশ হালকা করার জন্য বলল,

-না না তা ঠিক নয়। তবে বেশিরভাগ লোকজনদেরই কিছু না কিছু ব্যাপার থাকে; তবে ব্যতিক্রমও আছে যেমন আপনি। আপনি আসেন শুধু আব্বার সাথে ঝগড়া করতে।

-ঝগড়া করার অধিকার তার, ভালবাসার অধিকার যার। জবাবে বলেছিলাম আমি।

-তাতো অবশ্যই, সেটা কি আমরা বুঝি না। বাদ দেন এসব। একটা পরামর্শ দেনতো বস। বলল কামাল।

-কি বিষয়ে? জিজ্ঞেস করলাম।

-একটা স্কলারশীপ পাইছি ক্যানাডায় ল' পড়ার জন্য। ঠিক করতে পারতাছি না যামু কি যামু না।

-এটাতো অত্যন্ত সুখবর! যাবে না মানে? নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। জ্ঞান অর্জন করার জন্যতো চীন পর্যন্ত যেতে বলেছেন আমাদের প্রিয় নবী। মাত্র ৩-৪ বছরের ব্যাপার। সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আমি যদি এমন একটা সুযোগ পেতাম তবে খুশী হয়ে চলে যেতাম। আমার জবাব শুনে কামাল বলল,

-তাহলে যাওয়াই উচিত আপনার মতে?

-অবশ্যই যাওয়া উচিত। এরই মধ্যে বাড়ির কাজের ছেলেটা এসে জানাল কেউ এসেছে কামালের সাথে দেখা করতে তাই বিদায় নিয়ে কামাল চলে গেল। নেতা ফিরলেন বেশ রাতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ডাক পড়ল।

-কি খবর অনেকদিন পর আইলি যে? শেখ সাহেব বললেন।

-ঢাকায় কাজে এসেছি ভাবলাম আপনাকে সালাম জানিয়ে যাই। তিনি বেশ খোশমেজাজেই ছিলেন। কথার সাথে সাথে পাইপ টানছিলেন।

-চাচা, আপনি নাকি জেনারেল জিয়াকে বার্মায় Defence Attache করে পাঠাবেন ঠিক করেছেন? তার ভাল mood এর সুযোগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

-ঠিক করিনাই; তবে বার্মায় একজনরে পাঠাইতে হইবো। শফিউল্লাহ কইলো জিয়ার নাকি ইন্টিলিজেন্সের ট্রেনিং আছে তাই ওর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হইতাছে। তার কথার খেই ধরে আমি বললাম,

-ইন্টিলিজেন্স কোর্স করা আর্মিতে আরো অনেক অফিসারই আছে। তাদের থেকে কাউকে পাঠান। General Zia is too senior for that post anyway. তাছাড়া এই মুহূর্তে তাকে বাইরে পাঠালে সবাই ভাববে আপনি আপনার কথার খেলাপ করে তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আর্মি থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। এটা আপনার জন্য ভাল হবে কি? তাছাড়া বেশকিছু কারণে আর্মির ভেতরে একটা সুপ্ত ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ অবস্থায় এ ধরণের একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যদি কোন Out burst ঘটে; সেটা সরকার এবং সরকার প্রধান হিসাবে আপনার জন্য বিব্রতকরও হতে পারে। বেয়াদবী নেবেন না চাচা, আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক হবে না। চুপ করে আমার কথাগুলো শুনে গেলেন শেখ সাহেব পাইপ মুখে নিয়ে।

-তুই কেমন আছস? কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন তিনি।

-যেমন রাখছেন। জবাব দিলাম।

-তোরাতো একটা কথা বুঝস না। পার্টির রাজনীতি করতে গেলে সবকিছুতে যুক্তি চলে না। নিজের ইচ্ছামতও সবকিছু করন যায় না। আমার অবস্থাটা বুঝিস। দেশও চালাইতে হয় আবার পার্টির স্বার্থও দেখতে হয়।

-চাচা আমি রাজনীতি করি না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক। সেই তুলনায় আমার কোন জ্ঞান নাই বললেই চলে। তবু কেন জানি মনে হয় প্রচলিত প্রবাদটায় একটা গভীর মানে আছে, একটা ইঙ্গিত বলা চলে।

-কোন প্রবাদের কথা কছ তুই? জানতে চাইলেন জনাব শেখ মুজিব।

-ঐ যে, 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়; দলের চেয়ে দেশ বড়।' হালকাভাবে কথাটা বলেই ফেললাম। পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন শেখ সাহেব।

-জিয়া তোরে পাঠাইছে? প্রশ্ন করলেন তিনি।

-জিয়া পাঠাবে কেন? আপনিই আমাকে কথা দিয়েছিলেন উপযুক্ত সময় তাকে আপনি চীফ বানাবেন; তাই খবরটা জানার পর আমি নিজেই এসেছি স্বেচ্ছায় আপনার কাছ থেকে এ ব্যাপারে জানতে। বেয়াদবী হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন।

-ঠিক আছে বুঝলাম। তুই যা এখন, কিছু লোকজন আইবো।

আমি সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। পরদিন জেনারেল জিয়াকে সবকিছু জানিয়ে কুমিল্লায় ফিরে এলাম। আমাদের সেদিনের আলোচনার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক জেনারেল জিয়াকে আর বার্মায় যেতে হয়নি। তার জায়গায় পাঠানো হয়েছিল কর্নেল নূরুল ইসলাম শিশুকে। তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে চলে গেলেন বার্মায়। তার খুশী হওয়ার কারণ ছিল। যুদ্ধের সময় হার্টের পালপিটেশনের অযুহাতে

রণাঙ্গন ছেড়ে কোলকাতার মুজিবনগর হেডকোয়ার্টার্স চলে এসেছিলেন তিনি। দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পর তিনি হঠাৎ করে একদিন ২৭নং মিন্টু রোডের হেডকোয়ার্টার্স থেকে লাপাত্তা হয়ে যান। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল তবুও তিনি ফিরলেন না। এতে জেনারেল ওসমানী ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তৎকালীন সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিনকে ডেকে হুকুম দিলেন যেকরেই হোক না কেন deserter শিশুকে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে আসতে। আমরা সবাই জানতাম আর্মিতে আর চাকুরি করতে চাচ্ছেন না শিশু ভাই। কিন্তু জেনারেল ওসমানীও ছাড়বেন না তাকে। সে এক উভয় সংকট অবস্থা। এ কারণেই লাপাত্তা হয়েছিলেন তিনি। যাই হোক অনেক কষ্টে তাকে সবাই মিলে বুঝিয়ে কোনরকমে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। সেই শিশু ভাই পরবর্তিকালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে মেজর জেনারেল ইসলাম 'The Rajputine of Bangladesh' হয়ে উঠেন। একেই বলে 'কপালের নাম গোপাল'। বাংলাদেশের রাজপুটিন শিশুর কর্মতৎপরতার পরিণাম কি হয়েছিল সে এক করুণ ইতিহাস। সেক্সপিয়রীয় বিয়োগান্তর নাটকের জুলিয়াস সিজারে পরিণত হয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। যাই হোক, জেনারেল জিয়াকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ যাত্রায় তিনি রক্ষা পেলেও পরিষ্কার বোঝা গেল সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী চেতনার অধিকারী অংশকে দুর্বল করে তোলার জন্য সরকার ক্ষেপে উঠেছেন। মেজর জলিল, কর্নেল জিয়াউদ্দিন এবং কর্নেল তাহেরকে ইতিমধ্যেই হারিয়েছি এবং আরো অনেককেই হয়তো বা বের করে দেয়া হবে সেনা বাহিনী থেকে কোন না কোন অযুহাতে। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে, রাজনৈতিক মহল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সমমনা লোকদের সাথে আলোচনা হল। প্রায় সবাই একই মত পোষণ করলেন যে, সেনা বাহিনীতে স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিকদের ক্রমান্বয়ে বের করে দিয়ে শুধুমাত্র খয়ের খাঁ-জী হুজুর টাইপের সদস্যদেরকেই রাখা হবে সেনা বাহিনীতে। এরপর এক সময় রক্ষীবাহিনীকে তাদের সাথে একত্রীভূত করে গড়ে তোলা হবে সম্পূর্ণভাবে সরকারের তাবেদার এক সেনা বাহিনী। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম- এখন থেকে যতটুকু সম্ভব এ বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখব।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন বেশ রাত করেই শেখ কামাল, সাহান এবং তারেক কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আমার বাসায় এসে হাজির। রাত তখন প্রায় ১১টা বাজে। এতরাতে কোন খবর না দিয়ে ওদের আগমণে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিলাম।

-কি ব্যাপার কামাল। তোমরা এত রাতে এখানে? প্রশ্ন করলাম।

-বস sorry। কিন্তু উপায় নাই। রাতটা আপনার বাসায় নিরাপদে কাটাবো বলেই এলাম। সকালে এসেছি পার্টির কাজে। সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম শহরে। খবর দেবার

সময়ও পাইনি। কিছুক্ষণ আগে কাজ শেষ হল। দিনকাল খারাপ তাই ভাবলাম শহরে না থেকে আপনার কাছে চলে আসি।

-তা বেশ করেছো। শহরেতো আজ গোলাগুলিও হয়েছে শুনলাম।

-না বস। গোলাগুলি না; এই একটু রংবাজী আর কি! জানাল কামাল। এরি মধ্যে নিম্মী খাবারের বন্দোবস্ত করে এসে বলল,

-সবার মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে কারোই খাওয়া হয়নি, এসো খেয়ে নাও; তারপর কথা বলার জন্য সারারাত পড়ে আছে।

-নিম্মী You are realy great.বলল কামাল। সবাই হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে গেল। এরা তিনজনেই বিশেষভাবে পরিচিত এবং আপনজন। খাওয়ার মাঝেই সাহান বলে উঠল,

-ডালিম ভাই কামাল বিয়ে করছে।

-তাই নাকি! তা হঠাৎ করে বিয়ে কি বিষয়?

-না মানে, সবাই ধরছে; না করে আর উপায় কি বস ? রাজি হতেই হল।

-এত খুবই সুখবর। তা তোমার স্কলারশীপের কি হল? সস্ত্রীক যাচ্ছ নাকি? জানতে চাইলাম আমি।

-যাওন যাইবো না বস। পড়ালেখা করার সময় নাই। এরপর কামাল শার্টের কলারের একপ্রান্ত আঙ্গুল দিয়ে নাড়িয়ে বেশ একটু গর্বের সাথেই বলল,

-Future Prime minister বুঝতেইতো পারেন কত কাম। একদম সময় নাই।

-সেটাতো বুঝতেই পারছি; কিন্তু There is no short cut to knowledge. মাত্রতো ২-৪ বছরের ব্যাপার ছিল। লেখাপড়াটা সেরে আসলে ভবিষ্যতে একজন Educated Prime minister পেতাম This is my only interest nothing else. তাই বলা আর কি। তাছাড়া আগামী দু'চার বছরেতো চাচা Retire করছেন না; সেক্ষেত্রে স্কলারশীপটা avail করলেই পারতে। দেখ কামাল, চাচা বলেন তিনি প্রায় সর্বমোট ১৭বছর জেল খেটেছেন পাক আমলে। জেলে থাকাকালীন অবস্থায় পৃথিবীর প্রায় সব নামি-দামী নেতারা বিস্তর লেখাপড়া করেছেন। আমাদের ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের লাইব্রেরীটাও শুনেছি খুবই rich. জেলে থাকাকালীন সময়টার যথাযথ সদব্যবহার করে চাচা কিন্তু তেমন একটা লেখাপড়া করেননি। সময়টাকে কাজে লাগালে আজ তারই অনেক সুবিধা হত রাষ্ট্র পরিচালনা করতে। কি কথাটা ঠিক বললাম কি না? ওরা সবাই আমার কথা শুনছিল আর খাচ্ছিল। কামাল কিংবা অন্যদের

কেউ কোন উত্তর দিল না। আমার কথাগুলো সম্ভবত ওদের মনঃপুত হয়নি। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ হালকা আলাপ করে সবাই শুয়ে পড়েছিলাম। পরদিন নাস্তার পর ওরা ঢাকায় ফেরার জন্য রওনা হয়ে গেল।

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি ঘটে এক বর্বরোচিত অকল্পনীয় ঘটনা। দুস্কৃতিকারী দমন অভিযানে সেনা বাহিনী তখনও সারাদেশে নিয়োজিত। আমার খালাতো বোন তাহ্‌মিনার বিয়ে ঠিক হল কর্নেল রেজার সাথে। দু'পক্ষই আমার বিশেষ ঘনিষ্ট। তাই সব ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছিল আমাকে এবং নিম্মীকেই। বিয়ের দু'দিন আগে ঢাকায় এলাম কুমিল্লা থেকে। ঢাকা লেডিস ক্লাবে বিয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই বিয়েতে অনেক গন্যমান্য সামরিক এবং বেসামরিক লোকজন বিশেষ করে হোমরা-চোমরারা এসেছিলেন অতিথি হিসেবে। পুরো অনুষ্ঠানটাই তদারক করতে হচ্ছিল নিম্মী এবং আমাকেই। আমার শ্যালক বাপ্পি ছুটিতে এসেছে ক্যানাডা থেকে। বিয়েতে সেও উপস্থিত। বিয়ের কাজ সুষ্ঠভাবেই এগিয়ে চলেছে। রেডক্রস চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার পরিবারও উপস্থিত রয়েছেন অভ্যাগতদের মধ্যে। বাইরের হলে পুরুষদের বসার জায়গায় বাপ্পি বসেছিল। তার ঠিক পেছনের সারিতে বসেছিল গাজীর ছেলেরা। বয়সে ওরা সবাই কমবয়সী ছেলে-ছোকরা। বাপ্পি প্রায় আমার সমবয়সী। হঠাৎ করে গাজীর ছেলেরা পেছন থেকে কৌতুকচ্ছলে বাপ্পির মাথার চুল টানে, বাপ্পি পেছনে তাকালে ওরা নির্বাক বসে থাকে। এভাবে দু'/তিনবার চুলে টান পড়ার পর বাপ্পি রাগান্বিত হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করে,

-চুল টানছে কে?

-আমরা পরখ করে দেখছিলাম আপনার চুল আসল না পরচুলা। জবাব দিল একজন। পুচঁকে ছেলেদের রসিকতায় বাপ্পি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণ ক্ষেপে যায়; কিন্তু কিছুই বলে না। মাথা ঘুরিয়ে নিতেই আবার চুলে টান পরে। এবার বাপ্পি যে ছেলেটি চুলে টান দিয়েছিল তাকে ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলে,

-বেয়াদপ ছেলে মশকারী করার জায়গা পাওনি? খবরদার তুমি আর ঐ জায়গায় বসতে পারবে না। এ কথার পর বাপ্পি আবার তার জায়গায় ফিরে আসে। এ ঘটনার কিছুই আমি জানতাম না। কারণ তখন আমি বিয়ের তদারকি এবং অতিথিদের নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত। বিয়ের আনুষ্ঠিকতার প্রায় সবকিছুই সুষ্ঠভাবেই হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর্বও শেষ। অতিথিরা সব ফিরে যাচ্ছেন। সেদিন আবার টেলিভিশনে সত্যজিৎ রায়ের পুরষ্কার প্রাপ্ত ছবি 'মহানগর' ছবিটি দেখানোর কথা; তাই অনেকেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ছবিটি দেখার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই লেডিস ক্লাব প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। মাহবুবের আসার কথা। মানে এসপি মাহবুব। আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ট বন্ধুদের একজন। আমরা সব একইসাথে যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতা সংগ্রামে। কি

এক কাজে মানিকগঞ্জ যেতে হয়েছিল তাকে। ওখান থেকে খবর পাঠিয়েছে তার ফিরতে একটু দেরী হবে। ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনরা সবেমাত্র তখন খেতে বসেছি। হঠাৎ দু'টো মাইক্রোবাস এবং একটা কার এসে ঢুকল লেডিস ক্লাবে। কার থেকে নামলেন স্বয়ং গাজী গোলাম মোস্তফা আর মাইক্রোবাস দু'টো থেকে নামল প্রায় ১০-১২ জন অস্ত্রধারী বেসামরিক ব্যক্তি। গাড়ি থেকেই প্রায় চিৎকার করতে করতে বেরুলেন গাজী গোলাম মোস্তফা।

-কোথায় মেজর ডালিম? বেশি বার বেড়েছে। তাকে আজ আমি শায়েস্তা করব। কোথায় সে? আমি তখন ভেতরে সবার সাথে খাচ্ছিলাম। কে যেন এসে বলল গাজী এসেছে। আমাকে তিনি খুঁজছেন। হঠাৎ করে গাজী এসেছেন কি ব্যাপার? ভাবলাম বোধ হয় তার পরিবারকে নিয়ে যেতে এসেছেন তিনি। আমি তাকে অর্ভ্যথনা করার জন্য বাইরে এলাম। বারান্দায় আসতেই ৬-৭জন স্টেনগানধারী আমার বুকে-পিঠে-মাথায় তাদের অস্ত্র ঠেকিয়ে ঘিরে দাড়াল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমিতো হতবাক! কিছুটা অপ্রস্তুতও বটে। সামনে এসে দাড়ালেন স্বয়ং গাজী। আমি অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

-ব্যাপার কি? এ সমস্তো কিছুর মানেই বা কি?

তিনি তখন ভীষণভাবে ক্ষীপ্ত। একনাগাড়ে শুধু বলে চলেছেন,

-গাজীরে চেন না। আমি বঙ্গবন্ধু না। চল্ শালারে লইয়া চল্। আইজ আমি তোরে মজা দেখামু। তুই নিজেরে কি মনে করছস?

অশালীনভাবে কথা বলছিলেন তিনি। আমি প্রশ্ন করলাম,

-কোথায় কেন নিয়ে যাবেন আমাকে?

আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন তার অস্ত্রধারী অনুচরদের। তার ইশারায় অস্ত্রধারীরা সবাই তখন আমাকে টানা-হেচড়া করে মাইক্রোবাসের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিয়ের উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার জন্য পুলিশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে; গাড়িতে আমার এস্কট সিপাইরাও রয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত। একটা বিয়ের অনুষ্ঠান। কন্যা দান তখনও করা হয়নি। কি কারণে যে এমন অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আলম এবং চুল্লুকে মারতে মারতে একটা মাইক্রোবাসে উঠালো ৩-৪ জন অস্ত্রধারী। ইতিমধ্যে বাইরে হৈ চৈ শুনে নিম্মী এবং খালাম্মা মানে তাহমিনার আম্মা বেরিয়ে এসেছেন অন্দরমহল থেকে। খালাম্মা ছুটে এসে গাজীকে বললেন,

-ভাই সাহেব একি করছেন আপনি? ওকে কেন অপদস্ত করছেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে? কি দোষ করেছে ও?

গাজী তার কোন কথারই জবাব দিলেন না। তার হুকুমের তামিল হল। আমাকে জোর করে ঠেলে উঠান হল মাইক্রোবাসে। বাসে উঠে দেখি আলম ও চুল্লু দু'জনেই গুরুতরভাবে আহত। ওদের মাথা এবং মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। আমাকে গাড়িতে তুলতেই খালাম্মা এবং নিম্মী দু'জনেই গাজীকে বলল,

-ওদের সাথে আমাদেরকেও নিতে হবে আপনাকে। ওদের একা নিয়ে যেতে দেব না আমরা।

-ঠিক আছে; তবে তাই হবে। বললেন গাজী।

গাজীর ইশারায় ওদেরকেও ধাক্কা দিয়ে উঠান হল মাইক্রোবাসে। বেচারী খালাম্মা! বয়স্কা মহিলা, আচমকা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মাইক্রোবাসের ভিতরে। আমার দিকে অস্ত্রতাক করে দাড়িয়ে থাকলো পাঁচজন অস্ত্রধারী; গাজীর সন্ত্রাস বাহিনীর মাস্তান। গাজী গিয়ে উঠল তার কারে। বাকি মাস্তানদের নিয়ে দ্বিতীয় মাইক্রোবাসটা কোথায় যেন চলে গেল। মাইক্রোবাস দুইটি ছিল সাদা রং এর এবং তাদের গায়ে ছিল রেডক্রসের চিহ্ন আঁকা। গাজীর গাড়ি চললো আগে আগে আর আমাদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি চললো তার পেছনে। এসমস্ত ঘটনা যখন ঘটছিল তখন আমার ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা কামরুল হক স্বপন বীর বিক্রম ও বাপ্পি লেডিস ক্লাবে উপস্থিত ছিল না। তারা গিয়েছিল কোন এক অতিথিকে ড্রপ করতে। আমাদের কাফেলা লেডিস ক্লাব থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওরা ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানতে পারে লিটুর মুখে। সবকিছু জানার পরমুহূর্তেই ওরা যোগাযোগ করল রেসকোর্সে আর্মি কন্ট্রোল রুমে তারপর ক্যান্টনমেন্টের এমপি ইউনিটে। ঢাকা ব্রিগেড মেসেও খবরটা পৌঁছে দিল স্বপন। তারপর সে বেরিয়ে গেল ঢাকা শহরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের খুঁজে বের করার জন্য। আবুল খায়ের লিটু আমার ছোট বোন মহুয়ার স্বামী এবং আমার বন্ধু। ও ছুটে গেল এসপি মাহবুবের বাসায় বেইলী রোডে। উদ্দেশ্য মাহবুবের সাহায্যে গাজীকে খুঁজে বের করা।

এদিকে আমাদের কাফেলা গিয়ে থামল রমনা থানায়। গাজী তার গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল থানার ভিতরে। অল্প কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন গাজী। কাফেলা আবার চলতে শুরু করল। কাফেলা এবার চলছে সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে। ইতিমধ্যে নিম্মী তার শাড়ী ছিড়ে চুল্লু ও আলমের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজ বেধে দিয়েছে। সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। গাজীর মনে কোন দুরভিসন্ধি নেইতো? রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে নাতো? ওর পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। কিছু একটা করা উচিত। হঠাৎ আমি বলে উঠলাম,

-গাড়ি থামাও!

আমার বলার ধরণে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল। আমাদের গাড়িটা থেমে পড়ায় সামনের গাজীর গাড়িটাও থেমে পড়ল। আমি তখন অস্ত্রধারী একজনকে লক্ষ্য করে বললাম গাজী সাহেবকে ডেকে আনতে। সে আমার কথার পর গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে গাজীকে গিয়ে কিছু বলল। দেখলাম গাজী নেমে আসছে। কাছে এলে আমি তাকে বললাম,

-গাজী সাহেব আপনি আমাদের নিয়ে যাই চিন্তা করে থাকেন না কেন; লেডিস ক্লাব থেকে আমাদের উঠিয়ে আনতে কিন্তু সবাই আপনাকে দেখেছে। তাই কোন কিছু করে সেটাকে বেমালুম হজম করে যাওয়া আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

আমার কথা শুনে কি যেন ভেবে নিয়ে তিনি আবার তার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কাফেলা আবার চলা শুরু করল। তবে এবার রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে নয়, গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি চললেন ৩২নং ধানমন্ডি প্রধানমন্ত্রীর বাসার দিকে। আমরা হাফ ছেড়ে বাচলাম। কলাবাগান দিয়ে ৩২নং রোডে ঢুকে আমাদের মাইক্রোবাসটা শেখ সাহেবের বাসার গেট থেকে একটু দূরে এলকটা গাছের ছায়ায় থামতে ইশারা করে জনাব গাজী তার গাড়ি নিয়ে সোজা গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন ৩২নং এর ভিতরে। সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্ট তখন শেখ সাহেবের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। একবার ভাবলাম ওদের ডাকি, আবার ভাবলাম এর ফলে যদি গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় তবে ক্রস-ফায়ারে বিপদের ঝুঁকি বেশি। এ সমস্তই চিন্তা করছিলাম হঠাৎ দেখি লিটুর ঢাকা ক-৩১৫ সাদা টয়োটা কারটা পাশ দিয়ে হুস্ করে এগিয়ে গিয়ে শেখ সাহেবের বাসার গেটে গিয়ে থামল। লিটুই চালাচ্ছিল গাড়ি। গাড়ি থেকে নামল এসপি মাহবুব। নেমেই প্রায় দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সে। লিটু একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষায় রইলো সম্ভবত মাহবুবের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। লিটু এবং মাহবুবকে দেখে আমরা সবাই আস্বস্ত হলাম। নির্ঘাত বিপদের হাত থেকে পরম করুণাময় আল্লাহ্'তায়ালা আমাদের বাচিঁয়ে দিলেন।

লিটু যখন মাহবুবের বাসায় গিয়ে পৌছে মাহবুব তখন মানিকগঞ্জ থেকে সবেমাত্র ফিরে বিয়েতে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হঠাৎ লিটুকে হন্তদন্ত হয়ে উপরে আসতে দেখে তার দিকে চাইতেই লিটু বলে উঠল,

-মাহবুব ভাই সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়ি থেকে গাজী বিনা কারণে ডালিম-নিম্মীকে জবরদস্তি Gun point-এ উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

একথা শুনে মাহবুব স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীকেই খবরটা সবচেয়ে আগে দেওয়া দরকার কোন অঘটন ঘটে যাবার আগে। গাজীর কোন বিশ্বাস নাই; ওর দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। মাহবুব টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ টেলিফোনটাই বেজে উঠে। রেড টেলিফোন। মাহবুব ত্রস্তে উঠিয়ে নেয় রিসিভার। প্রধানমন্ত্রী অপর প্রান্তে,

-মাহ্বুব তুই জলদি চলে আয় আমার বাসায়। গাজী এক মেজর আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ধইরা আনছে এক বিয়ার অনুষ্ঠান থ্যাইকা। ঐ মেজর গাজীর বউ-এর সাথে ইয়ার্কি মারার চেষ্টা করছিল। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। বেশি বাড় বাড়ছে সেনা বাহিনীর অফিসারগুলির।

সব শুনে মাহ্বুব জানতে চাইলো,

-স্যার গাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন মেজর ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের কোথায় রেখেছেন তিনি।

-ওদের সাথে কইরা লইয়া আইছে গাজী। গেইটের বাইরেই গাড়িতে রাখা হইছে বদমাইশগুলারে। জানালেন প্রধানমন্ত্রী।

-স্যার গাজী সাহেব ডালিম আর নিম্মীকেই তুলে এনেছে লেডিস ক্লাব থেকে। ওখানে ডালিমের খালাতো বোনের বিয়ে হচ্ছিল আজ। জানাল মাহ্বুব।

-কছ কি তুই! প্রধানমন্ত্রী অবাক হলেন।

-আমি সত্যিই বলছি স্যার। আপনি ওদের খবর নেন আমি এক্ষুণি আসছি।

এই কথোপকথনের পরই মাহ্বুব লিটুকে সঙ্গে করে চলে আসে ৩২নং ধানমন্ডিতে। মাহ্বুবের ভিতরে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেহানা, কামাল ছুটে বাইরে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে যায়। আলম ও চুল্লুর রক্তক্ষরণ দেখে শেখ সাহেব ও অন্যান্য সবাই শংকিত হয়ে উঠেন।

-হারামজাদা, এইডা কি করছস তুই?

গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে নিম্মী এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। খালাম্মা ঠিকমত হাটতে পারছিলেন না। কামাল, রেহানা ওরা সবাই ধরাধরি করে ওদের উপরে নিয়ে গেল। শেখ সাহেবের কামরায় তখন আমি, নিম্মী আর গাজী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। নিম্মী দুঃখে-গ্লানিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। শেখ সাহেব ওকে জড়িয়ে ধরে শান্তনা দিতে চেষ্টা করছিলেন। অদূরে গাজী ভেজা বেড়ালের মত কুকড়ে দাড়িয়ে কাঁপছিল। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। রেড ফোন। শেখ সাহেব নিজেই তুলে নিলেন রিসিভার। গাজীর বাসা থেকে ফোন এসেছে। বাসা থেকে খবর দিল আর্মি গাজীর বাসা রেইড করে সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সমস্ত শহরে আর্মি চেকপোষ্ট বসিয়ে প্রতিটি গাড়ি চেক করছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিডন্যাপিং এর খবর পাওয়ার পরপরই ইয়ং-অফিসাররা যে যেখনেই ছিল সবাই বেরিয়ে পড়েছে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে মেজর ডালিম ও তার স্ত্রী নিম্মীকে। সমস্ত শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে। গাজীরও কোন খবর নেই। গাজীকে এবং

তার অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদেরও খুঁজছে আর্মি তন্নতন্ন করে সম্ভাব্য সব জায়গায়। টেলিফোন পাওয়ার পর শেখ সাহেবের মুখটা কালো হয়ে গেল। ফোন পেয়েই তিনি আমাদের সামনেই আর্মি চীফ শফিউল্লাহকে হট লাইনে বললেন,

-ডালিম, নিম্মী, গাজী সবাই আমার এখানে আছে, তুমি জলদি চলে আসো আমার এখানে।

ফোন রেখে শেখ সাহেব গাজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

-মাফ চা নিম্মীর কাছে।

গাজী শেখ সাহেবের হুকুমে নিম্মীর দিকে এক পা এগুতেই সিংহীর মত গর্জে উঠল নিম্মী,

-খবরদার! তোর মত ইতর লোকের মাফ চাইবার কোন অধিকার নাই: বদমাইশ।

এরপর শেখ মুজিবের দিকে ফিরে বলল নিম্মী,

-কাদের রক্তের বদলে আজ আপনি প্রধানমন্ত্রী? আমি জানতে চাই। আপনি নিজেকে জাতির পিতা বলে দাবি করেন। আমি আজ আপনার কাছে বিচার চাই। আজ আমার জায়গায় শেখ হাসিনা কিংবা রেহানার যদি এমন অসম্মান হত তবে যে বিচার আপনি করতেন আমি ঠিক সেই বিচারই চাই। যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আপনারা জাতির কর্ণধার হয়ে ক্ষমতা ভোগ করছেন সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে তাদের গায়ে হাত দেয়ার মত সাহস কম্বলচোর গাজী পায় কি করে? এর উপযুক্ত জবাব আমি আজ চাই আপনার কাছ থেকে। আজ পর্যন্ত আপনি বলতে পারবেন না ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু চেয়েছি আপনার কাছে কিন্তু আজ দাবি করছি ন্যায্য বিচার। আপনি যদি এর বিচার না করেন তবে আমি আল্লাহ্‌র কাছে এই অন্যায়ের বিচার দিয়ে রাখলাম। তিনি নিশ্চয়ই এর বিচার করবেন।

আমি অনেক চেষ্টা করেও সেদিন নিম্মীকে শান্ত করতে পারিনি। ঠান্ডা মেজাজের কোমল প্রকৃতির নিম্মীর মধ্যেও যে এধরণের আগুন লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা আমার কাছেও আশ্চর্য লেগেছিল সেদিন। শেখ সাহেব নিম্মীর কথা শুনে ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলেন, -মা তুই শান্ত 'হ। হাসিনা-রেহানার মত তুইও আমার মেয়েই। আমি নিশ্চয়ই এর উপযুক্ত বিচার করব। অন্যায়! ভীষণ অন্যায় করছে গাজী কিন্তু তুই মা শান্ত 'হ। বলেই রেহানাকে ডেকে তিনি নিম্মীকে উপরে নিয়ে যেতে বললেন। রেহানা এসে নিম্মীকে উপরে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে জেনারেল শফিউল্লাহ এবং ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল এসে পৌঁছেছে। শেখ সাহেব তাদের সবকিছু খুলে বলে জেনারেল শফিউল্লাকে অনুরোধ করলেন গাজীর পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে। জেনারেল শফিউল্লাহ

রেসকোর্স কন্ট্রোল রুমে Operation Commander মেজর মোমেনের সাথে কথা বলার জন্য টেলিফোন তুলে নিলেন,

-হ্যালো মোমেন, আমি শফিউল্লাহ বলছি প্রাইম মিনিষ্টারের বাসা থেকে। ডালিম, নিম্মী, গাজী ওরা সবাই এখানেই আছে। প্রাইম মিনিষ্টারও এখানেই উপস্থিত আছেন। Everything is going to be all right. Order your troops to stand down এবং গাজী সাহেবের পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দাও। অপরপ্রান্ত থেকে মেজর মোমেন জেনারেল শফিউল্লাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া অফিসার এবং তার স্ত্রীকে না দেখা পর্যন্ত এবং গাজী ও তার ১৭জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের তার হাতে সমর্পন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে গাজীর পরিবারের কাউকেই ছাড়া সম্ভব নয়। শফিউল্লাহ তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু মেজর মোমেন তার অবস্থানে অটল থাকলেন শফিউল্লাহর সব যুক্তিকে অসাড় প্রমাণিত করে। অবশেষে শফিউল্লাহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রধানমন্ত্রীকে Operation Commander এর শর্তগুলো জানালেন। শেখ সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন মেজর মোমেনের সাথে কথা বলতে। আমি অগত্যা টেলিফোন হাতে তুলে নিলাম,

-হ্যালো স্যার। মেজর ডালিম বলছি। Things are under control প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন তিনি ন্যায় বিচার করবেন।

-Well Dalim it's nice to hear from you. But as the Operation Commander I must have my demands met. I got to be loyal to my duty as long as the army is deployed for anti-miscreant's drive. The identified armed miscreants cannot be allowed to go escort free. As far as I am concerned the law is equal for everyone so there can't be any exception. Chief has got to understand this. বললেন মেজর মোমেন।

-Please Sir, why don't you comeover and judge the situation yourself. অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমি।

-There is no need for me to come. However, I am sending Capt. Feroz বলে ফোন ছেড়ে দিলেন মেজর মোমেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন ফিরোজ এসে পড়ল। ফিরোজ আমার বাল্যবন্ধু। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরল।

-তুই গাজীরে মাফ কইরা দে। আর গাজী তুই নিজে খোদ উপস্থিত থাকবি কন্যা সম্প্রদানের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অনেকটা মোড়লী কায়দায় একটা আপোষরফা করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

-আমার বোনের সম্প্রদানের জন্য গাজীর বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ওকে মাফ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা হবে আমার জন্য নীতি বিরোধিতা। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি রক্তের বিনিময়ে। আমাদের গা থেকে রক্ত ঝরাটা কোন বড় ব্যাপার নয়। ইউনিফর্মের চাকুরি করি টাকা-পয়সার লোভেও নয়। একজন সৈনিক হিসাবে আমার আত্মমর্য্যাদা এবং গৌরবকে অপমান করেছেন গাজী নেহায়েত অন্যায়ভাবে। আপনিই আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। অবৈধ অস্ত্রধারীদের খুঁজে বের করে আইনানুযায়ী তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে। সেখানে আজ আমাদেরই ইজ্জত হারাতে হল অবৈধ অস্ত্রধারীদের হাতে! আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে কথা দিয়েছেন এর উচিত বিচার করবেন। আমরা আপনি কি বিচার করেন সেই অপেক্ষায় থাকব।

ক্যাপ্টেন ফিরোজকে উদ্দেশ্য করে সবার সামনেই বলেছিলাম,

দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বিচারের ওয়াদা করেছেন সেক্ষেত্রে গাজীর পরিবারের সদস্যদের আর আটকে রাখার প্রয়োজন কি? কর্নেল মোমেনকে বুঝিয়ে তাদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করিস।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক সেই সময় শেখ সাহেব বললেন,

-আমার গাড়ি তোদের পৌঁছে দেবে।

-তার প্রয়োজন হবে না চাচা। বাইরে লিটু-স্বপনরা রয়েছে তাদের সাথেই চলে যেতে পারব।

বাইরে বেরিয়ে দেখি ৩২নং এর সামনের রাস্তায় গাড়ির ভীড়ে তিল ধারণের ঠাই নেই। পুলিশ অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবরা যারাই জানতে পেরেছে আমাদের কিডন্যাপিং এর ব্যাপারটা; তাদের অনেকেই এসে জমা হয়েছে স্বতঃস্ফুর্তভাবে। আমাদের দেখে সবাই ঘিরে ধরল। সবাই জানতে চায় কি প্রতিকার করবেন প্রধানমন্ত্রী এই জঘণ্য অপরাধের। সংক্ষেপে যতটুকু বলার ততটুকু বলে ফিরে এলাম লেডিস ক্লাবে। মাহবুবও এল সাথে। মাহবুবের উছিলায় সেদিন রক্ষা পেয়েছিলাম চরম এক বিপদের হাত থেকে আল্লাহ্‌পাকের অসীম করুণায়। বিয়ের আসরে আমরা ফিরে আসায় পরিবেশ আবার আনন্দ-উচ্ছাসে ভরে উঠল। সবাই আবার হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে বিয়ের বাকি আনুষ্ঠিকতা সম্পন্ন করে কন্যা সম্প্রদান করা

হল। তাহমিনার বিয়ের রাতটা আওয়ামী দুঃশাসনের একটা ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে থাকলো। জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে থাকলো আওয়ামী নেতাদের এবং তাদের ব্যক্তিগত বাহিনীর ন্যাক্কারজনক স্বেচ্ছাচার ও নিপীড়নের। কী করে এমন একটা জঘণ্য ঘটনার সাথে গাজী সরাসরি নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পেরেছিল তার কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক পরে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছিলাম আমাদের কুমিল্লা অপারেশনের পর পার্টির তরফ থেকে শেখ মুজিবের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল আমাদের বিশেষ করে আমার ঔদ্ধত্বের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু শেখ মুজিব ঐ চাপের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, "আর্মি কোন কাঁচা কাজ করে নাই। তারা আইন অনুযায়ী সবকিছু করছে, প্রত্যেককে ধরেছে হাতেনাতে প্রমাণসহ সে ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি?" তার ঐ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ আওয়ামী নেতাদের একাংশ। আইনের মাধ্যমে যদি কোন কিছু করা না যায় তবে অন্য কোনভাবে হলেও শিক্ষা তাদের দিতেই হবে এবং সেই দায়িত্বটাই গ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ের Top terror and most powerful leader বলে পরিচিত গাজী গোলাম মোস্তফা। তখন থেকেই নাকি সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি জিঘাংসা মিটাতে। বিয়ে বাড়িতে বাপ্পি এবং তার ছেলেদের মাঝে যে সামান্য ঘটনা ঘটে সেটাকেই সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে গাজী চেয়েছিল আমাকে উচিত শিক্ষা দিতে। এ বিষয়ে মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি তার বই 'বাংলাদেশ! সামরিক শাসন এবং গণতন্ত্রের সংকট' এ লিখেছেন, "গাজী সমর্থক লোকদের সম্ভবতঃ মেজর ডালিম ও তার স্ত্রীকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল।"

ঘটনার পরদিন সকালেই আমার ডাক পড়ল আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে। সেখানে উপস্থিত হয়েই জানতে পারলাম চীফ আমাকে ডেকেছেন। কিন্তু তার আগেই ডাক পড়ল জেনারেল জিয়ার অফিসে। মেজর হাফিজ তখন PS-Cord to DCAS. সেই আমাকে খবর দিল জেনারেল জিয়া আমার সাথে কথা বলতে চান। তিনি আমার অপেক্ষায় আছেন। অনুমতি নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। গতরাতে কি ঘটেছে তিনি জানতে চাইলেন। সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বেশ উত্তেজিতভাবেই বললেন, "This is incredible and ridiculous. This is simply not acceptable. ঠিক আছে দেখ চীফ কি বলে।" তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই হাফিজ তার ঘরে নিয়ে গেল। নূরও ছিল সেখানে। হাফিজ বলল, "দ্যাখো ডালিম: গতরাতের বিষয়টা শুধুমাত্র তোমার আর ভাবীর ব্যাপারই নয়: সমস্ত আর্মির Dignity. pride and honour are at stake. মানে আমরা সবাই এর সাথে জড়িত। You got to understand this clearly ok? অন্যান্য সব ব্রিগেডের সাথে আলাপ হয়েছে তারাও এ ব্যাপারে সবাই একমত। This has got to be sorted out right and proper. শেখ মুজিব কি বিচার করবে? আমরা

শফিউল্লাহর মাধ্যমে দাবি জানাবো আর্মির তরফ থেকে। প্রধানমন্ত্রীকে সে দাবি অবশ্যই মানতে হবে। দাবিগুলোও আমরা ঠিক করে ফেলেছি। তুমি শফিউল্লাহ্ কি বলে সেটা শুনে আস তারপর যা করবার সেটা আমরা করব।"

আর্মি হেডকোয়ার্টার্স এ সমস্ত তরুণ অফিসারদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। হাফিজের অফিস থেকেই চীফের ADC-কে ইন্টারকমে জানালাম, "I am through with DCAS so I am free now to see the Chief." "Right Sir." বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো ADC. কিছুক্ষণ পরই ADC হাফিজের কামরায় এসে জানাল চীফ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। চীফের অফিসে ঢুকতেই তিনি আমাকে বসতে বললেন। চেয়ার টেনে বসলাম মুখোমুখি।

-How are you?

-Fine Sir.

-How is Nimmi?

-She is ok Sir, but terribly upset.

-Quite natural. But she is a brave girl I must say. The way she talked to the Prime minister was really commedable. এ সমস্ত কথার পর আসল বিষয়ের উপস্থাপনা করলেন জেনারেল শফিউল্লাহ,

-দেখ ডালিম গতরাতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নিজেই দুঃখ এবং অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। I am also very sorry about the whole affair. শেখ সাহেবতো তোমাদেরও আপনজন। অত্যন্ত স্নেহ করেন তোমাদের দু'জনকেই। তিনি যখন চাইছেন তুমি গাজীকে মাফ করে দাও, তার সে ইচ্ছা তুমি পূরণ করবে সেটাইতো তিনি আশা করছেন। তুমি যদি গাজীকে মাফ কর তবে তিনি খুশী হবেন তাই নয় কি?

-স্যার, তিনি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। পারিবারিকভাবে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও আছে; সেটাও সত্য। তিনি ও তার পরিবার আমাদের ভালোবাসেন। কিন্তু নীতির ব্যাপারে আপোষ আমি করতে পারবনা সেটা আপনার সামনেই তাকে আমি বলে এসেছি। And I shall stick to that till the end.

-Well that's up to you then. I have nothing more to tell you.

-Thank you Sir. বলে বেরিয়ে এসে দেখি চীফের অফিসের সামনে AHQ-র প্রায় সব অফিসার একত্রিত হয়ে দাড়িয়ে আছে। তারা আমার কাছ থেকে জানতে

চাইলো চীফ কি বললেন। আমি আমাদের কথোপকথনের সবটাই তাদের হুবহু খুলে বললাম। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সবাই। একজন ADC কে বলল, "Go and call him out here, we want to talk to him."

ADC-র মাধ্যমে অফিসারদের অভিপ্রায় জানতে পেরে বেরিয়ে এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। সবাই তাকে ঘিরে দাড়াল। চীফ বললেন,

-বলো তোমাদের কি বলার আছে ?

-স্যার, গতরাতের ঘটনা শুধুমাত্র মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমরা আজ যেখানে দুস্কৃতিকারী দমনের জন্য সারাদেশে deployed সেই পরিস্থিতিতে বিনা কারণে গাজী ও তার সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে আমাদেরই একজন অফিসার এবং তার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনীই নয়; It has compromised the honour and the dignity of the whole armed forces particularly army. We can't take it lying. It has got to be sorted out right and proper." কথাগুলো বলল একজন। জেনারেল শফিউল্লাহ জবাবে বলার চেষ্টা করলেন,

-Well, the Prime minister is personaly very sorry about the whole affair.

-That's not enough! শফিউল্লাহকে থামিয়ে দিল একজন।

-Now Sir, you being our Chief and the leader have to shoulder your responsibility to uphold the honour and the dignity of this army. সমগ্র সেনা বাহিনীর তরফ থেকে আমাদের ৩টি দাবি আপনাকে জানাচ্ছি।

১। গাজীকে তার সংসদপদ এবং অন্যান্য সমস্ত সরকারি পদ থেকে এই মুহূর্তে অব্যাহতি দিয়ে তাকে এবং তার অবৈধ অস্ত্রধারীদের অবিলম্বে আর্মির হাতে সোপর্দ করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে; যাতে করে আইনানুযায়ী তাদের সাজা হয়।

২। গতরাতের সমস্ত ঘটনা সব প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে দেশের জনগণকে অবগত করার অনুমতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে।

৩। যেহেতু গাজী আওয়ামী লীগের সদস্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আপনাকে আমাদের এই ৩টি দাবি নিয়ে যেতে হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং আগামী ২৪ঘন্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে এ দাবিগুলো মেনে নিতে হবে। এই দাবিগুলি আপনি

যদি আদায় করতে অপারগ হন তবে You have got no right to sit on your chair. You will be considered not fit enough to lead this army.

ঘাবড়ে গিয়ে ঢোক গিলতে লাগলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। থতমত খেয়ে বেসামাল অবস্থায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু তার আগেই লেফটেন্যান্ট সামশের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম তার কোমরের বেল্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল জেনারেল শফিউল্লার পায়ের কাছে,

-We serve the army for our pride, honour and dignity. If that is not there then I hate to serve that army anylonger.

উত্তেজিতভাবে উপস্থিত সবাই একই সাথে বলে উঠল,

-Sir, you got to restore our lost honour and dignity. We have had enough humiliation but no more. Sir, please don't be afraid. We all are with you. Just try to understand the gravity of the problem and be one of us.

বাইরের শোরগোল শুনে জেনারেল জিয়া কখন বেরিয়ে এসেছিলেন আমরা খেয়ালই করিনি। হঠাৎ তিনি তার গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন,

-Boys be quite and listen to me. I have heared everything and I appreciate your sentiment. I have also understood the problem. Your demands are just and fair. Shafiullah you must go with their demands to the Prime minister and make him understand the gravity of the situation and suggest him to accept the demands for the greater interest of the nation and the armed forces.

জেনারেল শফিউল্লাহ যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন,

-আমি এখনই যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তক্ষুণি তিনি বেরিয়ে গেলেন গণভবনের উদ্দেশ্যে। তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। শফিউল্লাহ চলে যাবার পর আমরাও মেসে চলে এলাম লাঞ্চের জন্য। এখানে একটা বিষয় প্রাণিধানযোগ্য। শফিউল্লাহকে যখন ঘেরাও করা হয়েছিল তখন সেখানে কর্নেল এরশাদও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য PSO-দের সাথে। তিনি তখন AG (Adjutant General) হিসাবে হেডকোয়ার্টার্স-এ পোস্টেড ছিলেন। এক সময় জেনারেল শফিউল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

-এরশাদ তোমার অভিমত কি ?

-Sir, I think their demands are quite legitimate. এ ধরণের ঘটনা আপনার কিংবা আমার সাথেও ঘটতে পারত। যেখানে Army is deployed to maintain law and order and engaged in anti-miscreant drive সেখানে এ ধরণের একটা ঘটনাকে শুধুমাত্র ডালিম-নিম্মীর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে consider করা উচিত হবে না। It is definitely a question of honour and prestige of the entire army and you being the Chief must make this point clear to the Prime minister and advise the PM correctly to restore the lost honour by accepting the demands.

তার জবাব শুনে আমরা বেশ কিছুটা আশ্চর্যই হয়েছিলাম। কারণ, তিনি ছিলেন একজন Rpatriated officer. তিনি সাহস করে ঐ ধরণের স্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন সেটা আমাদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। এতেই প্রমাণিত হয় পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মাঝে অনেকেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। সন্ধ্যার দিকে চীফ ফিরলেন গণভবন থেকে: সারাদিন দরবার করে। রাত ৮টার দিকে তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন সেনা ভবনে। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল শাফায়াত এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফও উপস্থিত রয়েছেন। আমরা কুশলাদী বিনিময় করে সবাই বসলাম। চীফ শুরু করলেন,

-আমি প্রধানমন্ত্রীকে তোমাদের দাবিগুলো জানিয়েছি। তিনি সময় চেয়েছেন। Prime minister যখন সময় চেয়েছেন তখন তাকে সময় আমাদের দিতে হবেই। চীফের কথার মাঝে ফোঁড়ন কাটছিলেন কর্নেল শাফায়াত। ব্রিগেডিয়ার খালেদ নিশ্চুপ বসেছিলেন।

-স্যার 'তোমাদের দাবিগুলো' বলে আপনিকি এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে আপনার ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? দাবিগুলো ছিল entire army-র তরফ থেকে। তবে কি আমাদের বুঝতে হবে আপনি বা আপনারা মানে the senior lots are not with us ? জানতে চাওয়া হল জেনারেল শফিউল্লাহর কাছ থেকে। তিনি এ ধরণের কথায় একটু ঘাবড়ে গেলেন। চালাক প্রকৃতির ব্রিগেডিয়ার খালেদ অবস্থা আঁচ করতে পেরে শফিউল্লাহর হয়ে জবাব দিলেন,

-Boys don't have wrong impression. Offcourse we all are together. How could we be different on this issue?

-কিন্তু স্যার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দাবি মানবেন না। সময় চেয়ে নিয়ে তিনি প্রথমত: ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত: তার অবস্থানকে পোক্ত করার

জন্যই সময় চেয়েছেন তিনি। যদি শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের দাবি মানতে রাজি না হন তবে কি করা হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানতে চাই আমরা।

তিনজনই এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন।

-Well Sir, if you don't have any idea what to do next then we shall think what needs to be done. বলে চলে এসেছিলাম আমরা। আজিজ পল্লীর এক বাসায় বৈঠকে বসলাম আমরা। বিষয়বস্তু- দাবি মানা না হলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। অন্যান্য ব্রিগেডের সাথে যোগাযোগ করে মতামত বিনিময় করা হচ্ছিল সবসময়। রাত প্রায় ১১টার দিকে খবর পেলাম জেনারেল শফিউল্লাহর সাদা ডাটসন কারে দু'জন লোক সিভিল ড্রেসে চাদর মুড়ি অবস্থায় ২নং গেইট দিয়ে বেরিয়ে ৩২নং ধানমন্ডির দিকে যাচ্ছে। একজন young officer-কে মোটর সাইকেল নিয়ে গাড়িকে ফলো করতে বলা হল। রাত প্রায় ১১:৩০ মিনিটে ঐ অফিসার ফিরে এসে জানাল গাড়িতে ছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ এবং কর্নেল শাফায়াত। তারা গিয়ে ঢুকেছিলেন শেখ সাহেবের বাসায়। রাত প্রায় ১২:৩০ মিনিটের দিকে খবর আসতে লাগল শহরে রক্ষীবাহিনীর মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। দুইএ দুইএ চার; মিলে গেল হিসাব। শফিউল্লাহ এবং শাফায়াত শেখ সাহেবের একান্ত বিশ্বাসভাজন বিধায় ৩২নম্বরে গিয়ে আমাদের সন্ধ্যার আলোচনার সবকিছুই জানিয়ে এসেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে শহরে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে; আর্মির তরফ থেকে যেকোন move এর মোকাবেলা করার জন্য। নিজেদের প্রতি তার অনুকম্পা আরো বাড়াবার জন্যই ব্যক্তি পূঁজার এক ঘৃণ্য উদাহরণ! রাত আড়াইটার দিকে বিভিন্ন বর্ডার এলাকা থেকে খবর আসতে লাগল মধ্যরাত্রির পর থেকে ভারতীয় বাহিনীর অস্বাভাবিকভাবে তৎপরতা শুরু হয়েছে। তার মানে নিজের নিরাপত্তার জন্য শেখ মুজিব শুধুমাত্র তার অনুগত রক্ষীবাহিনী এবং সেনা বাহিনীর তার তল্পিবাহক নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে স্বস্তি পাচ্ছেন না তাই বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যও চেয়ে বসেছেন মৈত্রী চুক্তির আওতায়। আমরা কয়েকজন শহর ঘুরে দেখলাম খবরগুলো সত্যি। দুঃখ হল, পেশাগত নিজ যোগ্যতায় নয় শেখ মুজিবের বদন্যতায় যারা একলাফে মেজর থেকে জেনারেল বনে গেছেন তারা নিজেদের চামড়া পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন শেখ সাহেব এবং তার দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল: জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন তেমনি একজন। কিন্তু কথায় আছে Exception is never an example. ধিক্কার এসে গিয়েছিল আমাদের মনে এসমস্ত মেরুদন্ডহীন মতলববাজ সিনিয়র অফিসারদের চারিত্রিক দুর্বলতা জানার পর। পরদিন শফিউল্লাহর ডাক পড়ল গণভবনে। ফিরে এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। গত দু'দিনের তুলনায় আজ তাকে বেশি confident দেখাচ্ছিল,

-Well Dalim, the Prime minister has asked for time as you have been already told. Meanwhile, I am ordering a court of inquiry about the whole matter that has happened so far just for an official record. Once the court of inquiry is finished you will go back to Comilla.

-Right Sir. বলে সেল্যুট করে বেরিয়ে এসেছিলাম তার অফিস কক্ষ থেকে। কি অদ্ভুত যুক্তি! দোষ করল গাজী গোলাম মোস্তফা আর court of inquiry হবে আমার! বর্তমান অবস্থায় চীফের হুকুম মেনে নিয়ে court of inquiry-র পরিণাম পর্যন্ত চুপচাপ থাকতে হবে সিদ্ধান্ত হল। Court of inquiry শেষ করে কয়েকদিন পর কুমিল্লায় ফিরে এলাম।

মাসখানেক পর জুলাই মাসের শের্ষাধে এক সন্ধ্যায় আমার বাসায় একটা পার্টি ছিল। নিমন্ত্রিত অতিথিরা প্রায় সবাই এসে গেছে। বাইরে ইলশেগুড়ির বৃষ্টি হচ্ছে। হুদা ভাবীও এসে গেছেন কিন্তু হুদা ভাইয়ের পাত্তা নেই। বেশ একটু দেরি করেই এলেন কর্নেল হুদা। ভীষণ শুকনো তার মুখ। অস্বাভাবিক গম্ভীর তিনি। এসে সবার সাথে কুশল বিনিময় করে এককোনায় গিয়ে বসলেন তিনি। বোঝা যাচ্ছিল, কারো সাথে কথাবার্তা বলার তেমন একটা ইচ্ছে নেই তার। সদা উচ্ছল হুদা ভাই এত নিরব কেন? ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকলো। এক ফাঁকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

-কি হয়েছে হুদা ভাই? কোন অঘটন ঘটেনিতো?

-না কিছু না।

নিজেকে কিছুটা হালকা করে নেবার জন্য ড্রিংকসের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। নিম্মী অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। হঠাৎ হুদা ভাই নিম্মীকে ডেকে পাশে বসালেন। প্রশ্ন করলেন,

-আচ্ছা নিম্মী ধর এমন একটা খবর তুমি পেলে যার ফলে তোমার এই সুন্দর সাজানো সংসারটা ওলট-পালট হয়ে গেল, তোমাদের এই সুখ কেউ কেড়ে নিল তখন কি করবে?

নিম্মী অবাক বিস্ময়ে হুদা ভাইকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল,

-আজ আপনার কি হয়েছে হুদা ভাই? কী সব এলএেল বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। বলেন না কি হয়েছে? আমিও এরি মধ্যে তাদের সাথে যোগ দিয়েছি।

-ডালিম ঢাকা থেকে কোন খবর পেয়েছ? জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল হুদা।

-নাতো। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই পেতাম। প্লিজ হুদা ভাই রহস্য বাদ দিয়ে বলেন না কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

-যা হবার নয় তাই হয়েছে। Presidential Order No-9 (PO-9) প্রয়োগ করে আর্মি থেকে ৮জন অফিসারকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তুমি এবং নূরও রয়েছো এই ৮জনের মাঝে। খবরটা অপ্রত্যাশিত; তাই হজম করতে কিছুটা সময় লাগল। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে নিম্মীকে ডেকে বললাম,

-জান, take it easy. নিজেকে সামলে নাও। Don't get upset and spoil the party. Let this be over then we shall think about it. Now be brave as you have allways been and act like a good host ok? মেয়ে মানুষ তার উপর ভীষণ স্পর্শকাতর এবং কোমল প্রকৃতি নিম্মীর। তবুও সেদিন অতিকষ্টে সব কিছুই সামলে নিয়েছিল সে। অতিথিদের কেউই কিছু বুঝতে পারেনি কি অঘটন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। খবরটা তখন পর্যন্ত কেউ জানত না। পার্টি শেষে একে একে অভ্যাগতদের সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। থেকে গেলেন শুধু হুদা ভাই ও ভাবী। ভাবীকে খবরটা দেয়া হল। খবরটা জেনে ভাবী ভেঙ্গে পড়লেন। আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি। নিম্মীও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলোনা; ক্ষোভে-কান্নায় জড়িয়ে ধরল ভাবীকে। আমি ও হুদা ভাই দু'জনে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম। হুদা ভাই বললেন,

-Come on now both of you hold yourselves, this is not the end of the world. Allah is there and He is great. Please stop crying and think what should be done.

নীলু ভাবী কাঁদছেন আর হুদা ভাইকে বলে চলেছেন,

-Gudu you must do something about this injustice. You have to do whatever nessesary. This is simply outrageous you must not take this lying noway get this very clear. নিলু ভাবীর আন্তরিকতায় মন ভরে গেল।

-I got it Nilu I got it, please comedown. I promise you I shall go out of myway to redress this. Nimmi you too please stop crying, don't you have faith on your Huda Bhai? আমাকে বললেন,

-কাল তোমাকে নিয়ে আমি ঢাকায় যাব এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করব। নিম্মী তুমিও যাবে আমাদের সাথে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা থেকে ফোন এল। নূর বলল,

-Sir. we have been sacked under PO-9. We need your presence here as soon as possible. জবাব দিলাম,

-আমি এবং হুদা ভাই কালই আসছি। টেলিফোন রেখে দিলাম। পরদিন ব্রিগেডের সবাই খবরটা জেনে গেল। কর্নেল হুদা সকালেই CO's conference call করলেন। সেখানে তিনি বললেন,

-ডালিম এবং আমি ঢাকায় যাচ্ছি। I can assure you all that I personally shall do everything to redress this shocking injustice. এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমার অসন্তোষও কম নয়।

ঢাকায় এলাম আমরা। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স এ চরম উত্তেজনা। শফিউল্লাহ অফিসে নেই। তিনি নাকি অসুস্থ। জেনারেল জিয়া আমি এসেছি জানতে পেরে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। তিনি সিট থেকে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্বল্পভাষী লোক। বললেন,

-Have faith in Allah. He does everything for the better. This is just the beginning and I am sure manymore heads will roll.

-দোয়া করবেন স্যার। ঠিকই বলেছেন সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে। বললাম আমি।

-We must keep-in touch and you can count on me for everything just as before. For any personal need my doors are always open to you.

-Thank you very much Sir. You are most kind. But you must remain alert as you are our last hope. Future will say what is there in our common destiny.

MS branch থেকে PO-9 এর লিখিত orderটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি ও নূর সেনা সদর থেকে। Retirement order টা যখন হাতে নিচ্ছিলাম তখন মনে পড়েছিল শেখ সাহেব সস্নেহে নিম্মীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কথা দিয়েছিলেন সুবিচার করবেন তিনি। সেই সুবিচারের ফলেই আজ আমি চাকুরিচ্যুত হলাম বিনা কারণে।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে কর্নেল হুদা গিয়ে হাজির হলেন ৩২নং ধানমন্ডিতে। অতি পরিচিত সবকিছুই। কিন্তু এবারের আসাটা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির তাই পরিবেশটা কিছুটা অস্বস্তিকর। রেহানা, কামাল সবাই কেমন যেন বিব্রত! পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য বললাম,

-কি কামাল বিয়ের দাওয়াত পাবোতো? আমার প্রশ্নে লজ্জা পেয়ে কামাল উত্তর দিল,

-কি যে বলেন বস! আমি নিজে গিয়ে আপনাকে ও নিম্মীকে দাওয়াত করে আসব। আপনাদের ছাড়া বিয়েই হবে না। রেহানা চা-নাস্তা নিয়ে এল। হুদা ভাই চুপ করে বসে সবকিছু দেখছিলেন। বাসায় ফিরে এলেন শেখ সাহেব। ডাক পড়ল আমাদের তিন তলার অতিপরিচিত ঘরেই। একাই বসে ছিলেন শেখ সাহেব। ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানাবার পর কর্নেল হুদা বললেন,

-এতবড় অন্যায়কে মেনে নিয়ে চাকুরি করার ইচ্ছে আমারও নেই স্যার। বলেই পকেট থেকে একটা পদত্যাগপত্র বের করে সামনের টেবিলের উপর রেখে তিনি বললেন,

-আমার এই পদত্যাগপত্রের Official copy through proper channel শীঘ্রই আপনার কাছে পৌঁছাবে। তার এধরণের আকস্মিক উপস্থাপনায় কিছুটা বিব্রত হয়েই শেখ সাহেব বললেন,

-তোমরা সবকিছুই একতরফাভাবে দেখ। আমার দিকটা একটুও চিন্তা কর না। একদিকে আমার পার্টি আর অন্যদিকে ওরা। আমি কি করুম? পার্টির কাছে আমি বান্দা। পার্টি ছাড়াতো আমার চলব চলব না। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন,

-তুই আর নূর কাইল আমার সাথে রাইতে বাসায় দেখা করবি।

শেখ সাহেবের সাথে কথা বলার সময় হুদা ভাইয়ের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। পরদিন জেনারেল শফিউল্লাহর অফিসে আমার ডাক পড়ল। চীফ আমাকে নির্দেশ দিলেন কুমিল্লায় আমার আর ফিরে যাওয়া চলবে না। নিম্মীকে পাঠিয়ে জিনিষপত্র সব নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করতে হবে। কর্নেল হুদা এই নির্দেশের জোর প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু শফিউল্লাহ তার সিদ্ধান্ত বদলালেন না। কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না তিনি। কুমিল্লায় ফিরে আমি যদি আবার কোন অঘটন ঘটিয়ে বসি! এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পর যে আর্মি গঠন প্রক্রিয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম রাতদিন; সেই আর্মি থেকে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী বিদায় নেয়ার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল আমাকে। একজন সৈনিকের জন্য এই অবমাননা সহ্য করা খুবই কষ্টকর। আমি ঢাকায় রয়ে গেলাম। হুদা ভাই নিম্মী ও খালাম্মাকে নিয়ে ফিরে গেলেন কুমিল্লায়।

আমাকে কুমিল্লায় ফিরতে না দেয়ায় অফিসার এবং সৈনিকরা অসন্তোষ-ক্ষোভে ফেটে পড়ল। একদিন দুই ট্রাক সৈনিক কুমিল্লা থেকে আমাদের মালিবাগের বাসায় এসে হাজির। আমাকে ওরা নিয়ে যেতে এসেছে। সরকার অন্যায়ভাবে ক্ষমতাবলে আমাকে চাকুরিচ্যুত করেছে; তার উপর যে রেজিমেন্ট আমি শুরু থেকে তিলে তিলে গড়ে

তুলেছি সেই ইউনিটের তরফ থেকে আমাকে বিদায় সম্বর্ধনাও জানাতে পারবে না ইউনিটের সদস্যরা; সেটা কিছুতেই হতে দেবে না তারা। সব বাধা উপেক্ষা করে তারা আমাকে নিয়েই যাবে। পরিণামে যা কিছুই ঘটুক না কেন; তার মোকাবেলা করা হবে একত্রিতভাবে; সে সিদ্ধান্তই নেয়া হয়েছে ইউনিটে। Immotionally charged অবস্থায় পরিণামের বিষয়টি উপেক্ষা করে যে পদক্ষেপ তারা নিতে প্রস্তুত হয়েছে তার ফল তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে সেটা তারা ঠিক বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পারছিলাম। তাই অনেক কষ্টে সবাইকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার যুক্তিগুলো মেনে নিয়ে অনেক ব্যাথা বুকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল তারা। ফিরে যাবার আগে আমার প্রিয় সহযোদ্ধারা বলেছিল, "স্যার আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আমরা সবসময় আপনার সাথে আছি; একথাটা ভুলবেন না কখনো। প্রয়োজনে ডাক দিয়ে দেখবেন আমরা সব বাধা পেরিয়ে আপনার পাশে এসে দাড়াব।" একজন কমান্ডার হিসাবে অধিনস্থ সৈনিকদের কাছ থেকে এ ধরণের দুর্লভ সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এর বেশি আর কি লাভ করা সম্ভব হত চাকুরিতে থাকলেও। বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে পদভারে অনেক জেনারেল এবং কমান্ডার রয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাদের কতজনের ভাগ্যে এধরণের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জুটেছে! আবেগ এবং আত্মতৃপ্তির অনাবিল আনন্দে সেদিন নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি; খুশীর জোয়ার নেমে এসেছিল দু'চোখ বেয়ে। মনে হয়েছিল আমার সৈনিক জীবনের যবনিকাপাত অতি আকস্মিকভাবে ঘটানো হলেও স্বল্প পরিসরের এ জীবন আমার সার্থক হয়েছে। শুধু কুমিল্লা থেকেই নয়; দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকেও অফিসর-সৈনিকরা সুযোগ-সুবিধামত আসতে থাকলো সমবেদনা জানাবার জন্য। সবার একই আক্ষেপ– কেন এমন অবিচার; এতবড় অন্যায়??? জবাবে সবাইকে বলেছি, "স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। তারা ক্ষমতার দম্ভে ভুলে যায় ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়; প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই। আল্লাহতা'য়ালাই সব ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছাতেই যেকোন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে থাকে কিন্তু তার দেয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তিনিই আবার শাস্তি স্বরূপ সে ক্ষমতা কেড়ে নেন। সব অত্যাচারীর ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছে। আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন; এ ঈমানের জোর আমার আছে। আমি তোমাদের দোয়া চাই আর কিছুই নয়।"

ছোট দেশ আমাদের। সেনা বাহিনী আরো ছোট। এ সংগঠনে সবাই সবার খবর রাখে। প্রত্যেকটি অফিসার কে কি চরিত্রের; কার কতটুকু যোগ্যতা এসমস্ত খবরা-খবর সৈনিকরা রাখে। পদাধিকারে প্রাপ্য মর্য্যাদা তারা সবাইকেই দিয়ে থাকে নিয়মাফিক। কিন্তু তাদের মন জয় করা শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা লাভ করতে পেরেছে শুধুমাত্র পরীক্ষিত সৌভাগ্যবানরাই। নীতিগতভাবে পদাধিকার বলে যে সম্মান লাভ করা যায় তার চেয়ে

অর্জিত সম্মানই আমার কাছে বেশি মূল্যবান; তাই চাকুরি জীবনে অধিনস্থ সবাইকে সে ধরণের সম্মানই অর্জন করার জন্য অনুপ্রানিত করার চেষ্টা করেছি সবসময়। আমার সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

হালে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন সফরকালে সেখানে রেডিওতে আমিনুল হক বাদশাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমার বাবা সেনা বাহিনী গড়েছিলেন বলেই মেজররা জেনারেল হতে পেরেছিলেন।" একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি। এটা অতি সত্য কথা যে, মেজর থেকে যাদের জেনারেল বানানো হয়েছিল তাদের অনেকেরই জেনারেল হবার যোগ্যতা ছিল না। কিন্তু তবুও তাদের জেনারেল বানানো হয়েছিল। এর কারণ ছিল শেখ মুজিব চেয়েছিলেন অযোগ্য নেতৃত্বের অধিনে সেনা বাহিনীকে দুর্বল করে রাখতে এবং ঐ সমস্ত অযোগ্য 'খয়ের খাঁ' টাইপের জেনারেলদের মাধ্যমে সেনা বাহিনীকে তার ঠেঙ্গারে বাহিনীতে পরিণত করতে। কিন্তু সেটা ছিল তার দিবাস্বপ্ন মাত্র। বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের উপর ঐ সমস্ত 'জী হুজুর!' জেনারেলরা কোন প্রভাবই বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

নিম্মী ও খালাম্মা গিয়েছিলেন কুমিল্লায়; সংসার গুটিয়ে আনতে। বাসার সব জিনিষপত্র ট্রাকে করে বাই রোড পাঠাবার বন্দোবস্ত করে তারা বাই এয়ার ঢাকায় ফিরবেন। হঠাৎ করেই ব্রিগেড গোয়েন্দা ইউনিট খবর পেলো কুমিল্লা বিমান বন্দর থেকে আওয়ামী লীগের গুন্ডারা নিম্মীকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করেছে। খবরটা পেয়েই কর্নেল হুদা কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। নিরাপত্তার সব দায়িত্ব দেয়া হল ফার্ষ্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের মেজর বজলুল হুদা এবং ক্যাপ্টেন হাইকে। কর্নেল হুদা নিজে তার ফ্ল্যাগ কারে নিম্মী এবং খালাম্মাকে সঙ্গে করে এয়ারপোর্টে এসে তাদের প্লেনে তুলে দিয়েছিলেন। প্লেন take off না করা পর্যন্ত তিনি এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। এভাবেই আমার আর্মি ক্যারিয়ারের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

চাকুরি হারাবার পর অন্য জীবনে

- শেখ সাহেব নূর ও আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন।
- নতুন করে জীবিকার সংস্থানের চেষ্টায় SANS INTERNATIONAL গঠন।
- কোন সম্পর্কই নীতি-আদর্শের উর্ধ্বে নয়।
- সাপ্তাহিক জনমতকে দেয়া জেনারেল (অবঃ) শফিউল্লার সাক্ষাৎকার।
- '৭৪ এর মন্বন্তর। দুর্ভিক্ষের সময়ও ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দুর্নীতি।
- সোনার মুকুট পরে শেখ কামাল ও শেখ জামালের বিয়ে।
- বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা।
- নতুন রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস পার্টির (উপিপি) আত্মপ্রকাশ।
- ১৯৭৪ এর শেষের দিকে এসপি মাহবুব আমাকে সতর্ক করে দেয় বন্ধু হিসাবে।
- আমার প্রাণনাশের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।
- জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ডেকে পাঠালেন।
- সরকারি দলের আরো অনেক নেতাকর্মীদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলা হচ্ছিল।
- আওয়ামী-বাকশালী শোচনীয় ব্যর্থতা সম্পর্কে আর্ন্তজাতিক প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মূল রূপকার ছিলেন পাকিস্তান নৌ বাহিনীর লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন।
- আমার প্রাণনাশের তৃতীয় প্রচেষ্টা।

শেখ সাহেব আমাকে এবং নূরকে দেখা করতে বলেছিলেন; কিন্তু তখন পর্যন্ত দেখা করতে যেতে পারিনি বিভিন্ন ব্যস্ততায়। ব্যাপারটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না। শেখ সাহেব আবার খবর পাঠালেন দেখা করার জন্য। গেলাম আমি ও নূর ৩২নম্বরেই দেখা করতে। সালাম দোয়া বিনিময়ের পর শেখ সাহেবই শুরু করলেন,

– দেখ্ আমার কিছুই করার ছিল না। নেহায়েত অপারগ হয়েই তোদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আমাকে। জানি আমার এই সিদ্ধান্তে মনঃক্ষুন্ন হইছস তোরা: হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি তোদের জন্য কিছু একটা করতে চাই। বিদেশে দূতাবাসে চাকরি করতে চাইলে সেই ব্যবস্থা কইরা দিতে পারি। ব্যবসা করতে চাইলে নাসেররে কইয়া সে ব্যবস্থাও কইরা দিতে পারি; ওর অনেক ধরণের ব্যবসা আছে। তার সাথেও তোরা যোগ দিতে পারছ।

– চাচা আমরা সৈনিক মানুষ। সেনা বাহিনীর চাকরি স্বেচ্ছায় নিয়েছিলাম টাকা-পয়সার লোভে নয়; সম্মান এবং দেশের সেবা করার জন্যই। সেটাই যখন আপনার বিচারে হারাতে হয়েছে তখন আপনার কাছে আমাদের আর অন্য কিছুই চাওয়ার নাই। এরপরও আপনি আমাদের জন্য যদি কিছু করতে চান সেটা আপনার মহানুভবতা। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন সেটাই যথেষ্ট। রিজিকের মালিক আল্লাহ। খেয়ে-পড়ে বাঁচার মত কিছু একটা করতে পারব আপনাদের দোয়ায় ইনশাল্লাহ। জানিনা আর দেখা হওয়ার সুযোগ হবে কিনা? বেয়াদবী নেবেন না চাচা, একটা কথা আপনাকে বলে যাই। আপনার আশেপাশে যারাই সর্বক্ষণ আপনাকে ঘিরে রাখছে তাদের বেশিরভাগই মতলববাজ। দেশের অবস্থা এবং জনগণ সম্পর্কে তারা আপনাকে সঠিক কথা বলে না। যা শুনলে আপনি খুশী হবেন চাটুকাররা সেটাই বলে থাকে মতলব হাসিল করার জন্য। খোদা না করুক তেমন দুর্দিন যদি কখনো আসে তবে এদের কেউই আপনার সাথে থাকবে না; চলে যাবে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। তখন সেই অবস্থার জন্য সব দায়দায়িত্ব আপনার উপরই আরোপ করা হবে এবং অবস্থার মোকাবেলাও করতে হবে আপনাকেই। আপনি সবসময় বলে থাকেন যে দেশের জনগণকে আপনি ভালো করে চেনেন; কিন্তু আজ আমি বলে যাচ্ছি জনগণ থেকে বর্তমানে আপনি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন কিংবা আপনাকে করা হচ্ছে। আপনি আমাদের স্নেহ করেন। আমাদের চাকুরিচ্যুত করে আপনার কতটুকু লাভ হয়েছে সেটা আপনিই ভালো বোঝেন; তবে আমরা কিন্তু বরাবরই আন্তরিকভাবে আপনার ভালোই চেয়েছি। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে অনেক দিয়েছেন। আপনারতো আর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই থাকতে পারে না। 'চাটার দল' ছেড়ে দেশ ও জাতির নেতা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত আপনার। তারই মধ্যে রয়েছে আপনার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ত্যাগ ও পরিশ্রমের সার্থকতা।

শেখ সাহেব আমার কথাগুলো চুপচাপ শুনছিলেন আর পাইপে মৃদুমৃদু টান দিচ্ছিলেন। তিনি কিছু বলছেন না দেখে আমি বললাম,

-আমরা তাহলে এবার আসি? তিনি অনুমতি দিলেন। আমরা বেরিয়ে এলাম ৩২ নম্বর থেকে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই কথাগুলি বলেছিলাম তাকে: ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি বলেই ; এর কতটুকু তিনি বুঝেছিলেন জানি না।

এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়লাম জীবিকা সংস্থানের চেষ্টায়। আমার ছোট ভাই স্বপনের সাথেই ব্যবসা করব ঠিক করলাম। সে ব্যবসাতে অভিজ্ঞ। এমবিএ-তে ভালো রেজাল্ট করার পর থেকেই ব্যবসা করছে স্বপন। কর্নেল আকবর ও মেজর শাহরিয়ার ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছায় চাকুরি ছেড়ে দিয়েছে আমরা চাকুরিচ্যুত হওয়ার পর। মেজর শাহরিয়ার 'শ্যেরী এন্টারপ্রাইজ' নামে কোম্পানী খুলে ব্যবসা শুরু করল। কর্নেল আকবর আমাদের সাথে যোগ দিবেন ঠিক করলেন। স্বপন, কর্নেল আকবর, মেজর নূর এবং আমার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে গঠন করা হল 'SANS INTERNATIONAL'. চাকুরিচ্যুত হওয়ায় বাধ্যবাধকতার ঝামেলা অনেক কমে গেল। অবাধে সব জায়গায় ইচ্ছামত যোগাযোগের সুযোগ পেলাম আমরা। সরকার ও সরকারি দল আমাদের প্রতি বিরূপ থাকলেও অনেক হিতৈষী এবং সুজন ব্যবসায় আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে ঝুঁকি নিয়েও অনেকে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাদের সেই সাহায্য ও আন্তরিক সহযোগিতার ঋণ কখনোই শোধ করার নয়। পরিচয় নেই এমন অনেকেও সেই দুর্দিনে নাম শুনেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহানুভূতির সাথে। ছোটখাটো ইম্পোর্ট এবং সাপ্লাই এর ব্যবসা আমাদের অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। টাকা-পয়সার আমদানি হচ্ছিল ভালোই। আইআরডিপিতে সাপ্লাই কন্ট্রাকটার হিসাবে দেশের প্রায় সব থানাতেই কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। এতে করে সব মহলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার বিশেষ সুবিধা হয়েছিল আমাদের। শহর-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে সর্বস্তরের লোকজনদের সাথে মিশে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মনোভাব বোঝার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। বুঝতে পারছিলাম সরকারের অপশাসন আর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে দেশের সাধারণ মানুষ। যেখানেই গেছি পরিচয় জেনে লোকজন সম্মান দেখিয়েছেন; শ্রদ্ধার সাথে নিঃস্বার্থভাবে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করেছেন আমাদের কাজে। এভাবেই কাটছিল আমাদের সময়।

একদিন বেশ রাত করে ধানমন্ডির এক বন্ধুর বাসার পার্টি থেকে ফিরছিলাম আমি ও নিম্মী। মশুলধারে বৃষ্টি পড়ছে। অল্পদূরেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ইন্টারকন ছেড়ে পুরনো গণভবন মানে বর্তমানের সুগন্ধার কাছাকাছি এসেছি: হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে একটি গাড়ি অতি দ্রুতগতিতে আসছে দেখলাম। দূর থেকেই গাড়ির ভিতর

থেকে হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিছু উশৃঙ্খল তরুন বেসামাল অবস্থায় হৈ-হুল্লোড় করছিল। গাড়িটিও এগিয়ে আসছিল ঠিক একই অবস্থায় একেবেকে। নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য গাড়ি একটু সাইড করতেই গাড়ি স্কিড্ করে গিয়ে জোরে মুখোমুখি ধাক্কা খেল সামনের ল্যাম্পপোষ্টের সাথে। জোরে ধাক্কা লাগায় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। সামনের বনেটটাও দুমড়ে-মুচড়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। গাড়ি কিছুতেই আর স্টার্ট নিচ্ছে না। অন্য গাড়িটি আমাদের অবস্থা দেখে না থেমে আরো দ্রুতবেগে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। বৃষ্টির প্রচন্ডতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। রাত অনেক হয়েছে তার উপর এমন বৃষ্টি তাই রাস্তাও একদম ফাঁকা। ষ্টিয়ারিং এর সাথে মাথা লেগে মাথা ফেটে রক্ত ঝরে পরছে আমার কপাল বেয়ে। নিম্মীর অবশ্য কিছুই হয়নি। আমার রক্ত দেখে ঘাবড়ে গেছে বেচারী। কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ইঞ্জিনটা একটু নেড়েচেড়ে দেখছিলাম যদি কোনমতে গাড়িটা স্টার্ট নেয়। না; কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হঠাৎ সাইরেন বাজিয়ে রাষ্ট্রপতির কাফেলা এগিয়ে আসছে দেখতে পেলাম। আমি তখন অসহায় অবস্থায় দাড়িয়ে আছি গাড়ির পাশে। কাফেলা কাছে আসতেই রাষ্ট্রপতির গাড়ি দাড়িয়ে পড়ল। গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি মুখ বের করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার? কপালের রক্তক্ষরণ দেখে বুঝতে পারলেন গাড়ির এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মুহূর্তে তিনি তার একজন সহযোগীকে নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে গাড়িতে করে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তার হুকুমে আমি ও নিম্মী তার কাফেলারই একটি গাড়িতে করে CMH-এ পৌঁছালাম। চিকিৎসার পর তার গাড়িতেই বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরে দেখি বাসার সবাই উৎকণ্ঠিত অবস্থায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি বাড়ি ফিরেই মালিবাগে আমাদের দুর্ঘটনার খবরটা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফোনে অবশ্য জানানো হয়েছিল accident তেমন একটা serious নয়; তাই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আব্বাকে আস্বস্ত করার জন্য বলা হয়েছিল দুর্ঘটনাস্থলের কাছ দিয়ে যাবার সময় আমাদের দেখতে পেয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই আমাদের গাড়ি করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেছেন। সবাইকে দুঃশ্চিন্তামুক্ত করার জন্য বলেছিলাম, "Injury is not serious at all only three stitches that's all. So nothing to worry about and Nimmi is absolutely unhurt."

এ ঘটনার অবতারনা এখানে এর জন্য করা হল যা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন ব্যক্তি এবং পারিবারিক পর্যায়ে মুজিব পরিবারের সাথে আমাদের কি ধরণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু কোন সম্পর্কই নীতি-আদর্শের উর্দ্ধে নয়। তাই আমিও পারিনি আপোষ করতে ব্যক্তি মুজিব নয়; গণবিরোধী পুতুল সরকার প্রধান, গণতন্ত্রের হত্যাকারী, বাকশালী স্বৈরশাসনের প্রবর্তক শেখ মুজিবর রহমানের সাথে।

সেনা বাহিনীতে চাকুরিরত অবস্থায় আমাদের তৎপরতা সম্পর্কে মেজর রফিক পিএসসি তার গ্রন্থ 'বাংলাদেশ! সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সঙ্কট'-এ লিখেছেন, "সমসাময়িক ইতিহাসে কম্বোডিয়া, গণচীন, কিউবা, ভিয়েতনাম তথা সর্বত্রই মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন হবার পর ক্ষমতা দখল করেছে। শুধু বাংলাদেশেই ঘটেছে এর ব্যতিক্রম। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর অস্ত্র সমর্পন করেছে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে; দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী অফিসার-সৈনিকেরা স্বাভাবিকভাবেই দেশের দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতি দেখে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। সেনা বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকরা সরকার পরিচালনার মত একটি দূরহ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। মেজর ডালিম, মেজর পাশা, মেজর বজলুল হুদা, মেজর শাহরিয়ার তখন কুমিল্লা সেনা নিবাসে চাকুরিরত ছিলেন। এরা প্রায়ই অবসর সময়ে মিলিত হতেন এবং দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আওয়ামী লীগের দুর্নীতিবাজ লোকদের নিয়ে সরকার পরিচালনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। এভাবে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭২ সালে কুমিল্লা সেনা নিবাসে কর্নেল তাহের ও ঢাকা সেনা নিবাসে কর্নেল জিয়াউদ্দিন প্রতি সপ্তাহে ষ্টাডি পিরিয়ডের নামে অফিসারদের সমবেত করে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে তরুণ অফিসারদের সঙ্গে সমালোচনায় লিপ্ত হতেন।"

জনাব রফিক তার একই গ্রন্থে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং রেডক্রস চেয়্যারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা লেডিস ক্লাবে বিয়ের অনুষ্ঠানে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছিলেন সে সম্পর্কে লিখেছেন, "৩২নং ধানমন্ডিস্থ শেখ মুজিবের বাসভবনে শেখ মুজিবের সামনে ডালিম নিজের জামা খুলে মুক্তিযুদ্ধের সময় পিঠে এবং হাতে গুলির আঘাতের ক্ষত দেখান এবং বলেন, 'আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি আপনার এই গুন্ডারা সেদিন কোথায় ছিল?' শেখ মুজিব দুই পক্ষকে শান্ত করে সুবিচারের আশ্বাস দিয়ে তাদের বিদায় করেন। এদিকে মেজর ডালিম ও তাঁর স্ত্রীকে হেস্তনেস্ত করায় ঢাকা সেনা নিবাসে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই অপ্রীতিকর ঘটনার প্রেক্ষিতে মেজর ডালিম ও মেজর নূরকে সেনা বাহিনীর চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এই ঘটনাটি সামান্য হলেও সেনা বাহিনীর সকল স্তরে একটি চাপা অসন্তোষের সৃষ্টি করে। মেজর ডালিম সাধারণ সৈনিকদের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন।"

মুজিব সরকার এবং সেনা বাহিনীর সম্পর্ক, সেনা বাহিনীর প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক 'জনমত'-কে ২৮শে আগষ্ট দেয়া এবং ৩রা

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ এর সংখ্যায় প্রকাশিত মেজর জেনারেল (অবঃ) কেএম শফিউল্লাহর সাক্ষাৎকার থেকে:-

প্রশ্ন: আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক নাকি ততটা ভালো ছিল না। কথাটা কি সত্য বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর আস্থা ছিল। কিন্তু পুরো সামরিক বাহিনীর উপর তাদের আস্থা ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার পর আপনাকে কেন চীফ অফ স্টাফ নিযুক্ত করা হল?

উত্তর: এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ওসমানী সাহেবের কোন সিদ্ধান্ত নয়।

প্রশ্ন: রক্ষীবাহিনী গঠন করার আগে আওয়ামী লীগ সরকার এ ব্যাপারে কি আপনার সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা করেছিল?

উত্তর: না। তবে গঠন করার পর আমাকে বলা হয়েছিল রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসাবে। তবে লোকমুখে আমি শুনেছি যে, রক্ষীবাহিনী গঠন করা হচ্ছে আর্মড ফোর্সের জায়গা পূরণের জন্য।

প্রশ্ন: সামরিক বাহিনীর সাথে রক্ষীবাহিনীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর: সম্পর্ক ভালো ছিল না। তার কতগুলো কারণ ছিল। তখন গুজব ছড়িয়েছিল যে, রক্ষীবাহিনীকে আর্মির জায়গায় বসানো হবে। নতুন বাহিনী হিসাবে রক্ষীবাহিনীকে তখন সবকিছুই নতুন জিনিষপত্র দিয়ে সাজানো হচ্ছিল। এদিকে আর্মি দেখছে তাদের সেই পুরাতন অবস্থা। এগুলো দেখে আর্মড ফোর্সের অনেকের মনে আঘাত লাগে। যার ফলে সম্পর্কটা খারাপ রূপ নেয়। তবে এ ব্যাপারে সরকার একটা ভুল করেছিলেন, তা হল রক্ষীবাহিনীকে 'power of arrest and search' দেওয়া। এতে সামরিক বাহিনীর অনেকেই ক্ষুব্ধ এবং চিন্তিত হন। শুধু তাই নয়; রক্ষীবাহিনী এই সময় সেনা বাহিনীর অনেক অফিসারকে লাঞ্ছনা পর্যন্ত করে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা সেনা বাহিনীর চেয়েও বেশি।

প্রশ্ন: শেখ মুজিবর রহমান সামরিক বাহিনীর উন্নতির পক্ষে ছিলেন না, এ কথা কি সত্য?

উত্তর: হ্যাঁ। আমি বলবো একথা সত্য।

প্রশ্ন: গাজী গোলাম মোস্তফার সাথে লেডিস ক্লাবে মেজর ডালিমের অপ্রীতিকর ঘটনার পর সেনা বাহিনীর চীফ অফ স্টাফ হিসাবে কি কোন কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তর: যখন গোলমালের খবর আমি জানতে পারি তখন ডালিমের পক্ষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই এর একটা বিচারের জন্য। বঙ্গবন্ধু আমার উপর রেগে গেলেন। তখন আমি বললাম, 'বঙ্গবন্ধু আমি যদি আমার অফিসারদের জন্য না বলি তাহলে কে বলবে? গাজী গোলাম মোস্তফার এই ঘটনা আপনি তদন্ত করে দেখুন। আপনি যদি এ ব্যাপারে সাহায্য চান তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। যেহেতু ওরা গাজীর বিরুদ্ধে এবং আমিও তাদের পক্ষে, তাই গাজীর বিরুদ্ধেই বলেছি। তাই তিনি খুব খুশী হননি। তিনি শুধু বললেন, 'শফিউল্লাহ, আপনি জানেন কি যে আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন? (ইংরেজি ভাষায়) আমি বললাম, 'আমি জানি স্যার। আমি আমার জন্য কথা বলছি না: আমি কথা বলছি আপনার জন্য স্যার; মানুষ আপনাকে সত্য বলেনি। ঐ সময় জিয়া ও শাফায়াত জামিলও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন: তারপর কি হল?

উত্তর: তারপর আমরা ওখান থেকে কোন বিচার না পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হয়ে চলে আসি। পরে দেখা গেল সরকার মেজর ডালিমকে সেনা বাহিনী থেকে বরখাস্ত করলেন।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ছিলেন সরাসরিভাবে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ছত্রছায়ায়। যুদ্ধের পরপরই চট্টগ্রাম বন্দরে পাক বাহিনীর পাতা মাইন অপসারন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ডুবে যাওয়া জাহাজ উদ্ধারের উছিলায় সোভিয়েত নৌ বাহিনী এবং ভারতীয় নৌ বাহিনীর মিলিত একটি বহর চট্টগ্রামে আসে। তারা বন্দরের একটা বিশাল এলাকা নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে সেই এলাকাকে 'নিষিদ্ধ এলাকা' ঘোষণা করে। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী কিংবা নৌ বাহিনীর সদস্যরাও ঐ এলাকায় প্রবেশ করতে পারত না। নৌ বহরটি দীর্ঘ দুই বৎসরকাল সেখানে অবস্থান করে। শুধুমাত্র মাইন এবং ডুবে থাকা জাহাজগুলো উদ্ধার করা ছাড়াও তারা সন্দেহমূলক অনেক প্রকার জরিপ পরিচালনা করে উপকূল এবং সমুদ্রসীমার সব এলাকায়। তাদের এই দীর্ঘ সময় অবস্থান এবং সন্দেহমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল শেখ মুজিবের অনুমতিক্রমে। সোভিয়েত-ভারতের প্রতি আওয়ামী লীগ সরকারের নতজানু নীতির একটি প্রকট উদাহরণ সোভিয়েত-ভারত নৌ বহরের চট্টগ্রামে এই ধরণের সন্দেহমূলক দীর্ঘকালীন উপস্থিতি। পরবর্তিকালে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, সোভিয়েত-ভারত নৌ বহর দীর্ঘ সময় চট্টগ্রামে অবস্থান করে সমগ্র উপকূলাঞ্চল এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ২০০ মাইল ইকোনমিক জোনে উদীয়মান বিশাল ভূখন্ড, তেল-গ্যাস এবং অন্যান্য মেরিন সম্পদ; সোভিয়েত এবং ভারতীয় নৌ বাহিনীর ব্যবহারের জন্য নৌঘাটির উপযুক্ত স্থান নির্নয় প্রভৃতি বিষয়েই গোপন জরিপের কাজ সম্পন্ন করেছিল তারা নিজেদের স্বার্থে:

বাংলাদেশ সরকারকে উপেক্ষা করে। এসমস্ত খবর জানার পরও আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে কোন প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি। টু শব্দটি পর্যন্ত করার ক্ষমতা ছিল না তাদের তথাকথিত মৈত্রীচুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে।

২৫-২৬শে মার্চ এর কালরাত্রি এবং আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং ইন্দিরা গান্ধীর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মেজর রফিকুল ইসলাম তার বই 'বাংলাদেশ! সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সঙ্কট'-এ লিখেছেন, "পাক সামরিক জান্তার ২৫-২৬শে মার্চের হামলার পর একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা এবং পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ জনগণকে কামানের গোলার মুখে ফেলে রেখে কোলকাতায় পাড়ি জমালেন। অখন্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা পন্ডিত নেহেরুর সুযোগ্য কন্যা এবং উত্তরাধিকারিনী মিসেস গান্ধী এমন একটা মহেন্দ্রক্ষণকে যথাসময়েই কাজে লাগালেন। এ সময়ে দক্ষিন এশিয়ায় দিল্লীর পয়লা নম্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করে দুর্বল করার পরিকল্পনা ছাড়াও ইন্দিরা সরকারের আরেকটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম বাংলাসহ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বামপন্থীদের (মার্কসবাদী/লেনিনবাদী) দ্বারা পরিচালিত বিকাশমান গণযুদ্ধকে শেষ করে নিঃক্রিয় করে দেওয়া। ইন্দিরা গান্ধী একই সাথে এ দু'টো কাজেই সফলকাম হন।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর একদিন শেখ কামাল এবং শেখ রেহানা সত্যিই এল আমাদের মালিবাগের বাসায় বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাতে। দুই ভাইয়ের একই সাথে বিয়ে। শেখ জামাল ইতিমধ্যে যুগোস্লাভিয়ায় গিয়েছিল সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে কিন্তু ওখানকার পরিবেশ ভালো না লাগায় পরে কিছুদিন স্যান্ডহার্টসে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে কমিশন্ড অফিসার হিসাবে যোগ দিয়েছে জেনারেল শফিউল্লাহর নিজস্ব ইউনিট ২য় ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে কিছুটা নিয়ম বর্হিঃভুতভাবেই। বিয়ে হয়েছিল নতুন গণভবনে। বিশাল আয়োজন। অগুনিত অতিথির ভীড়। মনে হচ্ছিল পুরো ঢাকা শহরটাই এসে উপস্থিত হয়েছে বিয়েতে। বর্নাঢ্য জাকজমক পরিবেশে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। বিয়ের মন্ডপে কামাল-জামাল দুই ভাই সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে বর সেজে বসেছিল। বিয়ের পরদিন প্রায় সবগুলো দৈনিক পত্রিকায় বড় করে ছাপানো হল প্রধানমন্ত্রীর দুই ছেলের সোনার মুকুট মাথায় পড়ে বিয়ের খবর। একই পাতায় ছাপানো হয়েছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট, হাড্ডিসার মুমুর্ষ মানুষ নামি কঙ্কালের ছবি এবং দুর্ভিক্ষের খবর। ১৯৭২ সালে কোন এক বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, "কবে যে বাংলাদেশের মেয়েরা স্বর্নালঙ্কার বাদ দিয়ে বেলী ফুলের মালা পড়ে বিয়ে করবে!" তার এই খায়েশটাও বেশ ফলাও করে বেরিয়েছিল খবরের কাগজগুলোতে। কিন্তু

রাজনীতিবিদদের কথা আর কাজের মধ্যে কত তফাৎ! বিয়ের ব্যাপারটা হয়তো বা ছোট কিন্তু এ বিষয়টি বেশ আলোচিত হয়েছিল সব মহলেই।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালীন অবস্থায় রিলিফ সামগ্রী নিয়ে র্দুনীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৩ই আগষ্ট ১৯৯২ সালে সংসদে তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আওয়ামী লীগ আমলে রিলিফ চুরি এমন পর্যায়ে হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবকেও আক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, 'আমার কম্বল গেল কোথায়?' (বিচিত্রা ২১শে আগষ্ট ১৯৯২) তার এ বক্তব্য রাখার সময় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তার পক্ষে খালেদা জিয়ার ঐ বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রসঙ্গে জনাব বদরুদ্দিন আহমেদ তার বই 'স্বাধীনতার নেপথ্য কাহিনী'-তে লিখেছেন, "মুক্তি বাহিনীর তরুণরা সারাদেশের মানুষের মন জয় করেছিল। তাদের আত্মত্যাগ ইতিহাস হয়ে আছে। তাদের দেশাত্মবোধ ভাস্বর হয়ে থাকবে। কেউ বলতে পারবে না মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা লুট করেছে; ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য মানুষকে হত্যা করেছে; কোন নারী অপমানিত হয়েছে তাদের হাতে। মুক্তিযোদ্ধাদের সেই ভাবমুর্তি নষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন যুব নেতারা। নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অদ্ভুত খেয়ালে দেশটাকে যে তারা কোথায় নামিয়ে দিলেন সে কথা একবারও স্মরন হল না তাদের। রেডক্রস চেয়্যারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন শেখ মনি, তোফায়েল, রাজ্জাক। গাজী শেখ মুজিবের অত্যন্ত প্রিয় এবং তার পরিবারের একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। শুরু হল লুটের তান্ডব। রিলিফের মাল, অবাঙ্গালীদের দোকান, গোডাউন, বাড়ি-ঘর সব লুট করা হল গাজী ও তরুণ নেতাদের নির্দেশে। সারা দেশময় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল লুটতোরাজ। 'সিক্সটিনথ্ ডিভিশন' ও মুজিব বাহিনীর সদস্যরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এই প্রকাশ্য লুটপাটে। এই লুটপাটের তান্ডব বন্ধ করার কোন পদক্ষেপই নিলেন না শেখ মুজিব।"

সরকারি দল ও তাদের পেটোয়া বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো তাদের সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সর্বহারা পার্টি এবং জাসদের কর্মীরাই সরকার বিরোধিতায় মারাত্মকভাবে তৎপর। অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রগতিশীল সংগঠনগুলো তাদের সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়ছে। জনগণ সাধারণভাবে আওয়ামী ঐক্যজোটের বিরুদ্ধে। ঐক্যজোটের স্বৈরাচারী নির্যাতনে জীবন ও জীবিকার তাগিদে সবাই দিশেহারা। জাসদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, লেনিনবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি, সর্বহারা পার্টি, জাতীয় লীগ ইত্যাদি

দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং তাদের গোপন সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে। তাদের মধ্যে সরকার বিরোধিতার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে ঐক্যমতও রয়েছে। জনগণও আজ পিছিয়ে নেই। তারাও আজ আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরপরও কোন একটি দলের পক্ষেই পর্যাপ্ত পরিমাণের শক্তি এবং প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে না সরকারি নিষ্পেষণের কারণে। ফলে জনগণ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের পেছনে দাড়াতে ভরসা পাচ্ছে না। তারা এটাও লক্ষ্য করছে যে. বিরোধী দলগুলো মোটামুটিভাবে সরকার বিরোধী একই রকমের বক্তব্য রাখছে; একইভাবে সরকারের বিরোধিতা করছে কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না; দলগুলোর মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য না থাকায় এবং তাদের বক্তব্য এবং মতামতের মধ্যে একটা মৌলিক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়ায় তারা চাইছিল সব বিরোধী দল এবং সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হোক। এ ব্যাপারে কিছু নির্দলীয়, রাজনৈতিকভাবে সচেতন, দেশপ্রেমিক ব্যক্তি নিজেরা উদ্যোগ নিয়েছিল ঐধরণের একটা ঐক্য প্রচেষ্টার। লেখকেরও এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বিরোধী দলগুলোর কোনটাই সরকারের নির্যাতন এবং দমন নীতির মুখে এককভাবে দাড়াতে পারবে না: এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত ছিল না। গণআন্দোলন এবং সরকার বিরোধী সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে পর্যায়ক্রমে; এ ব্যাপারেও ঐক্যমত ছিল। এই দু'টো মূল বিষয়ই ছিল ঐক্য প্রচেষ্টার ভিত্তি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং আগামী দিনগুলোতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে কারো পক্ষেই শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না বরং দলগুলোর বিলুপ্তি ঘটারই সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে: এ বিষয়টিও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। তাছাড়া সরকার যেভাবে দেশে প্রকাশ্য রাজনীতির পরিধি ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত করে আনছে তাতে করে অচিরেই আগামীতে দেশে একদলীয় শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে। সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে সরকার বিরোধী কিছু করতে গেলে তাতে শক্তিক্ষয়ই ঘটবে কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। গোপনে বৈঠকের পর বৈঠক চললো। আলোচনাকালে বোঝা গেল ঐক্যের পক্ষে যারা; তারা শীর্ষ নেতাদের জন্য তেমনভাবে তাদের মতামতও প্রকাশ করতে পারছিলেন না। সারকথা, বুঝতে পারা যাচ্ছিল ঐক্যের পথে মূল বাধা নেতারা। আবিষ্কার করতে পারলাম এর কারণও রয়েছে অনেক:- নেতৃত্বের কোন্দল, অতীতের তিক্ততা, অবিশ্বাস, নেতাদের বিভিন্ন দুর্বলতা এবং নীতিগত ভুলের জন্য অতীতের ব্যর্থতা। এসব জটিল সমস্যাগুলোর উর্ধ্বে উঠার মত মানসিকতা নেতাদের মাঝে নেই। তার উপর ঐক্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে নেতৃত্বের কোন পদে কে থাকবেন: সেই প্রশ্নটি। নেতাদের সবাই যার যার হাতে সাড়ে তিন হাত! সবাই নিজেকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করছেন। এ ধরণের মনোভাব এবং পরিস্থিতিতে কোন ঐক্য গড়ে তোলা অসম্ভবই নয় অবাস্তবও বটে। তাই আমরা সেই উদ্যোগ থেকে সরে দাড়াব ভেবেছিলাম এক সময়। কিন্তু

পরে সিদ্ধান্ত হল ভেঙ্গে পরলে চলবে না; ধৈর্য্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সব নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ থাকলেও তাদের প্রত্যেকেই আমাদের আন্ত রিকতার তারিফ করেছিলেন। পরিশেষে আমাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একদিন কর্নেল আকবর এসে বললেন যে, এদের নিয়ে কোন ঐক্য গড়ে তোলা কিছুতেই সম্ভব নয় বলেই তিনি, কাজী জাফর, মেনন এবং রনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার। এই দলে আমাকে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে যোগদানের প্রস্তাব দিলেন তিনি। জবাবে আমি বলেছিলাম, "এত তাড়াতাড়ি হতাশ হলেতো চলবে না; ঐক্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যেখানে পুরনো দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে তাদের অস্তিত্বই বজিয়ে রাখতে পারবে না বলে মনে করা হচ্ছে সেখানে আর একটি নতুন দল করে লাভটা কি হবে? এরপরও আপনারা দল করতে চান ভালো কথা; তবে আমার জন্য এই মুহূর্তে র্নিদলীয় থাকাটাই উচিত হবে বলে মনে করি। আপনাদের দলে যোগ না দিলেও সময়মত আমরা সবাই একত্রিত হব কোন বৃহত্তর স্বার্থে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" এর অল্প কয়েকদিন পরেই United People's Party (UPP) আত্মপ্রকাশ করে। কর্নেল আকবর সেই পার্টিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন। এরপরও আমাদের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে।

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে আমার ছোট ভাই স্বপনের বিয়ে ঠিক হল আমারই ফুপাতো বোন গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামালুদ্দিনের কন্যা- মুন্নির সাথে। এয়ারফোর্স মেসে রিসেপ্সনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইখানে এসপি মাহবুব এক ফাঁকে আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল,

– ডালিম বন্ধু হিসাবে একটা কথা বলছি কিছু মনে করিস না। ওর কথার ধরণ দেখে বললাম,

– ভনিতা ছেড়ে আসল ব্যাপারটা কি বলে ফেলতো।

– দেখ্, আমি চাইনা তোর কোন বিপদ হোক। বন্ধু হিসাবে তোকে সাবধান হতে অনুরোধ করছি। Please be careful. কিছুদিনের মধ্যেই সিরাজ সিকদার ধরা পড়বে। This is certain. But I don't care about it, what is bothering me is that during interrogation of one of his close associate your name has also come up. তার এক close comrade এর নোটবুকে তোর নাম পাওয়া গেছে।

– কারো নোটবুকে আমার নাম পাওয়া গেলে আমি কি করতে পারি? প্রশ্ন করলাম আমি।

– Well you are matured enough. আমি বলছি please be very very careful about your movements and be causcious about the people you meet that is what is needed. I am pretty serious, do you understand? আমাদের দু'জনকে একসাথে দেখতে পেয়ে একজন বেয়ারা এসে জানাল খাবার দেয়া হয়েছে। দু'জনেই খাবারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। খাচ্ছিলাম আর মাহবুবের কথাগুলোর বিষয়ে ভাবছিলাম। যতটুকু সম্ভব স্পষ্ট ঈঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে মাহবুব। আরো সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হবে আমাকে। সরকারের বিশেষ মহলের সুনজরে পরে গেছি। অতএব সাবধান! খুব সাবধান হতে হবে আমাকে। খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে সিরাজ সিকদার; এ কথাটা এত জোর দিয়ে কি করে বলতে পারলো মাহবুব? তবে সরকার নিশ্চয়ই কোন ফাঁদ পেতেছে; যে ফাঁদ বুঝতে না পেরে সিরাজ সিকদার ধরা পড়বে। নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে মাহবুবের মত লোক এত দৃঢ়তার সাথে কথাটা বলতো না। সংবাদটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশ্লিষ্ট মহলে পৌঁছে দিতে হবে। সাবধানের মার নেই। পরদিনই খবরটা জায়গামত পৌঁছে দিয়ে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। জবাব পাওয়া গিয়েছিল তেমন কোন আশঙ্কার কারণ নেই।

মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকায় টয়েনবি সার্কুলার রোডের উপর আমাদের SANS International এর অফিস। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে নিত্য নানা ধরণের লোক আসা-যাওয়া করছে। বিভিন্ন ধরণের লোকজন আসতো আমাদের অফিসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাও আসতো জনতার স্রোতে মিশে। সে অবস্থায় কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির নোটবুকে আমার নাম পাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু যেটা ভাবনার বিষয় সেটা হল, সর্বহারা পার্টির গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তির নোটবুকে আমার নাম পাওয়া গেছে; সেটাই আশঙ্কার বিষয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও আমার যোগাযোগ রয়েছে সে বিষয়ে কিন্তু মাহবুব কিছুই বলল না। তবে কি বুঝে নিতে হবে সর্বহারা দলের সদস্যদের সাথে আমিও সরকারের priority target-তে পরিণত হয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হল। সবাই মত প্রকাশ করল মাহবুবের ঈঙ্গিতকে হালকাভাবে দেখা ঠিক হবে না। উপযুক্ত নিরাপত্তার সাথেই আমাকে চলাফেরা করতে হবে। তবে জীবনের স্বাভাবিকতাও বজিয়ে রাখতে হবে। যেকোন অস্বাভাবিক আচরণ সরকারি মহলকে আরো সন্দিহান করে তুলবে। ইতিমধ্যে পার্টির অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও যুব নেতাদের প্রভাবে শেখ মুজিব বিদেশ সফর থেকে দেশে ফিরে জনাব তাজুদ্দিনকে তার মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। জনাব তাজুদ্দিনের নীতি

এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম সমর্থন করতে পারিনি আমরা সংগ্রামকালে; কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে জনাব তাজুদ্দিনের অনেক চারিত্রিকগুন ছিল যার জন্য তাকে শ্রদ্ধা করতাম আমরা। তার 'পদত্যাগের' খবরটা পেয়ে সেই সন্ধ্যায়ই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম তার মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে। তিনি বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য গোছগাছ করছিলেন। বাড়ির লনে বসেই আলাপ হল। আলাপ শেষে বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক তখন তিনি হঠাৎ করে জানতে চাইলেন, ভবিষ্যতে যোগাযোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাঁর সাথে দেখা করব কিনা? জবাবে বলেছিলাম, আমার তরফ থেকে কোন বাধা নেই। ঠিক হল যোগাযোগ হবে গোপনে।

সারিয়াকান্দী এবং ধুনটেতে তখন আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। একদিন আমার উপর দায়িত্ব পড়ল কিছু মেশিনপত্র নিয়ে প্রজেক্ট পরিদর্শনে যেতে হবে। স্বপন ব্যবসার কাজে দেশের বাইরে; নূরও বিশেষ একটা কাজে ঢাকাতেই আটকে পড়েছে; তাই বাধ্য হয়েই আমাকে ঐ দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ট্রাকে মাল ভর্তি করে রওনা হলাম। আমি নিজের গাড়িতেই যাব কারণ আমাকে তাড়াতাড়ি আবার ঢাকায় ফিরতে হবে অন্য আরেকটি কাজে। আরিচা ঘাটে পৌছে দেখি ফেরি বিভ্রাট। নগরবাড়ি ঘাটে পৌছালাম বেশ রাত করে। রাতে ড্রাইভ করা সেই সময় ছিল বিপদজনক। তাই ঠিক করলাম ঘাটেই রাতটা কাটিয়ে ভোরে রওনা দেব গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। প্রায়ই উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া-আসা করতে হয় নগরবাড়ি ঘাট দিয়ে। ঘাটের ছাপড়া বেড়ার একটা রেষ্টুরেন্ট বিশেষ পরিচিত। সবসময় এই রেষ্টুরেন্টেই খাওয়া-দাওয়া করে থাকি আমরা যাত্রাকালে। সেই সুবাদে মালিক হাজী সাহেবের সাথে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেছে। আমাদের সবসময় বিশেষ খাতির-যত্ন করে পছন্দমাফিক টাটকা মাছ রেধে খাওয়ান হাজী সাহেব। হাজী সাহেবকে সমস্যাটা বোঝাতে বললাম, "হাজী সাহেব রাতটাতো এখানেই কাটাতে হয় আজ।" হাসিমুখে হাজী সাহেব জবাব দিলেন, "কোন অসুবিধা নাই স্যার। চকি একটা পাইতা দিমু; বিছানাপত্র বাসা থাইকা আইনা দিমু; মশারীও একটা লাগাইয়া দিমু।" রাতের খাবারের পর বাইরে বেরিয়ে দেখি আমার ট্রাক ড্রাইভার এবং অন্য সবাই টুয়েন্টিনাইন খেলছে ট্রাকের পাশেই। ঘুম আসছিল না; ভাবলাম ওদের সাথে কিছুক্ষণ তাসই খেলা যাক। অল্প সময়েই খেলা জমে উঠল। খেলা ভীষণ জমেছে; কখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে টেরও পাইনি। হঠাৎ করে ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনতে পেলাম কাছেই। নিরাপত্তার জন্য সবাইকে ট্রাকের নিচে শুয়ে পড়তে বলে নিজেও কাভার নিলাম। ট্রাকের নিচে শোয়া অবস্থা থেকে দেখলাম হাজী সাহেবের রেষ্টুরেন্টকে টার্গেট করেই দু'জন লোক একনাগাড়ে গুলি ছুড়ে চলেছে। পাশে দাড়িয়ে আছে একটা জিপ। মিনিট খানেক গুলিবর্ষণ করে লোক দু'টো জিপে উঠার পর জিপটা উত্তর দিকে চলে গেল। হাজী সাহেবের বাসা দোকানের কাছেই। গোলাগুলির আওয়াজ থামতেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে

ছুটে এলেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে নিয়ে। আমরাও বেরিয়ে এলাম ট্রাকের নিচ থেকে। আমাকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাজী সাহেব দৌড়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বেচারা নিজেকে সামলাতে না পেরে বাচ্চাদের মত কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, "আল্লাহ্ মেহেরবান, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।" সত্যিই আল্লাহ্ মেহেরবান। অন্যরা বুঝতে না পারলেও আমি আর হাজী সাহেব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম কি উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়া হয়েছিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে ট্রাক ড্রাইভার ও অন্যদের গন্তব্যস্থানে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে আমি ঢাকায় ফিরে এলাম। এই ঘটনার ব্যাপারে বিশেষ ঘনিষ্ঠমহল ছাড়া অন্য কারো সাথেই আলাপ করলাম না। এরপর থেকে নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া আমি ঢাকার বাইরে তেমন একটা যেতাম না। বাইরের কাজ দেখাশুনার দায়িত্ব নূর ও স্বপনকেই নিতে হয়।

একদিন অফিসে বসে আছি হঠাৎ আমার চাচা শ্বশুড় জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি-লেখক-সাংবাদিক এবং পাকিস্তান আমলে দৈনিক পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ টুডের মালিক) এসে হাজির। অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে দেখে স্বসম্ভ্রমে উঠে দাড়িয়ে তাকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

-কাক্কু, আপনি হঠাৎ কি মনে করে? খবর দিলেইতো পারতেন আমি নিজে গিয়ে দেখা করে আসতাম।

-বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। তাজুদ্দিন তোমার সাথে জরুরীভাবে দেখা করতে চায়। সম্পর্কে কাক্কু এবং তাজুদ্দিন সাহেব ভায়রা ভাই।

-কোথায়? জানতে চাইলাম।

-তাঁতিবাজারে।

-লাঞ্চের পর আগামীকাল আমি আর নূর আসব। তিনি চলে গেলেন। পরদিন সময়মত গিয়ে পৌঁছতেই দেখি জনাব তাজুদ্দিন অপেক্ষা করছেন। আমরা দুইজনই তার বিশেষ পরিচিত। দোতালার একটি নিভৃত কক্ষে আমাদের বৈঠক শুরু হল কুশলাদি বিনিময়ের পর।

-দেশের অবস্থা সম্পর্কে কি মনে করছেন? প্রশ্ন করলেন তিনি।

-যে দেশ বানিয়েছেন তার সর্ম্পকে ভাবনার কি কোন অন্ত আছে?

-দেশতো আপনারাই স্বাধীন করেছেন।

-তাই কি? আমরাতো এভাবে দেশ স্বাধীন করতে চাইনি সেটা আপনার চেয়ে বেশি আর কারো জানার কথা নয়। চুপ করে ছিলেন তিনি। আমি বললাম,

-তাজুদ্দিন সাহেব '৭১ এর আমাদের যুক্তিগুলোর সত্যতাই কি ক্রমান্বয়ে এই বাংলাদেশে সত্যে পরিণত হচ্ছে না? যাক অতীত নিয়ে আলোচনা না করে বলেন কেন ডেকে পাঠিয়েছেন? সরাসরি প্রশ্ন করলাম তাকে।

-দেশটাকে বাচাঁতে হবে।

-অবশ্যই। তবে কি করে?

-জনগণের মুক্তি আনা সম্ভব সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই।

-এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। সারাজীবন আপনারা বুর্জুয়া রাজনীতি করে এসে এখন সমাজতন্ত্র করবেন সেটা কি করে সম্ভব? আর জনগণই তা বিশ্বাস করবে কেন? আওয়ামী লীগতো একটা বুর্জুয়া সংগঠন। শেখ মুজিব কেন, কেউই এ দলের মাধ্যমে প্রকৃত সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে পারবে না। আপনিও এ সত্য এতদিনে নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হল বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে সমাজতন্ত্রের নামে আপনারা যে বিভীষিকা তুলে ধরেছেন তাতে আগামী ৫০ বৎসরেও সমাজতন্ত্রের কথা শুনলেই এদেশের লোক আতঁকে উঠবে। তাছাড়া গ্রামে-গঞ্জে সাধারণভাবে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার আলোকে বলব আমাদের জনগণ সাম্প্রদায়ীক নয় এটা ঠিক; তবে তারা সমভাবেই ধর্মভীরু। আপনারা আপনাদের রাষ্ট্রীয় চার নীতির কোনটাই গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেননি আপামর জনসাধারণের কাছে। বাংলাদেশ বলতে ঢাকা, চিটাগাং বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি ৬৪ হাজার গ্রাম যেখানে বাস করে ৯৫% লোকজন। সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব এ দেশের গণমানুষের কতটুকু উপকার করবে তা জানি না তবে অল্প বিদ্যায় যতটুকু বুঝি এ দেশের লোকজনকে নজর আন্দাজ করার অবকাশ নেই। উপর থেকে তাদের উপর জোর করে কিছুই চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষ রক্ত মাংসের গড়া। তার জৈবিক এবং বাচাঁর চাহিদার পাশাপাশি মনের এবং আত্মিক চাহিদাও রয়েছে। মানুষ মেশিন নয়। এ সত্য বাদ দিয়ে কিছু করলে সেটা হবে নেহায়েত ক্ষণস্থায়ী। থাক, তা আপনি বলুন আপনার রাজনৈতিক পরিকল্পনা কি? আপনি একজন সুশিক্ষিত সৎ ব্যক্তি। আপনার রাজনৈতিক দর্শনের সাথে একমত না হলেও এতটুকু আস্থা রাখতে পারেন, আমরা আপনাকে একজন ভাল মানুষ বলেই মনে করি। আর একটা কথা আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত আমাদের জন্য যদি কিছু করে থাকে তবে সেটা তার স্বার্থেই সে করেছে। তবুও আমরা তাকে কৃতজ্ঞতা জানাব জাতি হিসাবে। কিন্তু ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কি করে আমাদের সহায়ক শক্তি হতে পারে? সেটাতো তাদের নিজস্ব স্বার্থের পরিপন্থী। এদের প্রতি আপনি দুর্বল এ কথা সবাই জানে। এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকেই আপনার অভিমত আমরা জানতে চাই। আর সমাজতন্ত্রের দর্শন অনুযায়ী এটা কায়েম করা যায় শুধুমাত্র সর্বহারা দলের নেতৃত্বে।

আপনার দল কোনটি সেটাও আমাদের জানা দরকার। গম্ভীরভাবে আমার বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন জনাব তাজুদ্দিন। রাজনীতি নিয়ে এটাই ছিল আমাদের প্রথম বিশদ আলোচনা।

-রাজনৈতিকভাবে আপনারা সবাই কি এতটা সচেতন?

-সবাই বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন সেটা জানি না, তবে সেনা বাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ রাজনৈতিকভাবে অবশ্যই সচেতন।

-খুব খুশি হলাম জেনে। I can see some silver lining over the dark clouds. সমাজতন্ত্রের নীতিতে আমি বিশ্বাসী। তবে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন পদ্ধতি সব দেশেই সেদেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেই বের করতে হয়। ভারত একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। তাদের দেশের অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের যে প্রভাব রয়েছে সেটা অবশ্যই সোভিয়েত মডেলের নয়। গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী দেশ ভারত নীতিগতভাবে আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলায়ও এ কথাই বলা চলে। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব রকম সাহায্য করে চলেছে। রুশ বিরোধিতার মূলে কাজ করছে সাম্প্রদায়ীকতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাদের এ চক্রান্ত কি দেশের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনবে?

-দেখেন স্যার, আমি সে সমস্ত মানুষের মনোভাব আপনাকে জানিয়েছি যারা সাম্প্রদায়ীক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ দু'টো শব্দ ঠিকমত উচ্চারণও করতে পারে না; বোঝাতো দূরের কথা। এ সমস্ত আলোচনাতো শহুরে তথাকথিত বুদ্ধিজীবি সমাজের মাঝেই সীমিত। তারা জনগণের ১ কিংবা ২%ও নন। আমরা মনে করি ভারত প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক দেশ নয়। গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে সেখানে গত ২৫বছর ধরে চলেছে এক পার্টির তথা এক পরিবারের শাসন। শ্রীমতি ইন্দীরা গান্ধী 'অখন্ড ভারত' নীতির বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অনেকেই তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু আজ কিছুতেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ হিসাবে viable হয়ে উঠুক সেটা ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার কোনমতেই সমর্থন করতে পারে না। পরিবর্তে তারা চেষ্টা করবে আমাদের অর্থনীতিকে ভারতের অর্থনীতির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আমাদের উপর তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে। মানে আমাদের অবস্থা হতে হবে ভুটান বা সিকিমের মত। এতে করে ভারতের অভ্যন্তরে কেন্দ্রিয় শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অঙ্গার আজ জ্বলে উঠেছে তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া যাবে যে, স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপমহাদেশের কোন জাতির পক্ষেই আজ স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়।

ভারতের আজ্ঞাধীন হয়েই বেঁচে থাকতে হবে তাদের। বাংলাদেশকে সব ব্যাপারে তাদের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে পারলে ঐ সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাটা পড়বে। আর আমরা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বিশ্বের বুকে দাড়াতে সক্ষম হই তবে সেই সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অঙ্গার দাবানলে পরিণত হয়ে ভারতকে টুকর টুকর করে ফেলবে অল্প সময়ের মধ্যেই। 'অখন্ড ভারতের' স্বপ্ন কর্পুরের মত উড়ে যাবে। যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলগুলো আজ ভারতীয় কেন্দ্রিয় দুঃশাসনের নিষ্পেষনে জর্জরিত সেখানে তাদের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হলে আমাদের অবস্থা কি হবে? বরং অধুনাকালে ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা তৈরি আজকের ভারত যদি সনাতন রূপ পরিগ্রহ করে তবেই আমাদের লাভ। শুধু আমাদেরই নয় এ ভূ-খন্ডের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বারও লাভ। বর্হিঃশক্তির শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য উপমহাদেশের স্বাধীন রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে অখন্ড ভারত সৃষ্টি করার ফলেই আজ বিকশিত হচ্ছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো। এই দ্বন্দ্বের অবসানের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব এ অঞ্চলে সত্যিকারের স্থিতিশীলতা অর্জন করা। এর কোন বিকল্প নেই। ভারত একটি বহুজাতিক দেশ সেটাই বাস্তবতা। আমার বক্তব্য শুনে জনাব তাজুদ্দিন বললেন,

-ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

তার রাজনৈতিক দল হিসাবে জাসদের প্রতি ঈঙ্গিত করলেন তিনি। জবাবে আমি বলেছিলাম,

-জাসদ অবশ্যই আজ সরকার বিরোধী সংগ্রামে একটি অগ্রণী ভূমিকায় আছে। তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথাও বলছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসা এ দল সৃষ্টিকারীরা সত্যিই কি সমাজতন্ত্রী? তাদের নেতৃত্বের প্রায় সবারই আগমন ঘটেছে বুর্জুয়া কিংবা পেটি বুর্জুয়া শ্রেণী থেকে। কতটুকু তারা নিজেদের De-class করতে সক্ষম হয়েছে সেটা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। ঠিক এই মুহুর্তে জাসদকে একটি সর্বহারার দল হিসাবে চিহ্নিত করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এভাবেই সেদিনের বৈঠক শেষ হয়। ভবিষ্যতে আবার আলোচনায় বসবো ঠিক করে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। তত্ত্বগত দিক থেকে জাসদের নেতৃবৃন্দেরও একটি অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ বলে মনে করত। তাদের ধারণা অনেকটা জনাব তাজুদ্দিনের মতই। মানে রুশ এবং ভারত বাংলাদেশের গণমুক্তি এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি। কিন্তু জাসদের সাধারণ সদস্যদের বৃহৎ অংশই ছিলেন ভারত বিরোধী। পরবর্তিকালে জাসদের অবক্ষয়ের জন্য অন্যান্য কারণের সাথে এই দ্বন্দ্বটিকেও একটি প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা চলে। নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ভারত নীতি নিয়ে দ্বিমত ছিল সেটাও আমরা জানতাম। সেদিন জাসদের সাথে জনাব তাজুদ্দিনের সম্পর্কের কথা জেনে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে দেখা দেয়। তবে কি জাসদ সত্যিই ভারতের

'বি' টিম? তাই যদি না হবে, তবে কোন যুক্তিতে জাসদ জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্ব মেনে নেবে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে হবে। নারায়ণগঞ্জে কর্নেল তাহেরের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম একদিন। তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করার ফাঁকে জেনে নেবার চেষ্টা করলাম জনাব তাজুদ্দিনের সাথে জাসদের সম্পর্ক কি? তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানালেন যে, জনাব তাজুদ্দিনের সাথে জাসদের কোন সম্পর্ক নেই। এতে ঘটনা আরো ঘোলাটে হয়ে উঠল। হয়তো কর্নেল তাহের এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না কিংবা জাসদের হাই-কমান্ডের সাথে কোন গোপন বিশেষ মাধ্যমের সাহায্যে জনাব তাজুদ্দিন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন যা জাসদ নেতৃবর্গের অনেকের কাছ থেকেই গোপন রাখা হয়েছে। আমাদেরই আর একজন জাসদের জনাব শাহজাহানের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। জনাব শাহজাহানও একই জবাব দিয়েছিলেন, জাসদের সাথে জনাব তাজুদ্দিনের পার্টিগত কোন সম্পর্ক নেই।

কয়েকদিন পর জনাব তাজুদ্দিনের সাথে আমাদের দ্বিতীয় বৈঠক হয়। সে বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা হয়। আমি গত বৈঠকের জের টেনে বলেছিলাম,

-বাংলাদেশের তিনটি জিনিস ভারত কখনো মেনে নিতে পারবে না:-

(১) বাংলাদেশে স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে উঠুক।

(২) বাংলাদেশে একটি ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হোক।

(৩) পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা এক হয়ে একটা ভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হোক। এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলে জনাব তাজুদ্দিন বলেন,

-ভারত উপমহাদেশ তুলনামূলকভাবে একটা পরাশক্তি; এ সত্যকে পরিহার করলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যই ভারতের সাথে একটা সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজিয়ে চলতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি নেপালকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

-নেপালের সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বহুলাংশে নেপাল অর্থনৈতিক বিষয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল তাই বলে নেপালের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপরতো ভারত হস্তক্ষেপ করেনি। জবাবে আমি বলেছিলাম,

-নেপাল একটি হিন্দু রাষ্ট্র। আমার জানামতে নেপালের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব অত্যন্ত প্রচন্ড। কিন্তু নেপাল ও বাংলাদেশ কি এক? বাংলাদেশ ১০কোটি মুসলমানের দেশ। এটাওতো একটা বাস্তব সত্য। এ জাতি সশস্ত্র সংগ্রাম

করেছে পাকিস্তানের শোষকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য: দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়ার জন্য নয়। অস্তিত্ব হবে সম্পূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থে স্বাধীন স্বকীয়তায়। সেটাই এদেশের জনগণের আশা ও অঙ্গীকার। জনগণের এ চেতনাকে সাংগঠনিক রূপ দিতে পারলে ভারত যত বড় শক্তিধর হোক না কেন: আমাদেরকে সিকিম বানাতে পারবে কি? ১০কোটি লোককে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলে তাদের সংগঠিত করে যেকোন বর্হিশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে একটি দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিণত করে গড়ে তোলা অবশ্যই সম্ভব এবং সে চেষ্টাই কি করা উচিত নয় প্রতিটি দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিকের?

এর জবাবে জনাব তাজুদ্দিন সাহেব কিছু বলেননি। তার সাথে দু'দিনের আলোচনায় একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল ভারত সম্পর্কে তার একটা বিশেষ দুর্বলতা কিংবা বাধ্যবাধকতা রয়েছে যার বাইরে তিনি যেতে পারছেন না। এই দুর্বলতা কিংবা বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে তিনি কখনোই আমাদের কিছু বলেননি। পরবর্তী বৈঠকগুলোতে আমরাও তাকে আর বিব্রত করিনি ভারত সম্পর্ক উত্থাপন করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুযোগ তৎকালীন ভারতীয় ইন্দিরা সরকার কিভাবে নিয়েছিলো এর এক চমৎকার বাস্তব বর্ণনা ভারতীয় লেখক সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কেলকাতার ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকা সম্পাদক সমর সেন তার লেখায় তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "সেই '৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর বিশাল ভারতীয় সশস্ত্র সেনা বাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর উপর পূর্ব পাকিস্তানে বিজয় অর্জন করে এবং পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবকে নিয়ে এসে ঢাকায় গদিতে বসিয়ে ভারতীয় সরকার নিজের ক্ষমতাকে সেখানে সুসংহত করেছিল।"

জনাব তাজুদ্দিন ছাড়াও সরকারি দলের অনেক নেতা এবং কর্মীদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলাম আমরা। জনাব কামরুজ্জামান, জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, জনাব মালেক উকিল, মনরঞ্জন ধর, ফনিভূষণ মজুমদার, আব্দুল মান্নান, এ আর মল্লিক, এম আর সিদ্দিকী, জনাব ফরিদ গাজী, জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, ভোলা মিঞা এরা সবাই শেখ সাহেবের দিক নির্দেশনায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতৃবর্গকে উপেক্ষা করে তরুণ নেতৃবৃন্দের উপর শেখ মুজিবের নির্ভরশীলতাকে তারা সরকার ও সরকারি দলের গণবিচ্ছিন্নতা ও ব্যর্থতার মূল কারণ বলে অভিহিত করেন কিন্তু তাদের এ অসন্তোষ কিংবা অভিপ্রায় সরাসরিভাবে শেখ সাহেবকে বলার মত সাহস এদের কারো ছিল না। বিশেষ করে জনাব তাজুদ্দিনকে সরিয়ে দেবার পর তারা সবাই নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়েন। এদের সবাই ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু

নিজেদের দুর্বলতার জন্য সর্বোপরিসরে গণতন্ত্রকে যখন খর্ব করা হচ্ছিল তখন তারা কিছুই করতে পেরে উঠেননি তরুণ নেতাদের দাপটে।

জাতি যখন মরনপন লড়াইয়ে লিপ্ত তখন পাকিস্তানীদের হাতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পনকারী নেতাকে স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে বানোয়াট ভাবমুর্তি গড়ে তুলতে ভারতের ইন্দিরা সরকার কার্পণ্য করেনি। ক্ষমতা সুসংহত করার অন্যান্য প্রয়াসের সাথে তার হাতে তুলে দেয়া হয় মুজিববাদ ও বাকশালী দর্শন।

যে কোন কারণেই হোক অনেককেই অবাক করে দিয়ে দেশের প্রবীণ লেখক সাংবাদিক খন্দোকার মোহাম্মদ ইলিয়াস তার 'মুজিববাদ' পুস্তকটিতে উদ্ভট সব কথা লিখলেন। তিনি দাবি করলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল, মার্কস ও এঙ্গেলস লিখিত কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টোর নির্যাস থেকেই নাকি মুজিববাদ নামের নবতম রাজনৈতিক দর্শন তৈরি করা হয়েছে। আদি অকৃত্রিম মার্কসবাদের আধুনিক উন্নতর সংস্করণ নাকি মুজিববাদ। তবে মুজিববাদ যে ফ্যাসিবাদী জার্মানীর হিটলারের ন্যাশনাল সোস্যালিজম তথা নাৎসী-বাদের এক নিকৃষ্ট অনুকরণ মাত্র সেটা উপরোক্ত 'মুজিববাদ' বইটি নাৎসী নেতা হিটলারের মেইন ক্যাম্ফ (My struggle) শিরোনামের আত্মকথা রচনাটির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে সুধী পাঠকদের বুঝতে আদৌ কষ্ট হবে না।

দেশপ্রেমিক বিভিন্ন মহলের ঐক্য প্রচেষ্টার ফলে ১৯৭৩ এর নির্বাচনের আগে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৭টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে ১৫ দফার ভিত্তিতে একটি এ্যাকশন কমিটি গঠন করে। কিন্তু নির্বাচনে সিট ভাগাভাগির প্রশ্নে এ ঐক্য ভেঙ্গে যায়। পরে ১৯৭৪ সালে মাওলানা ভাসানী 'হুকুমতে রব্বানিয়া' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। একই সময়ে অনেক চেষ্টা ও আলোচনার ফলে ভাসানী ন্যাপ বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (অলি আহাদ), বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির (লেনিনবাদী) এবং বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক সাম্যবাদী দল মিলে 'সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট' গঠিত হয়। এ ফ্রন্টের প্রথম জনসভায় ৪ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলি ছিল:-

(১) সব রাজবন্দীদের মুক্তি।

(২) জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

(৩) দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ এবং গ্রামে রেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(৪) অন্যায়ভাবে দখলকৃত সকল সম্পতি বাজেয়াপ্ত করা এবং ভারতের সাথে অসম চুক্তি বাতিল করা।

মাওলানা ভাসানী সরকারকে হুশিঁয়ার করে দিয়ে দাবি তোলেন, সাত দিনের মধ্যে এই ৪ দফা দাবি মেনে না নিলে তিনি দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলবেন। কিন্তু তার শারীরিক অসুস্থতা এবং নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের অনুপস্থিতিতে দেশব্যাপী আন্দোলন তার পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এরপর প্রবীণ নেতা জনাব আতাউর রহমান খান জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহকে একত্রিত করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন করার উদ্যোগ নেন কিন্তু সরকার কর্তৃক ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে জরুরী আইন ঘোষণা করার ফলে তার সে প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। এভাবেই বিরোধী দলগুলো সরকার বিরোধী প্রচন্ড গণরোষের পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তার উপর সরকারি নির্যাতন, নিস্পেষন, এবং সরকারি দলের বাহুবল এবং অর্থবলের দৌরাত্মে বিরোধী দলগুলোর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়ে। নেতৃত্বের দুর্বলতা, অর্ন্তদলীয় কোন্দল, সুস্পষ্ট প্রোগ্রাম এবং সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব শুধু যে রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলোর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই অন্তরায় সৃষ্টি করছিল তা নয়; জনগণও তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে হতাশ হয়ে নির্জীব হয়ে পড়ছিল ক্রমান্বয়ে। বামপন্থীদের ঐক্য প্রক্রিয়াও একইভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল। এর মূলেও ছিল উল্লেখিত প্রায় একই কারণসমূহ। রাজনৈতিক শূন্যতা এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে রাজনৈতিক দলগুলো যখন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল তখন ১৯৭৪ সালে দেশের কিছু বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা হয় 'Civil Liberties and Legal Aid Committee'। মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবিতে গঠিত হয়েছিল এই মোর্চা। বিরোধী দল ও প্রতিবাদী জনগণের উপর অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদেও সোচ্চার হয়ে উঠে এই কমিটি। জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এই কমিটির প্রথম সভায় শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, কবি, আইনজীবি, সাংবাদিক এবং সমাজের অন্যান্য পেশাজীবীদের প্রতিনিধিগণ দাবি জানান :-

(১) শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী সমস্ত কালা-কানুন বাতিল এবং সরকার এর বিভিন্ন মহল কর্তৃক জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ অগণতান্ত্রিক ও আইন বিরোধী।

(২) জরুরী আইন এবং স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

(৩) রক্ষীবাহিনী আইন বাতিল করে অবিলম্বে তাদের নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

(৪) সকল রাজবন্দীদের অবিলম্বে শর্তহীনভাবে মুক্তি দিতে হবে।

(৫) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং

(৬) যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এবং হুলিয়া রয়েছে সেগুলো সরকারকে অবিলম্বে তুলে নিতে হবে।

অল্পসময়েই এই কমিটির উপর নেমে আসে সরকারি শ্বেত সন্ত্রাস। উদ্যোক্তাদের অনেকেই নির্যাতিত হন সরকারের হাতে। সে সময়েই ঘটে বাংলাদেশের ইতিহাসের ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি। বাংলাদেশের অগ্নিসন্তান সিরাজ সিকদারকে শেখ মুজিবের নির্দেশে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়। আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তির জন্য সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টি এবং জাসদ এ দু'টো বিরোধী দলই সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি তৎপর হয়ে উঠে। সর্বহারা পার্টি বাংলার গ্রামাঞ্চলে তাদের সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। অতি দ্রুতগতিতে দেশব্যাপী গোপন সংগঠন গড়ে তুলে সরকার মহলে ত্রাসের সঞ্চার করতে সমর্থ হয় সর্বহারা পার্টি এবং জাসদ। পার্টির গোপন সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিন। জাসদের গণবাহিনী পরিচালিত হচ্ছিল কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে। আওয়ামী লীগ শাসনের ব্যর্থতার নজীর তখন দেশে-বিদেশে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে বহুলভাবে প্রচারিত হচ্ছিল। লন্ডন থেকে প্রকাশিত নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ এ জনাথন ভিন্নাম্বলম্বী এক প্রতিবেদনে লেখেন, "এমন একদিন ছিল যখন শেখ মুজিব ঢাকার রাস্তায় বের হলে জনসাধারণ হাত তুলে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে মেতে উঠত। আর আজ যখন স্বীয় বাসভবন থেকে তিনি অফিসের দিকে যান তখন চর্তুদিকে থাকে পুলিশের কড়া পাহারা। পথচারীরা সজ্ঞানে তার যাতায়াত উপেক্ষা করে। জাতির পিতাও আর গাড়ির জানালা দিয়ে হাত আন্দোলিত করেন না। তার দৃষ্টি থাকে সামনের দিকে নিবদ্ধ। বাংলাদেশ আজ বিপজ্জনকভাবে অরাজকতার মুখোমুখি। লাখ লাখ লোক ক্ষুধার্ত। হাজার হাজার মানুষ আজ অনাহারে মরছে। মফস্বল এলাকার স্থানীয় কর্মচারীরা ভয় পাচ্ছে যে আগামী মাস খুব দুঃসময় হবে। ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড়ে ঢাকায় দম বন্ধ হয়ে আসে। এখন আবার চলছে বন্যা উপদ্রুতদের ভীড়। আগত লোকজনরা এমন নোংরা অবস্থায় থাকে যার তুলনা দুনিয়ার কোথাও নাই। কোথাও বিনামূল্যে কিছু বিতরণ করা হলে শরনার্থীদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। বুদ্ধিজীবিরা বলেন, এই ক্ষুধার্ত জনতা ক্ষেপে গেলে তাদের রক্ষা নেই। বাংলাদেশ আজ দেউলিয়া। গত আঠারো মাসে চালের দাম ৪ গুন বেড়েছে। সরকারি কর্মচারীদের মাইনের সবটুকুই চলে যায় খাদ্যসামগ্রী কিনতে আর গরীবরা থাকে অনাহারে। কিন্তু যতই বিপদ ঘনিয়ে আসছে শেখ মুজিব ততই মনগড়া জগতে আশ্রয় নিচ্ছেন। ভাবছেন দেশের লোক এখনও তাকে ভালোবাসে। সমস্ত মুসিবতের জন্য পাকিস্তানই দায়ী আর বাইরের দুনিয়া তার সাহায্যে এখনো এগিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশ উদ্ধার পাবে এ ধরণের ভাবনা তার নিছক দিবাস্বপ্ন। মুজিব সম্পর্কে বরাবরই সন্দেহ ছিল। নেতা হিসাবে আজো তার আকর্ষন রয়েছে। তিনি আবেগপ্রবণ বক্তা। তার অহংকার আছে, সাহস আছে। কিন্তু আজ দেশ যখন বিপর্যয়ের দিকে

এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি দিনের অর্ধেক ভাগ আওয়ামী লীগের চাইঁদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপে কাটাচ্ছেন। যিনি বাংলাদেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু ছোট-খাটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন: তিনি আজ আত্মম্ভরিতার মধ্যে কয়েদী হয়ে চাটুকার ও পরগাছা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। বাইরের দুনিয়া বাংলাদেশের দুর্নীতির কথা ফলাও করে বলে থাকে। সমাজের নীচুতলায় যারা আছে তারা হয়তো আজ খেতে পেয়েছে কিন্তু কাল কি খাবে জানে না। এমন দেশে দুর্নীতি অপরিহার্য। তবে এমন লোকও আছে যাদের দুর্নীতিবাজ হবার কোন অযুহাত নেই। সদ্য ফুলে ফেঁপে উঠা তরুণ বাঙ্গালীরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের শরাবখানায় ভীড় জমায়। তারা বেশ ভালোই আছে। এরাই ছিল তথাকথিত 'মুক্তিযোদ্ধা'। তাদের প্রাধান্য আজ অপরিসীম। রাজনৈতিক দালালী করে এবং ব্যবসায়ীদের পারমিট যোগাড় করে তারা আজ ধনাঢ্য জীবন যাপন করছে। সরকারি কর্মচারীদের ভয় দেখাচ্ছে। নেতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং প্রয়োজন হলে অস্ত্র প্রয়োগ করছে। এরাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের বাছাই করা পোষ্য। আওয়ামী লীগের উপর তলায় যারা আছেন তারা আরো জঘণ্য। যারা দেশ মুক্ত করেছেন সেই জনসাধারণের মেরুদন্ড ভেঙ্গে তারা আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। অবশ্য তাদের অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ নিয়ে তারা আজ শুধু নিজেদের কথা ভেবেই শংকিত হয়ে উঠেছে। ভাবছে আগামীকাল তাদের কি হবে? শুনতে রূঢ় হলেও কিসিঞ্জার ঠিক কথাই বলেছেন, 'বাংলাদেশ একটা তলাবিহীন ভিক্ষার ঝুলি।' ত্রাসজনক পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে বিপর্যয়ের মোকাবেলা করা অসম্ভব। আন্তর্জাতিক সমাজ বাংলাদেশের 'পুতুল সরকার' সম্পর্কে ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়েছে। এই কঠোর সত্যের মুখোমুখি হয়ে রিলিফ কর্মী এবং কূটনৈতিক মিশন ও জাতিসংঘের অফিসাররা বাংলাদেশ সরকার ও সরকার দলীয় লোকজনদেরই দোষারোপ করছেন।"

লন্ডনের ডেইলি মেইল পত্রিকার ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে জন পিনজার লেখেন, "পশ্চিম এশিয়ার এবং দুর্ভিক্ষের প্রাচীনতম বিচরণভূমি বাংলাদেশে মহা দুর্ভিক্ষের পূর্ণঃআর্বিভাব ঘটেছে। এত ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সম্ভবতঃ অনেককাল দেখা যায়নি। মৃতের কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এক হিসাব মতে গত জুলাই মাসের বন্যায় সমস্ত ফসল এবং পরবর্তী মৌসুমে বীজ ধান বিনষ্ট হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এবং পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লাখ লোক মারা গেছে। ঢাকার 'সেফ দি চিলড্রেন ফান্ড' এর কো-অর্ডিনেটর মিঃ মাইকেল প্রোসার বলেন, "আমাদের চরম আশংকাই ফলে গেছে। আমরা এমন একটা বিপর্যয়ের সূচনাতে আছি যা আমি এই উপমহাদেশে গত ৩১ বছর দেখিনি। বসন্তের আগে নতুন ফসল উঠবে না। বাইরের দুনিয়া থেকে যদি বাংলাদেশ প্রতি সপ্তাহে ১লাখ টন খাদ্যশস্য ও তদসঙ্গে প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সাহায্য না পায় তবে আমার ভয় হচ্ছে বহু লোকের জীবন বিপন্ন হবে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের একটি অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান হচ্ছে এই যে, দেশের

সবগুলি হাসপাতাল মিলিয়ে শিশুদের জন্য সর্বমোট ৭৫টি বেড আছে। অর্থাৎ প্রতি ১০ লাখে একটি। মিরপুর শরনার্থী শিবিরের প্রকান্ড লৌহ কপাটের বাইরে বহু নারী ও শিশু ভীড় করে আছে। গেটের সামনে একজন সিপাই পুরনো ৩০৩ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে। তার কাজ আশ্রয়প্রার্থীদের দূরে সরিয়ে রাখা। এসব শরনার্থীদের বেশিরভাগ লোকই এসেছে উত্তরের রংপুর, দিনাজপুর জেলা থেকে। এরা দু'দিন পায়ে হেটে না খেয়ে এসেছে। দেখে মনে হল দু'টো শিশু ছাড়া প্রায় সবগুলো শিশুই বসন্তে আক্রান্ত। এরা এতটাই দুর্বল যে গা থেকে মাছিও তাড়াতে পারে না। এদিকে রিলিফ ক্যাম্পেও তিল ধারণের জায়গা নেই। বরাবর যেমন হয়ে থাকে আমার ক্ষেত্রেও তাই হল। একজন বিদেশী সাংবাদিককে দেখে ক্যাম্পের গেট খুলে দেয়া হল। সুপারিনটেন্ডেন্ট আব্দুস সালাম আমাদের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য ঈঙ্গিত দিলেন। আর ওমনি ওরা প্রাণপন ছুটল ভিতর পানে। এ কথা আমি আক্ষরিক অর্থেই বলছি। জনাব সালাম বললেন, 'এখানে তিন হাজার শরনার্থী আছে। শুক্রবার থেকে ওদের খিচুড়ি দেয়া সম্ভব হবে না। শনিবারে হয়তো আমেরিকান কিছু বিস্কুট পাওয়া যেতে পারে।' এ দেশে একটি শিশুকে একটু গুঁড়ো দুধ ও একমুঠো দানা দিয়ে বাচিঁয়ে রাখতে মাত্র ২৫ পেন্স খরচ হয়। একটি তিন বছরের শিশু এতো শুকনো যে, মনে হল যেন মায়ের পেটে থাকাকালীন অবস্থায় ফিরে গেছে। আমি তার হাতটা ধরলাম, মনে হল তার চামড়া মোমের মত আমার হাতে লেগে গেল। এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়াবহ পরিসংখ্যান এই যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মত ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্ন দেহী। বাচাঁর তাগিদে বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আমার গাড়ি ইসলামিক মানবকল্যাণ সমিতি 'আঞ্জুমান-এ-মফিদুল ইসলাম' এর লরীর পেছনে পেছনে চলছে। এই সমিতি রোজ ঢাকার রাস্তা থেকে দুর্ভিক্ষের শেষ শিকারটিকে কুড়িয়ে তুলে নেয়। সমিতির ডাইরেক্টর ডঃ আবদুল ওয়াহিদ জানালেন, 'স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়তো কয়েকজন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে থাকি কিন্তু এখন মাসে অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি। সবই অনাহারজনিত মৃত্যু।' লরীটা যখন গোরস্থানে গিয়ে পৌঁছলো ততক্ষণে সাতটি লাশ কুড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে চারটি শিশুর। সব কয়টাই বেওয়ারিশ। লাশগুলো সাদা কাপড়ে মুড়ে সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর গোরস্থানের একপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গত মাসে দুর্ভিক্ষে যারা মারা গেছে তাদের কবর খুঁড়েই দাফনের জায়গা করা হয়। এ ধরণের দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। প্রকৃতি আর মানুষ মিলে যদি কখনো 'বেলসেন আর অশ' উৎসবের অসংখ্য কবর নতুন করে রচনা করার চেষ্টা করে থাকে তাহলে তারা এই গোরস্থানে সফল হয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কংকাল আর কংকাল। বোধ করি হাজার হাজার। প্রথমে লক্ষ্য করিনি। পরে বুঝতে পারলাম অধিকাংশই শিশুদের কংকাল।"

'ভারতীয় আধিপত্যের কবলে বাংলাদেশ' শিরোনামে লস এঞ্জেলস টাইমস এ প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:-

"ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিপুল সহায়তায় স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির তিন বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের জনমত ভারতের প্রতি বিরূপ হয়ে গেছে। ভারত ও বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারীরা এখনো বলে যে, দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক খুবই আন্তরিক। কিন্তু বেসরকারি অধিকাংশ বাঙ্গালীর মনোভাবে তা প্রতিফলিত হয় না। কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের চেয়ে বহু বাঙ্গালীর অভিযোগ হল এশিয়া মহাদেশে ভারত প্রাধান্য লাভ করার চেষ্টা করেছে এবং শুধু আয়তনের বিশালত্ব দ্বারাই ভারত বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করতে সক্ষম। এই কিছুদিন আগে একজন মাঝারী শ্রেণীর বাংলাদেশী সরকারি কর্মচারী জনৈক বিদেশীকে কৌতুকের ছলে বলেছিলেন, 'ভারত বলছে পৃথিবীর মধ্যে সেই হচ্ছে বৃহত্তম গণতন্ত্র। তাই যদি হয় তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম গণতন্ত্র।' বেশ কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী এখন এই ধারণা পোষণ করেন যে, ১৯৭১ সালের যে যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারতের প্রধান স্বার্থ ছিল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে এই উপমহাদেশে স্বীয় স্বার্থ নিশ্চিত করা। হলিডে পত্রিকার সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান বললেন, 'বাংলাদেশ মূলতঃ একদিকে ভারতীয় সম্প্রসারনবাদ ও অপরদিকে বাঙ্গালীদের ইচ্ছার ফল।' ভারত সম্পর্কে বাঙ্গালীদের মোহ কেটে গেছে সেটা বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীন সমস্যারই প্রতিফলন। কিছু বাংলাদেশী মনে করছেন যে, বাংলাদেশের সৃষ্টির জন্য ভারত যেমন প্রধানতঃ দায়ী তেমনি বাংলাদেশের বর্তমান দুদর্শার জন্যও ভারত দায়ী। অত্যন্ত উত্তেজনামূলক যে কয়টি সমস্যা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভারত সীমান্তের ১২মাইল অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ। ডিসেম্বর মাসে যখন এই বাঁধ চালু হবে তখন গঙ্গার পানি কোলকাতার পাশ দিয়ে বহমান হুগলী নদী দিয়ে প্রবাহিত হবে। গঙ্গার পানির এই ধারা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হল কোলকাতা বন্দরকে তলানী মুক্ত করা। তলানীর জন্য কোলকাতা বন্দর প্রায় অনাব্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশীরা ভয় করছে যে এই পরিবর্তনের ফলে গঙ্গা নদীর নিম্নাংশ যা বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে সে অংশ গ্রীষ্মের মৌসুমে একদম শুকিয়ে যাবে। কিছু বাংলাদেশী এ অভিযোগও করে যে, ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে পাট ও চাল পাচাঁরে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ভারতীয় সরকারি কর্মচারীরা স্বীকার করেছেন যে, বাংলাদেশের পাট ও চাউল ভারতে পাঁচার হচ্ছে। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরই উৎসাহ রয়েছে সীমান্তের ওপারে কাচাঁ মাল পাচাঁর করার; কেননা সরকারিভাবে বাংলাদেশ ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার এক হলেও কালোবাজারে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য বাংলাদেশী মুদ্রার দ্বিগুন। ফলে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল ভারতে পাচাঁর করে যে অর্থ উপার্জন করে সে টাকায় বাংলাদেশে যে সমস্ত জিনিষের অভাব তা ভারত থেকে কিনে এনে দ্বিগুন মুনাফায় বিক্রি করে। ভারতের একটা উদ্বেগের কারণ হচ্ছে চীনের সাথে বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্পর্ক। চীন হচ্ছে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারত কখনো

বাংলাদেশকে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে দেবে না। ভারত চায় বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ থাকবে এবং এমন বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে না যা হবে ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী। অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা আরো বলেন, 'যদি বাংলাদেশের উপকূলে তেল পাওয়া যায় তবে ভারত সরাসরি বাংলাদেশের উপকূল দখল করবে।' ব্যাঙ্গোক্তি করলেন একজন পদস্থ অফিসার, 'বাংলাদেশর ভাগ্য বাংলাদেশের হাতে নাই'।"

১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যখন সংসদীয় দলের মিটিং এ উত্থাপন করা হয় তখন প্রস্তাবটির বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন সংসদীয় দলের বেশিরভাগ সদস্য। এ অবস্থায় মিটিং এ বলা হয়- এই প্রস্তাব এর বিরোধিতা করা হলে শেখ মুজিব পদত্যাগ করবেন নতুবা একটি মেরুদন্ডহীন সংসদ সৃষ্টি করে এ প্রস্তাব পাশ করানো হবে। এই কথা শোনার পর মুজিবের ইচ্ছাকে অনেকটা বাধ্য হয়েই সবাইকে মেনে নিতে হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী জরুরী আইন ঘোষণার মাত্র ২৭দিন পর দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল কায়েম করে গণতন্ত্রের কবর রচনা করে এক আদেশ জারি করলেন শেখ মুজিব। সারাজীবন যে শেখ মুজিব গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে এসেছিলেন তিনিই বাংলাদেশে একদলীয় শাসনতন্ত্র কায়েম করে সর্বপ্রথম স্বৈরাতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম করেন। বাংলাদেশে একদলীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে দেশের সকল বিরোধী দল বাতিল বলে গন্য হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে ক'জন নেতা দেশের মানুষের এত ভালোবাসা পেয়েছেন? কিন্তু পরিবর্তে তিনি জনগণকে আপন করে নিতে পারেননি। দুষ্কৃতিকারী কর্মী ও নেতারা তার কাছে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়েছে। পরিবারের অনেকের বিরুদ্ধে দুঃষ্কর্মের রিপোর্ট পেয়েও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। কর্তৃত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণের জন্য তার চেয়ে অধিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিসম্পন্ন কাউকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তার চরিত্রে ধৈর্য্যের অভাবও ছিল যথেষ্ট। ফলে তিনি পরীক্ষিত ও গুনবান যোগ্য সহযোগীদের কান কথায় বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে অপসারন করেন। তিনি এক পর্যায়ে আপন-পর, বিশ্বস্ত সহযোগী এবং নির্ভরশীল বন্ধু বিবেচনার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন। শেখ মুজিবের এই মানসিকতাকে তার রাজনৈতিক জীবনের চরম ব্যর্থতা ও পরিণতির জন্য একটি বিশেষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যুব নেতাদের দৌরাত্ম্যে গোটা প্রশাসনযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। দেশে দুর্ভিক্ষ। প্রতিদিন হত্যার খবর শুনতে হয় মানুষকে। প্রকাশ্য দিবালোকে নির্বিচারে হত্যাকান্ড প্রায় প্রতিদিন সংঘটিত হয়েছে তখন। বিরোধী দলগুলোকে নির্মূল করার জন্য রক্ষীবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া ছাড়াও দলীয় কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছিল। পুরো দেশ এভাবেই একটা সীমাহীন নৈরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে

উপনীত হয়েছিল। যে মানুষ একদিন মুজিবের কারামুক্তির জন্য রোজা রেখেছে: নফল নামাজ আদায় করেছে: সেই মানুষই আওয়ামী-বাকশালী শাসনামলে আল্লাহ্‌পাকের কাছে কেঁদে কেঁদে শেখ মুজিবের দুঃশাসন থেকে মুক্তি চেয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের অপশাসন শেখ মুজিবকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। বাকশালী একনায়কত্ব সৃষ্টি করে তিনি তার দলের মধ্যেও অন্তঃবিরোধ তীব্র করে তোলেন। তার এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি দলের অনেকেই : শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় তিনি ছিলেন ভীষণভাবে স্বার্থপর ও সুযোগ সন্ধানী। নিজের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব বজায়ে রাখার জন্য যে কোন সুযোগই গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি শেখ মুজিব। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথাতেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সারা বাংলাদেশের মানুষকে জানানো হল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তথা বাঙ্গালী জাতিকে পাঞ্জাবী শোষণের হাত থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্ত করার স্বপ্নদ্রষ্টা নাকি ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। কিন্তু সেটা ঐতিহাসিক সত্য নয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেখ মুজিবকে রাতারাতি কিংবদন্তীর নায়ক করে তুলেছিল এতে কোন সন্দেহ না থাকলেও এর মূল রূপকার ছিলেন লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জাম হোসেন। এই অখ্যাত তরুণ নেভ্যাল অফিসারই প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের। পাঞ্জাবী শোষকদের কবল থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে: এটাও তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান নৌ বাহিনীতে যোগদানের পরই। ১৯৫০ সালে তিনি মিডশিপম্যান হয়ে ইংল্যান্ডের রয়্যাল একাডেমীতে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফেরার পর কাজ আরম্ভ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রথমে মাত্র ২জন সহচর নিয়ে শুরু হয় তার বিপ্লবী কর্মকান্ড। কাজে হাত দিয়েই তিনি উপলব্ধি করলেন সবচেয়ে আগে দরকার একজন রাজনৈতিক নেতার। কারণ একজন সামরিক অফিসার হিসেবে চাকুরিতে থেকে ব্যাপকভাবে কাজ করার সুযোগ হবে না তার।

তাছাড়া শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীতে গোপন সংগঠন গড়ে তুললেই বিপ্লব করা সম্ভব হবে না। সংগঠন গড়ে তুলতে হবে দেশের জনগণের মধ্যে। তার জন্য প্রয়োজন বহুল পরিচিত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। সুপরিচিত নেতার ডাকেই অস্ত্র হাতে তুলে নেবে কর্মীরা। তিনি যোগাযোগ শুরু করলেন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সাথে। কিন্তু বেশিরভাগ নেতারাই তার প্রস্তাবে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। যারা দিয়েছেন তারা জুড়ে দিয়েছেন বিভিন্ন শর্ত। তাদের গদি দিতে হবে। অনেকে তাকে পাগলও বলেছেন প্রস্তাব শুনে। ভয়ে আতঁকে উঠেছেন অনেক নামিদামী নেতা। ১৯৬৪ সালে তিনি শেখ মুজিবর রহমানের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেন। শেখ মুজিব তার প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন, যতটুকু সম্ভব পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। এতটুকু

পর্যন্তই এর বেশি কিছু নয়। ১৯৬৬ সালে কমান্ডার মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসেন। এতে তার তৎপরতা আরো জোরদার করার সুযোগ পান তিনি। ১৯৬৭ সালের জুন/জুলাই মাসে তিনি তার দুই প্রতিনিধি জনাব স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং জনাব আলী রেজাকে আগরতলাতে পাঠান ভারতীয় সাহায্যের আশায়। তার প্রতিনিধিদের সাথে ভারতীয় সরকারের আলোচনা তেমন ফলপ্রসু হয়নি। বিপ্লবী জনাব স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে স্বাধীনতার মাত্র একমাসের মধ্যে গুম করে ফেলা হয়। মুজিব সরকার কিংবা তার দল এ বিষয়ে বরাবরই এক রহস্যজনক নিরবতা অবলম্বন করে এসেছে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে রাওয়ালপিন্ডি পাঠানো হয়। সেখানে পৌছে বিভিন্ন সূত্রে তিনি জানতে পারেন, পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স সন্দেহ করছে যে কমান্ডার মোয়াজ্জেম রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। এই খবর জানতে পেরে ছদ্মনামে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ ঢাকায় চলে এসে তার ছোট ভাই এর সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িতে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকেন। ৯তারিখ রাত প্রায় ১১টার দিকে তৎকালীন পাকিস্তান সেনা বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরিরত ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম শিশু (পরবর্তীতে 'জেনারেল রাজপুটিন অফ বাংলাদেশ') ও আরো কয়েকজন হঠাৎ করে বাড়িতে হানা দিয়ে কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি তখন শারীরিকভাবে অসুস্থ। নিয়ে যাবার সময় ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম জনাব মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী কোহিনূর হোসেনকে বলেছিলেন যে, বিশেষ প্রয়োজনে তাকে ঢাকা ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘন্টা খানেকের জন্য। কিন্তু তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল ১৫ মাস পর। অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল তার উপর। দীর্ঘ ১৫ মাস অকথ্য অত্যাচার করেও পাকিস্তান সেনা বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ তার কাছ থেকে কোন কথাই বের করতে পারেনি। এর পরেই ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শুরু হয় বিখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ১নং আসামী কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। পরবর্তিকালে পাকিস্তানের অধিকর্তারা বুঝতে পারেন, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রধান আসামী বানানোর ফলে সারা বিশ্বের কাছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের ভীষণ বদনাম হচ্ছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এক ঢিলে দুই পাখি মারার। জড়ানো হয় শেখ মুজিবর রহমানকে প্রধান আসামী হিসাবে। পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক মতলব হাসিলের লক্ষ্যে মামলা শুরু হওয়ার পর কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নাম ১নং আসামী থেকে কেটে ২নং আসামীর জায়গায় সরিয়ে নেয়। আর এভাবেই ঐ মামলা সাপে বর হয়ে মুজিবকে গড়ে তুললো কিংবদন্তীর নায়ক হিসেবে। '৬৯ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে মেরে ফেলা হল মিথ্যে অপবাদ দিয়ে। তিনি নাকি বন্দী অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটনারই পূর্ণরাবৃত্তি ঘটেছিল মুজিব শাসনকালে বিপ্লবী নেতা সিরাজ সিকদারের হত্যার মাধ্যমে। শেখ মুজিব সর্ম্পকে কমান্ডার মোয়াজ্জেম তেমন আকর্ষণ বোধ করেননি কখনোই। শেখ মুজিবের দলের উপরও তার আস্থা ছিল না। কমান্ডার মোয়াজ্জেমের

স্পষ্টবাদিতাকে শেখ মুজিব কখনই পছন্দ করেননি। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে ভোর ৬টার দিকে হানাদার বাহিনী তাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ির সামনে গুলি করলেও তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে; যার হদিস আজ অব্দি তার পরিবার পরিজন পাননি। ধর্মপ্রাণ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। নির্ভীক এই মুক্তিযোদ্ধা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ছিলেন তার দেশ ও জাতিকে। সপেঁ দিয়ে গেলেন প্রাণ স্বাধীনতার জন্য। দেশ স্বাধীন হল। শেখ মুজিবর রহমান একচ্ছত্র নেতা বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করলেন, কিন্তু কমান্ডার মোয়াজ্জেমের ত্যাগের প্রতি সম্মান দেখাতে পারেননি তিনি। কখনো সত্যকে তুলে ধরেননি জনগণের সম্মুখে। চুপটি মেরে থেকে সব কৃতিত্ব নিজেই হজম করে গেছেন নির্বিবাদে।

আপোষহীন প্রতিবাদী কণ্ঠের অধিকারীদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যই তাদের মেরে ফেলা হয় আর সুবিধাবাদী আপোষকামীদের সবসময় বাচিঁয়ে রাখা হয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। সে হিসেবেই ২৬শে মার্চ প্রাণ দিতে হয়েছিল কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে আর শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাকিস্তানে। এমনটি ঘটেছে সর্বদা, ঘটবে ভবিষ্যতেও। ইতিহাসও তাই বলে।

১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এক সন্ধ্যায় আমি, নিম্মী ও নূর গিয়েছিলাম সাজেদা চাচীর বাসায়। চাচীরা তখন থাকতেন ইন্দিরা রোডের একটা দোতালা বাসার উপর তলায়। নিচের তলায় থাকতেন রক্ষীবাহিনীর কর্নেল সাব্বিউদ্দিন। চাচা ও চাচী মানে জনাব গোলাম আকবর চৌধুরী ও সাজেদা চৌধুরী (আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক) দু'জনই বাড়িতে ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে আমরা বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। আমার শ্বাশুড়ী ও বেগম সাজেদা চৌধুরী পরম বান্ধবী। পুরো সংগ্রামের সময়টা তাদের পরিবার আমার শ্বশুড় মহাশয়ের কোলকাতার বাড়িতেই কাটিয়ে ছিলেন আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়লেন না চাচী। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে প্রায় ১০টা/সাড়ে ১০টা বেজে গেল। বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে উঠলাম। বাড়ির গেট থেকে ইন্দিরা রোড পর্যন্ত একটি সরুপথ। নিচু জমিতে মাটি ফেলে রাস্তা বানানো হয়েছে। গেট দিয়ে বেরুতেই নূর হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, "স্যার, ওরা গুলি করছে।" সামনে চেয়ে দেখি দু'জন লোক চাদর মুরি দিয়ে রাস্তার একপাশে দাড়িয়ে। দু'জনারই হাতে ষ্টেনগান। গুলি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ব্যাক গিয়ার দিয়ে তীব্র গতিতে গেটের ভেতরে চলে এলাম এক নিমিষে। আমাদের পিছু হটে যাওয়ায় লোক দু'টি বুঝতে পারলো আমরা ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছি। মুহুর্তে তারাও হাওয়া হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে উপরে

উঠে গেলাম দৌড়ে। বেচারী নিম্মীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে চাচীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নিম্মী। বাসার সবাই হতভম্ব। কি ব্যাপার, কি হয়েছে? বাবলু, ছোটকা, লাবু, মানু সবাই ছুটে এল। চাচীকে ঘটনা খুলে বললাম। চাচী সব শুনে থ্ হয়ে গেলেন। চাচার অবস্থাও অনুরূপ। সাব্বিউদ্দিনের বাড়িতে সিভিল কাপড়ে আর্মড গার্ড থাকে। সে ক্ষেত্রে এ ধরণের ঘটনাতে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন চাচী। আমাকে ও নূরকে নিয়ে নিচে গিয়ে সাব্বিউদ্দিনকে সব খুলে বললেন তিনি। সব শুনে কর্নেল সাব্বিউদ্দিন বেশ কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন, "দিনকাল ভালো না। কি করা যায় বলেনতো?" বুঝলাম ব্যাপারটা কোনমতে কাটিয়ে দিতে চাচ্ছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর উপরে ফিরে এসে চাচী ৩২নং ধানমন্ডিতে ফোন করলেন শেখ সাহেবের বাড়িতে। কি কথা হল সেটা বলতে পারব না। তবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাচী বললেন, "বাসায় ফোন করে দাও আজ রাতে তোমরা ফিরছো না। আমার এখানেই থাকবে।" তার উপদেশ মেনে নিয়ে সে রাতটা তার বাসাতেই কাটিয়ে সকালে ফিরে এসেছিলাম। আল্লাহ্‌তা'য়ালা আর একবার জীবন রক্ষা করলেন। একেই বলে 'রাখে আল্লাহ মারে কে?' সিভিল ড্রেসে রক্ষীবাহিনীর গার্ডরা সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে এই বাড়ি। হঠাৎ খটকা লাগল মনে। আততায়ী দু'জন ছিলেন সিভিল ড্রেসে এবং তাদের হাতে ছিল ৯এমএম ইন্ডিয়ান ষ্টেনগান। হিসাব মিলে গেল। একই সাথে মনে পড়ে গিয়েছিল এসপি মাহবুবের সর্তকবাণী। আমাদের উপর থেকে 'সুনজর' এখনো যায়নি। আরো সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

একদলীয় নিষ্পেষনের জাতাকলে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা এবং সেনা পরিষদ

- জাতিকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্ত করার জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে উঠে।
- শেখ মুজিবকে আজীবন রাষ্ট্রপতি বানাবার পরিকল্পনা।
- সেনা পরিষদের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোর সিদ্ধান্ত।
- লেঃ কর্নেল রশিদ ও লেঃ কর্নেল ফারুকের সেনা পরিষদের সাথে যোগাযোগ।
- মিলিত প্রচেষ্টায় অভ্যুত্থান ঘটানোর সিদ্ধান্ত সাফল্যের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলল।
- খন্দোকার মোশতাক আহমদ সম্পর্কে সেনা পরিষদের মূল্যায়ন।

বাকশাল গঠন করার আগে জোর প্রচারণা চালানো হল- শেখ মুজিব তার দল ও দলীয় কর্মীদের ক্ষমতার লোভ, লালসা ও দুর্নীতি সম্পর্কে উদাসীন নন। তিনি বুঝতে পেরেছেন তার পার্টির চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এ পার্টি দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করা আর সম্ভব নয়। তাই তিনি পার্টির বিলুপ্তি ঘোষণা করে একদলীয় সরকার কায়েম করে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করতে যাচ্ছেন। লোকজন ভাবল, তার এই পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে কলুশিত লোকজন ক্ষমতাচ্যুত হবে এবং সে জায়গায় নিয়োগ করা হবে ভালো লোকজনদের। কিন্তু সে আশা অল্প সময়েই কর্পুরের মত বিলীন হয়ে গেল। দেখা গেল পার্টির বিলুপ্তি ঘোষণা করে তিনি যে বাকশাল গঠন করলেন সেখানে ক্ষমতাবলয়ে স্থান পেলো ধিকৃত গাজী গোলাম মোস্তফা, মনসুর আলী এবং শেখ মনি এন্ড গংরাই। তারাই হয়ে উঠল মুখ্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। যাদের অপকর্মের বদৌলতে আওয়ামী লীগ সংগঠন হিসাবে জনগণের আস্থা হারিয়েছিল: তাদের নিয়েই 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' যাত্রা শুরু করলেন শেখ মুজিব। জনগণ হতাশ হয়ে পড়ল। পার্টি বিলুপ্ত করলেও চাটার দলকে বাদ দিতে পারলেন না শেখ মুজিব। বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে আর একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলয়ে পাকাপোক্তভাবে অধিষ্ঠিত করা হল তার পরিবারবর্গকে। ব্যাপারটা এমনই যেন- পুরো দেশটাই শেখ পরিবারের ব্যক্তিগত জমিদারী!

বাকশাল গঠন করে একনায়কত্ব কায়েমের সাথে সাথে প্রকাশ্য রাজনীতি ও সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকান্ড আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যেতে বাধ্য হল। আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে দেশের নতুন পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময় করতে লাগলাম। জাতীয় অবস্থার পর্যালোচনা করে সবাই একমত হলাম, একদলীয় নিষ্পেষনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে অবিলম্বে। পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার। বাকশালের শিকড় বাংলার মাটিতে প্রথিত হবার আগেই উপড়ে ফেলতে হবে। একনায়কত্বের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণকে মুক্ত করার সাথে সাথে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু এই রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার যাদের সে সমস্ত দেশপ্রেমিক এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তি ও সামর্থ্য অত্যন্ত কম। স্বৈরশাসনের ষ্টিমরোলারের পেষণে তাদের আরো দুর্বল করে ফেলা হচ্ছে দিন দিন। এ ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সরকার বদল করার কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। শিকড় গেড়ে বসার আগেই একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক মহল থেকে অনেকেই ঈঙ্গিত দিলেন, সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে

আসতে ইচ্ছুক হলেই সম্ভব হবে এই একনায়কত্ব ও স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে জাতিকে মুক্ত করা। তাদের এ ধরণের ইঙ্গিতের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম আমরা। যেখানে সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একনায়কত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব নয় সেখানে স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করার জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মাধ্যমেই উৎখাত করতে হয় স্বৈরাচারী সরকার। এর কোন বিকল্প থাকে না বলেই জনগণ স্বাগত জানায় ঐ ধরণের যে কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপকে। স্বতঃস্ফুর্ত জনসমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লব অর্জন করে তার নৈতিক ও আইনগত বৈধতা। খন্দোকার মোশতাক আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রীমনা নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে একই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যে কোন বৈপ্লবিক উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে সর্বোতভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছেন তিনি এবং আরো অনেকেই। মোশতাক সাহেবের এ ধরণের উক্তির পেছনে আওয়ামী লীগের একটা বড় অংশের সমর্থন ছিল। ইস্তফা দেবার পর জেনারেল ওসমানীর সাথে দেখা করতে গেলে বাকশাল সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপের সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "মুজিব খানকে সরাতে হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?"

এদিকে বাকশালী একনায়কত্ব স্থাপন করেও শেখ মুজিব তার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। সিদ্ধান্ত হল- তাকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা দেবে বাকশাল। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেয়ার কথা প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তাকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেটাতে শেখ মুজিব সন্তুষ্ট হতে পারেননি বলেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তাকে আজীবন রাষ্ট্রপতি বানাবার। আরো খবর পাওয়া গেল সমস্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মাঝ থেকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় সরকার বিরোধী মনোভাবাপন্ন দুই লক্ষ লোকের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা গভর্ণর ও তাদের অধিনস্থ রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে ঐ তালিকাভুক্ত লোকদের মেরে ফেলা হবে। এই নীল নকশা বাস্তবায়িত করে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন বাংলাদেশের জনগণের প্রতিবাদী কন্ঠকে আগামী কয়েক দশকের জন্য স্তব্ধ করে দিতে। এভাবে রাজনৈতিক বিপক্ষ শক্তিকে সমূলে উৎপাটন করার এক হীন চক্রান্ত করা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশেই।

বাংলাদেশের একটি চিহ্নিত মহল স্বীয় স্বার্থে শেখ মুজিবর রহমানেকে 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'জাতির পিতা' বলে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা পর থেকেই। বাংলাদেশ কায়েম হয়েছে '৭১ এর মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে। জনগণের রক্তের

বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আজকের বাংলাদেশ। তাই স্বাধীনতার জনগণের সব ত্যাগকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মুজিবর রহমানকে এককভাবে স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন বানাবার প্রচেষ্টা ছিল এক চরম ধৃষ্টতা। শেখ মুজিবর রহমানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আরো অনেক নেতাদের মতই ব্যক্তিগত অবদান থাকলেও এ সত্যকে কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ, বিকাশ এবং সেই আন্দোলনকে চরম পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে '৭১ এর সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার মূল কৃতিত্ব বাংলাদেশের জনগণের। সংগ্রামের চরম পর্যায়- সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করেননি। পাক হানাদার বাহিনীর শ্বেত সন্ত্রাসের মুখে জনগণকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে আওয়ামী লীগ নেতারাও নিজ নিজ জান বাঁচাতে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। সেই ক্রান্তিলগ্নে নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় হতাশ হলেও জনগণ তাদের সিদ্ধান্তে ভুল করেননি। এক অখ্যাত মেজরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঝাপিঁয়ে পড়েছিলেন প্রতিরোধ সংগ্রামে। গড়ে তুলেছিল জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। এ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করা কখনোই সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম কখনও মেনে নেবে না মিথ্যা প্রচারণাকে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অভাব ছিল শেখ মুজিবের। তারই ফলে জাতি যখন হয়ে উঠেছিল মুক্তি পাগল তখন শেখ মুজিব চরম সুবিধাবাদীর মত আপোষরফায় ব্যস্ত ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে। জনগণের সব আশাকে নস্যাৎ করে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের পাশে না থেকে কারাবরণ করে সাচ্ছন্দে পাড়ি জমিয়েছিলেন পাকিস্তানে। দেশ স্বাধীন হবার পর সেই শেখ মুজিবকেই স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বানানো হয় অতি সহজেই। রাষ্ট্র প্রধান হয়ে নিজ ও দলীয় স্বার্থে তিনি জাতীয়তাবাদের মূল চেতনা গণতন্ত্র, স্বাধীকার, মানবিক অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি, আইনের শাসন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলেন না শেখ মুজিব। সন্ত্রাস ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলেন তিনি। স্থাপন করলেন একনায়কত্বের স্বৈরশাসন। তার শাসনকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় এবং এক ব্যর্থতার ইতিহাস। চরম জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার পরও যারাই তাকে অযৌক্তিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' কিংবা 'জাতির পিতা' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে তারা সবাই একদিন হবে জনধিকৃত। ইতিহাসের আস্তাঁকুড়ে হবে তাদের ঠাঁই। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে মিথ্যাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব হয়নি কখনো। সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক ধারা প্রবাহে। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না।

আমরা ঠিক করলাম, জাতিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে যে কোন ত্যাগের বিনিময়েই। পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার। শুরু হল আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা। সেনা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে সেনা

পরিষদ গড়ে তোলার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। দেশের প্রতিটি সেনানিবাসের বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্টে সমমনা অফিসার ও সৈনিকদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে গোপন সংগঠন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, শেখ মুজিবকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আগেই বিপ্লব ঘটিয়ে শেখ মুজিবের একনায়কত্ব ও বাকশালের পতন ঘটাতে হবে। বিপ্লবকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সাংগঠনিক তৎপরতা তরিৎ গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলে কেন্দ্রিয় কমিটি।

প্ল্যানিং ষ্টেজের এক পর্যায়ে একদিন লেঃ কর্নেল আব্দুর রশিদ খন্দোকার সেনা পরিষদের কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের কয়েকজনের সাথে সাক্ষাৎ করে। মিটি-এ দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও শেখ মুজিবকে আজীবন রাষ্ট্রপতি বানাবার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে লেঃ কর্নেল রশিদ অভিমত প্রকাশ করে যে, শেখ মুজিব যদি একবার পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতায় আসন গেড়ে বসে তবে তার স্বৈরাচারী সরকারের জোয়াল থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করা খুবই দূরূহ হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দুর্বলতার কারণে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সে ও লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দোকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকারের কথা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এ ব্যাপারে সেনা পরিষদের নেতাদের অভিমত কি তা জানতে চায় লেঃ কর্নেল রশিদ। লেঃ কর্নেল রশিদ ও লেঃ কর্নেল ফারুক দু'জনেই মুক্তিযোদ্ধা। সেই সময় লেঃ কর্নেল রশিদ ও লেঃ কর্নেল ফারুক যথাক্রমে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ও ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারস এর অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছিল। দু'টো ইউনিটই তখন ঢাকায়। দু'জনই সেনা পরিষদের নেতৃবৃন্দের কাছে সুপরিচিত। তাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রশ্নে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই লেঃ কর্নেল রশিদকে সেনা পরিষদের সিদ্ধান্তের কথা খুলে বলা হল। সব শুনে লেঃ কর্নেল রশিদ প্রস্তাব রাখলো যৌথ উদ্যোগে অভ্যুত্থান সংগঠিত করার। তার প্রস্তাবে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলা হল, অভ্যুত্থানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী সর্ম্পকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত রয়েছে সেনা পরিষদের। আলোচনা সাপেক্ষে সেগুলোতে ঐক্যমত্য হলেই সেনা পরিষদ তার প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। লেঃ কর্নেল রশিদ আলোচনা করতে রাজি হওয়ায় পরবর্তিকালে ঐ সকল বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সেনা পরিষদের তরফ থেকে লেঃ কর্নেল রশিদকে জানানো হয় বিপ্লবের পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানই হবেন চীফ অফ আর্মি ষ্টাফ। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেঃ কর্নেল রশিদ প্রস্তাব রাখে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দোকারকে অব্যাহতি দিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এমজি তোয়াবকে বিমান বাহিনী প্রধান হিসাবে নিয়োগ করার। তার এই প্রস্তাব সেনা পরিষদ মেনে নেয়। ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যৌথ বৈপ্লবিক

অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেনা পরিষদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যাবলী ও নূন্যতম প্রোগ্রাম সম্পর্কে খন্দোকার মোশতাক সম্মতি প্রদান করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খবরা-খবর আদান-প্রদান ও যৌথভাবে বিপ্লবের কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এভাবেই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে অভ্যুত্থানের সফলতার সম্ভবনা স্বাভাবিক কারণেই আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আওয়ামী লীগের খন্দোকার মোশতাক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাবশালী নেতা ও কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন অনেক প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ সমস্ত তথ্যগুলো ছিল আমাদের পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। আমরা জানতে পেরেছিলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখরাই ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে কট্টর রুশ-ভারতপন্থী। বাকশালী একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার মূল উদ্দ্যোক্তা ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, নজরুল ইসলাম, আব্দুস সামাদ আজাদ, আব্দুর রাজ্জাক, মনসুর আলী, সেরনিয়াবাত, সৈয়দ হোসেন, মনি সিং এবং প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং নিজের অবস্থানকে সুসংহত করার জন্যই শেখ মুজিব এ সমস্ত উচ্চাভিলাসী নেতাদের প্রভাব ও পরামর্শ মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের বলি দিয়ে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার এই হঠকারী সিদ্ধান্তকে আওয়ামী লীগের বৃহৎ অংশই মেনে নিতে পারেনি। শেখ মুজিবের ক্ষমতার প্রতাপের মুখে নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে সেদিন এরা প্রকাশ্য বিরোধিতা না করে নিরব থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের এ সিদ্ধান্তের ফলে সংসদে সেদিন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল গণতন্ত্রীমনা নেতৃবৃন্দ ও সংসদ সদস্যেদের মাঝে। এদের অনেকেই বর্ষীয়ান নেতা খন্দোকার মোশতাকের সাথে আলোচনা করে এ ব্যবস্থার প্রতিকারের রাস্তা খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কোন পদক্ষেপ নিলে আওয়ামী লীগের এই বৃহৎ অংশের সমর্থন পাওয়া যাবে অতি সহজেই। তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানিয়ে সমর্থন করবেন এ ধরণের যে কোন পরিবর্তনকে। আর একটি বিষয়ও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে সেটা হল আওয়ামী লীগের মধ্যে খন্দোকার মোশতাকের সমর্থন রয়েছে অনেক। তার ব্যক্তিগত প্রভাব ও জনপ্রিয়তা পার্টির নেতা ও কর্মীদের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট। আমরা খন্দোকার মোশতাককে '৭১ এর সংগ্রামকাল থেকে দেখে আসছি। তিনি ছিলেন ঘোর রুশ-ভারত বিরোধী। ধর্মপ্রাণ প্রবীণ নেতা খন্দোকার মোশতাক ছিলেন নীতির প্রশ্নে আপোষহীন। একজন সাচ্চা গণতান্ত্রিক এবং উদারপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিলেন। আলাপ প্রসঙ্গে

আওয়ামী লীগের অনেকেই খন্দোকার মোশতাকের ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করে অভিমত পর্যন্ত ব্যক্ত করেছেন যে, নেতৃত্বের যোগ্যতার বিচারে খন্দোকার মোশতাকের স্থান শেখ মুজিবর রহমানেরও উপরে। তাদের এ ধরণের মনোভাব থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, খন্দোকার মোশতাকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হলে তারা অতি সহজেই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে বিপ্লবের পক্ষে স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন জানাবেন। ফলে আওয়ামী বাকশালীদের বৃহৎ অংশকে শুধু যে নিউট্রালাইজ করাই সম্ভব হবে তা নয়; এতে করে বাকশালী যোগসাজসে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও অনেকাংশে কমে যাবে। আওয়ামী-বাকশালী নেতাদের সমর্থন পেলে রক্ষীবাহিনীকে নিরস্ত্র করার কাজটিও সহজ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া পশ্চিমা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতাবলয়ে একজন ধর্মপ্রাণ, উদারপন্থী, গণতন্ত্রীমনা রাজনীতিবিদ হিসেবে খন্দোকার মোশতাকের একটা ইতিবাচক গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। এ সমস্ত দেশের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের অনেকের সাথেই তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই অবস্থায় খন্দোকার মোশতাক আহমদকে সরকারের রাষ্ট্রপতি বানালে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এবং মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর স্বীকৃতি ও সমর্থন আমরা সহজেই পেতে পারব। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিনে বেসামরিক সরকার গঠন করলে আমরা দেশে-বিদেশে এটাও প্রমাণ করতে পারব যে, বাংলাদেশের বৈপ্লবিক অভ্যূত্থান ঘটেছে দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনীর নেতৃত্বে। স্বৈরশাসন ও রুশ-ভারতের নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বিস্তারিত বিশ্লেষনের পরই খন্দোকার মোশতাক আহমদকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

একবিংশ অধ্যায়

সফল অভ্যুত্থান এবং বিপ্লবত্তোর পরিস্থিতি

- সেনা পরিষদকে অনেক জটিল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল।
- কেন্দ্রিয় কমিটির তরফ থেকে বিভিন্ন ইউনিটে পাঠানো দেশের সার্বিক অবস্থা, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত এবং লক্ষ ও উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে ইশতেহার।
- ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।
- রাষ্ট্রপতি হিসাবে জনাব খন্দোকার মোশতাক আহ্মদের শপথ গ্রহণ এবং মন্ত্রিসভা গঠন।
- মোশতাক সরকারের গৃহিত নীতি ও পদক্ষেপসমূহ।
- ১৫ই আগষ্ট ছিল জাতীয় মুক্তির দিন।
- নতুন সরকার গঠিত হবার পর খুবই নাজুক পরিস্থিতিতে সেনা পরিষদকে নিজস্ব উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হচ্ছিল।
- জনপ্রিয় আগষ্ট বিপ্লব নৈতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন পেয়ে।
- নিজের এবং পারিবারিক ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী ভিত্তি দেয়ার লক্ষেই বাকশালী স্বৈরাচার কায়েম করেছিলেন শেখ মুজিব।
- জাতীয় আশা-আকাংখাকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কোন ব্যবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

সেনা পরিষদকে অনেক জটিল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল। বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে সে সমস্ত সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কেও ভেবে দেখতে হয়েছিল নেতৃবৃন্দকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহিত তথ্যাবলী ও খবরা-খবরের ভিত্তিতেই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সর্বপ্রথম ঠিক করতে হয়েছিল- কবে বিপ্লব ঘটানো হবে, কি পরিসরে সংগঠিত করা হবে বিপ্লব? খবর ছিল, ১৫ই আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ এবং কেন্দ্রিয় নেতারা ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের প্রায় সব বাকশালী নেতারাই উপস্থিত থাকবেন। নব্য নিযুক্ত জেলা গভর্ণররা এবং জেলা পর্যায়ের নেতারা ইতিমধ্যেই ঢাকা শহরে এবং শেরে বাংলা নগরের এমপি হোস্টেলে ভীড় জমিয়েছেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে পুলিশ এবং স্পেশাল স্কোয়ার্ড। নেতাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য ছাড়াও শেখ মনি ও শেখ কামালের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের অস্ত্রধারীরাও থাকবে অনুষ্ঠানে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে ভার্সিটি এলাকায় টহল দেবার জন্য মোতায়েন করা হবে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান এবং ডেপুটি ডাইরেক্টর কর্নেল সাব্বিউদ্দিন দু'জনেই ঘটনাক্রমে সেদিন দেশের বাইরে অবস্থান করবেন। ঐ দিনটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস বিধায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আনন্দ উৎসব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ভারত সরকার। ১৪-১৫ তারিখ এর রাত ঢাকা ব্রিগেডের নাইট ট্রেনিং এর জন্য নির্ধারিত।

১২ই আগষ্ট এক বৈঠকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিপ্লব সংগঠিত হবে ১৫ই আগষ্ট সুবেহ্ সাদেকে। যেহেতু বাকশালী নেতাদের প্রায় সবাই সেদিন ঢাকায় অবস্থান করবেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ঢাকাতে অপারেশন চালিয়ে বিপ্লবকে সফল করে তোলা সম্ভব হবে। সীমিত পরিসরে বিপ্লব ঘটালে বিপ্লবের সফলতার জন্য অতি প্রয়োজনীয় তিনটি উপকরণ যথা:-

(ক) নূন্যতম শক্তির প্রয়োগ

(খ) গতিশীলতা

(গ) গোপনীয়তা

অতি সহজেই হাসিল করা যাবে। টার্গেট হিসাবে নির্ধারন করা হয় রাষ্ট্রপতি, শেখ ফজলুল হক মনি, মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, সেরনিয়াবাত, সৈয়দ হোসেন, তাজুদ্দিন আহমদ, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক। এদের বন্দী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রেডিও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ টিভি, ওয়্যারলেস সেন্টার, টিএন্ডটি, জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদর দফতর, রক্ষীবাহিনীর সাভারের মূল ক্যাম্প, সংসদ সদস্যদের হোস্টেল, এয়ারপোর্ট, সাভার ট্রান্সমিশন-রিলে সেন্টার প্রভৃতি স্থানগুলো নিয়ন্ত্রণে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সীমিত পরিসরে নূন্যতম শক্তি প্রয়োগ করে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করা হবে নির্ধারিত টার্গেটগুলোর উপর। একই সাথে

দেশের অন্যান্য সেনা নিবাসের ইউনিটগুলোর সেনা পরিষদগুলোকে সর্তক অবস্থায় রাখা হবে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে; যাতে করে প্রয়োজনে যে কোন প্রতিবন্ধকতা কিংবা সীমান্তের ওপার থেকে কোন প্রকার সামরিক হুমকির যথাযথভাবে মোকাবেলা করা যায় জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

কেন্দ্রিয় কমিটি '৭১ থেকে '৭৫ সাল অব্দি দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং বিপ্লব সর্ম্পকে একটি দলিল তৈরি করে সেনা পরিষদের সব ইউনিটে বিতরণ করে। দলিলের সারবস্তু ছিল নিম্নরূপ: -

রুশ সামাজিক সম্প্রসারণবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ১৯৭১এর স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল আপোষকামী শ্রেণীর প্রতিভূ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের যোগসাজসে বাংলাদেশকে তাদের একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। শেখ মুজিবর রহমান এবং আওয়ামী লীগের প্রতারণা ও ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়ে উঠেছে অর্থহীন। স্বাধীকার ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতীয় সংগ্রাম নিক্ষিপ্ত হয়েছে ব্যর্থতার অন্ধ গলিতে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ভৌগলিক স্বাধীনতা লাভ করে বটে কিন্তু জাতীয় মুক্তির পথ সুকৌশলে বন্ধ করে দেয় আওয়ামী লীগ সরকার ও তার বিদেশী প্রভুরা। স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের শাসনামলের চার বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের এক চরম বিভীষিকাময় কাল। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, সম্প্রসারণবাদী নীল নকশা এবং ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠির ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্র, অবিচার, অত্যাচার এবং অবাধ দুর্নীতি জাতীয় জীবনকে করে তুলেছে র্দুবিষহ। জাতীয় সম্পদের অবাধ লুন্ঠনের ফলে দেশের অর্থনীতি হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এবং দেশ আজ পৌঁছে গেছে চুড়ান্ত ধ্বংসের শেষপ্রান্তে। জাতীয় রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে চরম নৈরাজ্য ও স্থিতিহীনতা। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করার দায়িত্ব স্বভাবতঃই বর্তায় প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর উপর। কিন্তু আওয়ামী-বাকশালী শ্বেত সন্ত্রাস এবং সুপরিকল্পিত চক্রান্তের মুখে সাংবিধানিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মুজিব সরকারকে উৎখাত করা তাদের পক্ষে আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকারি নির্যাতন ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোর অপারগতার মূল কারণ হল- তাদের অনৈক্য, তাত্ত্বিক জ্ঞানের দেউলিয়াপনা, সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের কোন্দল এবং নেতাদের স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকতা। দেশ ও জাতি আজ এক চরম সংকটে নিমজ্জিত। স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে হতাশাগ্রস্থ জাতিকে মুক্ত করা আজ প্রতিটি দেশপ্রেমিকের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন উপায়ে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব নয় বলেই এ গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করার অভিপ্রায়ে একটি জনপ্রিয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটাবার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে সেনা পরিষদ।

বিপ্লবের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জনগণের উপর সামরিক শাসনের বোঝা চাপিয়ে দেয়া নয়। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করে সামরিক শাসন কায়েম করা হয়েছে কিন্তু এভাবে সামরিক বাহিনীকে সরাসরিভাবে জাতীয় রাজনীতিতে জড়ানোর পরিণামে সে সমস্ত দেশে উচ্চাভিলাসী সামরিক শাসকবৃন্দের গোষ্ঠিস্বার্থই চরিতার্থ হয়েছে: জাতি ও দেশের কোন কল্যাণ হয়নি। কোন বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ হাসিল করা আমাদের বিপ্লবের উদ্দেশ্য নয়। এই বিপ্লবের চরিত্র হবে অন্যান্য দেশে সাধারণভাবে সংগঠিত যে কোন ক্যু'দ্যাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেনা পরিষদ দেশবাসী এবং সারাবিশ্বে প্রমাণ করবে- বাংলাদেশের সেনা বাহিনীর বৃহৎ অংশ দেশপ্রেমিক: ক্ষমতালিপ্সু, সুযোগ সন্ধানী নয়। অবস্থার সুযোগ নিয়ে জনগণের রক্ষক হয়ে ভক্ষক বনে যাবার অভিপ্রেত তাদের নেই। দেশ ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় নির্ভীক, নিবেদিত প্রাণ সৈনিক তারা। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই বিপ্লব। স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো হবে যাতে করে সুষ্ঠ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটাবার জন্য দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা সংগঠিত হতে পারেন গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারাবাহিকতায়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব হবে দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলসমূহের। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের। সেনা বাহিনী দেশ ও জাতীয় স্বার্থের অতন্ত্র প্রহরী হয়ে র্নিবাচিত সরকারের অধিনে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে যাবে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে। প্রমাণ করা হবে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সদস্যরা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। জাতীয় স্বার্থই তাদের কাছে মুখ্য, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠি স্বার্থ নয়। অনন্য এই বিপ্লব নিখাদ দেশপ্রেমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মূলক মাইলফলক হিসাবে স্থাপিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে।

আসন্ন বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীঃ -

১। রুশ-ভারতের নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা।

২। মানবাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩। 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' নামে বাকশাল ও মুজিব সরকারের প্রতারণামূলক কার্যক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা।

৪। কৌশলগত কারণে স্বল্প সময়ের জন্য সংসদকে বলবৎ রেখে সাংবিধানিকভাবে একটি দেশপ্রেমিক সর্বদলীয় অস্থায়ী / র্নিদলীয় সরকার গঠন করা।

সর্বদলীয় অস্থায়ী / র্নিদলীয় সরকারের দায়িত্বঃ

১। বাকশাল প্রণোদিত শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা আইন, রক্ষীবাহিনী আইন, আর্ন্তজাতিক শ্রমিক আইনের পরিপন্থী শ্রমিক আইন ও অন্যান্য কালা-কানুন বাতিল করা।

২। রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে দেশে অবিলম্বে প্রকাশ্য রাজনীতি ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩। সকল রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া।

৪। সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৫। জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা এবং জরুরী ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম ছেলে-মেয়েদের সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় সার্মরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অবকাঠামো গড়ে তোলা।

৬। সমাজতন্ত্রের নামে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব ও সরকারি সহযোগিতায় জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চোরাচালান ও অবাধ দুর্নীতির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটিয়ে বিপর্যস্ত দেউলিয়া অর্থনীতির পূর্ণবিন্যাসের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭। জাতীয় জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বিচার বিভাগের পুর্ণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দেশে আইনের শাসন প্রবর্তন করা।

৮। প্রশাসন কাঠামোকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

৯। রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহে বাংলাদেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জীবনাদর্শের প্রতিফলন নিশ্চিত করার সাথে সাথে সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

১০। পঁচিশ বছরের মৈত্রী চুক্তি বাতিল করা।

উল্লেখিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই সংগঠিত করা হবে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।ঐতিহাসিক বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিকল্পনা ও নির্দেশাবলী যথা সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রিয় কমিটির তরফ থেকে জানানো হবে।

১৪ই আগষ্ট রাত ঢাকা বিগ্রেডের নাইট প্যারেড। এই অযুহাতে বিপ্লবের শেষ পর্যায়ের সব প্রস্তুতি শেষ করে ১৫ই আগষ্ট সুবেহ্ সাদেকে আল্লাহ্‌তা'য়ালার নাম করেই বিপ্লব

শুরু করা হল। পূর্ব নির্ধারিত টার্গেটগুলোর উপর অভিযান চালানো হল। অতি সহজেই স্ট্র্যাটেজিক (Strategic) পজিশনগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হল। শেখ মুজিব, শেখ মনি ও সেরনিয়াবাতের বাড়ি থেকে বাধা এল। প্রথম গোলাগুলি শুরু করা হল বাড়িগুলো থেকেই। গুলিতে তিনজন বিপ্লবী শহীদ হলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমান্ডাররা নির্দেশ দিতে বাধ্য হলেন পাল্টা আক্রমণ চালানোর। সংঘর্ষে নিহত হলেন শেখ মুজিব ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য। শেখ মনি ও সেরনিয়াবাতের বাড়িতে অবস্থানরত অস্ত্রধারীদের কয়েকজন মারা গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সব টার্গেটগুলোই নিউট্রেলাইজ করা সম্ভব হল। রেডিও বাংলাদেশের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হল, শেখ মুজিবের সরকারের পতনের কথা। একই সাথে ঘোষণা করা হল, খন্দোকার মোশতাক আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। মার্শাল'ল জারি করা হল দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। জনগণের কাছে আবেদন জানানো হল- বিপ্লবের সমর্থনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সেনা বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের পতন ঘটেছে জানতে পেরে সমগ্র জাতি সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে ঢাকার রাস্তায় লোকের ঢল নেমেছিল। জনগণ সারাদেশ জুড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে। মসজিদে মসজিদে লোকজন সেদিন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যদের জন্য বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেছিলেন। মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল মহল্লায় মহল্লায়। শেখ মুজিব ও তার দোসরদের জন্য সেদিন বাংলাদেশের জনগণ 'ইন্নালিল্লাহে ----- রাজেউন' পড়তেও ভুলে গিয়েছিলেন। সবারই এক কথা, 'দেশ জালিমের হাত থেকে বেঁচে গেছে।'

আমরা জানতাম বাকশালী শাসনে জনগণ অতিষ্ঠ। কিন্তু আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠি যে এতটা ধিকৃত হয়ে উঠেছিল জনগণের কাছে সেটা উপলব্দি করতে পেরেছিলাম বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর জনগণের অভূতপূর্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের বহিঃপ্রকাশে। বাংলাদেশের মানুষ জাতির ক্রান্তিলগ্নে অতীতে সবসময় সঠিক রায় দিয়ে এসেছেন সেটাই তারা আরেকবার প্রমাণ করলেন ১৫ই আগষ্টের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে। সমগ্র জাতির প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অভিভূত করেছিল। জনগণের দেশপ্রেম দেখে জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেছিলাম আমি। নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম জাতি ও দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছিলাম ভেবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৃহৎ স্বার্থে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সার্থকতা সেদিনই পেয়ে গিয়েছিলাম জনগণের দোয়া ও আন্তরিক অভিনন্দনে। জনগণের উপর বিশ্বাস ও প্রত্যয় বেড়ে গিয়েছিল। বুঝে নিয়েছিলাম বাংলাদেশের ৮কোটি মুসলমানকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না কোন অপশক্তিই। সব চক্রান্তের ব্যুহভেদ করে আত্ম মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে

নিজের স্থান করে নেবে একদিন বাংলাদেশের সচেতন সংগ্রামী জনতা। জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থনের জোয়ারে সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে পড়ল রুশ-ভারত চক্র। গণবিচ্ছিন্ন দেশ বিরোধী বিশ্বাসঘাতকরা সেদিন প্রাণের ভয়ে লেজ গুটিয়ে আত্মরক্ষার জন্য গর্তে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু সেখানেও রেহাই পায়নি তারা। জনগণ জাতীয় বেঈমানদের খুঁজে বের করে ধরিয়ে দিতে থাকে আইন-শৃঙ্খলা পালনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে। এ অবস্থায় বাকশালী চক্রের যে সমস্ত নেতারা জান বাঁচাবার চেষ্টায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই জনগণের কাছ থেকে কোন সাহার্য্য-সহযোগিতা না পেয়ে উপায়হীন হয়ে স্বেচ্ছায় সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন। জনাব তোফায়েল আহমেদ এবং জনাব আব্দুর রাজ্জাক তাদের মধ্যে অন্যতম। জনাব কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল থেকে একটি টেলিগ্রাম করে তাতে জানায়, সে রাষ্ট্রপতির কাছে আত্মসমর্পন করতে চায়। এ টেলিগ্রামের কোন জবাব না পেয়ে প্রাণের ভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকারের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে দেশ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর সহযোগিতায় তার দ্বারা পরিচালিত এক সশস্ত্র হামলার মোকাবেলা করতে গিয়ে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর এক তরুণ অফিসার ও চারজন সৈনিক শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জিয়া সরকার দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তার বিচার করে। বিচারে আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দীর্ঘ মেয়াদী সাজা প্রদান করে। তখন থেকেই রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে হালে বাংলাদেশে ফিরে এসে রাজনীতিতে আবার পুনর্বাসিত হয়েছে সেই কাদের সিদ্দিকী। কাদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রদ্রোহী কাদের সিদ্দিকী আবার বাংলাদেশের মাটিতে প্রকাশ্য রাজনীতি করার সুযোগ পেল এই রহস্যের উদঘাটনও ঘটবে একদিন এই বাংলাদেশের মাটিতেই।

ফিরে যাওয়া যাক ১৫ই আগষ্টে। অপারেশন শেষ। রেডিওতে সরকার পতন ও শেখ মুজিবের নিহত হবার খবর ঘোষিত হয়েছে। আমি কিছু জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলাম হঠাৎ ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার এসে জানাল রক্ষীবাহিনীর তিনটি ট্রাক ও একটি জিপ টিএসসি-র দিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারলাম এরা রক্ষীবাহিনীর টহলদার ইউনিট। শেখ মুজিবের বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবের মৃত্যু সংবাদ যদি শুনে থাকে তবে তাদের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সংঘর্ষ অনিবার্য। আর যদি না শুনে থাকে তবে তাদের খবরটা জানিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে শাহরিয়ারকে বললাম, "আমি ওদের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য যাচ্ছি। ওদের সমর্থন না পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য তুমি তৈরি থেকো।" জিপ চালিয়ে একাই বেরিয়ে এলাম গেট দিয়ে। পিজি হাসপাতাল এর সামনে পৌঁছতেই দেখলাম কনভয়টি পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে এসে থেমেছে। আমি জিপ

থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম জিপে বসে আছে রক্ষীবাহিনীর একজন লিডার। লিডার আমাকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে স্যালুট করে দাড়াল।

– তোমরা এখানে কি করছ? প্রশ্ন করলাম।

– আমরা টহল দিচ্ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। গোলাগুলির শব্দ শুনে এদিকে এসেছি। জবাব দিল লিডার। বুঝলাম ওরা বিপ্লব ও মুজিবের মৃত্যুর খবরটা এখনও শোনেনি। লিডার জিজ্ঞাসা করল,

– ব্যাপার কি স্যার? বললাম,

– শেখ মুজিবের সরকারের পতন ঘটিয়েছে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী। শেখ মুজিব মারা গেছেন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে। এ পরিস্থিতিতে তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমরা এই পরিবর্তনের পক্ষে না বিপক্ষে। অল্পক্ষণ চিন্তা করে লিডার বলল,

– আমরা পরিবর্তনের সপক্ষে। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ট্রুপসদের গাড়ি থেকে নামিয়ে তাদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলে তাদের মতামত জানতে চাইলে সবাই একবাক্যে পরিবর্তনকে সমর্থন জানাল। এরপর সবাইকে সাথে নিয়ে 'নারায়ে তাকবির। আল্লাহু আকবর', 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ', 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই' প্রভৃতি শ্লোগান দিতে দিতে রেডিওতে ফিরে এলাম। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে বুঝেছিলাম, ওদের সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ছিল নির্ভুল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল (অবঃ) তাহের, কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন, মেজর (অবঃ) শাহজাহান ওমর, মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দিন, মেজর (অবঃ) রহমতউল্লাহ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) মাজেদ এবং এক্স পিএমএ ক্যাডেট মোস্তাক ও সরাফত এসে হাজির হল রেডিও বাংলাদেশে। ঘোষণা শুনেই এসেছে তারা বিপ্লবের প্রতি তাদের সমর্থন ও অভিনন্দন জানাতে। খবর এল পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী ইতিমধ্যেই সাভারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পকে নিরস্ত্র করে তাদের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। লেঃ কর্নেল রশিদ চলে গেছে জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদকে নিয়ে আসার জন্য আর আমি গেলাম মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও বাহিনী প্রধানদের নিয়ে আসতে। ঘটনাগুলো ঘটছিল অতি তরিৎ গতিতে। ঢাকা সেনানিবাস তখন সম্পুর্ণভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে সারা ক্যান্টনমেন্টে। অতি প্রত্যুষে বিপ্লবের খবর পেয়ে জেনারেল শফিউল্লাহ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলকে ফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের পক্ষে তখন কিছুই করা সম্ভব ছিল না। তিনি ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন বটে কিন্তু তার অধিনস্ত রেজিমেন্ট ও ব্যাটালিয়নগুলো সবই তখন সেনা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে, বৈপ্লবিক অভুত্থানের স্বপক্ষে। শাফায়াত জামিলের কাছে

থেকে নিরাশ হয়ে জেনারেল শফিউল্লাহ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ) কে অনুরোধ জানান কিছু করার জন্য। ব্রিগেডিয়ার খালেদ জবাবে তাকে জানান, "Bangabandhu is dead. The army has revolted and whole army has celebrated." এ পরিস্থিতিতে কারো কিছু করার নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমি জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দোকার, নৌ বাহিনী প্রধান এমএইচ খানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম রেডিও বাংলাদেশে। রশিদ ফিরে এল জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমেদকে নিয়ে। আমিন ফিরে এল তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রক্ষীবাহিনী প্রধান কর্নেল আবুল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে। বিডিআর প্রধানকেও ডেকে আনা হল। রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমদ রেডিও-তে জাতির প্রতি তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানরা সবাই রাষ্ট্রপ্রধান খন্দোকার মোশতাক আহমদের আনুগত্য প্রকাশ করে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের স্বপক্ষে ভাষণ দিলেন রেডিওতে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আওয়ামী-বাকশালী নেতারা অনেকেই গ্রেফতার হন। ঐ দিনই জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ করেন। অস্থায়ী বিচারপতি সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেন এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। একই দিন উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন জনাব মাহ্‌মুদুল্লাহ। মন্ত্রী পরিষদও গঠিত হয় সেদিনই।

মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ:

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
ফনিভূষণ মজুমদার
মোঃ সোহরাব হোসেন
আব্দুল মান্নান
মনরঞ্জন ধর
আব্দুল মোমেন
আসাদুজ্জামান খান
ডঃ এ আর মল্লিক
ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী

প্রতিমন্ত্রীঃ

শাহ মোয়াজ্জম হোসেন
দেওয়ান ফরিদ গাজী
তাহের উদ্দিন ঠাকুর
অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
নূরুল ইসলাম মঞ্জুর
কে এম ওবায়দুর রহমান
মোসলেম উদ্দিন খান
রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ
ক্ষিতিশচন্দ্র মন্ডল
সৈয়দ আলতাফ হোসেন
মোমিন উদ্দিন আহমদ

খন্দোকার মোশতাক সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল পরবর্তিকালে। বাকশাল সরকারের ১৮জন মন্ত্রীর ১০জন এবং ৯জন প্রতিমন্ত্রীর ৮জনই মোশতাক সরকারে যোগদান করেছিলেন ১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়ে। পাকিস্তান অভ্যুত্থানের প্রথম দিনই খন্দোকার মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। যে সৌদি আরব মুজিব সরকারকে দীর্ঘ সাড়ে চার বছর স্বীকৃতি দেয়া থেকে বিরত ছিল সেই সৌদি আরবও অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় দিনে মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। গণচীন শুধু মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতিই দান করেনি; পিকিং বেতার ও ভয়েস অব আমেরিকা অভুত্থানের সমর্থনে একই সাথে হুশিঁয়ার বাণী প্রচার করে, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন একটি আভ্যন্তরীন ব্যাপার। সে দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপার বিদেশী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীন সহ্য করবে না। এ ধরণের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে বিধায় গণচীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ধরণের হস্তক্ষেপে নিশ্চুপ থাকবে না। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই তারা গ্রহণ করবে।" শুধু হুশিঁয়ারীই নয়; গণচীনের সেনা বাহিনীকে ভারতের যে কোন আগ্রাসী হামলার মোকাবেলায় সীমান্ত অবস্থান জোরদার করে তোলার হুকুম দিয়েছিল গণচীনের সরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীনের হুশিঁয়ারী এবং দেশের জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সরকার ১৭ই আগষ্ট বাংলাদেশে আগ্রাসী সামরিক অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়; অভ্যুত্থানের ১২দিনের মাথায় জাপান, ইরান, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আরো ৩৯টা দেশের সাথে ভারতও মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

রেডক্রস এর চেয়্যারম্যান পদ থেকে কুখ্যাত গাজী গোলাম মোস্তফাকে অপসারিত করে বিচারপতি বি.এ সিদ্দিককে তার পদে নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোশতাক এক অধ্যাদেশ জারি করে একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করে দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। মুজিব কর্তৃক দেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করে গভর্ণর নিয়োগের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। দেশের ১৯টি জেলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জেলা প্রশাসকদের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়। দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি, মুজিব সরকারের ৬জন মন্ত্রী, ১০জন সংসদ সদস্য, ৪জন আমলা এবং ১২জন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিচারের জন্য দু'টো বিশেষ আদালত গঠিত হয়। সামরিক বাহিনীর ৩৬ জন দুর্নীতিপরায়ন অফিসারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। রাজবন্দীদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বিলুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়। সরকারি আদেশে মশিউর রহমান এবং অলি আহাদকে বিনাশর্তে মুক্তি দান করা হয় ২৫শে আগষ্ট। একই দিনে জেনারেল ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির নয়া সামরিক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে জয়েন্ট চীফ অব ডিফেন্স ষ্টাফ হিসাবে এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর স্থানে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আর্মি চীফ অফ ষ্টাফ হিসাবে নিয়োগ করা হয়। বিমান বাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ হিসাবে নিযুক্ত হন এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব।

দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকা দুইটি মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৬ই আগষ্ট মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী নয়া সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এক বার্তা পাঠান। দেশের প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, নেতা এবং গণসংগঠনের সমর্থনও লাভ করতে সমর্থ হয় নতুন সরকার। তারা সবাই দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনীকে তাদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ৩রা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মোশতাক ঘোষণা করেন, "১৯৭৬ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে দেশে বহুদলীয় অবাধ রাজনীতি পুনরায় চালু করা হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী দেশে সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত করা হবে।"

এভাবেই উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নেবার ফলে দেশের সার্বিক অবস্থা অতি অল্প সময়ে শুধুমাত্র স্বাভাবিকই হয়ে উঠেছিল তাই নয়; দেশের আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং কল-কারখানার উৎপাদনেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। দেশে চুরি-ডাকাতি ও চোরাচালানের মাত্রা কমে যায় বহুলাংশে। দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে পূর্ণমাত্রায়। দেশে বিদেশে অস্থায়ী সরকারের

নীতিসমূহ ও পদক্ষেপগুলি প্রশংসিত হয়। সার্বিক অবস্থার স্বাভাবিকরণের পর সেনা পরিষদ বিপ্লবের অবশিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। লোকচক্ষুর অন্তরালে আমরা রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলি আমাদের লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায়। পর্বত সমান প্রতিবন্ধকতার মুখে কাজ করতে হচ্ছিল সেনা পরিষদকে।

বস্তুতঃ শেখ মুজিব তার নিজের ও পরিবারের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী একটা ভিত্তি দেয়ার লক্ষ্যেই বাকশালী স্বৈরাচার কায়েম করেছিলেন। এভাবেই যুগযুগ ধরে স্বৈরাচারী শাসকরা আর্বিভুত হয়। এরা একই নিয়মে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। জার্মানীর হিটলারের উত্থান ঘটেছিল এভাবেই। নাৎসী পার্টি তাকে মহামানব আখ্যায়িত করেছিল। বাকশালীরাও শ্লোগান তুলেছিল, "এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।" ফলশ্রুতিতে মুজিব পরিণত হয়েছিলেন, একজন স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়কে। ইটালীতে মুসোলিনির আবির্ভাবও ঘটেছিল একই প্রক্রিয়ায়।

জনাব হায়দার আকবর খান রনো ও আরো অনেকে মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ও লেখক বাকশাল ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। আওয়ামী লীগের শাসনামল ছিল বর্বরতার নজীরে পূর্ণ। সংসদীয় গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করে একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারসহ সকল রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল। জাতি কখনোই এই কলংকিত ইতিহাসের কথা অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারে না। আওয়ামী-বাকশালী শাসনামল ছিল মূলতঃ হত্যার ইতিহাস, নারী নির্যাতনের ইতিহাস, লুণ্ঠনের ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস, চোরাচালানের ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবার ইতিহাস, জাতীয় অর্থনীতিকে বিকিয়ে দেবার ইতিহাস, রক্ষীবাহিনীর শ্বেত সন্ত্রাসের ইতিহাস, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ও লাখো শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানীর ইতিহাস। রাষ্ট্রীয়করণের নামে আওয়ামী লীগ ব্যাংক, বীমা, মিল, কল-কারখানায় হরিলুট করেছিল। দেশে সম্পদ পাচাঁর করার জন্য সীমান্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আওয়ামী শাসনামলে অবাধ লুটপাটের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে 'তলাহীন ঝুড়ি' আখ্যা পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের আমলে বিদেশী সাহায্যের বেশিরভাগ মালই ভারতের কোলকাতা ও বিশাখা পাওম বন্দরে খালাস পেতো। একাত্তরের যুদ্ধ আর ধ্বংসযজ্ঞের পর বাহাত্তরে কোন দুর্ভিক্ষ না হয়ে আওয়ামী লীগের শাসন ও শোষণের ফলে '৭৪-এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। অনাহারে মারা গিয়েছিল লাখ লাখ আদম সন্তান। ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছিল মানুষ আর কুকুরে। অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের কলাপাতার কাফনে দাফন করতে হয়েছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বন্য লতা-পাতা, কচু-ঘেচু আর কলাগাছের কান্ড সংগ্রহে ব্যস্ত জাল পরা বাসন্তীরা আওয়ামী কুশাসনের ঐতিহাসিক সাক্ষী। বিপুল

পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সরকারিভাবে ভারত থেকে সুন্দরী ও সোহাগী নামের দেড় হাত প্রস্থ ও সাত হাত দৈর্ঘ্য শাড়ী আমদানি করে আওয়ামী লীগ বস্ত্রহীন, নিরন্ন ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাথে জঘণ্য মস্করা করেছিল। জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ঐ কাপড়ের নাম দিয়েছিল 'উলঙ্গ বাহার শাড়ী'।

আওয়ামী লীগ ও বাকশাল সরকার তাদের শাসনামলে এ দেশের জনগণকে গণতন্ত্রের নামে দিয়েছিল স্বৈরাচার; সমাজতন্ত্রের নামে শুরু করেছিল সামাজিক অনাচার; বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে জাতিকে করেছিল বিভক্ত; আর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যুগিয়েছিল ধর্মহীনতার ইন্ধন। স্বৈরাচারী মুজিব সরকার সুপ্রীম কোর্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল! ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যদি না হত তাহলে গণতন্ত্রের বধ্যভুমিতে আজকের শতাধিক রাজনৈতিক দলকে একদলীয় বাকশালের ধ্বজা বহন করেই বেড়াতে হত। এমনকি আওয়ামী লীগ নামক কোন দলেরও পুর্ণজন্ম হত না। আওয়ামী-বাকশালীদের অনাসৃষ্টির জন্য বিধ্বস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ঘানি দেশবাসীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টানতে হত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, গোলাবারুদ, স্বর্ণ, মূল্যবান ধাতু, যানবাহন, মিল-কারখানার মেশিনপত্র, কাঁচামাল ভারতের হাতে তুলে দিয়ে আওয়ামী লীগ সমগ্র জাতিকে প্রতিপক্ষ করে স্বাধীনতার সোল এজেন্ট সেজে বসেছিল। এসবের প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় দেশমাতৃকার অন্যতম সেরা সন্তান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল; প্রাণ হারাতে হয়েছিল বিপ্লবী সিরাজ সিকদার ও হাজারো মুক্তিযোদ্ধাকে। লাঞ্ছণার শিকারে পরিণত হতে হয় অনেক দেশপ্রেমিককে। দীর্ঘমেয়াদী অসম চুক্তির মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বন্ধক রেখেছিল আওয়ামী লীগই। লালবাহিনী, নীলবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, রক্ষীবাহিনীসহ ইত্যাকার নানা রকমের বাহিনী গঠনের দ্বারা দুঃসহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে বিনা বিচারে ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক কর্মীর প্রাণ সংহার করার কালো ইতিহাস আওয়ামী-বাকশালীদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় রাজনৈতিক নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে নির্মমভাবে পাশবিক অত্যাচার করে হত্যা করার পর শেখ মুজিব স্বয়ং সংসদ অধিবেশনে ক্ষমতার দম্ভে বলেছিলেন, "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?" ২৩/১/১৯৯২ তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে '৭২ থেকে '৭৫ সালের আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসন প্রসঙ্গে জনাব মওদুদ আহমেদ বলেন, "১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার পর ২৯শে ডিসেম্বর ভোরে আমাকে বিনা অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বন্দী করা হয়েছিল। অথচ সরকার আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনতে পারেনি সেদিন। এই তোফায়েল সাহেবই রক্ষীবাহিনীর ইনচার্জ ছিলেন। আর এই বাহিনীর হাতেই এ দেশের ৪০ হাজার নিরীহ মানুষ জীবন হারিয়েছে। সিরাজ সিকদারের হত্যার কথা আজো এ দেশবাসী ভুলে

যায়নি। '৭২ থেকে '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট অব্দি আওয়ামী-বাকশালী শাসনকাল এ দেশের ইতিহাসে সবচাইতে কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

জাতির আশা-আকাংখাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সে ব্যবস্থা টিতে থাকেতে পারে না। জনসমর্থন ছাড়া কোন ব্যবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। জাতীয় বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকরা যখন জাতির কাঁধে একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাতন্ত্রের বোঝা চাপিয়ে দেয়, জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থ হাসিলের জন্য মীরজাফর বা রাজাকার-আলবদরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাদের অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য তাদের দুঃশাসন উৎখাত করার জন্য দেশপ্রেমিকদের বিপ্লবের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে যুগে যুগে। একই যুক্তিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বিপ্লব সংগঠিত করেছিল বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ। সেই বিপ্লব ছিল একটি সফল অভ্যুত্থান। দেশ ও জাতি মুক্তি পেয়েছিল দাসত্বের নাগপাশ ও স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে। বাকশাল সরকারের উৎখাত ও মোশতাক সরকারের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন এ কথাই প্রমাণ করেছিল জনগণের আশা-আকাংখার সাথে বাকশালের কোন সম্পর্ক ছিল না। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনসমর্থনও ছিল না। ১৫ই আগষ্টের বিপ্লব স্বতঃস্ফুর্ত জনসমর্থন পেয়ে একটি জনপ্রিয় অভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

বিভিন্নমুখী চক্রান্তের জাল

- ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে।
- দুর্নীতির দায়ে এবং বাকশাল সমর্থক ৩৬ জন সেনা অফিসারকে সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও তার দোসররা বৃহত্তর চক্রান্তের বড়ে হিসাবেই ব্যবহার হচ্ছিল।
- জেনারেল জিয়া নিজের অজান্তেই সতর্ক ঘন্টা বাজিয়ে দিলেন।
- একটি চমকপ্রদ ঘটনা।
- জনাব আবেদুর রহমান অতি কৌশলে ঘুষ দেবার ধৃষ্টতা দেখান।
- টিপিক্যাল আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা।
- তোষামদকারীরা মাছির মতই ভন্ ভন্ করতো ক্ষমতাবলয়ের আশেপাশে।
- মেজর নূর পেলো শেষ আলটিমেটাম।
- আসন্ন বিপর্যয়ের মোকাবেলা করার প্রচেষ্টায় সেনা পরিষদ এবং জেনারেল জিয়ার সাথে ৩রা নভেম্বরের আগে শেষ সাক্ষাত।

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিজয়কে আপামর দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানালেও পরাজিত বাকশালী চক্র ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী মহল সহজে এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছিল না। তারা জনসমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষভাবে এই বিপ্লবের বিরোধিতা করতে না পেরে গোপনে তাদের হারানো স্বর্গ ফিরে পাবার আশায় তাদের বিদেশী প্রভুদের যোগসাজসে চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করে বিপ্লবের পরমুহূর্ত থেকেই। তাদের এ ধরণের তৎপরতা সম্পর্কে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছিল। বিপ্লবের পর পরাজিত শক্তিকে সমূলে বাংলাদেশের মাটি থেকে উপড়ে ফেলার জন্য আমরা সচেষ্ট ছিলাম। সর্বদলীয় সরকার কায়েম করে তার তত্ত্বাবধানে যতশীঘ্র সম্ভব নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। একই সাথে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে proper screening এর পর সেনা বাহিনীর সাথে একত্রীভূত করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেনা বাহিনীর পুর্নগঠন করে বিপ্লবের স্বপক্ষ শক্তিকে সুসঙ্গবদ্ধ করার। সেনা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দানকারী জেনারেল ওসমানীকে নিয়োগ করা হয় প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সামরিক উপদেষ্টা। তাঁর মূল দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের উপেক্ষিত সামরিক বাহিনীর সার্বিক কাঠামো নতুন করে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ধাঁচে গড়ে তোলা। সেনা বাহিনীর পুর্নগঠনের কাজটি তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল খুবই জটিল এবং দূরহ একটি কাজ। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বাছাই করে তাদের সেনা বাহিনীতে নিয়োগ করতে হবে। সেনা বাহিনী থেকে বাকশালীমনা, দুর্নীতিপরায়ন এবং উচ্চাভিলাসীদের বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত ইউনিটগুলোর পুনর্বিন্যাশ করতে হবে। কমান্ড স্ট্রাকচারে প্রচুর রদবদল করতে হবে। সর্বোপরি সেনা বাহিনীর প্রতিটি সৈনিককে বিপ্লবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এ সমস্ত কাজে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সেনা পরিষদের সদস্যরাই ছিল জেনারেল জিয়ার মূল শক্তি। তাদের সার্বিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করেই জেনারেল জিয়া তার দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। আওয়ামী-বাকশালী আমলে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত অফিসারদের সামরিক বাহিনীতে পুনর্বহালের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং এই নীতি কার্যকরী করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একই সাথে আমরা তখন দেশের দেশপ্রেমিক-জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল, গ্রুপ এবং ব্যক্তিবর্গের সাথে দেশের ভবিষ্যত রাজনৈতিক কাঠামো, জাতীয় সরকার, নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে মত বিনিময় করছিলাম। এই প্রক্রিয়াটাও ছিল ভীষণ জটিল। বিগত ঐক্য প্রক্রিয়ার মত এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনাকালে সব

রাজনৈতিক দলই তাদের দলীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। এমনকি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবটি খন্দোকার মোশতাক আহমদও প্রথমে মেনে নিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি চাইছিলেন সরকার প্রধান থেকে একটি নিজস্ব দল গঠন করে তার অধিনস্থ অস্থায়ী সরকারের অধিনেই নির্বাচন করতে। কিন্তু আমাদের জোরালো যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মেনে নিতে হয়েছিল জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব। যে সংসদ গণতন্ত্রের বলি দিয়ে বাকশাল কায়েম করেছিল তাদের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর মোশতাক সরকার ও গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে সর্বদলীয় সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম আমরা। বামপন্থী রাজনৈতিক অনেক দলই বিশেষ করে জাসদ চাচ্ছিল একটি বিপ্লবী সরকার কায়েম করে তাদের দলীয় কর্মসূচী আমরা বাস্তবায়ন করি। কিন্তু তাদের সেই সব প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার কোন ইচ্ছা নেই আমাদের এমনকি রাজনীতিতে সরাসরিভাবে সেনা বাহিনীর অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে সেনা পরিষদ। জাতীয় কিংবা নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে কোন বিশেষ দলের কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্য নয়। তাদের দায়িত্ব হবে দেশে একটি সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের অধিকার অর্জন করবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাজনৈতিক দল।

কিছুদিন পর একদিন জেনারেল জিয়া জানালেন, তার কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করছে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল। তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে কিছু বাকশালপন্থী অফিসার। ব্রিগেডিয়ার খালেদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু ভীষণ উচ্চাভিলাসী। তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য অতি কৌশলে যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি তার শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করে আসছিলেন। মুজিব সরকার ও বাকশালীদের সহানুভূতিও ছিল তার প্রতি। আচমকা বাকশালী সরকারের পতনের ফলে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তাই তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যে কোন উপায়েই তার পরিকল্পনা কার্যকরী করে তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করতে। তার এই হীন চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ থেকে তাকে কিছুতেই নিরস্ত্র করতে পারছিলেন না জেনারেল জিয়াউর রহমান। ক্ষমতার প্রতি ব্রিগেডিয়ার খালেদের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল বাকশালী চক্র এবং তাদের মুরুব্বী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দোসর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। ১৫ই আগষ্ট পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে আগষ্ট বিপ্লবের পূর্ব অবস্থায় দেশকে নিয়ে যাবার এক গভীর ষড়যন্ত্রের সূচনা ঘটানো হল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্টেও এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যেতে লাগল। ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রধান উস্কানিদাতা ছিল কর্নেল শাফায়াত। শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ এই অফিসার কিছুতেই বাকশালী সরকারের পতনকে মেনে নিতে পারছিলেন না।

কুখ্যাত আত্রাই অপারেশনের চ্যাম্পিয়ন কর্নেল শাফায়াত জামিল যাকে পরে ঢাকায় ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করে শেখ মুজিব পুরস্কৃত করেছিলেন: সেই শাফায়াত জামিলের অধিনস্ত ঢাকা ব্রিগেডই মুজিব সরকারের পতন ঘটালো এই humiliation তার পক্ষে কিছুতেই সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে এই গ্ল্যানি তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। এর জন্যই সে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে মোশতাক সরকার এবং জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে উস্‌কে দিয়ে তাকে বাকশালী চক্র ও তাদের বিদেশী প্রভুদের ক্রিয়াণকে পরিণত করেছিল। তাদের সাথে জোট বেধেছিল রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আগরতলা মামলার আসামীদের কয়েকজন অফিসার। প্রথমত: আমরা এবং কর্নেল ওসমানী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এ ধরণের আত্মঘাতী এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে পারেন সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু ক্রমে যখন বিভিন্ন সেনা নিবাসগুলো থেকে সেনা পরিষদের সদস্যরাও একই ধরণের খবর পাঠাতে লাগল তখন বিষয়টি চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। বোঝা যাচ্ছিল সংকট ঘনিয়ে আসছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে এ ধরণের সর্বনাশা চক্রান্ত থেকে সরে দাড়াবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হল না। প্রত্যেকবারই মুখে সবকিছুই অস্বীকার করেছিলেন খালেদ ভাই। বুঝলাম, ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে গেছেন তিনি। তার কর্মকান্ডের গুরুত্ব এবং পরিণাম কি হতে পারে সেটাও বোধ করি তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চক্রান্তের ক্রিয়াণক হয়ে কোন অঘটন ঘটালে এর পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর এবং জনগণ তাকে চিহ্নিত করবে জাতীয় বেঈমান হিসাবে। সেটা হবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এ মুহূর্তে জাতীয় স্থিতিশীলতা বজায়ে রাখার জন্য সামরিক বাহিনী বিশেষ করে আর্মির মধ্যে ঐক্য একান্তভাবে প্রয়োজন। জেনারেল জিয়াকেও কার্যকরী করে তুলতে হবে তা না হলে আগষ্ট বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। পর্দার আড়ালে যে চক্রান্তের বীজ দানা বেঁধে উঠছে তার কবল থেকে দেশ ও জাতিকে কী করে বাচানো যায় সেটাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছিল আমাদের। ঠিক হল জেনারেল জিয়া, ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে নিয়ে মুখোমুখি বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। কয়েকবারই বৈঠক হল। প্রতিবারই তারা দু'জনেই জেনারেল জিয়ার সাথে সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছিলেন কিন্তু সেটা ছিল শুধু কথাই। তাদের কাজ-কর্মে কোন পরিবর্তন হল না। পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল, ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল শাফায়াত এবং তাদের সহযোগিদের অবিলম্বে সেনা বাহিনী থেকে বহিষ্কার করতে হবে। দেশ এবং জাতিকে দাসত্বের হাত থেকে বাচানোর আর কোন উপায়ই ছিল না। কাজটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ; কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামের সব যোগ্য কমান্ডারদের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষন এবং আনুগত্য ছিল তাদের অধিনস্ত যোদ্ধাদের। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল

শাফায়াতকে চাকুরিচ্যুত করলে সেনা বাহিনীতে একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে কিন্তু আমরা নিশ্চিত ছিলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের চক্রান্তের আসল উদ্দেশ্য সৈনিকদের সামনে তুলে ধরলে ব্যক্তিগত আনুগত্য যাদের আছে তারাও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী হীন চক্রান্তকে সমর্থন করবে না। আমাদের তরফ থেকে সিদ্ধান্তের কথাটা জেনারেল জিয়াই জেনারেল ওসমানীকে জানালেন। সব শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না খালেদ এবং শাফায়াত এ ধরণের ন্যাক্কারজনক কাজে লিপ্ত হতে পারে! কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগীয় প্রধানরা যখন বিস্তারিত রিপোর্ট তার সামনে পেশ করলেন তখন অসহায় আক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও কর্নেল শাফায়াতকে ডেকে তাদের সাথে জেনারের জিয়ার বিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে একইভাবে তাকে আস্বস্ত করার জন্য বলেছিলেন, তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, এই চক্রান্তে হাত রয়েছে বাকশালীদের একটি চক্র এবং তাদের সার্বিকভাবে মদদ যোগাচ্ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা চালাচ্ছে আর্মির মধ্যে কিছু লোকের মাধ্যমে একটা প্রতি বিপ্লবী ঘটনা ঘটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভক্তি সৃষ্টি করে দেশকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে ২৫ বছরের আওতায় বাংলাদেশে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করে জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি অনুগত সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে আবার একটি করদ রাজ্যে পরিণত করা। রিপোর্ট থেকে আরও জানা গেল, এই নীল নকশা বাস্তবায়নে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দূতাবাস যৌথভাবে অত্যাধিক মাত্রায় তৎপর রয়েছে। তাদের পরামর্শে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ভাই সাবেক সাংসদ বাকশালী নেতা জনাব রাশেদ মোশাররফ সংশ্লিষ্ট মহল এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই চক্রান্তের সম্পর্কে পরবর্তিকালে জনাব এনায়েতউল্লাহ খানের পত্রিকা সাপ্তাহিক Holiday-তে এক বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 'Bangladesh The Unfinished Revolution' গ্রন্থে জনাব লিফস্যুলজ লিখেছেন, "রয়টার সংবাদদাতা জনাব আতিকুল আলমের হাতে ভারতীয় হাই কমিশনার জনাব সমর সেনের কাছে অভ্যুত্থান বিষয়ক জনাব তাজুদ্দিনের স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠি পৌঁছেছিল।"

জনাব জিল্লুর রহমান খান 'Leadership crisis in Bangladesh' গ্রন্থে লিখেছেন, "খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের বিষয়ে জেলে চার নেতা অবহিত ছিলেন। এটা ছিল একটি মুজিবপন্থী পাল্টা অভ্যুত্থান। কারণ চার নেতা বীরদর্পে জেল থেকে বের হয়ে এসে সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।"

সর্বমোট ৩৬জন অফিসারকে সেনা বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একই সাথে মুজিব আমলে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত অফিসারদের পুনর্বহালের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার জন্য জেনারেল জিয়াকে অনুরোধ জানানো হয়। এর কয়েকদিন পরেই আমরা আবার চাকুরিতে পুনর্বহাল হই। এতে করে সেনা বাহিনীতে বিপ্লবের স্বপক্ষ শক্তি বৃদ্ধি পায়। জেনারেল জিয়ার হাতও এতে করে তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠে। জেনারেল জিয়া অবিলম্বে আমাদের সবাইকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলোতে নিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমাদের সেনা বাহিনীতে পূর্ণবাসনের ফলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও তার সমর্থকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তারা বুঝতে পারেন, সেনা বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসলে তাদের কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। তারা এটাও বুঝতে পারলেন যে, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই তারা অস্থির হয়ে উঠলেন মরণ কামড় দেবার জন্য। ঐ সময়ে একদিন জেনারেল জিয়া প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কাছ থেকে কর্নেল রউফ (শেখ মুজিবের আমলে তার বিশেষ আস্থাভাজন সেনা বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান) এবং কর্নেল মালেকের চাকুরিচ্যুতির ফাইল সই করিয়ে নিয়ে সেনা বাহিনী থেকে তাদের অবসর প্রদানের আদেশ জারি করলেন। ব্যাপারটা জানতে পেরেই আমি শংকিত হয়ে পড়লাম। ছুটে গেলাম জেনারেল জিয়ার কাছে,

–স্যার এটা আপনি কি করলেন! কথা ছিল ৩৬জনকে একই সাথে অবসর প্রদান করা হবে। সেটা না করে মাত্র দু'জনকে অবসর প্রদান করে বাকি ষড়যন্ত্রকারীদের হুঁশিয়ার করে দিলেন আপনি। এটা কি ঠিক হল? জবাবে জেনারেল জিয়া আমাকে বললেন,

– Don't worry, let me move step by step. Things would be all right. Let me handle the affairs in my own way.

তার যুক্তিতে মন সায় দিল না। কিন্তু কিছুই করার নেই। তিনি আমাদেরই একজন। তার কর্মপদ্ধতির উপর দখলদারী করাটা যুক্তিসঙ্গত তো নয়ই; সেটা উচিতও নয়। তবু বেশ কিছুটা অস্বস্তি নিয়েই ফিরে এলাম। ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার চামচারা তখন সেনা বাহিনীতে জোর প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে। তাদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, জেনারেল জিয়া যোগ্য বিপ্লবী নন; তার দ্বারা আগষ্ট বিপ্লবের উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। তিনি সর্বোময় ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে কারসাজি করে চলেছেন অতি ধূর্ততার সাথে। এক্ষেত্রে সবাইকে তার বিকল্পের কথা ভাবতে হবে। সাধারণ সৈনিকদের কাছে জিয়া ছিলেন আদর্শের প্রতীক। সততার জন্য তার জনপ্রিয়তাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তারই সহযোদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি অংশের বিরূপ প্রচারণা সেনা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল। ফলে পরিস্থিতি হয়ে উঠল আরও ঘোলাটে। একসাথে ৩৬জন

অফিসারকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি না দেবার কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল চক্রান্তকারীরা। অবস্থার কতটুকু অবনতি ঘটেছে তার হদিস পেলাম সেই দিন যেদিন আমাদেরই দুইজন অফিসার মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবাল এক বৈঠকে জেনারেল জিয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করল। জেনারেল জিয়ার প্রতি অনাস্থাই শুধু প্রকাশ করেনি তারা। তারা প্রস্তাব রেখেছিল, "যেহেতু জেনারেল জিয়া তার উপর প্রদত্ত দায়িত্ব আশানুরূপভাবে পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তাই প্রয়োজনের খাতিরেই বিকল্প হিসাবে আরো যোগ্য কাউকে চীফ বানাবার কথা ভাবতে হবে তা না হলে অবস্থা সামলানো যাবে না। রাগ এবং হতাশায় কথাচ্ছলে তারা এমনও বলেছিল, "ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফতো আমাদের অনেক তোষামোদ করেছিলেন তাকে চীফ বানাবার জন্য। আমাদের সব শর্ত মেনে নেয়ার জন্যও রাজি ছিলেন তিনি। তার খায়েশ মিটিয়ে দিলে জিয়ার তুলনায় তার কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ আদায় করে নিতে পারতাম আমরা। বর্তমানে সেনা বাহিনীতে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী জেনারেল জিয়ার ভুল পদক্ষেপ এবং তার আস্তে চলার নীতি।" ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রসঙ্গে তাদের সেসব উক্তিকে শুধুমাত্র ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ মনে করে উপস্থিত কেউই তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি সেই সময়। জেনারেল জিয়ার প্রতি তাদের অভিযোগের অনেকটাই সত্য হলেও তাদের সেই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি বৈঠকে। বেশিরভাগ সদস্যদের অভিমত ছিল, "জেনারেল জিয়া আমাদেরই একজন এবং আমরাই তাকে মনোনীত করেছি সেনা প্রধান হিসাবে। বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি আমাদের সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত। সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও বিপ্লবের পরিপন্থী কোন কিছু তিনি করেননি; যাতে করে তাকে সন্দেহ করা চলে। এ অবস্থায় আমাদের উচিত হবে ধৈর্য্য ধারণ করে তার shortcommings and omissionsগুলো সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তুলে তাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করা; যাতে করে খালেদ চক্রের চক্রান্তকে নস্যাৎ করা সম্ভব হয়। কোনক্রমেই বর্তমান পরিস্থিতিতে এর পরিপন্থী অন্য কিছু চিন্তা করা উচিত হবে না। Implimentation process এ তার ভুলভ্রান্তি অবশ্যই আমরা তার সামনে তুলে ধরবো। এভাবেই সব সমস্যার সমাধান করে এগুতে হবে আমাদের। সেনা বাহিনীর মধ্যে ধুমাঁয়িত হয়ে উঠা এই Explosive situation সম্পর্কে দেশবাসী কিন্তু তেমন কিছুই একটা জানতে পারেনি। সবকিছুই ঘটছিলো পর্দার অন্ত রালে।

সেনা বাহিনীর ভিতরে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত রাজনৈতিক আলোচনার জটিলতা সর্বকিছু মিলিয়ে সংকট যখন বেশ গভীর হয়ে উঠল তখন সেনা পরিষদের একাংশ অভিমত প্রকাশ করল যে, অস্থায়ী জাতীয় কিংবা র্নিদলীয় সরকারের পরিবর্তে খন্দোকার

মোশতাকের নেতৃত্বে Revolutionary Council গঠন করে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সেনা পরিষদকে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হওয়া উচিত বর্তমান বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য। এই অভিমতের বিরুদ্ধে নেতৃত্বের বেশিরভাগ সদস্যই সোচ্চার হয়ে উঠেন। তারা বিপ্লবের মূল আদর্শের প্রতি অটল থেকে মত প্রকাশ করেছিলেন ক্ষমতা দখল কিংবা সামরিক বাহিনীকে সরাসরিভাবে রাজনীতিতে জড়িত করা আগষ্ট বিপ্লবের উদ্দেশ্য নয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সুষ্ঠ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটানোই হচ্ছে আগষ্ট বিপ্লবের মূল লক্ষ্য। কোন অবস্থাতেই আগষ্ট বিপ্লবের এই মহান চেতনা থেকে আমাদের সরে দাড়ানো উচিত হবে না। নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিলে আগষ্ট বিপ্লবকেও তৃতীয় বিশ্বের অন্য যেকোন দেশে ক্যু'দাতার মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের একটি অপপ্রয়াস হিসাবেই মনে করবে দেশ ও বিশ্ববাসী। এতে করে নিজেরাই যে শুধুমাত্র ক্ষমতালোভী হিসাবে প্রতিপন্ন হব তাই নয়; বাংলাদেশের সেনা বাহিনী দেশপ্রেমিক সেই ভাবমুর্তিও ক্ষুন্ন হবে। জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রক্ষক এবং গণতন্ত্রের অতন্ত্র প্রহরী হিসাবে বহু কষ্টে অর্জিত এই ভাবমুর্তি যেকোন মূল্যেই বজায়ে রাখতে হবে আমাদের। নিজেদের জীবনের বিনিময়েও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতেই হবে সেনা পরিষদকে। এভাবেই সার্বিক কিংবা আংশিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে নতুন অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম আমরা। যেকোন ত্যাগের বিনিময়েই আগষ্ট বিপ্লবের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আমাদের প্রত্যেককেই। সময়ের সাথে জেনারের জিয়া এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদের দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। প্রায় প্রতিদিন রাতেই আমি ছুটে যাচ্ছি সেনা নিবাসে তাদের বিরোধে মধ্যস্থতা করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সবার মধ্যেই পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল খুবই Close and informal. নীতি-আদর্শ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ মর্যাদার ভেদাভেদ এসব কিছুর উর্ধ্বে ছিল সেই সম্পর্ক। যুদ্ধকালীন সময় থেকেই আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একের প্রতি অপরের অদ্ভুত নির্ভরশীলতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা। সেই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছিলাম খালেদ ভাই এবং কর্নেল শাফায়াতকে বোঝাতে; কিন্তু আমার সেই প্রচেষ্টাতে তেমন কোন লাভ হচ্ছিল না। শেষ চেষ্টা হিসাবে হুদা ভাইকে অনুরোধ জানালাম ঢাকায় আসার জন্য। কর্নেল হুদা তখন রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার। হুদা ভাই এবং খালেদ ভাই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একেবারে হরিহর আত্মা। হুদা ভাই ব্যক্তি হিসাবে ছিলেন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ন, স্পষ্ট বক্তা, সৎ এবং উদারপন্থী চরিত্রের। এধরণের চরিত্রের লোক ছিলেন বলেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন হয়েও এবং শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধভক্তি থাকা সত্যেও দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগ সরকার সম্পর্কে হতাশ হয়ে

পড়েছিলেন তিনি। তার সচেতন মন কিছুতেই আওয়ামী দুঃশাসনকে মেনে নিতে পারেনি। এর ফলেই কুমিল্লায় ব্রিগেড কমান্ডার থাকাকালে আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন হুদা ভাই। (এ ব্যাপারে আগেই বিস্তারিত লেখা হয়েছে) ভেবেছিলাম হুদা ভাইকে দিয়ে খালেদ ভাইকে বোঝালে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও হতে পারে। জিয়া বিরোধী চক্রান্ত থেকে নিরস্ত্র করার এটাই হবে আমার শেষ চেষ্টা।

খবর পেয়েই হুদা ভাই এলেন ঢাকায়। তার সাথে আমার বিস্তারিত খোলাখুলি আলাপ হল। সব কিছু শোনার পর হুদা ভাই কথা দিলেন সাধ্যমত চেষ্টা করবেন তিনি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বোঝাতে। পরপর দু'দিন বৈঠক করলেন তিনি খালেদ ভাই এর সাথে। কিন্তু তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। কোন যুক্তি দিয়েই তাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন না হুদা ভাই। সেই রাতের কথা ভোলার নয়......।

ব্রিগেডিয়ার খালেদের সাথে শেষ বৈঠক করে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন তার ভাই কে কিউ হুদার বনানীর বাসায়। সন্ধ্যায় আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম বনানীতে। অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল হুদা ভাইকে। গম্ভীরভাবে বসে ছিলেন হুদা ভাই আমার অপেক্ষায়। আমি পৌঁছাতেই আমাকে নিয়ে গেলেন ভিতরের একটা ঘরে।

– ডালিম, খালেদ ভীষণভাবে হতাশ করেছে আমাকে। ও কিছুতেই বুঝল না। জেনারেল জিয়ার ব্যাপারে কোন আপোষ করতে রাজী নয় খালেদ। তার মতে জিয়া আগষ্ট বিপ্লবের উদ্দেশ্যাবলীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেই ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করে চলেছে যেটা তোমরাও নাকি বুঝতে পারছ না। তার এধরণের চিন্তা এবং একগুঁয়েমির পরিণাম কি হতে পারে সেটা ভাবতেও গা শিঁউড়ে উঠছে আমার। শুধু তাই নয় জিয়ার বিরুদ্ধে আমার সমর্থনও চেয়েছে খালেদ।

আমি তার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম,

– এই অবস্থায় কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন স্যার ?

– ঠিক বুঝতে পারছি না to be honest. চিন্তিতভাবে জবাব দিয়েছিলেন হুদা ভাই। এরপর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে ছিলাম আমরা।

– খালেদকে বোঝাতে না পারলেও কাছে থাকলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা যেত। By the way I don't know whether you know about this or not. Brigadier Nuruzzaman is also with Khaled. খালেদের অনুরোধ আমার পক্ষে সরাসরিভাবে উপেক্ষা করাটাও would be very difficult because of our relation. You know how close we are.

– তা জানি। কিন্তু এতো জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেবার মত ব্যাপার স্যার।

– ঠিকই বলেছ তুমি। আমি কি করব সেটা জানি না তবে খালেদকে আমি পরিষ্কারভাবেই বলেছি এই মুহূর্তে যেকোন কারণেই হোক না কেন জেনারেল জিয়া অথবা মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বলেই পরিগণিত হবে এবং জনগণ ও সৈনিকরা সেটা কিছুতেই মেনে নেবেনা। তাছাড়া জেনারেল জিয়া সেনা পরিষদের মনোনীত সেনা প্রধান; সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকলে সেটা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসনে বাধা কোথায়? I think he has been intrigued and is being used by some unknown quarters. শেষের কথাগুলো অনেকটা স্বগতোক্তির মতই বললেন হুদা ভাই। চক্রান্ত সম্পর্কে অনেক খবরা-খবরই আমাদের জানা আছে; সে বিষয়ে কোন আলাপ না করে আমি শুধু বলেছিলাম,

– Well Sir, decision is yours. আপনি একজন বিবেকবান পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক এবং মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী; তাই যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন ভবিষ্যতে। অতীতের মত ভবিষ্যতেও ব্যক্তি সম্পর্কের থেকে জাতীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিবেন আপনি সে প্রত্যাশাই করব আমি। দেখা যাক কি হয়? আল্লাহ ভরসা। সবকিছুইতো পরিষ্কার বুঝে গেলেন। আমি যোগাযোগ রাখব। আমার অনুরোধ রক্ষা করে রংপুর থেকে ছুটে এসেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ফিরে গিয়ে নীলু ভাবীকে আমার সালাম জানাবেন। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম তখন হঠাৎ করে হুদা ভাই বললেন,

– যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও ডালিম। তোমার নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম এবং আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা করি আমি মনেপ্রাণে।

সেটাই ছিল কর্নেল হুদার সাথে আমার শেষ দেখা। সেদিন গভীর রাত করে ফিরেছিলাম এক অজানা আশঙ্কা ও একরাশ চিন্তা মাথায় করে। বুঝতে পেরেছিলাম চক্রান্তের জাল ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দূর। সারাটা পথ শুধু একটা কথাই মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল; শেষ রক্ষা বুঝি আর করতে পারব না!

সময় কেটে যাচ্ছে। রঙ্গমঞ্চের সব খেলোয়াড়রাই যার যার খেলায় মত্ত। কিন্তু পর্দার অন্তরালে যে অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে কেউই কিছু বুঝতে পারছে না শুধু আমরা কয়েকজন ছাড়া।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিলের ঔদ্ধত্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। জেনারেল জিয়ার প্রায় সব নির্দেশই উপেক্ষা করে চলেছেন তারা। প্রতি রাতেই মধ্যস্থতার জন্য ছুটে যেতে হচ্ছে তাদের বিরোধের মিমাংসা করার জন্য। সামরিক বাহিনীর আভ্যন্তরীন অবস্থাকে ভীষণভাবে অস্থিতিশীল করে তুলেছেন তারা। একদিন

সন্ধ্যায় জেনারেল জিয়া আমাকে জরুরী তলব করে পাঠালেন। খবর পেয়েই গেলাম তার বাসায়। অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাকে।

– ক্ষমতার লোভে খালেদ মরিয়া হয়ে উঠেছে। We have got to do some thing about it before it is too late.

– সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে আপনার। সেক্ষেত্রে যা কিছু করার সেটাতো আপনাকেই করতে হবে স্যার।

– You are right. ঠিক বলেছ তুমি। জবাবটা দিয়ে চুপ করে কি যেন ভেবে নিচ্ছিলেন জেনারেল জিয়া।

– ঠিক করেছি তালিকাভুক্ত অফিসারদের চাকুরিচ্যুতির ফাইল নিয়ে যাব প্রেসিডেন্টের কাছে। আর দেরি করা উচিত হবে না।

– এই কাজটা আরো অনেক আগেই করা উচিত ছিল স্যার। However it is always better to be late than never. ১ম ফিল্ড রেজিমেন্ট এবং ৮ম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে ঢাকায় আনার ব্যাপারে কতটুকু কি করলেন? আমার প্রশ্নের জবাবে চীফ বললেন,

– খালেদ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।

– সেটাইতো স্বাভাবিক! তিনি ভালো করেই জানেন এই দু'টো ইউনিটকে ঢাকায় আনলে তার পক্ষে রাজধানীতে কিছুই করা সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ব্রিগেডিয়ার খালেদের মতকে উপেক্ষা করেই আপনাকে ইউনিট দু'টোকে অতিসত্ত্বর ঢাকায় নিয়ে আসতে হবে। আমাদের পোষ্টিং এর ব্যাপারেও আর দেরি করা উচিত হবে না। পোষ্টিং অর্ডারটা বেরোলে আমরাও তখন প্রত্যক্ষভাবে আপনার পাশে থেকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারব। জেনারেল জিয়া আমার কথাগুলো নিশ্চুপ বসে শুনছিলেন আর ভাবছিলেন। আমাদের এই আলোচনার দু'দিন পর জেনারেল জিয়া প্রেসিডেন্টের কাছে ফাইলটি উপস্থাপন করেন। প্রেসিডেন্ট তক্ষুণি ফাইলে সই না করে বলেছিলেন যে, এ ব্যাপারে জেনারেল ওসমানীর মতামত নেবার পরই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রেসিডেন্টের অভিপ্রায় জেনারেল জিয়ার কাছ থেকে জানার পর জেনারেল ওসমানীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ফাইলটির ব্যাপারে। তিনি পরিষ্কার কোন জবাব না দিয়ে বলেছিলেন, "বিষয়টি তার ও প্রেসিডেন্টের বিবেচনাধীন রয়েছে। তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন।" যেকোন কারণেই হোক ফাইলটা চাপা পড়ে থাকলো। ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক ঠেকলো। কিছুটা দুর্বোধ্যও। ভাবলাম, দেখা যাক কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে কি হয়।

এদিকে কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদের কিছুটা দাম্ভিক আচরণ; বেফাঁস কথাবার্তায় সেনা বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাদের এ ধরণের বাড়াবাড়ি এবং ছেলেমানুষীকে ব্যবহার করতে ছাড়লেন না ব্রিগেডিয়ার খালেদ-কর্নেল শাফায়াত এবং তাদের দোসররা। নানা ধরণের কুৎসা রটনা করতে লাগলেন তারা। তাদের মিথ্যা প্রচারণা আগুনে ঘি ঢালার মতই সার্বিক পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তুললো। ক্রমান্বয়ে আর্মির Chain of command -কে অকেজো করে তুলেছে CGS ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং ঢাকা Brigade Commander কর্নেল শাফায়াত জামিল। জেনারেল জিয়া তাদের হাতে প্রায় জিম্মী হয়ে পড়লেন। চীফ অফ আর্মি ষ্টাফ হিসাবে তার দৈনন্দিন কার্যক্রমেও তারা বাধাঁর সৃষ্টি করতে লাগলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম; যেকোন প্রতিবিপ্লবের মোকাবেলা করার জন্য বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিক সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করা উচিত। আলোচনা হল। সোভিয়েত-ভারত মদদপুষ্ট যেকোন প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন সবাই। সব কিছু জানার পর কর্নেল তাহের বলেছিলেন, "এই মুহূর্তে জেনারেল জিয়ার বিরোধিতা করা দেশদ্রোহিতারই সমান। কারণ, বর্তমান অবস্থায় সেনা বাহিনীর পুর্নঃগঠন এবং ঐক্যের প্রয়োজনে জেনারেল জিয়ার কোন বিকল্প নাই। তাছাড়া যেকোন বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য জিয়ার ভাবমুর্তি, ব্যক্তিত্ব এবং ভাবমুর্তিও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। তাই জিয়াকে আমাদের যে করেই হোক না কেন; বাঁচিয়ে রাখতে হবে বিপ্লবের স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে। তিনি দ্ব্যার্থহীনভাবে আরো বলেছিলেন, "অবশেষে খালেদ যদি সত্যিই জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে তার নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী সেনা পরিষদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই চক্রান্তের বিরোধিতা করবে। আবার আমরা শুরু করব সমাজ পরিবর্তনের অসমাপ্ত বিপ্লব। বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার স্বার্থে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করতে হবে অন্যান্য সব জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল দলগুলোর সাথে।" এ ব্যাপারে আমাদের বিভিন্ন মহলের সাথে আলোচনার কথা শুনে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। সে দিন আমাদের আলাপ হচ্ছিল পুরনো বন্ধুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। একান্ত বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতার সাথে আলোচনা করেছিলাম আমরা। সেদিন কোন বিশেষ দলের নেতা হিসাবে কথা বলছিলেন না কর্নেল তাহের। তার অঙ্গীকারে খুঁজে পেয়েছিলাম নিষ্কলুশ-নিবেদিত প্রাণ, দেশপ্রেমিক একজন সাচ্চা মুক্তিযোদ্ধার আন্তরিক উৎকণ্ঠা। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে একদিন কোয়েটা থেকে একত্রে পালিয়ে আসার পরিকল্পনা প্রণয়নে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল সেই একই অনুপ্রেরণায় আজ আবার জাতির এক মহা ক্রান্তিলগ্নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম জাতীয় স্বার্থ বিরোধী যেকোন চক্রান্তের মোকাবেলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। রাজনৈতিক দর্শন

এবং লক্ষ্য হাসিলের পদ্ধতিতে আমাদের মাঝে কোন কোন ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকলেও সেটা দেশ ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নয়। সে প্রশ্নে আমরা এক ও অভিন্ন। সিদ্ধান্ত নেয়া হল, যেকোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য সেনা পরিষদ এবং গণবাহিনীকে যৌথভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে অতি সতর্কতার সাথে। কর্নেল তাহের এবং আমাদের মাঝে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের বন্দোবস্ত করা হল।

এদিকে আমাদের চাকুরিতে পুনর্বহালের Gazatte notification বেরুলেও পোষ্টিং অর্ডার তখন পর্যন্ত বেরোয়নি। লিষ্টেড অফিসারদের চাকুরিচ্যুতির ফাইলটিও সই হয়ে আসেনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। বুঝতে পারলাম বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের কূটচালের পরিপ্রেক্ষিতেই এই দু'টো বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্বিত হচ্ছে। গলদটা যে কোথায় সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেও কোন হদিস পেলাম না আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচের গোলক ধাঁধাঁয়। সংকট ঘণীভূত হতে থাকলো। এরই মধ্যে ঘটলো এক অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা।

একদিন রাতে ক্যাবিনেট মিটিং শেষ হবার পর মন্ত্রীমহোদয়গণ বঙ্গভবনের করিডোরে বেরিয়ে এসেছেন। হঠাৎ মন্ত্রী জনাব রিয়াজুদ্দিন আহমদ ভোলা মিয়া আমাকে ডেকে একটু নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন,

– ডালিম, তোমার পাঠানো লোকটার কাজটা করে দিয়েছি। কালই পারমির্টটা ইস্যু করে দেবার জন্য সেক্রেটারী সাহেবকে অর্ডার দিয়েছি। আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

– চাচা, আমিতো কোন লোককে পাঠাইনি আপনার কাছে। ব্যাপারটা একটু খুলে বলুনতো? আমার জবাবে তিনি একটু বিব্রত হলেন। বললেন,

– এক যুবক সকালে আমার অফিসে এসে বলল, তুমি তাকে পাঠিয়েছ অনুরোধ জানিয়ে তাকে যাতে ৫০ লক্ষ টাকার একটা কাঠের পারমিট দিয়ে দেয়া হয় যত শীঘ্র সম্ভব। সব শুনে আমি 'থ হয়ে গেলাম। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! আমাকে বেচার চেষ্টা করছে কেউ! লোকটা কে জানার একটা কৌতুহল হল। বললাম,

– এক কাজ করেন চাচা, আগামীকাল লোকটা যখন পারমিটটা নিতে আসবে তখন আপনি আমাকে জানাবেন, আমি আসব দেখার জন্য লোকটা কে! আপনি আমার পরিচয় দেবেন আপনার দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় বলে। বাকিটা ঘটনাস্থলেই দেখবেন কি হয়।

পরদিন সকালে যুবক পৌঁছামাত্র আমি ফোন পেলাম। আমি কয়েকজন আইবির লোক সঙ্গে করে উপস্থিত হলাম মন্ত্রী সাহেবের দফতরে। চেম্বারে ঢুকে দেখি এক কেতাদুরস্থ তরুণ চাচার মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছে। আমি সালাম জানিয়ে বসলাম যুবকের পাশেই। যুবকটি আমার পরিচিত নয়। চাচাকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

– স্যার, আপনি বলেছিলেন আজ আসতে আমার ছোট ভাই এর আর্মিতে অফিসার র‍্যাঙ্কে ভর্তির ব্যাপারে। আপনি বলেছিলেন মেজর ডালিমের খুব ঘনিষ্ঠ কেউ আসবে আজ যার মাধ্যমে কাজটা করিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন আপনি। আমার কথার ধরণ বুঝে নিয়ে মিনিষ্টার সাহেব বললেন,

– হ্যা, এই ভদ্রলোকই সেই ব্যক্তি। বলেই আমাকে তার দূর সর্ম্পকের আত্মীয় বলে পরিচয় করিয়ে অনুরোধ জানালেন,

– ভাই সাহেব, এর ছোট ভাই কমিশন র‍্যাঙ্কের জন্য আইএসএসবির অপেক্ষায় আছে। বুঝতেইতো পারেন এদেশে সুপারিশ ছাড়া কিছুই হয় না; আপনি মেজর সাহেবের খাস লোক তাই অনুরোধ জানাচ্ছি ওর কাজটা যদি করে দিতেন তবে খুবই উপকার হত। কথা শেষ হতেই যুবক বলল,

– কি যে বলেন মিনিষ্টার সাহেব, এতো খুবই সামান্য একটা কাজ। এর জন্য মেজর ডালিমের প্রয়োজন নেই। জেনারেল জিয়া কিংবা ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বলে দিলেই যথেষ্ট। কথা শেষ করে যুবক আমার দিকে ফিরে তার একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলল,

– আমার সাথে দেখা করবেন। আপনার সামনেই জেনারেল জিয়া এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদকে ফোন করে আপনার সমস্যার সমাধান করে দেবো। তার সাহস ও আত্মপ্রত্যয় দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যুবক দিব্যি আরামে বসে সিগারেট টানছিল আর কথা বলছিল। চাচার সাথে চোখাচোখি হল; দু'জনকেই কৃতজ্ঞতা এবং সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষারত আইবির লোকদের বললাম, "লোকটা ধুরন্দর ঠগ; ভিতরে গিয়ে আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। তদন্তের রির্পোটটা আমাকে দেখাবেন।" পরে তদন্তে দেখা গিয়েছিল যুবকের নাম-ঠিকানা সবই ভূয়াঁ। রিপোর্টে ঠিক বোঝা যায়নি সমস্ত ব্যাপারটা একটা ঠগবাজী প্রতারণা ছিল নাকি এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল। ঘটনাটি হাতে নাতে ধরা না পড়লে আমার নামে দূর্নীতির অভিযোগ রটানো যেত অবশ্যই। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে এধরণের প্রতারণার ব্যাপারে সচেতন থাকার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। আমরাও বিশেষভাবে সতর্ক হয়ে উঠেছিলাম। চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হবে। অক্টোবরের শেষাশেষি ঘটলো আরেকটি ঘটনা। এক সন্ধ্যায় মেজর শাহরিয়ার রেডিও কন্ট্রোল থেকে জরুরী ফোন করে ডেকে পাঠালো।

– হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম।

– ওয়ালাইকুম আসসালাম।

– আজ রাতে আবেদুর রহমানকে custody থেকে বের করে লন্ডন পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট; এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি? বলল শাহরিয়ার।

– না তো; এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

– স্যার, দুর্নীতির অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের এভাবে বিনা বিচারে ছেড়ে দেয়া হলে এ সরকারের সুনাম ক্ষুন্ন হবে। লোকজন বলাবলি করবে আবার সেই পুরনো খেলাই শুরু হল, টাকা-পয়সার লেনদেনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজরা নিজেদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

– তুমি ঠিকই বলছো শাহরিয়ার। তোমার খবর যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে কিছুতেই আবেদুর রহমানকে বিদেশে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। তুমি পুনরায় তাকে আটক করার ব্যবস্থা কর। তাকে ধরতে হবে এয়ারপোর্ট থেকে; যাতে করে এর পিছনের মূল ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়। অভিযুক্ত কাউকে ছেড়ে দেবার অধিকার কারো নেই। After you get him let me know.

– OK Sir. I shall do everything that is necessary. টেলিফোন রেখে দিল শাহরিয়ার।

মাঝ রাতের লন্ডনগামী ফ্লাইটে বিশেষ ব্যবস্থায় তুলে দেয়া হয়েছিল আবেদুর রহমানকে। প্লেনের ভিতর থেকেই off load করে ধরে এনেছিল শাহরিয়ারের পাঠানো টাস্কফোর্স। খবর পেয়ে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম শাহরিয়ারের control room-এ। আইজি জনাব নূরুল ইসলাম এবং গ্রেফতারকৃত বিশেষ ব্যক্তিদের ইনচার্জ ডিআইজি জনাব ইএ চৌধুরীকেও ডেকে আনা হল। কারণ, খবর পাওয়া গিয়েছিল এ ব্যাপারে তাদের হাত রয়েছে। জনাব ইএ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলাম,

– স্যার, দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের দায়িত্বেতো আপনিই রয়েছেন তাই না?

– জ্বী হ্যাঁ। জবাবে বললেন জনাব চৌধুরী।

– সেক্ষেত্রে জনাব আবেদুর রহমানকে ছাড়পত্র দিয়ে প্লেনে তুলে দেবার বন্দোবস্ত করলেন কার হুকুমে? আমার অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কিছুটা ভড়কে গেলেন জনাব চৌধুরী। আমতা আমতা করে বললেন, আইজি সাহেবের হুকুমেই এ ব্যবস্থা করেছিলাম আমি।

– আইজি সাহেব আপনি কি করে এ ধরণের হুকুম দিলেন ? থতমত খেলেন আইজি সাহেব।

– প্রেসিডেন্টের কথামত কাজ করেছি আমি।

– প্রেসিডেন্ট সাহেব এ ব্যাপারে কোন লিখিত অর্ডার দিয়েছেন কি? প্রশ্ন করলাম।

– জ্বী না। টেলিফোনে বলেছিলেন।

– টেলিফোনের কথা যদি এখন প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেন তখন আপনার অবস্থা কি হবে আইজি সাহেব? আইনের রক্ষক হয়ে এ ধরণের কাজ করাটা ঠিক হয়েছে কি আপনার? আমার কথায় ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন পুলিশের জাঁদরেল অফিসার জনাব ইসলাম। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন,

– মেজর সাহেব, উপরওয়ালাদের ইচ্ছা আমাদের মত জুনিয়রদের জন্য হুকুমেরই সমান।

– বাহ্! বেশ বলেছেন! ঔপনিবেশিক আমলাদের এই বিশেষ গুনটি ভালোই জানা আছে আপনার। কিন্তু বাংলাদেশতো একটি স্বাধীন দেশ। এক্ষেত্রে এমন একটি আইন বিরোধী কাজ করতে এতটুকুও বাধলোনা আপনার! বাধবেই বা কেন? ঘুনে ধরা ব্যবস্থার শিকার আপনারা আমরা সবাই। স্বাধীনতা পূর্বকালে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করে তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই শোষণ কায়েম রেখেছিল বিদেশী শাসকরা। তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর সেই আমলাতন্ত্রের অবকাঠামো অটুট রেখে দেশকে লুটেছে সাদা চামরার জায়গায় জাতীয় ব্রাউন সাহেবরা! তাদের ঐ অপশাসন-শোষণে সবসময়েই মদদ যুগিয়ে এসেছে ভাগীদার হিসাবে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র। অসৎ রাজনীতিবিদ এবং আমলাতন্ত্রের মাঝে জাতীয় সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে এসেছে সব আমলেই। কিন্তু এই লুটপাটের দায়-দায়িত্ব কখনোই বহন করতে হয়নি আমলাতন্ত্রকে, সব দায় বহন করতে হয়েছে শুধু রাজনীতিবিদদেরই। আমলারা হেফাজতে থেকেছেন সব সময়েই back stage player হিসাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু সেই অপকর্মের ধারাবাহিকতা বজায়ে রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ কিংবা আগষ্ট বিপ্লব হয়নি। এই দু'টো সংগ্রামই করা হয়েছে জাতীয় পরিসরে সর্বক্ষেত্রে গণমুখী পরিবর্তন আনার জন্য। সেক্ষেত্রে সময়ের দাবিতে আমাদের মন-মানসিকতা বদলাতে হবে তা না হলে সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আইজি সাহেব প্রেসিডেন্ট যদি আপনাকে সে ধরণের কোন কথা বলেও থাকেন তখন একজন অভিজ্ঞ অফিসার হিসাবেতো আপনার বলা উচিত ছিল যে, কাজটা বেআইনী বিধায় করা ঠিক হবে না; তাই নয় কি? আশা করি আগামীতে এধরণের ঘটনা আর ঘটবে না। আবেদুর রহমানকে ধরে আনা হয়েছে যাবার সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আইন সবার জন্যই সমান; কথাটা কাজেও প্রমাণিত হওয়া উচিত; কি বলেন?

তাদের সাথে আলাপ শেষ করে জনাব আবেদুর রহমানকে ডাকিয়ে আনা হল। আমাদের সামনে এসেই তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে বলতে লাগলেন,

– স্যার, আমি জীবনে অনেক অন্যায় কাজ করেছি। যথেষ্ট টাকা-পয়সাও অর্জন করেছি অসৎ উপায়ে। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমাকে একটা সুযোগ দেন আপনারা। বলেই বিদেশী একটি ব্যাংকের চেক বুক বের করে তার কয়েকটা ব্ল্যাঙ্ক পাতায় সই করে সেটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললেন,

– বিদেশে আমার যা গচ্ছিত আছে তার সবটাই আমি আপনাদের দিয়ে দিতে চাই স্বেচ্ছায়।

কি সাংঘাতিক লোক! প্রকারন্তরে ঘুষ দিতে চাচ্ছেন তিনি। উপস্থাপনাটা অতি অভিনব এবং চমৎকার। তার সাথে আর কোন কথা বলতে রুচিতে বাধলো। শাহরিয়ারকে বললাম,

– আমি চললাম, অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি আবেদুর রহমান সাহেবকে আইজি সাহেবকে hand over করে দাও বলে ফিরে এসেছিলাম।

সমস্ত বঙ্গভবন তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কাপড় ছেড়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ঘুম আসছিল না। সন্ধ্যার ঘটনাটাই মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কি বিচিত্র চরিত্র এসমস্ত পদস্থ সরকারি আমলাদের! দুর্নীতিপরায়ন লোকদের ধরার সিদ্ধান্ত হলে তারাই সব তথ্যবহুল লিষ্ট তৈরি করে দেন আবার উপরওয়ালাদের খুশী করার জন্য রুই-কাতলা টাইপের অপরাধীদের ছেড়ে দেবার আইনের ফাঁকটিও তারাই বের করে দেন র্নিবিবাদে। আইনের ঠিকাদার হয়ে নিজেদের স্বার্থে আইন বিরোধী কোন কিছু করতে দ্বিধাবোধ করেন না তারা।

এই বঙ্গভবনে আসার পর এই আমলা শ্রেণীর চরিত্র সর্ম্পকে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। বাঘা বাঘা জাদরেল আমলাদের বেশিরভাগই বঙ্গভবনের ভিতরে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের মন জয় করে তাদের বিশ্বাস এবং আস্থা অর্জন করার জন্য সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করছেন ভেজা বেড়ালের মতো; কখনও বা ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হচ্ছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। ক্ষমতাবানদের একটু কৃপাদৃষ্টি পেলেই তারা সব বর্তে যান। কিন্তু ধূর্ত শৃগালের মত পরমুহূর্তেই তারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন ক্ষমতাসীনদের দুর্বলতা। একবার সেই সন্ধান পেলে ক্ষমতাশালীদের হাতের মুঠোয় পুরতে তাদের বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না। এরপরই শুরু হয় অপরের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজেদের গা বাঁচিয়ে স্বার্থ হাসিলের সনাতন প্রক্রিয়া। অপশাসন ও শোষণের এক পর্যায় গণবিক্ষোভ এবং রোষের মুখে যখন শেষ রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠে তখন এসমস্ত আমলারাই আগ বাড়িয়ে লুটপাটের কিচ্ছা-কাহিনী ফলাও করে প্রচার করে সব দোষ রাজনৈতিক নেতাদের উপর চাঁপিয়ে দিয়ে: নিজেরা দুধে ধোয়া আম হয়ে অপেক্ষায় থাকেন সরকার পতনের এবং নতুন সরকার গঠনের। অনেক সময় তারা পরোক্ষভাবে বিশেষ অবদানও রাখেন সরকার বদলের পালাবদলে। একনায়কত্ব, সার্মরিক সরকার,

প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার, সব ধরণের সরকারই তাদের কাছে সমান। কারণ ব্যক্তি স্বার্থ, কায়েমী স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, গোষ্ঠি স্বার্থ হাসিলের জন্য সব সরকার প্রধান এবং নেতাদের বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয় দূর্নীতিপরায়ণ আমলাদের উপর। এর ফলেই তারা এদের হাতের মুঠোয় বন্দী হয়ে পড়েন। শুরু হয় নতুন করে পুরনো খেলা। ধারাবাহিক লুটপাটের ফলে দেশ হয়ে উঠে দেউলিয়া। জনজীবন হয়ে উঠে দুঃর্বিষহ, স্বাধীনতা হয়ে উঠে অর্থহীন। অসহনীয় জীবনের ঘানি টানতে টানতে দেশবাসী হয়ে পড়ে নেতিবাচক। বেচেঁ থাকার সংগ্রামের জাতাকলে নিঃশেষ হয়ে যায় তাদের কর্মস্পৃহা ও চেতনা। এ ধরণের অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়ে হারাতে হয় স্বাধীন সত্ত্বা। এসব বিষয় নিয়ে এদের কোন মাথাব্যথা নেই; নেই কোন ভাবনা। একই প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা।

একদিন পররাষ্ট্র সচিব কাজে এসেছিলেন বঙ্গভবনে। মিলিটারি সেক্রেটারীর ঘরে আমাকে দেখেই বলে উঠলেন,

– এই যে মেজর সাহেব, আপনাকেই খুঁজছি।

– কেন বলুনতো ? জানতে চাইলাম।

– আপনার শ্বশুড় জনাব আরআই চৌধুরী আমার বিশেষ বন্ধু। তিনি এ মাসেই রিটায়ার করছেন। তার মত একজন অভিজ্ঞ লোকের খুবই প্রয়োজন আমাদের লন্ডন মিশনে; বিশেষ করে এই সময়ে। তাই ভাবছি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বলে তিন বছরের একটা extention করিয়ে দেই, কি বলেন? প্রেসিডেন্টের বিশেষ কারণে যেকোন অফিসারকেই সর্বাধিক তিন বছর পর্যন্ত extention দেবার ক্ষমতা রয়েছে। ধৈর্য্য সহকারে তার কথা শুনে বললাম,

– স্যার, আমার শ্বশুড় সরকারি চাকুরির নিয়মানুযায়ী রিটায়ার করছেন। তাকে extention দেবার প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আপনার departmental affairs. সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। এক্ষেত্রে আমার মতামত কিংবা পরামর্শ নেবার যৌক্তিকতাটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আমার জবাবে সেক্রেটারী সাহেব কেমন যেন একটু দমে গেলেন; কিন্তু ঝানু লোক যেতে যেতে বলে গেলেন,

– না মানে ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখা আর কি; এছাড়া আর কিছুই নয়।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তিনি আমাকে জানান দিয়ে গেলেন, আমার শ্বশুড়ের extention- টা হচ্ছে তারই উদ্যোগে। তিনি পরে ঠিকই প্রেসিডেন্টের কাছে ফাইলটা পাঠিয়েছিলেন strongly recommend করে। তবে আমিই সেটা হতে দেইনি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করে। আমার যুক্তি ছিল, সাধারণভাবে সরকারের নীতি

যেখানে extention এর বিরুদ্ধে সেখানে আমার শ্বশুড়কে extention দিলে লোকজন কথা বলার সুযোগ পাবে। আর একটি ঘটনা।

একদিন দেখি জাতীয় ব্যাংকের গভর্ণর জোরেশোরে লবি করে চলেছেন – নতুন নোট যেটা ছাপাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাতে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের ছবিই ছাপানো উচিত। কয়েকজন পদস্থ আমলাও কোরাসে যোগ দিয়ে একই কথা বলে বেড়াচ্ছেন। এক ফাঁকে আমি গভর্ণর সাহেবকে কাছে পেয়ে বললাম, "স্যার, অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতির ছবি ছাপানোর জন্য এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছেন কেন?" আমার প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে কিছু না বলেই কেটে পড়লেন। এমনিভাবে একদিন শুনতে পারলাম, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু আমলা বিতর্কের ঝড় তুলেছেন – আমাদের কোন নির্দিষ্ট জাতীয় পোষাক নেই। একটা জাতীয় পোষাক নির্ধারণ করতে হবে; পোষাক যেটাই সাব্যস্ত হোক না কেন 'মোশতাক টুপি'-কে অবশ্যই জাতীয় পোষাকের অংশ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মুসলমান হিসাবে জাতীয় পোষাকে টুপি থাকতে পারে যুক্তিসঙ্গত কারণেই; কিন্তু সেটা 'মোশতাক টুপি' হতেই হবে কোন যুক্তিতে; সেটাই বোধগম্য হচ্ছিল না। তাই একদিন তদবীরকারীদের একজন জাঁদরেল নেতাকে অনুরোধ করেছিলাম যুক্তিটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে। তিনি তেমন কোন ঠোস যুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এরপর হঠাৎ করেই এই তদবীরে ভাটা পরেছিল যে কোন কারণেই হোক। সব জায়গাতেই কেমন যেন পচঁনের র্দুগন্ধ। ধসে পড়ছে চারিত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ। যেকোন রাষ্ট্রের জন্য সার্মরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র হল মেরুদন্ড। সেখানে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পচঁন ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। সেই ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে জাতীয় পরিসরে। সেখানে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে কতটুকু পরিবর্তন আনা সম্ভব সেটা একটা কঠিন প্রশ্ন ও ভাবনার বিষয়। দ্রুত এই পচঁন ও অবক্ষয়ের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচানো অত্যন্ত দুরহ্ কাজ। অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রক্রিয়া শুরু করার পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবেই আজ আমাদের উপর বর্তেছে। এই গুরু দায়িত্ব পালনের আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি আমরা পাহাড় সমান প্রতিবন্ধকতার মুখে। জানি না কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এই প্রক্রিয়াকে! এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পরেছিলাম।

পরদিন অভ্যাস মতো ভোর ৬টায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে কাপড় পরছিলাম সেই সময় প্রেসিডেন্টের আরদালী এসে জানাল প্রেসিডেন্ট সাহেব নাস্তার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তার কামড়ায় গিয়ে দেখলাম আমাদের প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত। আমি একটা খালি চেয়ারে বসলাম প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে। ভাবছিলাম, প্রেসিডেন্ট গতরাতে আবেদুর রহমানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু

সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "বাবা, আমগো মইধ্যে কম্যুনিষ্ট কেডা কেডা?" অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা করেই তিনি আমাদের সবাইকে দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে। মুখে ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ রহস্যময় হাসি। আমাদের কেউই তার প্রশ্নের জবাবে কিছুই বলল না। তিনিই আমাদের সবাইকে নিশ্চুপ দেখে আবার বললেন, "যারাই কম্যুনিষ্ট হওনা কেন; তোমরা জাইন্যা রাইখো আমি সবচেয়ে বড় কম্যুনিষ্ট।" এরপর আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হল না। নাস্তা শেষে আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। মনে খট্‌কা লাগল, প্রেসিডেন্ট হঠাৎ করে এমন একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলেন কেন? তবে কি তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিদের সাথে আমাদের বিশেষ করে আমার গোপন যোগাযোগের বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছেন? নাকি তিনি ঈঙ্গিতে আমাদের কাছে নিজেকে প্রগতিবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করলেন কিছুই ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার সেই উক্তি রহস্যাবৃত্তই রয়ে গেল আমাদের সবার কাছে।

সেপ্টেম্বরের শেষে এক দুপুরে মেজর নূর এসে উপস্থিত হল আমার ঘরে।

– কী ব্যাপার নূর; তোমাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে?

– চিন্তারই বিষয় স্যার। গত দু'দিন যাবৎ মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথেই আছি। শেষবারের মত ওরা আমার মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছে, তাদের প্রস্তাবটা উপেক্ষা না করে পুনর্বিবেচনা করার জন্য। ওরা চুড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জেনারেল জিয়াকে আর্মি চীফ অফ স্টাফের পদ থেকে সরাবার প্রস্তাব সেনা পরিষদ যদি মেনে না নেয় তবে তারাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

নূরের কথায় বুঝতে পারলাম, বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। যে কোন সমঝোতার ভিত্তিতেই হোক হাফিজ ও ইকবাল ব্রিগেডিয়ার খালেদের সাথে এক হতে চলেছে। ১ম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের উপর বিশেষ প্রভাব রয়েছে হাফিজ ও ইকবালের। ১ম ইষ্টবেঙ্গলকে হাত করতে পারলেই সম্ভব হবে ব্রিগেডিয়ার খালেদের পক্ষে ঢাকায় জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে কোন প্রতি বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া আর সেটা হবারই আলামত দেখা যাচ্ছে। মেজর নূরের কাছে তাদের প্রকাশিত মনোভাব সেই ঈঙ্গিতই বহন করছে। চিন্তিতভাবেই নূরকে বলেছিলাম,

– ওদের বলে দিও, যা ইচ্ছে তাই ওরা করতে পারে, তাতে বাধা দিতে না পারলেও সমর্থন আমরা কিছুতেই দিতে পারব না। এ বিষয়ে মিটিং-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেটাই বলবৎ থাকবে।

– আমিও আপনার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত স্যার। দেশের স্বার্থে আর কিছু করতে না পারলেও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী যেকোন চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যাব শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে; তবু নীতির প্রশ্নে অটল থাকতে হবে আমাদের।

আপনি জেনারেল জিয়াকে সাবধান হতে বলেন স্যার। যেকোন সময় চরম একটা কিছু ঘটে যেতে পারে।

নূরের সাথে আলাপের পর সেদিনই ছুটে গিয়েছিলাম জেনারেল জিয়ার কাছে। তার বাসার লনে বসেই কথা হচ্ছিল,

– স্যার, কি অবস্থা সেনা নিবাসের ?

– খালেদ ও শাফায়াতের ঔদ্ধত্যের মাত্রা সকল সীমা ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওদের সন্দেহমূলক আচরনের খবরা-খবর আসছে সব দিক থেকেই। তাদেরকে কি করে handle করা যায় সেটাই ভাবছি।

– স্যার, শুনতে পাচ্ছি ব্রিগেডিয়ার খালেদ নাকি ১ম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে হাত করার চেষ্টা করছেন? এ ব্যাপারে আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। ১ম বেঙ্গলকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারলে ঢাকায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ যে কোন একটা চুড়ান্ত অঘটন ঘটিয়ে ফেলার ঝুঁকি নিতে পারে।

– Don't you worry. The advanced party of the 1st Field Regiment has already arrived from Comilla and the mainbody is on the way. They should be here just within a few days.

-১ম ইষ্টবেঙ্গল সম্পর্কে ভেবো না। ওটাতো আমারই নিজস্ব ব্যাটালিয়ন। How could Khaled lay his hand on it? স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জবাব দিলেন জেনারেল জিয়া।

– তবুও সাবধানের মার নেই স্যার। সবদিকেই সার্বক্ষণিক নজর রেখে চলতে হবে আপনাকে এখন থেকে। Please don't under estimate your opponant. ভালো কথা, আমাদের পোষ্টিং অর্ডারগুলো এখনো বেরুচ্ছে না কেন? এ ব্যাপারে গড়িমসি করছে কেন MS branch. Our postings at the different strategically important units would immensly strengthen your hand to deal with Brig. Khaled & Co. particularly in the present complex and explosive situation. You should have been able to get the retirement orders signed by the President by now. I tell you Sir, time is running out and you must exert yourself to get these things done before it is too late.

– I understand! জবাব দিলেন জেনারেল জিয়া। বাইরে প্রকাশ না করলেও তিনি যে বিশেষভাবে উদ্বিঘ্ন সেটা আমি তাকে একান্তভাবে জানি বলেই বুঝতে পারছিলাম।

এভাবেই সেদিন আমাদের আলাপ শেষ হয়েছিল। সেটাই ছিল ২-৩রা নভেম্বরের আগে তার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

৩রা নভেম্বরের প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দাতা এবং ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার পাল্টা অভ্যুত্থান

- ২রা নভেম্বর ১৯৭৫ ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দাতা।
- সেই ক্রান্তিলগ্নেও নিম্মী ছিল আমার পাশেই।
- শান্তির সন্ধানে।
- ঝুঁকিপূর্ণ এনকাউন্টার।
- বঙ্গ ভবন।
- নিজেকে একজন পাকা স্টেটস্‌ম্যান হিসাবে প্রমাণ করলেন রাষ্ট্রপতি মোশতাক।
- ফিরে গেলাম ৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার্সে।
- সেনা পরিষদ সাময়িকভাবে চিহ্নিত নেতাদের কৌশলগত কারণে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।
- ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ সিপাহী-জনতার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।
- ১৫ই আগষ্ট ও ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব ছিল একই সূত্রে বাধা।
- জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং নির্বাচিত সাংসদরা সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব এবং বিপ্লবীদের সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করে।
- আগষ্ট বিপ্লব সম্পর্কে ১৬ই আগস্ট ১৯৭৫ দৈনিক ইত্তেফাকে 'ঐতিহাসিক নবযাত্রা' নামে সম্পাদকীয়।
- উপসংহার

২রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। গত বেশ কয়েকদিন কাজের চাপে বাসায় যাওয়া হয়নি। ঠিক করলাম দুপুরের পর কিছু সময়ের জন্য বাসায় যাব। প্ল্যান মাফিক লাঞ্চের পর এক ফাঁকে চলে এলাম মালিবাগে। বেশ কয়েকদিন বিরতির পর হঠাৎ আমার আগমনে বাসার সবাই খুব খুশী হল। সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোড় করা হল আনন্দঘন পরিবেশে। সন্ধ্যায় নিম্মীকে নিয়ে গেলাম মিনু ফুপ্পুর বাসায়। রাতের খাওয়া ওখানেই খেতে হল। বেশ রাত অব্দি গল্প-গুজব করে আমি আর নিম্মী ফিরছিলাম মালিবাগে। হঠাৎ নিম্মী বলল, "আজ আমি তোমার সাথে বঙ্গভবনে থাকব।" ১৫ই আগষ্টের পর থেকেই বেচারী ভীষণভাবে neglected. একদম সময় দিতে পারছিলাম না ওকে। বললাম, ঠিক আছে তাই হবে। দু'জনে ফিরলাম বঙ্গভবনে। সময় তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। তেমন কোন ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় আমার কামরার দিকে এগুচ্ছি, ডিউটিরত হাবিলদার এগিয়ে এসে বলল, "স্যার মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবাল সাহেব বঙ্গভবন ছেড়ে চলে গেছেন। ১ম ইষ্টবেঙ্গলের গার্ড replacement ও এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি ঢাকা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স থেকে। সবাই আপনাকে খুঁজছেন। কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক এবং অন্যান্য সব অফিসাররাই প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে বৈঠক করছেন।" আচমকা খবরটা পেয়ে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যেভাবে অবস্থা গড়াচ্ছিল তাতে এমন কিছু একটা ঘটতে পারে সেটা অপ্রত্যাশিতও ছিল না। বিগত দিনগুলোর ঘটনা প্রবাহের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই ধরে নিয়েছিলাম সমস্ত ব্যাপারটাকে। নিম্মীকে কামরায় যেতে বলে দ্রুত গিয়ে হাজির হলাম প্রেসিডেন্টের স্যুইটে। প্রেসিডেন্ট সাহেব বেশ কিছুটা বিরক্ত এবং উত্তেজিতভাবে একটা সোফায় পা গুটিয়ে তার নিজস্ব স্টাইলে বসে তার পাইপে তামাক ভরছিলেন। কর্নেল রশিদ রেড টেলিফোনে কার সাথে যেন যোগাযোগের চেষ্টা করছিল। কর্নেল ফারুক আরেকটি সোফায় নিশ্চুপ বসেছিল। ঘরে ঢুকে প্রেসিডেন্টকে সালাম জানিয়ে কর্নেল রশিদের কাছে জানতে চাইলাম,

– ব্যাপার কি রশিদ, কি হয়েছে?

– যা এতদিন সন্দেহের পর্যায়ে ছিল তাই হয়েছে। তোর দুই বন্ধু হাফিজ এবং ইকবাল ১ম ইষ্টবেঙ্গলের সব troops withdraw করে নিয়ে গেছে বঙ্গভবন থেকে। প্রথমে সবাই মনে করেছিলাম এটা routine replacement এর ব্যাপার। কিন্তু সন্ধ্যার পরও যখন replacement এসে পৌঁছালো না তখন থেকেই ক্যান্টনমেন্টে ফোন করে চীফ জেনারেল জিয়া, সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ, ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত কাউকেই contact করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে অস্বাভাবিক troops movements হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই কিছু পরিষ্কার করে বলতে পারছে না ক্যান্টনমেন্টে কি ঘটছে। জেনারেল ওসমানীর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি কিন্তু তিনিও সঠিক কিছু বলতে পারলেন না। তিনি

বঙ্গভবনে আসছেন। জেনারেল ওসমানী ব্রিগেডিয়ার খলিলকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন বিডিআর-এর দু'টো রেজিমেন্ট বঙ্গভবনে পাঠিয়ে দিতে। হাফিজ এবং ইকবালকেও পাওয়া যাচ্ছে না টেলিফোনে। আমার সাথে কথা শেষ করে কর্নেল ফারুককে বলা হল রেসকোর্সে তার ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের কাছে চলে যেতে। কর্নেল ফারুক রেসকোর্সে যাবার জন্য উঠে দাড়াতেই আমি বললাম, "ফারুক তুই অবশ্যই রেসকোর্সে যাবি তবে you would not move under any provocation or circumstances whatsoever. সব বিষয়ে পরিষ্কার হবার পরই আমাদের করণীয় কি হবে সেটা বিবেচনা করা হবে। এর আগে আমাদের তরফ থেকে কোন move নেয়াটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রথমত: চেষ্টা করতে হবে এই সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় কিনা। এর জন্য আমি নিজেই যাব ক্যান্টনমেন্টে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা আমার কোন কিছু না হওয়া পর্যন্ত no action at all, is that clear? ইতিমধ্যে জেনারেল ওসমানীও এসে পৌঁছেছেন। তিনিও আমার অভিমতকে সমর্থন জানালেন। আমরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত তখন বিডিআর-এর দু'টো রেজিমেন্ট এসে পৌঁছে গেছে সে খবর নিয়ে এল মেজর পাশা, মেজর শাহরিয়ার এবং ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা। নিম্মীই গিয়ে তাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেজর শাহরিয়ার চলে গেল তার রেডিও বাংলাদেশের কন্ট্রোল সেন্টারে। ক্যাপ্টেন হুদা প্রেসিডেন্ট, জেনারেল ওসমানী এবং কর্নেল রশিদকে সাহায্য করার জন্য বঙ্গভবনেই থাকবে সেটাই সাব্যস্ত হল। বাকিরা সবাই প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট এবং deployed ইউনিটগুলোর কমান্ড নেবার জন্য যার যার পজিশনে চলে গেল। আমি বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক সেই সময় কর্নেল রশিদ আন্তরিকভাবেই বলেছিল,

– ডালিম ভেবে দেখ, এই অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া ঠিক হবে কিনা? সেই তরল অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়াটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও তাৎক্ষণিক জবাব দিয়েছিলাম,

– এই ক্রান্তিলগ্নে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে someone has to clean the dirty linen then why not me?

প্রেসিডেন্টের স্যুইট থেকে বেরিয়ে চলে এলাম আমার কামরায়। বেচারী নিম্মী অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল,

– এখন কি হবে? আমি বললাম,

– তুমি বঙ্গভবন ছেড়ে ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাও। ঠিক বুঝতে পারছি না ঘটনা কোনদিকে মোড় নেয়। যাই হোক না কেন: বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। ড্রাইভারকে ডাকিয়ে এনে নির্দেশ দিলাম,

-বেগম সাহেবের হুকুম মত তার সাথেই থাকবে তুমি যতক্ষণ তিনি চান। নিম্মী কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নিশী রাতে একা একা বেরিয়ে গেল একরাশ আশঙ্কা মনে নিয়ে অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে। যাবার সময় অশ্রুসিক্ত চোখে ধরা গলায় শুধু বলে গেল,

– আল্লাহর হাতেই তোমাকে সোর্পদ করে দিয়ে গেলাম। সাবধানে থেকো। নিম্মী চলে যাবার পর আমিও ইউনির্ফম পড়ে নিয়ে আমার বিশ্বস্ত গার্ড এস্কট, অয়্যারলেস অপারেটার এবং ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম আজিমপুরে মিসেস মোয়াজ্জেম কহিনূর ভাবীর বাসায়; মেজর নূর রয়েছে সেখানে। সব শুনে নূর বলল,

– রক্তপাত বন্ধ করার একমাত্র উপায় মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথে সরাসরি দেখা করা। এছাড়া রক্তপাত কিছুতেই এড়ানো সম্ভব হবে না। আমিও নূরের সাথে একমত হয়ে বললাম,

– সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি তোমাকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে যাবার জন্য। ঠিক করলাম, ক্যান্টনমেন্টে যাবার আগে সার্বিক অবস্থাটা সরেজমিনে আরো একটু ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার। আমরা জিপে করে গিয়ে উপস্থিত হলাম ফুলার রোডে প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের বাসায়। ওখানে তখন মহুয়া এবং লিটু থাকত। উদ্দেশ্য খাকি পোষাক বদলে সাধারণ কাপড় পরে নেবো। ঘুম থেকে মহুয়াদের ডেকে তুললাম। সংক্ষেপে মহুয়া এবং লিটুকে অবস্থা বুঝিয়ে লিটুর কয়েকপ্রস্থ কাপড় চেয়ে নিয়ে আমরা সবাই ড্রেস পরিবর্তন করে নিলাম। মহুয়া জিজ্ঞেস করল,

– নিম্মী কোথায়? বললাম,

– বঙ্গভবনে ওকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বলে এসেছি ও যেন কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। তুই আত্মীয়-স্বজনদের ফোন করে সতর্ক করে দিস। এরপর আমরা বেরুলাম শহর প্রদক্ষিন করতে। পুরো ভার্সিটি এলাকা, পিলখানা, নিউ মার্কেট, সেকেন্ড ক্যাপিটাল, রামপুরা টিভি ষ্টেশন, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া, রাজারবাগ পুলিশ লাইন। কোথাও কোন অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সৈনিকদের সুরক্ষিত চেকপোষ্টগুলোই নজরে পড়ল। strategicaly deployed tanksগুলোও দেখলাম ঠিকমতই রয়েছে। প্রায় সারা শহরটাই ঘুরে এলাম শাহরিয়ারের control room-এ। ওর ঘরে ঢুকতেই দেখি ও কারো সাথে টেলিফোনে কথা বলছে। আমাদের দেখে সংক্ষেপে কথা সেরে জানতে চাইলো,

– কি অবস্থা স্যার, কি বুঝছেন! আমরা ঘুরে ফিরে যা দেখেছি তাই বললাম। শাহরিয়ার জানাল, তার খবরা-খবরও প্রায় একই রকম; তবে সাভারের বুষ্টার ষ্টেশনের

সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অজানা কারণে। ফলে রেডিও ষ্টেশন থেকে কোন কিছু প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে না। টিভির প্রচারণাও একই কারণে সম্ভব নয়। তাকে আমরা জানালাম,

– আমরা ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছি রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করার চেষ্টায়। নিজেদের মধ্যে যে কোন প্রকার সংঘর্ষ বন্ধ করতেই হবে at any cost যাতে করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপের সুযোগ না পায়। শাহরিয়ার আরো জানিয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও জেনারেল জিয়ার সাথে সে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়নি। শাহরিয়ারের ওখানে যাবার আগেই সোনাটেঙ্গরে আমার প্রিয় মেঝো ফুপ্পুর (বিভা ফুপ্পু) বাসায় গিয়েছিলাম কতগুলো বিশেষ জরুরী টেলিফোন কল সেরে নেবার জন্য। তাদের ফোনটা খারাপ ছিল কিন্তু ইমান আলী ফুপ্পা পাশেই তার এক কলিগের বাসা থেকে ফোন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই আমাদের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন ইউনিটের সেনা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে বুঝলাম তারা প্রায় সবাই অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। তাদের সংক্ষেপে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের আশংকার কথা জানিয়ে অবস্থার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে জেনারেল জিয়ার বাসায় ফোন করে বুঝতে পারলাম তার বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। দেশের অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের সাথেও যোগাযোগ করেছিলাম সেই বাসা থেকেই। যোগাযোগের পর বুঝতে পারলাম ঘটনাটা ঘটানো হচ্ছে অতি সীমিত পরিসরে ঢাকা ভিত্তিক। এতে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। নিশ্চয়ই রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হবে।

শাহরিয়ারের ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চললাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে একটু এগুতেই দুই ট্রাক সৈনিক দেখতে পেলাম মাউন্টেড অবস্থায়। কাছে যেতেই দেখলাম তারা ৪র্থ ইষ্টবেঙ্গলের। Contingent commander কে জিজ্ঞাসা করলাম,

– তোমরা এখানে কেন? জবাবে সুবেদার সাহেব স্যালুট করে জানাল,

– আগামীকাল আওয়ামী লীগের প্রসেশন বের হবার সম্ভাবনা আছে; তাই হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের এয়ারপোর্ট এলাকায় deployed থাকতে হবে আইন-শৃংখলা বজায়ে রাখার জন্য। তার জবাব শুনে বুঝতে পারলাম, খালেদ চক্র ট্রুপসদের কাছে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলেনি সৈনিকদের সমর্থন না পাওয়ার ভয়ে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত তার অধিনস্ত ৪র্থ বেঙ্গলকে চতুরতার সাথে মোতায়ন করেছে just as show of force হিসাবে আমাদের ভয় দেখাবার জন্য। সৈনিকদের কাছে খুলে বলা হয়নি সরকার এবং জিয়া বিরোধী পাল্টা অভ্যুত্থানের

কথা। মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জেনারেল জিয়াকে প্রায় বন্দী করা অবস্থায় রাখা হয়েছে এ কথাটা বলার মত সাহস হয়নি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের। কারণ তারা ভালোভাবেই জানতেন, এ ধরণের কোন পদক্ষেপকে কিছুতেই মেনে নেবেনা সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক বেশিরভাগ অফিসার ও সৈনিকরা। সবকিছু দেখে শুনে বুঝলাম, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরাসরি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সাথেও আলোচনা করা সম্ভব। তার বাসাতেই গেলাম প্রথম। বাসায় তাকে পাওয়া গেল না। বাসা থেকে বলা হল, তিনি সেনা সদরে গেছেন। পৌঁছালাম সেনা সদরে। সেখানেও কেউ নেই। সেন্ট্রি, ডিউটি অফিসার ও ক্লার্ক ছাড়া পুরো সেনা সদরটা নিস্তব্ধ। সেখান থেকে গেলাম মেজর হাফিজের বাসায়। হাফিজ বাসায় নেই। ইকবালের খোঁজ করে তাকেও পাওয়া গেল না। এরপর গেলাম কর্নেল শাফায়াত জামিলের বাসায়। সেখান থেকে জানানো হল তিনি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স এ গেছেন। সেখান থেকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স এ যাবার পথে দেখলাম জেনারেল জিয়ার বাসার সামনে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। ডিউটিরত গার্ডসরা তাদের দায়িত্ব পালন করছে। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্সেও নেই তারা। সেখান থেকে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের গেইট দিয়ে ঢুকতেই দেখি ট্রুপসরা সেখানে সব stand to অবস্থায় পজিশন নিয়ে আছে। এ ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কেন জানতে চাইলে আমাদের বলা হল যে, সন্ধ্যার পর রাতের আঁধারে ৪র্থ বেঙ্গল ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের দিকে তাক করে তাদের RR (Recoilless Rifle) এবং সৈন্য মোতায়েন করেছে; তাই তারাও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ৪র্থ বেঙ্গল এবং ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট পাশাপাশি দু'টি ইউনিট। তাদের মধ্যে এ ধরণের উত্তেজনা যেকোন সময় বিস্ফোরন ঘটাতে পারে। উত্তেজনা কমানোর জন্য সেনা পরিষদের সদস্যদের সার্বিক অবস্থা বুঝিয়ে তাদের বললাম, এই অবস্থায় সতর্ক অবশ্যই থাকতে হবে সবাইকে। আরো জানালাম, আমরা ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে খুঁজছি। ওদের পেলেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ৪র্থ বেঙ্গলের উস্কানিমূলক কার্যক্রম বন্ধ করার বন্দোবস্ত করব। সেখানেই জানতে পারলাম মহারথীরা সব ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স এ রয়েছেন। ৪র্থ বেঙ্গলের গেইট দিয়ে ঢুকতেই নজরে পড়ল সাজ সাজ রব। ভীষণ ব্যস্ততা! সৈনিকদের রনসজ্জায় সজ্জিত করে রাখা হয়েছে। কিছুদূর এগুতেই ক্যাপ্টেন কবিরের দেখা পেলাম। একটি এসএমজি কাঁধে ঝুলিয়ে সে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল কবির। তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

- Where is Brig. Khaled and Col. Shaffat?"

- Their all here Sir. জবাব দিল কবির। কবিরের সাথে কথা বলছিলাম এমন সময় ল্যান্সারস-এর ক্যাপ্টেন নাছের এসে উপস্থিত হল।

– Assalamu Alaicum. welcome Sir. বলেই করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন নাছের। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়েই করমর্দন করলাম আমি ও নূর।

– স্যার, মোশতাক এবং জিয়াকে দিয়ে আমাদের কোন উদ্দেশ্যই সফল করা সম্ভব হবে না। Both of them are self centred and hypocrite. They are not the right kind of people Sir. তাই আমরা ওদের অপসারন চাই and I am sure both of you would be definitely with us. ওকে অনেকটা থামিয়ে দিয়েই বললাম,

– Is Brig. Khaled arround?

– সবাই এখানেই আছেন। মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালও রয়েছেন এখানে।

– Naser do me a favour. please find out Hafiz and tell him I would like to talk to him.

– Ok sir. আমি এখুনি যাচ্ছি তাকে নিয়ে আসার জন্যে। আপনারা ততক্ষণ এ্যাডজুটেন্টের অফিসে অপেক্ষা করুন বলে চলে গেল নাসের। এ্যাডজুটেন্টের ঘরে ঢুকে দেখি ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় কর্নেল আমিনুল হক বীর উত্তম ও লেফটেন্যান্ট মুনিরুল ইসলাম চৌধুরী বিষন্ন হয়ে চুপচাপ বসে আছে। কর্নেল আমিনকে জিজ্ঞাসা করলাম,

– কি ব্যাপার স্যার, আপনাদের এই দশা কেন? What's up?

-You must be jocking at our miserable plight is'nt it Dalim? তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারছ না ইউনিট কমান্ডার এবং এ্যাডজুটেন্ট হয়েও নিজেদের ব্যাটালিয়নেই আমাদের এমন নিঃক্রিয় অবস্থায় বসে থাকতে হচ্ছে তার মানেটা কি?

– কিছু মনে করবেন না স্যার। আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? এমন কিছু যে ঘটতে পারে সেটাতো অজানা ছিল না আপনাদের অনেকেরই। সময়মত action না নেবার ব্যর্থতার জন্যই আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাই নয় কি? আমার প্রশ্নের ঈঙ্গিত বুঝে কর্নেল আমিন চুপ করে রইলেন। বস্তুতঃ কর্নেল আমিন ও লেফটেন্যান্ট মুন্নাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে না করায় তাদের প্রায় বন্দী অবস্থাতেই রাখা হয়েছে তাদের নিজস্ব ইউনিটেই। খবর পেয়েই হাফিজ এবং ইকবাল এল। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালো পাশের একটি খালি কামরায়।

– এ কি করলে হাফিজ! শেষ পর্যন্ত অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লে?

– অঘটন বলছ কেন? জিয়া এবং মোশতাকের ঘোড়েল মনের পরিচয় পাবার পরও তারা যে আমাদের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে মোটেও আন্তরিক নয় সেটা তোমরা বুঝেও মেনে নিতে পারছ না কেন? Both of them are betraying our cause. উল্টো প্রশ্ন করল হাফিজ। ওদের বাদ দিয়েই এগুতে হবে। আওয়ামী লীগের গড়া সংসদকেও আর কাল বিলম্ব না করে ভেঙ্গে দিতে হবে। এই সঠিক উদ্যোগে বিশেষ করে তোমার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, শাহরিয়ার এর মাধ্যমে সেনা পরিষদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পাব আশা করছি আমরা। আমি জানি ব্রিগেডিয়ার খালেদ সম্পর্কে তোমাদের যুক্তিসঙ্গত reservations আছে: সেগুলোকে আমিও অস্বীকার করছি না কিন্তু এরপরও ব্রিগেডিয়ার খালেদের চীফ হবার lifelong ambition fulfill করে দিলে জিয়ার তুলনায় তাকে দিয়ে more efficiently কাজ করানো যাবে।

– দেখ হাফিজ, আমি স্বীকার আগেও করেছি এখনো করছি, আশানুরূপভাবে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ হতে হচ্ছে জেনারেল জিয়া এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাকের জন্য। শুধু তাই নয়; অনেকক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করছেন তারা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, কিন্তু তাই বলে হঠাৎ করে এ ধরণের একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর্মির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে অপশক্তিকে সুযোগ করে দিতে হবে to stage back and reverse the process সেটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না এবং আমাদের কাছেও সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তা যাক, এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে; আমার ধারণা- এসমস্ত বোঝাবুঝির সময় পার হয়ে গেছে কারণ যে অঘটন কখনোই সম্ভব হত না সেটাই ঘটিয়ে বসেছো তোমরা। এই অবস্থায় কোন রক্তপাতের সূত্রপাত যাতে না ঘটে তার জন্যই আমরা স্বেচ্ছায় ছুটে এসেছি। এখন চলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে সঙ্গে করে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা যাক এই সংকটের রাহুগ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে কি করে উদ্ধার করা যায়। এ বিষয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে তবে সেটাও বলো পরিষ্কার করে। সেক্ষেত্রে আমরা ফিরে যাব। এরপর যা হবার তা হবে। সার্বিক অবস্থার বিশ্লেষনের পর আমার এবং নূরের বিশ্বাস জন্মেছিল, আলোচনার প্রস্তাব কিছুতেই না মানা সম্ভব না খালেদ চক্রের কাছে; কারণ তাদের বিশেষ করে হাফিজ এবং ইকবালের অজানা ছিল না ঢাকায় তো বটেই অন্যান্য সেনানিবাসগুলোতেও সেনা পরিষদের শক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে তাদের চেয়ে অনেক বেশি। কি যেন ভাবল হাফিজ এরপর বলল,

– ঠিক আছে, তাই হবে। চলো আমাদের সাথে। হাফিজ, আমি, নূর এবং ইকবাল ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেরুতেই দেখলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল

শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার মঈন, ক্যাপ্টেন নাছের, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, কর্নেল রউফ, কর্নেল মালেক প্রমুখ সবাই অফিস ব্লকের সামনে লনে দাড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। আমরা এগিয়ে যেতেই তারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে অভিবাদন জানাতেই তিনি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

– আরে এসো এসো, welcome. আমি জানতাম তোমরা দু'জন আসবেই। তার কথা শেষ হতেই বললাম,

– শেষটায় অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লেন।

– What do you mean? It's not my doing. Believe you me Dalim it is their's doing, these young officers. They think Zia can't deliver. They also think he will do nothing to achieve the goals of the 15th August revolution at the sametime he is also totally incapable to protect the interest of the armed forces. Therefore, they want a change.

– বুঝতে পারলাম স্যার, জেনারেল জিয়ার জায়গায় বসে সেই যোগ্য নেতৃত্ব দেবার জন্যই এই সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন অথবা করানো হয়েছে।

– No no not atall. I don't want to be the Chief. Believe me, I have no such ambition. ছেলেরা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে তাই আমি এসেছি। That's it. কথার মাঝেই কে একজন বলে উঠল,

– We don't mind to accept Brig. Khaled's leadership.

– Come on keep quite. ব্রিগেডিয়ার খালেদ সেই কণ্ঠকে চুপ করিয়ে দিলেন।

– যাক স্যার, এ বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবার সময় এটা নয়; এতে কোন লাভও নেই। আমি ও নূর এসেছি কোন প্রকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ যাতে শুরু না হয় সেটা নিশ্চিত করতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। রশিদ এবং ফারুককে বলে এসেছি আপনাদের সাথে আমাদের আলোচনার ফলাফল জানার আগ পর্যন্ত বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাংক কিংবা ট্রুপস এর কোন মুভমেন্ট করা হবে না। এখন বলেন, আলোচনায় আপনারা রাজি আছেন কিনা? আমার কথার ধরণে তারা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জবাব খোঁজার চেষ্টা করছিলেন সবাই। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ঠিক পাশেই দাড়িয়ে ছিল হাফিজ। সে নীচু স্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কিছু বলল। হাফিজের কথা শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন,

– তোমাদের আলোচনার প্রস্তাব মেনে নিলাম আমরা। আলোচনা হবে।

– কিন্তু আসার পথে দেখলাম এয়ারপোর্টের কাছে কিছু সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। অবশ্য, তাদের যে কথা বলে deploy করা হয়েছে তার সাথে আপনাদের কার্যকলাপ সঙ্গতিহীন। যাক, সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু ৪র্থ বেঙ্গলের উস্কানিমূলক deployment-কে কেন্দ্র করে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টে যে ভয়ংকর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে সেটা প্রশমিত না করলে যেকোন মুহূর্তে বিস্ফোরন ঘটতে পারে আর সেটা ঘটলে আমাদের আলোচনার কোন সুযোগই থাকবে না। তাই আমার অনুরোধ, খালেদ ভাই আপনি আলোচনায় বসার আগে ৪র্থ বেঙ্গলকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে stand down করার।

আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ কর্নেল শাফায়াতকে নির্দেশ দিলেন ৪র্থ বেঙ্গলকে stand down করানোর জন্য। কর্নেল শাফায়াত চলে গেলেন নির্দেশ কার্যকরী করতে। এরপর আমরা সবাই গিয়ে বসলাম কমান্ডিং অফিসারের ঘরে। প্রথমেই আমি জানতে চাইলাম জেনারেল জিয়ার সম্পর্কে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ জানালেন তিনি তার বাসাতেই আছেন এবং ভালোই আছেন। তার নিরাপত্তা এবং দেখাশুনার জন্য কিছু অতিরিক্ত সৈনিকে তার বাসার কাছে অবস্থান নিতে বলা হয়েছে এবং কাউকে তার সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না সাময়িকভাবে; এর বেশি কিছুই নয়। তার মানে হল, তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে এবং এই কথাটাও সৈনিকদের জানাবার সাহস হয়নি খালেদ চক্রের। আলোচনার আগেই জেনারেল জিয়ার ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে। আমি সোজা ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বললাম,

– স্যার কোন আলোচনায় বসার আগে একটা বিষয়ে আপনাকে পরিষ্কার করে দিতে চাই- জেনারেল জিয়ার সাথে এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে এর বেশি কিছু করা হলে সেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে you have to give me your explicit assurance. বুদ্ধিমান লোক ব্রিগেডিয়ার খালেদ। তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। কোন সময় না নিয়েই তিনি জবাব দিলেন,

– Be rest assured, no harm would be done to him. At the most he may be removed as the chief of army staff that's all. Nothing more than that .

আলোচনা শুরু হল। একদিকে আমি ও নূর অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বে ওদের তরফের উপস্থিত প্রায় সবাই। শুরুতেই আমি সরাসরি প্রশ্ন রাখলাম,

– দেশে একটি জনপ্রিয় সরকার থাকতে এ ধরণের একটা সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি? আমার প্রশ্নে উপস্থিত সবাই কেমন যেন থমকে গেলেন। মনে মনে সবাই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিলেন। নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে কর্নেল শাফায়াত বলে উঠলেন,

– We want to dismiss the Mushtaq government and the present parliament because the present parliament is the parliament of Awami-Bksalites. জবাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

– তারপর?

– We don't want Gen. Zia to remain as our Chief.

– দেশ চালাবে কে? প্রশ্ন করলাম।

– We shall form a 'Revolutionary Council'. ক্যাপ্টেন ইকবাল জবাব দিল। কর্নেল শাফায়াত আবার বলে উঠলেন,

– Khandakar Mushtaq will handover power to the chief justice. ব্রিগেডিয়ার খালেদ ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন,

– Continuetion must be maintained and therefore. Khandaker Mushtaq will remain as the President but three Cheifs must be removed.

বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না কোন নির্দিষ্ট blue print ছাড়াই অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন তারা। কোন পরিষ্কার পরিকল্পনা কিংবা মতানৈক্য কোনটাই নেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের। আলোচনা চলছে হঠাৎ আকাশে জঙ্গী বিমান উড়ার বিকট শব্দে সবাই চমকে উঠলাম। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম,

– Sir, why the MIGS are up? For heaven's sake stop this provocative act. Otherwise, it would be simply impossible to holdback Col. Farooq. He will roll his tanks towards the cantonment. ব্রিগেডিয়ার খালেদ টেলিফোন রিসিভার উঠিয়ে নিয়ে এয়ারফোর্স কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত নিজের উদ্যোগেই মিগ নিয়ে আকাশে উড়েছে। খবরটা জেনে তক্ষুণি Air traffic control-এর মাধ্যমে লিয়াকতকে অবিলম্বে নেমে আসার নির্দেশ দিয়ে তাকে ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স এ আসার জন্য বললেন। রিসিভার নামিয়ে রাখার পরপরই মেস ওয়েটার এসে জানাল প্রাতঃরাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গরম গরম আলুভাজি,

ডালপুরি এবং চায়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে রেজিমেন্টের ফিল্ড মেসে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ আমন্ত্রণ জানালেন নাস্তার জন্য। নাস্তা শেষ করে বেরিয়ে এসেছি হঠাৎ নজরে পড়ল কর্নেল মান্নাফ ইউনিফর্ম পরে দাড়িয়ে আছেন। ব্রিগেডিয়ার বেরিয়ে আসামাত্র তিনি তার দিকে ত্রস্তপায়ে এগিয়ে এসে সেল্যুট করে বললেন, "Khaled you are the Boss. I salute you as a deciplined soldier and I am with you." তার ব্যবহার দেখে ভাবলাম কি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ এই কর্নেল মান্নাফ! ১৫ই আগষ্ট সকালে ঠিক একই কায়দায় তিনি আমাকে একই কথা বলেছিলেন। সেদিন একজন সিনিয়র অফিসার হিসাবে তার ঐ ধরণের ব্যবহারে আমি বেশ বিব্রতবোধ করেছিলাম। সামান্য একটা চাকুরির জন্য আত্মসম্মানও যারা বিকিয়ে দিয়ে গিরগিটির মত রূপ পাল্টাতে পারেন সেই সমস্ত দূর্বল চরিত্রের অফিসারদের পক্ষে কখনোই তাদের অধিনস্ত সহকর্মীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য লাভ করা সম্ভব নয়। তার ঐ ধরণের গায়ে পড়া মোসাহেবীপনা সবার কাছেই হাস্যকর মনে হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ তার কথার কোন জবাব দেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। মুচকি হেসে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন,

– Let's get down to business, we have to discuss a lot.

আমরা সবাই আবার গিয়ে বসলাম আলোচনায়। আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়ার পর কর্নেল সাব্বিউদ্দিন এসে আলোচনায় শরিক হলেন।

– তুমি অযৌক্তিকভাবেই সব ঘটনার জন্য আমাকেই দোষারোপ করছ। যা ঘটেছে তার জন্য শুধুমাত্র একা আমি দায়ী নই। জিয়ার বিরুদ্ধে তরুণ অফিসাররা অসন্তুষ্ট। তারা বুঝতে পেরেছে কোন বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তার নেই। মোশতাক এবং জিয়ার উপর বিতশ্রদ্ধ; তাই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে এদের বিরুদ্ধে। বলেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন কবির প্রমুখদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। এদের অনুরোধেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

বুঝলাম, তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী চতুর ব্রিগেডিয়ার খালেদ অতি কৌশলে গা বাঁচিয়ে অন্যদের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজের উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

– জেনারেল জিয়াকে সরিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যোগ্য নেতৃত্ব দেবার দায়িত্বটা কি আপনিই নিবেন স্যার? আমার প্রশ্নের জবাবে নিজের সাফাই দেবার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

– তুমি কি মনে কর চীফ হওয়ার জন্যই আমি এখানে এসেছি?

– আমি কিছুই মনে করছি না, শুধু জানতে চাইছি আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি? কি আপনাদের দাবি-দাওয়া? আপনাদের দাবিগুলো পরিষ্কারভাবে জানার পরইতো সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা সম্ভব তাই নয় কি স্যার? ক্ষমতার লড়াই এবং রক্তপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যেইতো ছুটে এসেছি আমি ও নূর। ইনশাল্লাহ্ দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবোই যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে। আমার বক্তব্য শেষ হতেই ল্যান্সারস এর ক্যাপ্টেন নাসের উঠে বলল,

– Yes, we want Brigadier Khaled to be our Chief. 'Yes' 'Yes' উৎসাহী সমর্থন শোনা গেল কিছু তরুণ অফিসারের গলায়। ঠিক সেই সময় duty officer খবর নিয়ে এল স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত এসেছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ duty officer-কে বলল লিয়াকতকে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে। লিয়াকত ঘরে ঢুকে সেল্যুট করতেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ জিজ্ঞাসা করলেন,

– What's up man! Why did you took off?

– Sir, I got information that Col. Farooq had started up his tanks at the racecourse and was mooving towards the cantonment that's why I went up.

– ডালিম, তুমি বলছ রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্যই তোমরা এখানে এসেছ অথচ তোমাদেরই একজন ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের পায়তারা করছে। Is in't a contradiction? How can you justify this?

– Sir, please have trust on me. Let me check what is happening. I assure Sir, nothing of that kind would ever happen. বলেই পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলাম কর্নেল রশিদের সাথে যোগাযোগের জন্য। ঘরে ঢুকেই দেখি এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবকে ইতিমধ্যেই ধরে আনা হয়েছে। বিমর্ষ চিত্তে নির্বাক হয়ে বসেছিলেন তিনি। পাশেই নেভ্যাল চীফ রিয়ার এডমিরাল এমএইচ খানও বসে আছেন দেখলাম। তারও একই অবস্থা। শংকা-উদ্বেগে দু'জনেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। আমাকে দেখে তারা দু'জনেই যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেলেন। এয়ার চীফ ত্রস্তে উঠে এসে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,

– ডালিম, তুমি এখানে! কি হচ্ছে বলতো? তার প্রশ্নের জবাবে শুধু বললাম,

– স্যার ঘাবড়াবেন না। Take it easy. চুপচাপ বসে দেখেন কি হচ্ছে। টেলিফোন তুলে নিয়ে বঙ্গভবনে কর্নেল রশিদের সাথে যোগাযোগ করলাম।

– রশিদ, ডালিম বলছি ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স থেকে। এখানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল এবং অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত রয়েছেন। এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব এবং রিয়ার এডমিরাল এমএইচ খানও আছেন। জেনারেল জিয়াকে তার বাসাতেই রাখা হয়েছে। আমার সাথে নূরও রয়েছে। আলোচনা চলছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদের নির্দেশে লিয়াকত মিগ উড়ানো বন্ধ করে এখানে ফিরে এসেছে। তারা অভিযোগ করছেন কর্নেল ফারুক নাকি তার ট্যাংক বহর নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে; যদি খবর সত্যি হয়ে থাকে তবে তাকে এ ধরণের উদ্যোগ নিতে নিষেধ কর্। No tanks should roll down the street whatsoever. ওদের দাবি-দাওয়া জেনে নিয়ে আমি আসছি বঙ্গভবনে as soon as possible. ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বলেছি রক্তক্ষয়ী সংঘাতের হাত থেকে দেশও জাতিকে বাঁচাবার শান্তিপূর্ণ উপায় খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্যই আমি ও নূর এসেছি। তারা আলোচনায় যখন রাজি হয়েছেন এবং আলোচনা চলছে সেক্ষেত্রে you have to ensure that no provocative action is initiated from our side. Please talk to Farooq and tell him to restrain himself.

– আমি এক্ষুণি কর্নেল ফারুকের সাথে যোগাযোগ করে তাকে বলছি এ ধরণের কোন উদ্যোগ না নিতে। জবাব দিল কর্নেল রশিদ। কন্‌ফারেন্স রুমে ফিরে এসে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

– Don't worry Sir. Col. Farooq will not move his tanks. আমার কথা শোনার পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ তাদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করলেন,

– Where is AirVicemarshal Twab?

– He is here Sir. জবাব দিল অফিসার।

– Bring him in. নির্দেশ দিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ। এভিএম তোয়াবকে নিয়ে আসা হল কন্‌ফারেন্স রুমে। ভিতরে ঢুকে সবাইকে দেখে তিনি কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন,

– Well Khaled, would you please tell me why the aircheif has been brought here in such a disgraceful way! What's happening? Where do I stand? Am I still the Chief? তার কথা শেষ না হতেই ক্রোধে চেয়ার ছেড়ে উঠে গর্জে উঠল স্কোয়ার্ডন লিডার লিয়াকত,

– Shut up you! You are no more the Chief. I have taken over the command of the airforce. লিয়াকতের কথার ধরণে স্লিপিং স্যুট পরিহিত এভিএম তোয়াব কুকঁড়ে গিয়ে বসে পড়লেন খালি একটা চেয়ারে।

– Make him sit in someother place. বললেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ। তার আদেশে জনাব তোয়াবকে আবার পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। এই ড্রামার পর আবার আমাদের আলোচনা শুরু হল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন,

– ডালিম, আমাদের দাবি চারটি:-

১। খন্দোকার মোশতাকই প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

২। বর্তমানের তিন চীফ অফ স্টাফকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের জায়গায় গ্রহণযোগ্য নতুন চীফ অফ স্টাফ নিয়োগ করতে হবে আর্মি, এয়ারফোর্স এবং নেভীতে।

৩। আর্মিতে chain of command re-establish করতে হবে। বঙ্গভবন এবং শহরে deployed সমস্ত ট্রুপস এবং ট্যাংকস ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

৪। বাকশালী শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে বর্তমানের সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। বহুদলীয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশ পরিচালিত হবে সামরিক শাসনের মাধ্যমে।

বুঝতে পারলাম, বর্তমানে জনগণের মানসিকতা এবং গ্রহণযোগ্যতার কথা চিন্তা করেই দাবিগুলো র্নিধারণ করা হয়েছে। অত্যন্ত চতুরতার সাথে সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে বর্তমান রাজনৈতিক ধারাকে উল্টে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে। এ ধরণের সুক্ষ্ম পরিকল্পনা শুধুমাত্র ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের কাজ নয় এবং এর পিছনে যে অজানা চানক্যরা রয়েছেন সেটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না আমার। যাই হোক, সব শুনে আমি বললাম,

– ঠিক আছে খালেদ ভাই। প্রেসিডেন্টের সাথে আপনাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য চলুন তবে বঙ্গভবনে যাওয়া যাক। আমার প্রস্তাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যরা কেন জানি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কর্নেল শাফায়াত ব্রিগেডিয়ার খালেদের হয়ে জবাব দিলেন,

– ব্রিগেডিয়ার খালেদ বঙ্গভবনে যাবেন না। তার প্রতির্নিধি পাঠানো হবে। জবাব শুনে রসিকতাচ্ছলে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

– আমরাতো নিজেরাই ছুটে এসেছি। আপনারা আমাদের সাথে কোন আলোচনা করতে আদৌ রাজি হবেন কিনা সে বিষয়েও আমরা নিশ্চিত ছিলাম না তবু এসেছি।

আপনাদের সাথে বসে আলোচনা করতে আমাদেরতো কোন ভয় হচ্ছে না; সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিনিধি পাঠাতে চাচ্ছেন কেন? নিজেই চলুন না আমাদের সাথে। ভয় পাচ্ছেন নাকি স্যার? For heaven's sake have a heart! We must have mutual trust and confidence and that is the only basis on which we shall succeed to find out a way to salvage the nation from this uncalled for crisis. Don't you agree with me Sir? আমার রসিকতার কোন জবাব দিলেন না খালেদ ভাই। ঠিক হল, তাদের তরফের প্রতিনিধি হয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক যাবেন আমাদের সাথে বঙ্গভবনে। তাদের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দু'জনকে সাথে করে আমরা ফিরে এলাম বঙ্গভবনে।

আসার পথে দেখলাম রাস্তাঘাটে মানুষজন নির্লিপ্তভাবে চলাফেরা করছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাকা শহর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে। স্বাভাবিক অবস্থার আড়ালে কি ভীষণ বিস্ফোরনুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে জনগণ এখন পর্যন্ত বে-খবর। অন্যান্য দিনের মতই আজও তারা বেরিয়ে পড়েছে জীবিকার তাড়নায়।

বঙ্গভবনের গেটেই নজরে পড়ল বিডিআর-এর সশস্ত্র সৈনিকরা পজিশন নিয়ে আছে। মিলিটারি সেক্রেটারীর কামরায় কর্নেল মান্নাফ ও মেজর মালেককে বসিয়ে আমি ও নুর গিয়ে ঢুকলাম প্রেসিডেন্টের কামরায়। সেখানে প্রেসিডেন্টের সাথে জেনারেল ওসমানী ও কর্নেল রশিদকে আলাপরত অবস্থায় পেলাম। হুদা ব্যস্ত ছিল নোট নেয়ায়। আমরা ঢুকতেই তারা জানতে চাইলেন, ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা কি? আমি বিস্তারিত সবকিছু খুলে বলে জানালাম, ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বেই ঘটেছে সব কিছু। তাদের সবার তরফ থেকে চারটি দাবি নিয়ে এসেছেন কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক। এরা দু'জনেই জেনারেল ওসমানীর কাছে বিশেষভাবে পরিচিত; তাই নাম শুনতেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন,

– How could they give their allegiance to Khaled! জবাবে আমি বললাম,

– স্যার, মানুষের চরিত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীল। এ নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই এখন। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূল সমস্যা নিয়েই ভাবতে হবে। সবাই আমাদের অভিমত কি সেটা জানতে চাওয়ায় নূর ও আমার পক্ষ থেকে আমিই আমাদের অভিমত জানালাম,

– প্রথমত: আমি মনে করি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের এই putch কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমরাই বেশি শক্তিশালী। জনগণ এবং সৈনিকরা যখন তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে

পারবে তখন এই ক্যু'দাতা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। শুধু তাই নয়: তখন তারা এর বিরোধিতা করার জন্যও মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের তরফ থেকে কোন প্রকার সামরিক অভিযানের তৎপরতা হবে আত্মঘাতী: তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হওয়ার আগে কোন প্রকার সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পরলে দেশের জনগণ এবং বিভিন্ন সেনা নিবাসের সৈনিকরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়বে ফলে দেশে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটবে: জনগণ এটাকে শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর আভ্যন্তরীন ক্ষমতার লড়াই হিসাবে বিবেচনা করে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পরে সব কিছু থেকে নিজেদের দূরে সরিয়েও রাখতে পারে। এই দুই ধরণের অবস্থারই পূর্ণ সুযোগ নিবে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী ত্রানদাতা হিসাবে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরাজিত শক্তিকে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে দেশকে আবার নিয়ে যাবে আগষ্ট বিপ্লবের পূর্বাবস্থায়: জনগণের কিছু বোঝার আগেই। এ ধরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি এই সময় কোন প্রকার দ্বন্দ্বে না গিয়ে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরে দাড়াই তবে আমার বিশ্বাস, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খালেদ চক্রের নিজস্ব কীর্তিকলাপের মাধ্যমেই খসে পরবে তাদের মুখোশ: ফলে দেশবাসী এবং সেনা বাহিনীর সদস্যরা জানতে পারবে তাদের আসল পরিচয়। সবাই যখন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে যে, পরাজিত আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসন এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বিনিময়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য তাদের উস্কানি এবং মদদ নিয়েই পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন; তখন যদি কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় খালেদ চক্রের বিরুদ্ধে তবে সেই উদ্যোগকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও সমর্থন জানাবে দেশবাসী। ঠিক একইভাবে যেমনটি তারা জানিয়েছিল ১৫ই আগষ্ট বিপ্লবকে। সেক্ষেত্রে জাতীয় বেঈমান ও তাদের বিদেশী প্রভুদের যেকোন হুমকির মোকাবেলায় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে জাগ্রত জনতা। সিপাহী-জনতার ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী করা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে; যেমনটি হয়নি আগষ্ট বিপ্লবের পর।

দ্বিতীয়ত: আমি মনে করি জাতিকে ধোকা দেবার জন্য কৌশল হিসাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগীরা প্রেসিডেন্ট মোশতাককে সামনে রেখে আমাদের নিয়োজিত চীফ অফ স্টাফদের অপসারন করে সমস্ত সামরিক বাহিনীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার হীন প্রচেষ্টা করছে। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে এই কাজটি হাসিল করার পর অতি সহজেই তাঁকে সরিয়ে তাদের রাজনৈতিক দোসরদের ক্ষমতায় পুনর্বহাল করবে তারা। তাই আমি মনে করি, জাতীয় বেঈমানদের নীল নকশা বাস্ত বায়নে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কোনরূপ ভূমিকা রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। যদি রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হয় তবে সেটা তাকে করতে হবে আগষ্ট বিপ্লবের চেতনার আলোকেই: তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজিয়ে

রেখেই। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে নয়। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রকে পরিষ্কার করে বলে দেয়া উচিত। তারা যদি প্রেসিডেন্টের শর্ত মেনে নিতে রাজি না হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের ছেড়ে দেওয়াই উচিত হবে বলে মনে করি আমি। আমার বক্তব্যের আলোকে রুদ্ধদ্বার অবস্থায় আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। আমার যুক্তি মেনে নিয়ে সবাই একমত হলেন এই মুহূর্তে কোনরূপ সামরিক সংঘর্ষে যাওয়া ঠিক হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের প্রতিনিধিদের কি বলা হবে সেটাও ঠিক করে নেয়া হল। এরপর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেককে ডেকে পাঠানো হল প্রেসিডেন্টের অফিস কক্ষে। তারা দু'জনেই কামরায় ঢুকে প্রেসিডেন্টকে সেল্যুট করে দাড়াল। ভাব গম্ভীর পরিবেশ। আমরাও রয়েছি একপাশে। প্রেসিডেন্ট মোশতাক জানতে চাইলেন,

– বলো, তোমাদের কি বলার আছে ? কর্নেল মান্নাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদদের তরফের দাবিগুলি একটা একটা করে ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্টের জবাব জানতে চাইলেন। সব কিছু শুনে খন্দোকার মোশতাক ধীর স্থিরভাবে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দৃঢ়তার সাথে বললেন,

– Well I have heard you patiently, go back and tell the people at the cantonment, if they want me to continue as the President then I shall execute my responsibilities at my own terms for the best interest of the nation and the country. I am not at all prerared to remain as the head of state and government to be dictated by some Brigadier. Before anything I want the chain of command be restored immediately and Khaled should allow my three chief of staffs to comeover to Bangabhaban without any further delay. Khaled should also withdraw the troops from the relay station so that the national radio and TV can resume normal broadcasting at the soonest possible time. My priority at this time is to bring back normalcy in the country. আমার নির্দেশ যদি খালেদ মানতে রাজি না হয়; তবে তাকে বলবে he should comeover to Bangabhaban and takeover the country and do whatever he feels like. আমি একটা রিক্সা ডাইকা আগামসী লাইনে যামুগা।

প্রেসিডেন্টের জবাব শুনার পর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেকের সঙ্গে ফিরে এলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স এ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যান্য সবাই আমাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে ছিলেন।

কর্নেল মান্নাফ সবার উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরলেন। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, খন্দোকার মোশতাকের কাঁধে বন্দুক রেখে তার অভিসন্ধি হাসিল করা সম্ভব হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদের চাল যে করেই হোক না কেন তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী জনাব মোশতাক ধরে ফেলেছেন এবং তাই তিনি তার ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করেছেন। মুহূর্তে চাঁপা আক্রোশে ফেটে পড়ল সবাই। কর্নেল শাফায়াত ক্ষোভে বলে উঠলেন,

- How dare he speak's like that? তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বলে উঠলেন,

- Allright. we shall see. বলেই কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার মঈন, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত, কর্নেল রউফ, মেজর মালেক প্রমুখকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গিয়ে পাশের রুমে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বসলেন। খালেদ চক্রের মূল সমস্যা ছিল, সেনা পরিষদের সাংগঠনিক শক্তি, সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে জেনারেল জিয়ার এবং জাতীয় পরিসরে মোশতাক সরকারের জনপ্রিয়তা। আমাদের সমস্যা ছিল খালেদ চক্রের বাকশালপন্থী চেহারা উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ২৫বছর মেয়াদী চুক্তির আওতায় ভারতীয় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ না করে দেয়া। মিনিট বিশেক পর তারা ফিরে এলেন নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা শেষ করে।

- ডালিম, খন্দোকার মোশতাক যখন আমাদের দাবিগুলো মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে রাজি হচ্ছেন না; সেক্ষেত্রে তাকে প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বললেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।

- জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করাটা হবে সংবিধান বিরোধী। তাছাড়া, আইনের মানুষ হয়ে জাষ্টিস সায়েম কি অসাংবিধানিকভাবে এভাবে রাষ্ট্রপ্রতি হতে সম্মত হবেন? জবাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

- Well, যে ভাবেই হোক না কেন; এই হস্তান্তরকে আইনসম্মত করে নিতে হবে। জাষ্টিস সায়েমকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমার।

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা থেকে আঁচ করতে অসুবিধা হল না কোন অদৃশ্য সুতার টানে তিনি এ ধরণের সংবিধান বর্হিভূত একটা সমীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন; কোন একটা বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য।

– এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপ না করে আমরা কিছুই বলতে পারব না স্যার। আপনি আপনার প্রতিনিধিদের আমাদের সাথে দিয়ে দেন: বঙ্গভবনে ফিরে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপের পর তার জবাব তারা আপনার কাছে নিয়ে আসবেন।

– বেশ তাই হবে। সম্মত হলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

– Well Sir, if there is nothingelse from your side then I think we should leave now. বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালাম। সেই ক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবে খালেদ ভাই বললেন,

– ডালিম, একটা কথা- আমরা জানি তুমি, নূর, পাশা, শাহরিয়ার, হুদা, রাশেদ, মহিউদ্দিন ও অন্যান্যরা সবাই নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা যুদ্ধকাল থেকেই দেশ ও জাতি সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণাও প্রায় এক। আমাদের তরফ থেকে আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, কর্নেল রশিদ এবং কর্নেল ফারুক ছাড়া কারো বিরুদ্ধেই আমাদের তেমন কোন অভিযোগ নেই। Rather we expect your co-operation to fulfil our dreams. I request earnestly, please join us and strengthen our hands for the cause.

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা শুনে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। অভাবনীয় প্রত্যাশা! বুঝতে পারছিলাম না তার এ প্রস্তাবে কতটুকু আন্তরিকতা রয়েছে। পাল্টা ক্যু'দাতার তাৎপর্য কি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসররা বুঝতে পারছেন না? এটা অসম্ভব! আর সব বুঝে শুনে এ ধরণের প্রস্তাব রাখার মানে হল এটাও একটি অতি সূক্ষ্ম চাল। প্রেসিডেন্টের মত আমাদেরও এই রাষ্ট্র বিরোধী চক্রান্তে জড়িয়ে ফেলতে চাইছেন চক্রান্তকারীরা। একটু ভেবে নিয়ে আমি জবাব দিলাম,

– স্যার, এখন পর্যন্ত নিজেদের সম্পর্কে ভাববার কোন সময়ইতো পেলাম না তাছাড়া ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে সবার সাথে আলাপ-আলোচনা করা ছাড়া আমাদের পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়। আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক করা হবে আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কি করব। স্যার, আপনার স্বপক্ষে যারা রয়েছে তাদের অনেকেই ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় আমাদের স্বপক্ষেই ছিল এ সম্পর্কে আপনিও অবগত রয়েছেন। আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলছি, জেনারেল জিয়া আমাদের কিংবা আগষ্ট বিপ্লবের তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন অথবা সেনা বাহিনীর স্বার্থ রক্ষা করে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এর কোনটাই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। এ ধরণের অভিযোগ এবং প্রচারণা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে করি আমরা। বিনা কারণে তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে তার উপর অনাস্থা আনার

অযুহাতে এই ধরণের একটা জাতীয় সংকট সৃষ্টি করার উদ্যোগ কখনোই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি করার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এতটুকুই বলবো, ১৫ই আগষ্টের চেতনা এবং ৩রা নভেম্বরের উদ্দেশ্য এক নয়। ১৫ই আগষ্ট এবং ৩রা নভেম্বরের ঘটনা কোন দিনই বাংলাদেশের ইতিহাসে একইভাবে লেখা হবে না।

স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের নাগপাশ এবং বিদেশী প্রভুদের যাতাকল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে স্বাধীনতার চেতনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের পথ খুলে দেবার জন্যই সংঘটিত হয়েছিল ১৫ই আগষ্টের মহান বিপ্লব। আগষ্ট বিপ্লবের সফলতা এবং এর প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন এক উজ্জ্বল-অবিস্মরণীয় মাইলফলক হয়ে চিহ্নিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে। আপোষহীন সংগ্রামী বাংলাদেশীদের জন্য জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিভু হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে ১৫ই আগষ্টের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন। পক্ষান্তরে, ৩রা নভেম্বরের ঘটনা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চক্রান্তের কালো অধ্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হবে ইতিহাসে। জানি, আমার এই বক্তব্য ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের কারো কাছেই গ্রহণীয় নয়; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতই আমার কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করবে। আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করি সেটা যথা সময়ে আপনারা জানতে পারবেন।

এভাবেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগিদের সাথে বোঝাপড়া শেষ করে বঙ্গভবনে ফিরে এলাম। সঙ্গে এসেছিলেন তাদের দুই প্রতিনিধি কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক। পথে নূর আমায় বলল,

– স্যার আপনি যেভাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কথাগুলো বলছিলেন তাতে আমি কিন্তু বেশ কিছুটা শংকিতই হয়ে উঠেছিলাম। নূরের কথার কোন জবাব না দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম–

যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছে নূর। এতটা খোলাখুলিভাবে ঐ ধরণের কথা বলাটা নিঃসন্দেহে ছিল একটা বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কথাগুলি বেফাঁস বেরিয়ে এসেছিল মুখ দিয়ে automatically. নিঃস্বার্থভাবে কোন সঠিক এবং মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলে প্রয়োজনীয় সাহসিকতা হয়তো বা আল্লাহ্‌তা'য়ালাই যুগিয়ে দেন।

বঙ্গভবনে ফিরে এসে প্রেসিডেন্টকে জানালাম, চক্রান্তকারীরা জাষ্টিস সায়েমের মাধ্যমে ক্ষমতা পুনর্দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সব শুনে প্রেসিডেন্ট মোশতাক জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার এ সিদ্ধান্তের কথা জেনে নিয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক বঙ্গভবন থেকে ফিরে যান।

প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের পর সেনা পরিষদের কার্যনিবাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে এক জরুরী বৈঠক হয়। বৈঠকে বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের exposed নেতারা কৌশলগত কারণে দেশ ত্যাগ করে দেশের কাছাকাছি কোন রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে অবস্থান নেবে। সার্বিক বিবেচনায় ব্যাংকক-কেই সর্বত্তোম জায়গা হিসাবে বিবেচিত করা হয়। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কি করে খালেদ চক্রের পতন ঘটাতে হবে সেই বিষয়ে। জাতীয় বেঈমান পরাজিত আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠি এবং তাদের মুরুব্বী ভারতের হাতে ক্রিয়াণক খালেদ চক্রকে উৎখাত করার জন্য সেনা পরিষদ কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী এবং জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক অন্যান্য দল ও গ্রুপ নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে খালেদ চক্রের মুখোশ উন্মোচিত হবার পর উপযুক্ত সময়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আর একটি অভ্যুত্থান ঘটাবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা ছিল প্রেসিডেন্ট মোশতাক এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সম্পর্কে। সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ চক্রের পতনের পর সর্বপ্রথম কাজ হবে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাকে আবার সেনা প্রধান হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। নিজ পদে অধিষ্ঠিত হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানাবেন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, নেতৃবৃন্দের যে অংশ ব্যাংককে অবস্থান করবে তার সাথে প্রয়োজনমত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে সেনা পরিষদ। জরুরী বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলো বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের ইউনিটগুলোকে জানিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। কর্নেল তাহেরও তখন বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে তিনি বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। বৈঠক যখন শেষ হয় তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংককে যাবার সব ব্যবস্থা করার জন্য প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েট থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদকে আমাদের দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য ফোন করলাম,

– স্যার, আমাদের ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি হয়তো বা জেনেও থাকতে পারেন। তবুও কথা দিয়ে এসেছিলাম তাই কথা রক্ষার্থে জানাচ্ছি: রশিদ, ফারুক, শাহরিয়ার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, মহিউদ্দিন, শরফুল, মাজেদ, কিসমত, নাজমুল, মোসলেম, হাশেম, মারফত এবং আমি স্বপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ রাতেই চলে যাব আমরা। প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েটের মাধ্যমে। আপনার

সাথে সহযোগিতা করার অনুরোধ রাখা সম্ভব হল না স্যার। দেশ ও জাতির জন্য ভবিষ্যতে আর কিছু করার তৌফিক আল্লাহ্‌পাক যদি নাই দেন সেটা মেনে নিতে পারব; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে '৭১ এর চেতনা এবং নীতির প্রশ্নে আপোষ করে জাতীয় বেঈমান হিসাবে পরিচিতির যে গ্ল্যানি সেটা সহ্য করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়; হবেও না কোনদিন।

– রশিদ-ফারুক সম্পর্কে আমাদের বিরূপ মনোভাব আছে, তারা দেশ ছেড়ে যেতে চাইতে পারে কিন্তু তোমরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছ কেন সেটা এখনো বুঝতে পারছি না। আবার কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

মুখে আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেও বুঝেছিলাম আমাদের দেশ ত্যাগের খবরটা পেয়ে হাঁফ ছেড়েই বেঁচেছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগিরা এটা ভেবে যে, তাদের প্রতিপক্ষের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠির threat থেকে রেহাই পেলেন তারা।

এভাবেই দেশ ও জাতিকে একটি সম্ভাব্য আত্মঘাতী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়ে খালেদ চক্র ও নব্য চানক্যদের ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করার কৌশলগত কারণেই ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল রাত সাড়ে দশটায় বিমানের একটি স্পেশাল ফ্লাইটে আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম। আমাদের দেশ ত্যাগের মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে মূলতঃ সেনা পরিষদ এবং কর্নেল তাহেরের অধিনস্থ গণবাহিনীর যৌথ নেতৃত্বে সংঘটিত হয় ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক সিপাহী-জনতার বিপ্লব। ক্ষমতাচ্যুত হয় খালেদ চক্র। জাতীয় বেঈমান ও তাদের বিদেশী প্রভুদের সব চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে দেয় অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা। দেশের আপামর জনসাধারণ ৭ই নভেম্বরের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন জানিয়ে সেনা বাহিনীর বীর জোয়ানদের সাথে যোগ দেয় ঠিক একইভাবে যেভাবে তারা সমর্থন জানিয়েছিল আগষ্ট বিপ্লবকে। এই দুই ঐতিহাসিক দিনে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র সংগ্রামী জনতার ঢল নেমেছিল পথে-প্রান্তরে, অলিতে-গলিতে, শহরে-গ্রামে। নামাজে শুক্‌রানা আদায় করেছিলেন মুসল্লিরা মসজিদে-মসজিদে। শহর-বন্দরে খুশীতে আত্মহারা জনগণের মাঝে মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ এবং জনগণের একাত্মতায় সৃষ্টি হয়েছিল এক দূর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য। সেই দুই ক্রান্তিলগ্নে সম্মিলিতভাবে তারা বাংলাদেশকে পরিণত করেছিল এক দুর্জয় ঘাঁটিতে। সমগ্র জাতি প্রস্তুত ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যেকোন আগ্রাসন কিংবা হুমকির বিরোধিতা করার জন্য। সফল বিপ্লবের পর কুচক্রীদের নেতা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং তার কয়েকজন ঘনিষ্ট সহযোগী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। কর্নেল

শাফায়াত জামিল ও অন্যান্যদের বন্দী করা হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে আবার তাকে আর্মি চীফ অফ স্টাফের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার আবেদন জানান। কিন্তু জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ জেনারেল জিয়াউর রহমানের আবেদনে পুনরায় রাষ্ট্রপতি হতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি ঐদিনই জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দান করে ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনা দুইটি বিচ্ছিন্ন নয়। ঘটনা দুইটি একই সূত্রে বাঁধা। একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল এই দুইটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। ১৫ই আগষ্ট অগ্রণীর ভূমিকায় ছিল সেনা পরিষদ আর ৭ই নভেম্বর একই দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করেছিল সেনা পরিষদ এবং কর্নেল তাহেরের অধিনস্থ গণবাহিনী। এই দুইটি ঐতিহাসিক জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার চেতনা, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেতনা, ইন্দো-সোভিয়েত বলয়ের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার চেতনা, স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার চেতনা– এক কথায় বলতে গেলে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

৩রা নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর এই সময়ের আমার এ ঘটনা বিবরণের স্বপক্ষে প্রমাণ হয়ে আছে ৭ই নভেম্বর সফল বিপ্লবের পর সৈনিক-জনতার মুখে ধ্বনিত শ্লোগানগুলি। সেদিন ঢাকার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল গগনবিদারী শ্লোগানে,

– নারায়ে তাক্‌বীর। আল্লাহু আক্‌বর।

– সিপাহী-জনতা ভাই ভাই। খালেদ চক্রের রক্ত চাই।

– খন্দোকার মোশতাক জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

– মেজর ডালিম জিন্দাবাদ। কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ।

– ডালিম তাহের ভাই ভাই। বাকশালীদের রক্ষা নাই।

– রশিদ-ফারুক জিন্দাবাদ। খালেদ মোশাররফ মুর্দাবাদ।

– জেনারেল জিয়া যেখানে, আমরা আছি সেখানে।

১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল জাতীয় সংসদে মরহুম শেখ মুজিবের উপর একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তখন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরহুম জিয়াউর রহমান

এবং স্পীকার ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ। কোন মৃত ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গেলে প্রথাগতভাবে তার জীবন বৃত্তান্ত পড়ে শোনানো হয় এবং সংসদের কার্যবিবরণীতে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল শেখ মুজিবের উপর যে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তা উত্থাপন করেন স্বয়ং মীর্জা গোলাম হাফিজ। তার পঠিত শেখ মুজিবের জীবন বৃত্তান্তের শেষ লাইনে বলা হয়, "১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

এটাই মূল কথা। শেখ মুজিবের মৃত্যু একটি সাধারণ হত্যাকান্ড নয়। শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যু হয়েছিল রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রক্রিয়ায়। একই দিনে শেখ মুজিবের পতনের রাজনৈতিক দিকটি খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে ব্যাখ্যা করে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। সেটা তিনি করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনুমোদনক্রমে। তিনি বলেছিলেন, "১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে যে কুখ্যাত কালা-কানুন পাস করে বাকশাল নামক একদলীয় স্বৈরাচারী জগদ্দল পাথর দেশের তৎকালীন ৮ কোটি লোকের বুকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল; সেটা ছিল একটা সংসদীয় ক্যু'দাতা (অভ্যুত্থান)। ঐ একদলীয় স্বৈরাচারী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সংগঠিত হয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।" একই অধিবেশনে পরে তিনি ইনডেমনিটি বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটি ২৪১ ভোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়। ফলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে সংবিধানে সংযোজিত হয় এবং দেশের শাসনতন্ত্রের অংশে পরিণত হয়। এভাবেই জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ও নির্বাচিত সাংসদরা ১৫ই আগষ্টের বিপ্লবের স্বপক্ষে চুড়ান্ত ফয়সালা করে বিপ্লব ও বিপ্লব সংগঠনকারীদের সাংবিধানিক বৈধতা দান করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের বিপ্লব দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সমসাময়িক দেশ বিদেশের প্রতিক্রিয়াতেই তা লেখা রয়েছে। ইতিহাসেও তা থাকবে। আজ আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ৩০বছর আগে স্বাধীনতার যাত্রাকাল থেকে ক্ষমতাসীনরা যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করত, যদি সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা থাকত, যদি বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কার্যক্রম ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকত, যদি অন্যায়-অত্যাচার, হত্যা-নির্যাতন না হত, যদি সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল থাকত তাহলে দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হত না।

১৬ই আগষ্ট ১৯৭৫ দৈনিক ইত্তেফাকে 'ঐতিহাসিক নবযাত্রা' নামে সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি:- "দেশ ও জাতির এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণে ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার প্রত্যুষে প্রবীণ জননায়ক খন্দোকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন এবং এক ভাবগম্ভীর অথচ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে খন্দোকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের আইন-শৃংখলাকারী সংস্থাসমূহ যথা: বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনী প্রধানগণও নতুন সরকারের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে এই পরিবর্তনের এক বিষাদময় পটভূমি রহিয়াছে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত ও অসংখ্য মা-বোনের পবিত্র ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা একদিন যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম সেখানে আমাদের আশা ও স্বপ্ন ছিল অপরিমেয়। কিন্তু বিগত সাড়ে তিন বছরেরও উর্ধ্বকালে দেশবাসী বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা লাভ করিয়াছে তাহাকে এক কথায় হতাশা ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার আশা-আকাংখা রূপায়নে খন্দোকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিতে আগাইয়া আসিতে হইয়াছে। তারও কারণ ছিল। পূর্ববর্তী শাসকচক্র সাংবিধানিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে কোনদিন ক্ষমতা লিপ্সার বাধ দিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় না। আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব অনেক। বাংলাদেশের এক মহা ক্রান্তিলগ্নে জননায়ক খন্দোকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সুসংহত করিতে হইলে জনগণের প্রতি অর্পিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমাদের সকলকে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া যাইতে হইবে।"

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ এর বৈপ্লবিক সফল অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। অম্লান হয়ে থাকবে নিজ মহিমায়। সেদিন আগষ্ট বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মাটি থেকে স্বৈরশাসনের একনায়কত্ব ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটেছিল এবং উন্মোচিত হয়েছিল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্বার। আগষ্ট বিপ্লব বাকশালী কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে গতিশীলতার সৃষ্টি করে সূচনা করে এক নতুন দিগন্তের। '৭৫ এর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময় বাকশালী প্রবীণ নেতা মরহুম আব্দুল মালেক উকিল লন্ডন সফর করছিলেন। মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তখন সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "বাংলাদেশে ফেরাউনের পতন হয়েছে।" আওয়ামী-বাকশালী নেতা জনাব মহিউদ্দিন আহমদ খন্দোকার মোশতাক

সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে ছুটে গিয়েছিলেন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকে আগষ্ট বিপ্লবের অপরিহার্যতা বুঝিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করার জন্য। জনাব আবু সাইদ চৌধুরী মুজিব সরকারের সাবেক রাষ্ট্রপতিও স্বেচ্ছায় খন্দোকার মোশতাকের বিশেষ দূত হিসেবে ও পরবর্তিকালে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র সফর করে আগষ্ট বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে সে সমস্ত দেশের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির উন্মেষ ঘটেছিল জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তারই ধারা আজও দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির প্রতীক ১৫ই আগষ্টের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও তার চেতনা সর্বকালে সর্বযুগে এদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিক ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাবে নব্য সৃষ্ট মীরজাফর ও জাতীয় বেঈমানদের উৎখাত করতে। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার জ্বলন্ত নিদর্শন ১৫ই আগষ্টের মহান বিপ্লব।
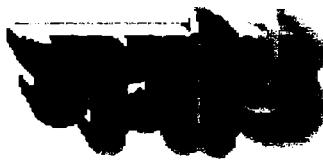
বিজ্ঞপ্তি

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল একটি স্বপ্ন। অনেক রক্ত - অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা। একটি ফুলকে বাচাঁনোর জন্য যারা হাসিমুখে সবকিছুই করেছিল দান; তাদের আত্মত্যাগের অগুণিত বীরগাঁথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলাদেশের পথে-প্রন্তরে। কালের আবর্তে ম্লান হয়ে গেলেও সহযোদ্ধাদের সে সমস্ত না বলা ঘটনা আজো যারা বেঁচে আছে তাদের অনেকের মনেই জীবন্ত স্মৃতি হয়ে জ্বলছে। লেঃ কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম বীর উত্তম এর লেখা তেমনি কয়েকটি অব্যক্ত কাহিনীর সংকলন "কিছু কথা কিছু ব্যাথা" পাঠকদের জন্য হবে পরবর্তী উপহার।

উৎসুক পাঠকদের জন্য রয়েছে দু'টি ওয়েব সাইট:-

১। বাংলায়- www.majordalimbangla.com

২। ইংরেজীতে- www.majordalim.com

ালিম বলছি...

সীম শ্রদ্ধা এবং প্রত্যয়ের সাথে এই বই বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের
দেরকেই উৎসর্গ করলাম যারা স্বাধীনতা, সত্য, ন্যায় এবং অধিকারের জন্য
ংগ্রাম করার সাহস রাখবেন।

ংলাদেশ এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হলেও পুরো সত্য
খনো উদঘাটিত হয়নি। যারা প্রথম থেকেই ভারতীয় নীল নকশা সম্পর্কে অবগত
লেন এবং শেখ মুজিবের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা তেমন
ঠিন ছিল না যে দেশের সার্বিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে চরম পরিণতির দিকেই ধাবিত
বে। কিন্তু যারা শেখ মুজিবের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখেছিলেন তাদের পক্ষে
তমনটি যে ঘটবেই সেটা মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না।
শখ মুজিব সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন
নটাও ছিল অসাধারণ। সমভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিও ছিল অত্যন্ত
টিল। সেদিক থেকে বিচার করলে এই বইয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে আসা প্রত্যেকটি
সুই বিশদ বিশ্লেষনের দাবিদার। আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব ছিলেন অতি
নপ্রিয় একজন কাংখিত নেতা কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনিই হয়ে উঠেন
নধিকৃত নিকৃষ্টতম এক স্বৈরাচারী শাসক। তার এই দুই বিপরীত চরিত্রের মাঝে
য়েছে এক হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র। শেখ মুজিবের এই চারিত্রিক দ্বৈততাকে এক
ত্রে বেঁধেছিল কোন একটি বিশেষ তাড়না:-
জনীতি? আদর্শ? ভীতি? হীনমন্যতা? আত্মম্ভরিতা? উচ্চাভিলাষ? পাঠক
ষয়টিকে কিভাবে দেখবেন তার উপরই নির্ভর করবে এর জবাব বইয়ের বিষয়
স্তুগুলো ঐ সমস্ত লোকদের জীবন থেকে নেয়া যারা শুধুমাত্র নিঃক্রিয় নিরব দর্শক
লেন না। তারা সবাই ছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী
র মুক্তিযোদ্ধা। তখনকার ঘটনাপ্রবাহ এবং পরবর্তিকালে স্বাধীন বাংলাদেশের
জনীতির সাথেও তারা ছিলেন স্বাভাবিক কারণেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে
ড়িত। তাই যুক্তিসঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশ সম্পর্কে কর্তৃত্বের সাথে কথা
লার অগ্রাধিকার রয়েছে তাদের। জনগনের একাংশের মাঝে ঐ সমস্ত বিশেষ
রুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে অস্বচ্ছতা রয়েছে তা দূর করার জন্য অনেক শ্রদ্ধেয়, পদস্থ',
তিষ্ঠিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বক্তব্য এবং মতামতও এই বই-এ দেয়া হয়েছে।
ঠকের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে এই বই প্রকাশ করা হয়নি। এর
ল লক্ষ্য হল পাঠকদের জন্য কিছু চিন্তার খোরাক যোগানো। তথ্যবহুল
টনাসমূহের আলোকে তারা যেন সত্যকে খুঁজে নিতে পারেন।

মার প্রিয় খালাম্মা, নিম্মী, স্বস্তি, রাকিব, শাফি, হিমু, আমীরুল আজিম এবং
তয়ব গুলজার এর অনুপ্রেরনা ও সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া এ গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন
রা কিছুতেই সম্ভব হতো না। ওদের ঋণ পরিশোধ কখনোই সম্ভব নয়; তবুও
াদের জন্য রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।